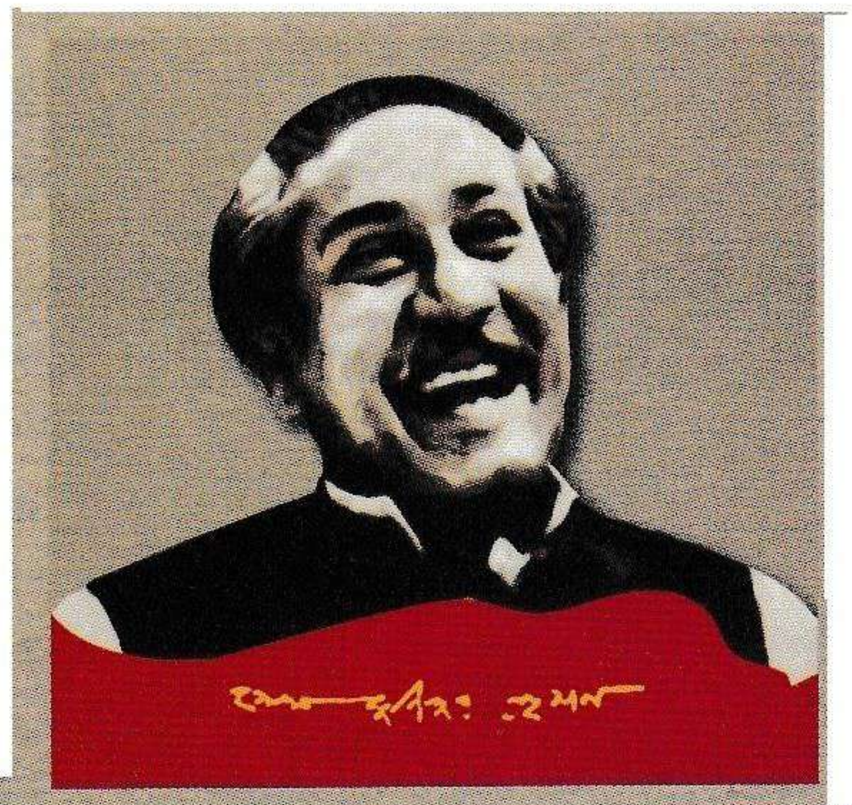
শেখ মুজিব
বাংলাদেশের আরেক নাম

আতিউর রহমান



যদি এদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামের হ্যামিলনের বংশীবাদকের জন্ম না হতো, যদি তিনি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বারে বারে মৃত্যুর মুখোমুখি হবার সাহস না দেখাতেন, যদি সারাটা জীবন তিনি গরিব-দুঃখী মানুষের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য স্বদেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত দৌড়ে না বেড়াতেন, যদি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বারে বারে জেলে যাবার মতো মনের জোর না দেখাতেন তাহলে কি এত দ্রুত আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করতে পারতাম? আর স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য তিনি যদি আমূল পরিবর্তনকামী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার এবং পুনর্গঠনে হাত না দিতেন তাহলে কি তাঁকে এমন ট্র্যাজিক পরিণতির শিকার হতে হতো?

আর সে কারণেই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক। একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। সারা বিশ্বেই একাত্তরে বাংলাদেশ ও শেখ মুজিব একই সঙ্গে উচ্চারিত হতো। সকল অর্থেই তিনিই বাংলাদেশ। শারীরিকভাবে না থাকলেও তিনি যে রয়েছেন আমাদের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে। দিনদিনই তিনি তাঁর দিঘল ছায়া দিয়ে ঢেকে দিচ্ছেন তাঁর প্রিয় বাংলাদেশকে। টুঙ্গিপাড়ায় সাধারণ মানুষের কাছে শুয়ে থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই আমাদের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় বীর। তাঁর কাছে আমরা কতো ভাবেই-না ঋণী।

আমাদের সন্তানদের কাছে তাঁর ঐতিহাসিক অবদান তুলে ধরার আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছেন অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান এই গ্রন্থে। আগামী দিনের বাংলাদেশকে আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হলে আমাদের উন্নয়ন-নীতিকৌশলে বঙ্গবন্ধুর জনহিতৈষী চিন্তা-চেতনাকে পাথেয় করা ছাড়া যে গত্যন্তর নেই সে কথাটিই জোর দিয়ে বলবার চেষ্টা করেছেন লেখক তাঁর গবেষণানির্ভর এই তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থে।

প্রচ্ছদ : শতাব্দী জাহিদ



শেখ মুজিব
বাংলাদেশের আরেক নাম

আতিউর রহমান

শেখ মুজিব
বাংলাদেশের আরেক নাম

আতিউর রহমান

আলোঘর প্রকাশনা

লেখক এবং প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো
অংশ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহার,
পুনরুৎপাদন বা সংরক্ষণ করা যাবে না। তবে আলোচনা-সমালোচনা বা গবেষণাধর্মী নিবন্ধ
লেখার প্রয়োজনে বইটির কোনো অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে নিয়মানুযায়ী ব্যবহার করা
যেতে পারে। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

আলোঘর
প্রকাশনা

শেখ মুজিব বাংলাদেশের আরেক নাম
আতিউর রহমান

গ্রন্থস্বত্ব ■ লেখক

প্রকাশকাল ■ তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৯
দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ২০১৮
প্রথম প্রকাশ ■ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮

প্রকাশক ■ আলোঘর প্রকাশনা
ই/৭, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর সাড়ে ১১, ঢাকা-১২১৬।
ফোন : ০২-৯০২৩৬২৯, ০১৭৬১৪৯২৫৩৭
ই-মেইল : aloprokashana@aloghar.org
ওয়েব : alogharprakashana.com

আলোঘরের বই কিনতে অনলাইনে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/aloghar

প্রচ্ছদ ■ শতাব্দী জাহিদ
গ্রাফিক্স ■ মো. ফখরুল ইসলাম

মুদ্রণ : বর্ণা ডাই কাটিং এন্ড প্রিন্টিং, ২২৪ ফকিরাপুল
১ম লেন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

দাম ■ ১২০০ টাকা

Sheikh Mujib Bangladesher Arek Nam by **Atiur Rahman**
January 2019, Published by Aloghar Prakashana, Dhaka
Price 1200 Taka
US$ 25

ISBN : 978-984-93081-6-4

উ ৎ স র্গ

যাঁদের সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,
"আমাদের চাষীরা হলো সবচেয়ে
দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণী"
বাংলাদেশের সেই সংগ্রামী কৃষকদের
করকমলে সশ্রদ্ধায়

প্রাক্ কথন

শেখ মুজিব : বাংলাদেশের আরেক নাম বইটির প্রথম সংস্করণের যখন চূড়ান্ত রূপ দিচ্ছিলাম তখন বাংলাদেশ ছিল অনেকটাই অবরুদ্ধ। দেশে তখনও জরুরি আইন জারি ছিল। অবশ্য, এ বইয়ের অনেক লেখাই বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে অযথা বিতর্কিত করার হীন প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই মূলত, আমি সেসব লেখা লিখেছিলাম। সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের ধন্যবাদ জানাই ঐ সময়ে তাদের দেওয়া সাহসী সমর্থনের জন্য। এই বইটি যখন লিখছিলাম তখনও বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা কোনো বই বের হয়নি। তাঁরই সুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্পাদনায় এরই মধ্যে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও *কারাগারের রোজনামচা* শিরোনামে বঙ্গবন্ধুর দুটো গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশিত হয়েছে। এ বইদুটোতে মূলত, তাঁর কারাজীবনের অভিজ্ঞতার কথা বেশি করে স্থান পেলেও আসলে তাতে বঙ্গবন্ধুর বেড়ে ওঠা এবং বাঙালি জাতির বিকাশের প্রক্রিয়া স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং মনের কথা সহজ করে প্রকাশের এক অতুলনীয় ভঙ্গি এই বইদুটো পড়লে সহজেই আন্দাজ করা যায়। এমন ঝরঝরে বাংলা এবং সোজাসাপ্টা বর্ণনার কারণেই যে বইদুটো আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্যে অনন্য স্থান করে নেবে সে বিষয়ে আমার মোটেও সন্দেহ নেই। যিনি বাংলাদেশের আরেক নাম সেই মানুষটির সংগ্রামী জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত তাঁরই মুখ থেকে শোনা পাঠকদের জন্য এক বিরাট সৌভাগ্য বটে। জেলখানায় বসে প্রতিকূল পরিবেশে তিনি এমন তথ্যপূর্ণ রচনা কী করে লিখলেন তা সত্যি অবাক করার মতো বিষয় বটে। এই বইদুটো পড়লে বোঝা যায়, তিনি নিরন্তর চোখ-কান খোলা রাখতেন। স্বদেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের পাশাপাশি তিনি সমসাময়িক বিশ্বের কথাও লিখেছেন। লিখেছেন গণচীনের কথা, ভিয়েতনামের কথা। আরও লিখেছেন ভারতবর্ষের রাজনীতির কথা। লিখেছেন সাতচল্লিশের দেশভাগের প্রভাবে লাখ লাখ মানুষের শরণার্থী হয়ে যাবার কথা, বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা, লঙ্গরখানার কথা, শরণার্থী শিবিরের কথা। আর লিখেছেন তারুণ্যের অবিশ্বাস্য সাংগঠনিক ক্ষমতার কথা। কী করে এই তরুণদের সংগঠিত করে তিনি প্রথমে ছাত্রলীগ এবং পরে আওয়ামী লীগ গড়ে তুললেন—সেসব কথা এমনভাবে তিনি তাঁর ডায়েরিতে তুলে রেখেছেন যা আজ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি তিনি তাঁর পরিবারের সকল সদস্যের কথাই লিখেছেন। বাবা, মা, স্ত্রী ও সন্তানদের কথা লিখেছেন দারুণ আন্তরিকতার সাথে। বেশিরভাগ সময় জেলে থাকেন বলে পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হতে পারেননি। সে কারণে এক ধরনের অপরাধবোধ তাঁকে অস্বস্তিতে রাখে। এমনকি বড় মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। এ দুঃখের কথা তিনি সেভাবে না লিখলেও পাঠক ঠিকই বুঝতে পারেন তাঁর চাপাকষ্টের মাত্রা কতটা গভীর।

এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্গবন্ধুর লেখা বইদুটোর তিনটি আলোচনা স্থান করে নিয়েছে। তাছাড়া পুরোনো সংস্করণের যেসব সম্পাদকীয় সীমাবদ্ধতা ছিল সেসব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টাও করা হয়েছে নতুন সংস্করণে। দ্বিতীয় সংস্করণের তাগিদটা এসেছিল শিল্পী শতাব্দী জাহিদের কাছ থেকে। এই উদ্যোগ নেবার জন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই সংস্করণের সম্পাদনায় সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই উন্নয়ন সমন্বয়ের ওয়ালিউল ইসলাম, জাহিদ রহমান ও জাহানারা মনসুরকে। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই বইটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশক দ্বীপ্তি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী এস. এম. আমিনুল ইসলামকে তাঁর বদান্যতার জন্য। তিনি সম্মতি দিয়েছেন বলেই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা সম্ভব হলো। আমি জানি, বঙ্গবন্ধু আমাদের তরুণ প্রজন্মের প্রিয় এক নাম। এই বইটি মূলত, তাদের জন্যই লেখা। আশা করি, তারা এই বইটি পড়ে বাংলাদেশকে এবং বঙ্গবন্ধুকে আরও বেশি বেশি ভালোবাসবে।

অনেক সতর্কতা সত্ত্বেও বইটিতে কিছু ভুলত্রুটি হয়তো থেকেই গেল। সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আসুন আমরা বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করি এবং তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে ব্রতী হই।

আতিউর রহমান
২০ আগস্ট, ২০১৭

সূচি

ভূমিকা/হায়াৎ মামুদ ১১
প্রস্তাবনা ১৭
০১. তিনিই বাংলাদেশ ২৩
০২. যে মানুষ স্বদেশের প্রতিচ্ছবি : তাঁর জীবন ও জনকল্যাণ-ভাবনা ২৮
০৩. বাঙালি মধ্যবিত্তের যোগ্য প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধু ১০৭
০৪. ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর কারাবরণ এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা ১৩৪
০৫. ৭ই মার্চ : বাঙালির সার্বিক মুক্তির ডাক ১৩৯
০৬. বঙ্গবন্ধু ও অসহযোগ আন্দোলন ১৪৪
০৭. স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে অযথা বিতর্ক ১৫৭
০৮. বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তি চিন্তা (এক) ১৭১
০৯. বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তি চিন্তা (দুই) ১৮২
১০. বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ১৯৩
১১. দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালির কৃষকপ্রীতি ২০৫
১২. বঙ্গবন্ধুর শিল্প ও সংস্কৃতি-ভাবনা ২১৫
১৩. বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের সূচনাপর্বের দলিল ২৪৪
১৪. কারাগারের রোজনামচা : মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার দলিল ২৫০
১৫. গুণীজনদের দৃষ্টিতে বহুমাত্রিক বঙ্গবন্ধু ২৫৮
১৬. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ : নিরবচ্ছিন্ন এক ইতিহাস ২৬৬
১৭. উপসংহার ২৭১

পরিশিষ্ট

০১. আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচি ২৭৭
০২. বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য ভাষণের অংশবিশেষ (১৯৫৫-১৯৭৫) ২৯২
০৩. বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি ভাষণ ৪০৬
০৪. একুশ দফা (১৯৫৪), ছয় দফা (১৯৬৬), এগারো দফা (১৯৬৯) ৪৩৩
০৫. স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র (মূল বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ) ৪৪৩
০৬. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু কবিতা ৪৪৯
০৭. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু গান ৪৭৪
০৮. আলোকচিত্রে বঙ্গবন্ধু ৪৯০
তথ্যসূত্র ৪৯৯
নির্ঘণ্ট ৫০৩

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

মরদেহী মানুষের সীমাবদ্ধতা অনেক। সে মনন ও আবেগের অলক্ষ্য ব্যাপ্তির বাইরে কোনোখানেই স্বাধীন নয়। পঞ্চভৌতিক দেহের আধারে বন্দী হওয়ায় শরীরধর্মের শাসনে তাকে থাকতেই হয়, ফলে সে রোগ-শোক ও জরা-মৃত্যুর অধীন। সমাজবদ্ধ জীব বলে সামাজিক আচরণ-কাঠামো ও সংস্কারকে বিবেচনায় না এনে তার উপায় নেই। মূল্যবোধ ও ঔচিত্যজ্ঞানও তো সংস্কৃতিনির্ভর, তাই ব্যক্তিমানুষের বেড়ে ওঠার ভিতর দিয়ে তার অজ্ঞাতসারে তার নিজস্ব সংস্কৃতিই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অগত্যা ব্যক্তি যতই নিজেকে স্বাধীন ভেবে অহং পরিতৃপ্ত করুক না কেন, নিজের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের অনুশাসন তার অজ্ঞাতেই তার চৈতন্যে বেড়ি পরায়। আমাদের অবচেতন যেমন সজ্ঞানতা ও যুক্তি-বহির্ভূত ঘটনা, এসবও তেমনি অন্তরালে দাঁড়িয়ে থাকে, টের পাওয়া যায় না। এভাবে এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে ব্যক্তি আর নিঃসঙ্গ থাকে না, সমাজ তাকে নিজের গভীরে শোষণ করে নেয়, সে সমাজের সম্মিলিত সমষ্টির একটি অংশ হয়ে ওঠে। তার দুটি সত্তা—কখনো উল্লোলভাবে সামাজিক আবার কখনো-বা সমষ্টিছিন্ন নিভৃত একক—সমান্তরালভাবে কাজ করে চলে। কিন্তু সমান্তরালতার যে ধর্ম, দূরত্ব বহাল রেখেই দূরযানী যাত্রা, তা ছিন্ন হয় গতিপথের নৈকট্য ও মিলনে। তখন সমাজ ও ব্যক্তি পরস্পর-অবলম্বী ও অনন্যনির্ভর হয়ে ওঠে। সমষ্টি ও ব্যষ্টি একে অন্যের প্রতিবিম্ব হতে চায়। সমাজে বা রাষ্ট্রের একক ব্যক্তির অর্জন ও সর্বজনস্বীকৃতিতে নায়কের ভূমিকায় অধিষ্ঠান এভাবেই জনগোষ্ঠীর ভূগোল ও নির্দিষ্ট কাল দ্বারা সম্পন্ন হয়ে ওঠে। ইতিহাস তার নায়ক নির্মাণ সম্পন্ন করে নিয়ে তাকে দিয়ে নিজের কথা বলিয়ে নেয়।

কোনো জনগোষ্ঠীর বিকাশ ও বিবর্তনের এই রূপরেখার মুখচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধুর যাপিত জীবন ও কর্ম প্রত্যক্ষ করলে। তাঁর কর্ম মূলত রাজনীতি-সম্পৃক্ত। কিন্তু জীবন তো সামাজিক ব্যক্তিমানুষের জীবন; সেখানে সংসারধর্ম পালন, প্রত্যক্ষ সমাজপরিবেশে নিকট বা দূর প্রতিবেশীর সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের চরিত্রগুণ, মানুষের প্রতি ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ, ব্যক্তি-স্বার্থ উপেক্ষা করে সমষ্টি-স্বার্থের জন্য মমতা ইত্যাদির প্রমাণ তাঁর মনের গড়ন চিনতে সাহায্য করে। আমরা দেখতে পাই, এক গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সন্তানের উত্থান। দেশের এক নিভৃত গ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠদ্দশায় স্কুল-ইন্সপেক্টারের সামনে অকুণ্ঠচিত্তে সত্য উচ্চারণের সৎসাহসে আমরা চমৎকৃত হই, এবং গ্রামীণ বালকের নির্ভীকতা আমাদের আকৃষ্ট করে। তখনো কেউ জানি না, ঘটনাটি কোনো আকস্মিক আবেগস্ফুরণ নয়, বরং এই বালকের চরিত্রকাঠামো। সেটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকবে কলকাতায় ছাত্রজীবনে, ছাত্র-আন্দোলনে ভূমিকা গ্রহণে এবং বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠতা লাভে। অবশিষ্ট পথপরিক্রমার সবটুকুই আমাদের জানা। প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীণ ব্যক্তিরা যেমন তা জানেন, অব্যবহিত পরবর্তী প্রজন্মও তার অনেকখানির সঙ্গে পরিচিত, আর বর্তমানের

বয়ঃকনিষ্ঠ দেশবাসী জেনেছেন অন্যের বয়ানে, লোকশ্রুতির মাধ্যমে, এদের রাজনৈতিক ইতিহাসের পঠনপাঠনসূত্রে।

ব্যক্তি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা, আমার বিবেচনায়, অত্যন্ত ব্যতিক্রমী, দলছুট এক ঘটনা। খুবই লক্ষণীয় বিষয়, প্রাক্-সাতচল্লিশ অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে সত্যিকার অর্থে কোনো 'সাধারণ' অভাজন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, সোহরাওয়ার্দী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবুল হাশিম প্রমুখ সকলেই 'অভিজন', এলিট শ্রেণির মানুষ। এমনকি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক যে তাদেরই স্বগোত্র–তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, পেশা, অতুলনীয় বাগ্মিতা বিচার করলে না মেনে উপায় নেই। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও 'অসাধারণ' তাঁর উৎসের কারণে; একই সঙ্গে ধর্মবেত্তা ও ধর্মীয় নেতা হওয়ার ফলে এক ধরনের বিশিষ্টতা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তাঁর ক্ষেত্রে। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য উপলব্ধি না করলে এই বয়ঃকনিষ্ঠ উত্তরসূরির অনন্যতা শনাক্ত করা সম্ভব নয়। তাঁর অসামান্যতা ছিল তাঁর আত্মপরিচয়ের অহংকারে : তিনি যে কৃষকের সন্তান তা নিজে কখনো ভোলেননি এবং কাউকে ভুলতে দেননি তো বটেই—এমনকি কৃষককে ভোলা চলবে না বাংলার মানুষেরও, এই দাবি ও স্বীকৃতি আদায়ে অনড় ছিলেন।

বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে উঠল কোনো উচ্চশিক্ষিত, বিত্তবান, পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারপ্রসূত সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রভাব-বিকীর্ণ এবং পেশায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরুষের হাত দিয়ে নয়; বরং তুলনামূলকভাবে ন্যূন ও দুর্বল এক মধ্যবিত্ত গ্রামীণ কৃষকসন্তানের দ্বারা। এই ঘটনা এতখানিই অদ্ভুত ও স্বাতন্ত্রিক যে একে নৈসর্গিক বিধান বলে মেনে নেয়া চলে। এই ইতিহাসগতিকে আমি অন্তত নিয়তিনির্দিষ্ট, ফেতাকঁপ্লি (Fait accompoli), বলে বিশ্বাস করি। এর ফলে এ সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, পূর্ববাংলা–যা এক সময়ে ইস্ট বেঙ্গল (পূর্ববঙ্গ) থেকে ইস্ট পাকিস্তান (পূর্ব-পাকিস্তান) হয়ে 'বাংলাদেশ' নামে রূপান্তরিত হলো–বেঙ্গল রাজনীতি বঙ্গবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এমন এক নতুন যুগে প্রবেশ করল যেখানে অভিজন শ্রেণির নেতৃত্বের স্বাভাবিক প্রস্থান সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং পুনরাগমনের সম্ভাবনা নেই। এতে ভালো কি মন্দ হলো তা কালপ্রবাহে ইতিহাসই প্রমাণ করবে, আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ বা মূল্যায়নে তা নির্ধারণ করা যাবে না। কোনো জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে তিন যুগ (১৯৭১-২০০৮) কোনো সময়ই নয়, পুরো ভবিষ্যৎ এখনো সামনে পড়ে আছে। উপরন্তু, রাষ্ট্র তো জাতির মতো চিরন্তনী ব্যাপার নয়; নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের রাষ্ট্রিক পরিচয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে কত স্থানে কতই-না পরিবর্তিত হতে দেখছি : আমাদের এ দেশই তার রাষ্ট্রনাম কতবার পাল্টাল সকলেই জানি। জাতি তার মতোই থাকে, প্রয়োজনে তার মর্জিমাফিক দেশের নাম বা চরিত্র ইত্যাদির বদল ঘটে। শেখ মুজিব বাঙালির জাতি-অহংকারকে প্রতিষ্ঠিত করে ন্যায্যতা দিলেন রাষ্ট্র নির্মাণের মাধ্যমে। এটিই তাঁর মহত্তম, সর্বপ্রধান ও অবিস্মরণীয় কীর্তি। 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' রাষ্ট্রটির জনক নিয়ে অজস্র মলিন ও অসভ্য বিতর্কের সূত্রপাত তাঁকে সপরিবারে হত্যার পর থেকেই শুরু হয়েছে। পিতৃহত্যার পাতকীদের পক্ষে অসম্ভব কর্ম বলে কিছু থাকে না;

ফলে মূঢ়মতি ব্যতীত কারও এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু যা তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিবেচনার দাবি রাখে তা হলো, তাঁকে অপসারণের পূর্ববর্তী অবস্থা এবং তাঁর পরবর্তী শাসকবর্গের দেশচালনায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি যে অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে–এ দুয়ের মধ্যে তুলনা করে উন্নতির বা অবনতির মাত্রা নির্ণয়। রাজনীতি আমার অধ্যয়ন/গবেষণা ও বিশ্লেষণের চৌহদ্দিতে পড়ে না; কিন্তু সমাজের সাধারণ নাগরিক হিসেবে অন্যদের মতো বিধিদত্ত স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান যেটুকু আছে তা আমাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে : আমাদের জাতিগর্ব নিঃশেষিত, 'বাঙালি' পরিচয়ে আর কোনো আনন্দ আমরা পাই না; আমাদের মাতৃভাষাপ্রেম পলাতক, হুজুগে বাঙালি ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত উৎসব-কৃত্য পালন শেষ করেই ২২ তারিখ থেকে দেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয়। ১৯৭৫-উত্তর এই দেশে বর্তমান বাস্তবতার রাষ্ট্রিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক যত দিক আছে সবই ঐ দুটি নেতি থেকে জাত। এখানেও ভালো-মন্দ মূল্যায়নের অধিকার ব্যক্তি তার বোধ-বুদ্ধি অনুযায়ী সংরক্ষণ করুন, আপনিও নেই। কিন্তু বাস্তব সত্য তাহলে এটাই প্রমাণ করছে, শেখ মুজিবুর রহমান নামে যে বাঙালি যে আত্মপরিচয়ের গর্বে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাঙালিকে উপহার দিয়ে তাদের অস্তিত্বকে গৌরবান্বিত করেছিলেন, তা থেকে আমরা বহু দূরে এখন অবস্থান করছি; তাই 'বাংলাদেশ' নামটি এখন কেবলই এক অভ্যাস, নামসর্বস্ব রাষ্ট্র, ঐ নাম তার অর্থ ও যৌক্তিকতা হারিয়েছে। এত দিনে পিছনপানে তাকিয়ে কারও মনে হতেই পারে, সংবিধানের মূলনীতি চতুষ্টয়ের পরিবর্তন-পরিমার্জনাদি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের যত চালন-অঙ্গ বা ইন্সটিটিউশন আছে–শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিচারব্যবস্থা পর্যন্ত সকল কিছু–সব ধ্বংস করার চক্রান্তে প্রথম ধাপ ছিল ১৫ আগস্টের ঐ হত্যাযজ্ঞ। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ও রাজনীতিবিদদের আচরণগত সংস্কৃতির (দলের ভিতরে, সংসদে, সমাজে, সর্বত্রই–কি পোশাকআশাকে কি ভব্যতাবোধে) নিম্নগামিতাও '৭৫-পূর্ব ও '৭৫-উত্তরের মাঝখানের বিভাজনরেখা স্পষ্ট করে তোলে। প্রতিতুলনায় ধরা পড়বে, নীতিজ্ঞানের শৈথিল্য বা অভাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবক্ষয় এবং দেশবাসীর সঙ্গে নেতৃবৃন্দের প্রতিনিয়ত মিথ্যাচার '৭৫-উত্তরের মাঝখানের বিভাজনরেখা স্পষ্ট করে তোলে। প্রতিতুলনায় ধরা পড়বে, নীতিজ্ঞানের শৈথিল্য বা অভাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবক্ষয় এবং দেশবাসীর সঙ্গে নেতৃবৃন্দের প্রতিনিয়ত মিথ্যাচার '৭৫-পরবর্তী কালের বাস্তবতা। আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা, পুলিশপ্রশাসনের জনবৈরিতা এবং সামরিক বাহিনীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধিপত্যের পাকিস্তানি উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর কোনো শ্রদ্ধা ও মোহ ছিল না; তার কারণ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের নির্ণায়ক ঐসব রাষ্ট্রযন্ত্রীয় কলকব্জা নয়, শুধুই জনগণ ও তার সম্মিলিত গণশক্তি–এই বোধ অনেকখানি যেন স্বজ্ঞার (intuition) মতোই তার ভিতরে দৃঢ়মূল ছিল সুদীর্ঘকালীন রাজনীতিচর্চার প্রভাব। উপমহাদেশে ব্রিটেনের লিবারেল ডেমোক্রেসির অনুসরণে যে রাজনৈতিক অভ্যাস ও আচরণ চালু ছিল তিনি তারই উত্তরাধিকার বহন করতেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৈহিক লাবণ্যসুষমা ও ব্যক্তিত্বের শালপ্রাংশুতা স্বীকার ও প্রশংসার জন্য কারও মুজিবপন্থী বা মুজিবপ্রেমী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

নিরপেক্ষ বিচারক্ষমতা ও নির্মোহ দৃষ্টি থাকলে সকলেরই তা উপলব্ধি করার কথা। যেকোনো আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ নিজস্ব মেধাশক্তি ও হৃদয়বৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন, এটাই শ্রদ্ধেয় এবং সৎ ও বিবেকবান ব্যক্তির নিকট প্রত্যাশিত; দলসম্পৃক্তির বাইরে, নির্দলীয়, মুক্তচিন্তার মানুষ হিসেবে দেশ ও দশের ভিতরে নিঃশর্তে, নিঃসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার দেওয়ার লক্ষ্যেই মানবসভ্যতা শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা আবিষ্কার করেছে। ফলে, বঙ্গবন্ধুর প্রতি কেউ দুর্বল না হতেই পারেন, তাঁর কঠোর সমালোচক হওয়ার অধিকার নিশ্চয়ই তিনি স্বাধীন নাগরিক হিসেবে সংরক্ষণ করেন; কিন্তু তার পরেও সবশেষে তার না মেনে উপায় থাকবে না যে, প্রতিতুলনায় তাঁর পরবর্তী শাসকগোষ্ঠী বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দৈত্যের পাশে বামনসদৃশ।

তিনি কি তবে সর্বপ্রকার ত্রুটি, অসঙ্গতি, ভ্রান্তি, মালিন্যের ঊর্ধ্বে ছিলেন, যেকোনো অমর্ত্যলোকবাসী? কেউ তা বলে না। তাঁর নিজেরও এমন হাস্যকর অহংবোধ ছিল না; ভুল তিনি করতেই পারেন, কিন্তু শুধরে দেওয়ার জন্য জনগণ তো আছে–এমন অপ্রেমের বিশ্বাস বহুবার ব্যক্ত করেছেন। তার 'আদি পাপ', আমি যেমন বুঝি, তো একটিই : রাষ্ট্রচালনার দায়িত্বগ্রহণ। তার সম্মুখে গান্ধী তো ছিলেনই দৃষ্টান্ত হিসেবে। এটিও সম্ভবত ইতিহাসনির্ধারিত ভবিতব্য। গুজরাতি ব্যবসায়ী-সন্তানের পক্ষে যা সম্ভব হয়, বাঙালি কৃষকসন্তানের কল্পনাতেও তা আসে না। বণিকবৃত্তির মূলাধারে যে জঙ্গমতা, স্থান থেকে স্থানান্তরে বিচরণ ও সর্বত্র একীভূত হওয়ার স্বভাবধর্ম; আর কৃষকের জমিসংলগ্নতায় শিকড় প্রোথিত জীবনে যে আশ্রয় ও বিশ্বাস–এ দুয়ের জীনঘটিত ভিন্নতা কি তবে দায়ী? মুক্তিযুদ্ধ তাঁর ডাকে সংগঠিত ও সংঘটিত হলেও তিনি পাকিস্তানে বন্দী থাকায় কিছুই চাক্ষুষ করতে পারেননি : না বাঙালির শৌর্য-বীর্য-আত্মত্যাগ, না বাঙালির বিশ্বাসঘাতকতা-প্রতারণা-দেশদ্রোহিতা। ফলে, মনুষ্যত্ববোধ ও ন্যায়নীতি সম্বল করে দেশ ও রাষ্ট্রের বিবেক হিসেবে নিরপেক্ষ দ্রষ্টা ও পথনির্দেশকের ভূমিকা গ্রহণ অসম্ভব বা অস্বাভাবিক হতো না এবং তাঁর সাধ্য ও সিদ্ধি কোনো অংশেই গান্ধী অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। পরিণতিতেও উভয়ের কী সাযুজ্য! বিশ্বাসহন্তা দুর্বৃত্তের হাতে উভয়েই নিষ্ঠুরভাবে শহিদ হলেন। ক্ষমাগুণও দুজনেরই হৃদয়নিঃসৃত বিশ্বাস ছিল। বঙ্গবন্ধু 'সাধারণ ক্ষমা'-ঘোষণা তাঁর হৃদয়ধর্মেরই প্রতিফলন ছিল; জনগণ–যে-জনগণের ওপর তাঁর এত নির্ভরতা–বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী পাকিস্তানসেবী কোনো বাঙালিকে তো ক্ষমা করতে চায়নি, তাঁর কাছে সে দাবিও তোলেনি। মনে না এসেই পারে না, ইতিহাসে এমন নিদর্শন আর একটিই পাই : বলশেভিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা। কিন্তু রাজনীতিতে ও স্বভাবে বঙ্গবন্ধু একেবারেই ভিন্ন গোত্রের ছিলেন। রুশ জনগণও চরিত্রে বাঙালিদের মতো নয়, কোনো দিক দিয়েই। লেনিনের 'ক্ষমা' তাঁর দেশবাসী সর্বত্র মান্য করেছিল, এমন নয়; চিহ্নিত ও অবিসংবাদী দেশদ্রোহীকে যেখানেই সম্ভব সেখানেই নিঃশব্দে নির্মূল করেছে রুশ জনগণ, এমন সাক্ষ্য ইতিহাসে মেলে। আমার বিবেচনায়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতির এটিই ছিল 'দ্বিতীয় পাপ': ক্ষমা প্রদর্শন। কিন্তু 'পাপ' তো স্বেচ্ছায় কেউ করে না, জ্ঞাতসারে ও জ্ঞান সিদ্ধান্তের ফলে তা হয় না; ঘটে বা ঘটে যায় ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে। প্রথম পাপ যদি থেকে থাকে মানুষী দুর্বলতা, দ্বিতীয়টিতে মনুষ্যত্বসাধনার মহনীয়তা।

কোনোটিতেই কোনো দোষ তাকে স্পর্শ করে না। এ দুটিও বাঙালির নিয়তিবিধান বলেই মানি। কিন্তু এই ভ্রান্তির মাশুল তাঁকে যেমন শোধ করতে হলো, তেমনি করছি আমরাও–তাঁর প্রিয় দেশবাসী।

তবে বিশ্ববিধান বা cosmic justice বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করলে এমন প্রত্যাশা মনে জাগে যে, এ দেশের বাঙালি জাতি একদিন তার পিতৃহত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্তে সক্ষম হবে। সে দিন আশু যদি নাও হয়, নিশ্চিতই দূরভবিষ্যে অপেক্ষমাণ; কিন্তু পাপক্ষালনের কর্তব্যকর্মে মনপ্রাণ নিয়োজিত করতে হবে এখন থেকেই। তার ভার সচেতন দায়িত্বশীল দেশবাসীর ওপরেই বর্তায়, এবং তার অগ্রভাগে আছেন কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-গবেষক প্রমুখ ধীমান ও সৃজনশীল নানা ব্যক্তিত্ব। গভীর দেশপ্রেমে ও সংশয়হীন বিশ্বাসে নতুন করে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মসাধনা, তাঁর স্বপ্ন ও লক্ষ্যভূমি সাধারণ দেশবাসীর সম্মুখে নানাভাবে প্রত্যক্ষ করানোর চেষ্টাই হবে প্রায়শ্চিত্তের প্রথম অঙ্গীকার ও সাধনা।

তাঁকে 'জাতির জনক' বলায় যাদের আপত্তি আছে তারা বুঝতে অক্ষম যে, জাতি এখানে রাষ্ট্রের সমার্থক। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে উনিশ শতকের 'হিন্দু মেলা' যেমন কেবল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপার ছিল না, সকলেরই ছিল, এও তেমনি; 'হিন্দু'র অর্থাৎ স্বদেশি ভারতবর্ষীয়দের মেলা বা সম্মিলনক্ষেত্র। তেমনি, 'জাতির জনক' মানে 'রাষ্ট্রের জনক'। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, 'কায়েদে আজম' শব্দের অনুষঙ্গের সাদৃশ্যঘটিত কারণে এই শব্দদ্বয়ে মন সায় দেয় না। তাছাড়া, বাঙালি জাতির উৎপত্তি ও বিকাশের আদি তো দূর অতীতে এবং বঙ্গবন্ধু এ জাতির নির্মাতা নন। জাতি কেউ তৈরি করে না, জাতি হয়ে ওঠে। তবে নামের বাচ্যার্থ অস্বীকার করলেও এই রাষ্ট্রের জনক ও স্থপতি যে বঙ্গবন্ধু সেই ঐতিহাসিক সত্য তো প্রশ্নসাপেক্ষ নয়। বাংলাদেশের যাত্রাবিন্দুই হলেন বঙ্গবন্ধু, আর কেউ নয়।

তাঁর স্বপ্নের স্থাপত্যকর্মের যে ক্ষতিসাধন '৭৫-পরবর্তী সময় থেকে চলে আসছে, তার পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব তাঁরই প্রিয় সন্তান দেশপ্রেমী নাগরিকদের নিতে হবে। এখনো যেটুকু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তার সংরক্ষণ ও নতুন নির্মাণ প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করা ব্যতিরেকে অন্য কোনো পন্থা নেই আমাদের বাঁচবার ও বাংলাদেশকে বাঁচাবার।

সে লক্ষ্যে যারাই ব্রতী তাদেরই বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই এবং প্রার্থনা করি তাদের সাধনা জয়যুক্ত হোক, সিদ্ধিলাভ করুক। এবং আমাদের মাতৃভূমি ধ্বংসের নিপুণ আয়োজনে যাদেরই–ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা দল–প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ আছে তাদের শাস্তি বা হৃদয়পরিবর্তনের অধিক কোনো সদিচ্ছা দেশপ্রেমী ও শান্তিকামী বঙ্গসন্তান পোষণ করে না। এই দুর্ভাগা জাতি ও দুঃখী এই দেশের সকলের মঙ্গল কামনার বাইরে আর কোনো প্রার্থনা থাকতে পারে না।

হায়াৎ মামুদ
জানুয়ারি ২০০৯

প্রথম সংস্করণের

প্রস্তাবনা

এই আমি আজকে আমি হতে পারতাম না যদি 'বাংলাদেশ' নামক স্বাধীন দেশটি না পেতাম। আজও হয়তো পরাধীন পূর্ব-পাকিস্তানের কোনো অফিসে সামান্য এক কর্মকর্তা বা কোনো শিক্ষালয়ে সাধারণ এক শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত থেকে বেঁচেবর্তে থাকতাম। আমার ধারণা, আমার মতো এমন আরও অনেকেই এই ধরনের আর্থসামাজিক অবস্থানে থেকে যেতেন। কিংবা পরাধীন দেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে মাথা নিচু করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আদেশ-নির্দেশ পালন করে কোনোমতে বেঁচে থাকার ভান করতেন। কেউ কেউ হয়তো-বা তাদের খুশি করে সামাজিক মইয়ের দু-এক ধাপ উপরে উঠতেন।

কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার ফসল বাংলাদেশ—হতাশাজনক এই বাস্তবতাকে পুরোপুরি বদলে ফেলে। হতে পারে, আমাদের অনেক ভাই-বোনের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এখনো আসেনি। কিন্তু তাই বলে পরাধীন দেশের নাগরিকদের মতো সারাক্ষণ বিদেশি প্রভুকে খুশি করে তাদের চলতে হয় না। অনেক সংগ্রাম করে হয়তো তাদের অনেককে বাঁচতে হয়। কিন্তু কারও কৃপায় তাদের বাঁচতে তো হয় না। স্বাধীনতার এই সুফল কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা যারা পরাধীনতার নাগপাশে ছিলেন না তারা ঠিক বুঝতে পারবেন না। স্বাধীনতা আমাদের জন্য যে বহুমাত্রিক সুযোগ সৃষ্টি করেছে সেসবের কারণেই আজ বিশ্ব জুড়ে একাধিক বাংলাদেশের সরব উপস্থিতি চোখে পড়ছে। লন্ডন, সিডনি, নিউইয়র্ক, দুবাইসহ দুনিয়া জুড়েই পরিশ্রমী, উদ্যমী বাঙালির অবদান আজ স্বীকৃত। বিশেষ করে, সারা বিশ্বেই দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালির শিক্ষা, গবেষণা, শিল্প-উদ্যোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রাণবন্ত পদচারণা জাতি হিসেবে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করছে। এ কথা ঠিক, স্বদেশের নানা স্থানে এখনো রয়েছে দুঃখ, বঞ্চনা, বৈষম্য ও অবিচার। রয়েছে নানা মাত্রার অপূর্ণতা। আছে স্বাধীনতার শত্রুরা। তাই এখনো সমাজে, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে প্রত্যাশিতভাবে কাটেনি আঁধার। তবুও আমরা গর্বিত আমাদের প্রিয় স্বদেশের জন্য। সুখে-দুঃখে যেভাবেই থাকি না কেন, প্রিয় বাংলাদেশকে আরও সজীব ও সুন্দর করার স্বপ্ন এবং সদিচ্ছা আমরা প্রায় সকলেই পোষণ করি। কিন্তু সেই স্বপ্ন রূপায়ণে আমরা কতটা আন্তরিক সে প্রশ্ন থেকে যায় বৈকি।

একটি প্রশ্ন বারবার মনে জাগে। সকলের প্রিয় এই বাংলাদেশ কি এমনি এমনি অর্জন করেছি আমরা? যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামের হ্যামিলনের বংশীবাদকের জন্ম না হতো এদেশে, যদি তিনি এমন করে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি হবার সাহস না দেখাতেন, যদি সারাটা জীবন শুধুই স্বদেশের গরিব-দুঃখী মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য স্বদেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত দৌড়ে না বেড়াতেন, যদি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে থোড়াই কেয়ার করে বারবার জেলে যাবার মতো দেশপ্রেমের প্রমাণ না রাখতেন তাহলে কি এত দ্রুত আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশটির নাগরিক হতে পারতাম?

সর্বশেষ, স্বদেশের খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক মুক্তির আশায় বড় ধরনের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠনে যদি হাত না দিতেন তাহলে কি তিনি পঁচাত্তরে এমন ট্র্যাজিক পরিণতির শিকার হতেন? এসব প্রশ্ন আমি তুলছি এ কারণে যে, তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁরই দেওয়া নাম 'বাংলাদেশ'টিকে যে খুঁজেই পাওয়া যায় না। আক্ষরিক অর্থেই তিনি এবং বাংলাদেশ সমার্থক। যেন মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। এমনই যাঁর অবদান, স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা কি তার প্রাপ্য সম্মান রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁকে দিয়েছি? হীনমনা এই আমরাই কি দেয়াল থেকে তাঁর ছবিটি নামাইনি? 'বঙ্গবন্ধু সেতু' লেখা অক্ষরগুলো কি আমাদেরই কেউ কেউ উপড়ে ফেলেনি? এই 'শিক্ষিত' আমরাই কি কোমলমতি শিশুদের পাঠ্যপুস্তক থেকে তাঁকে আড়াল করার পাঁয়তারা করিনি? তাঁর জন্মদিন ও শাহাদাত-দিবস রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে নীরবে পার হয়ে যেতে আমরা দেখেছি। অন্তত, ঐ দুদিনও কি মনে পড়েনি সুবিধাভোগী এলিটদের যে, তিনি ছাড়া বাংলাদেশ অস্তিত্ববিহীন। তারা কি জানেন না যে তিনিই বাংলাদেশ? একথা ঠিক যে, মৌল আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন তা থেকে আমরা এখনো বহুদূরে। তবুও যতটুকু সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি আমরা অর্জন করেছি তার ভিত্তিটা কি তিনিই তৈরি করে দেননি আমাদের?

তাই যদি সত্যি হয় তাহলে এতগুলো বছর পরেও কেন আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বোচ্চ আসনে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে বসাতে পারিনি? কেন তাঁর আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচার করেছি? এ কথাও ঠিক, এখন তিনি পাঠ্যপুস্তকে স্বমহিমায় উপস্থাপিত হচ্ছেন, তাঁর সমাধিতে দেশচালকেরা শ্রদ্ধা জানাতেও এখন যাচ্ছেন। তবুও এই আনুষ্ঠানিকতার বাইরে আমরা তাঁকে আমাদের জাতীয় জীবনের কার্যকর অংশ করে তুলতে পারিনি। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের সন্তানেরা তাঁকে গান্ধী, হো চি মিন, মাও সেতুং বা ম্যান্ডেলার মতো করে খুঁজে পাওয়ার সুযোগ পায়নি। তেমন সুযোগ আমরা সৃষ্টি করতে পারিনি। উল্টো একটা সময় ছিল যখন তাঁর অবদানকে করা হয়েছে কটাক্ষ। স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছেন–সে প্রশ্নে অযথাই তাঁকে করা হয়েছে বিতর্কিত। আজ আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছি যে, এই দুঃখজনক বিতর্কের কোনো মানে নেই। ইচ্ছে করলেই ইতিহাসের সত্যকে কেউ নিজের মতো করে তৈরি করতে পারেন না। করলেও তা টেকে না। ইতিহাস তার আপন গতিতে নদীর মতো তার আপন পথ তৈরি করে নেবেই। বাংলাদেশের জন্মের প্রকৃত ইতিহাস এবং তার সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় অবদানের বিষয়টি ইচ্ছে করলেই কেউ বিকৃত করে পার পেয়ে যাবেন বলে মনে হয় না। হয়তো সাময়িক বিভ্রান্তি ছড়ান যাবে, কিন্তু ইতিহাসের প্রকৃত সত্য ঠিকই সময়ের ব্যবধানে স্বমহিমায় থিতু হবে। ঠিক যেমনটি এখন হতে শুরু করেছে। দেরিতে হলেও বিভ্রান্তির কালোমেঘ বিদীর্ণ করে সত্যের উজ্জ্বলতা ঠিকই ঠিকরে পড়তে শুরু করেছে। এমনটিই যে হবে সে বিশ্বাস আমার মনে বরবারই ছিল। আর সে কারণেই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম অংশ ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং সেই ইতিহাস নির্মাণে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অতুলনীয় অবদানের কথা বৈরী সময়েও বারবার বলেছি ও লিখেছি। মহান এই মানুষটির কাছে আমাদের ঋণের কোনো সীমা-পরিসীমা

নেই। এই বাংলাদেশ সৃষ্টি না হলে, আগেই যেমনটি বলেছি, সময়ের স্রোতধারায় খড়কুটোর মতো আমরা অনেকেই ভেসে যেতাম। তাই বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে যাঁর দান সর্বোচ্চ তাঁর জীবন এবং জনগণের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ও কর্ম ঠিকমতো তুলে ধরা আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। ঋণশোধের এক ধরনের চেষ্টাও একে বলা চলে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ফের বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার দায়িত্ব পেয়েছে। কোনোরকম বাড়াবাড়ি না করে এই সরকার গরিব-হিতৈষী নীতি গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর অঙ্গীকার মতো নতুন এক বাংলাদেশ গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি। আর তা করা গেলেই সেটাকে তার ঋণশোধের প্রচেষ্টা বলে গণ্য করবেন তার গুণগ্রাহীরা।

আমি সেই অভিপ্রায়েই নানা সময়ে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে বিভিন্ন লেখা লিখেছি। লেখাগুলোতে আমার ব্যক্তিগত আবেগ নিশ্চয় ছিল। ভেতরের তাগিদেই তা করেছি। পাশাপাশি, গবেষণা-নির্ভর তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণেরও চেষ্টা করেছি। তবে স্বীকার করছি, যতটা সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে তা করার প্রয়োজন ছিল ততটা সবসময় করে উঠতে হয়তো পারিনি। সময় ও সুযোগ পেলে নিশ্চয় একসময় তা করা যাবে। তেমন গবেষণা যে একেবারে নেই তা বলা যাবে না। তবে যেহেতু এটি তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা প্রকাশের এক সামান্য প্রচেষ্টা, তাই আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁর ইতিবাচক অবদানের কথাই বেশি করে উঠে এসেছে। মাও সেতুং বলতেন–কোনো মানুষের ৭০ শতাংশ ভালো গুণ থাকলেই তিনি ভালো মানুষ, ৩০ শতাংশ খারাপ বৈশিষ্ট্য সহজেই উপেক্ষা করা যায়। আমার বিচারে বঙ্গবন্ধুর ভালো বৈশিষ্ট্য এর চেয়ে ঢের বেশি। আপাদমস্তক ভালোমানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান দুর্বলতা ছিল এই যে, তিনি অতি গভীরভাবে মানবিক ও দয়ালু ছিলেন। সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক কর্মী, বন্ধু রাজনীতিকদের বরাবরই তিনি বেশি ভালোবাসতেন। দুঃসময়ে তারা জেলে গেলেও তাদের পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এসবের ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে।

আর সে কারণেই তিনি অনেক সময় তাদের ওপর কঠোর হতে পারেননি। আর যখন তিনি শক্ত হবার চেষ্টা করলেন তখনই তাঁকে অনেকেই ভুল বুঝলেন। ইতিহাসের স্রোতধারা যখন খানিকটা থিতু হচ্ছে তখন ঠিকই সত্যি কথাটি বের হয়ে আসছে যে, জনগণের মঙ্গলের জন্যই সাময়িকভাবে তিনি কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা জানতেন, সময়মতো বহুদলীয় গণতন্ত্রে ঠিকই তিনি ফিরে আসতেন। কেননা, গণতন্ত্র ছিল তাঁর মজ্জাগত। আজীবন জনগণের অধিকারের জন্য লড়েছেন তিনি। তাই প্রচলিত গণতন্ত্র থেকে দূরে থাকা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল? বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই কথাগুলো সেদিন মধ্যবিত্তের কাছে কেউ তুলে ধরার চেষ্টা করেননি। অতি সম্প্রতি যে অস্থির সময় আমরা পার করলাম তারপরেও কি আমরা অনুভব করতে পেরেছি কেন তিনি সেসময় এমন কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর সহজে দেওয়া সম্ভব নয়। যারা তাঁকে কাছে থেকে তাঁর গণতান্ত্রিক আচার-আচরণ দেখেছেন, তারাই অবাক হয়েছিলেন তাঁর একদলীয় শাসনব্যবস্থা

প্রবর্তনের সিদ্ধান্তে। এর ঝুঁকি সম্বন্ধে তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা অবহিত ছিলেন। অনেকেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণেরও চেষ্টা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর মঙ্গলই চেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের জীবনমানের যেন সত্যি সত্যি উন্নতি হয় সেই আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের শত্রুরা এই সাময়িক বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে ঠিকই মরণকামড় বসিয়েছিল বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানটির শরীরে। শারীরিকভাবে তাঁকে নিঃশেষ করলেও তিনি যে রয়ে গেছেন আমাদের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে। দিনদিনই তিনি ছাড়িয়ে যাচ্ছেন নিজেকে। পুরো বাংলাদেশকে যে তিনি তাঁর দীঘল ছায়া দিয়ে ঢেকে দিতে চাইছেন। প্রতিদিন শান্তির সেই ছায়া দৈর্ঘ্যপ্রস্থে বেড়েই চলেছে। সাধারণ মানুষের কাছে শুয়ে থাকা বাঙালির প্রাণপ্রিয় বঙ্গবন্ধু আমাদের ইতিহাসের প্রধানতম নায়ক। সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় বীর। আমাদের সন্তানদের কাছে তাঁকে তুলে ধরার এই সীমিত প্রচেষ্টাকে পাঠক কীভাবে নেবেন, আমি সত্যিই তা জানি না। তবে এ কাজটি করতে পেরে আমি মনে মনে খানিকটা হলেও হালকা বোধ করছি। তাঁর কাছে পাহাড় সমান ঋণের খানিকটা হলেও শোধ করার এই অনুভূতি যে কতটা স্বস্তিদায়ক তা ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। এই বইটি দীর্ঘ সময় ধরে নানা লেখার সংকলন। তাই কোথাও কোথাও ভাবের ও ভাষার কিছুটা পুনরাবৃত্তি থেকেই গেল। শত চেষ্টা করেও আবেগঘন সেই ভাষার ওপর ছুরি চালাতে আমার হাত কেঁপেছে বলেই এমনটি হয়েছে। আশা করছি, পাঠক আমার এই দুর্বলতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখবেন। তবে সংযোজনীতে আমি অনেক তথ্য ও দলিল যুক্ত করেছি, যেগুলো ভবিষ্যতে গবেষণার কাজে খুবই সহায়ক হবে। অনেক কবিতা, গানও সংযোজনীতে যুক্ত করলাম। বঙ্গবন্ধুকে যারা নান্দনিক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করতে চান তাদের জন্য এসব গান, কবিতা খুবই কাজে আসবে। যারা এসব কবিতা ও গান রচনা করেছেন তাদের প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাই। তাদের আনুষ্ঠানিক অনুমতি ছাড়াই এগুলো গ্রহণ করেছি এই বিশ্বাসে যে, তাঁরাও নিশ্চয় চান বঙ্গবন্ধুপ্রেমী পাঠকেরা যেন এসবের সন্ধান পান।

সংসদে দেওয়া তাঁর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো সংযোজন করলাম এ কারণে যে, গবেষকরা বুঝতে পারবেন কত আগে থেকেই তিনি জনগণের কল্যাণের আশায় আইনসভায় সোচ্চার হয়েছিলেন। আমি জানি, বঙ্গবন্ধু যে মাপের মানুষ তাঁকে এই সীমিত পরিসরে উপস্থাপন করা মোটেও সহজ নয়। তবুও শুরু তো করলাম। ভবিষ্যতে আরও তথ্য জোগাড় করতে পারলে বইটি আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করব।

আমার সহকর্মী শাহ মাহবুবুল আলম টিটোর অকৃত্রিম সহযোগিতা ও পরিশ্রম ছাড়া এই বইটির পাণ্ডুলিপি দাঁড় করানোই সম্ভব হতো না। আমি তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ। মনে হয় বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁরও যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে তাই-ই হয়তো এমন পরিশ্রম করতে তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। অধ্যাপক হায়াৎ মামুদকে ধন্যবাদ তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনার জন্য। তাঁর মতো সম্পাদকের হাতে পড়েছিল বলেই খসড়া রচনাটি অনেকটাই পাঠপোযোগী হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। নির্ঘণ্ট তৈরি ভারি ঝকমারি কাজ, অথচ এ জাতীয় গ্রন্থে অপরিহার্য; কন্যাপ্রতিম লোপামুদ্রা মামুদকে তাই ধন্যবাদ না জানালেই নয়। বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদ

হোসেনকে ধন্যবাদ বিভিন্ন তথ্য ও ছবি সরবরাহ করার জন্য। এক্ষেত্রে সারোয়ারকেও ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাতে চাই শিবাজীকেও তাঁর গবেষণা সহায়তার জন্য। আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই হিরন্ময়কে তাঁর হৃদয়-নিংড়ান ভালোবাসা দিয়ে প্রচ্ছদ ও দৃষ্টিনন্দন অলংকরণের জন্য। ধন্যবাদ জাহানারা, শিরিন ও ওয়ালীকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার জন্য। কৃতজ্ঞ দীপ্তি প্রকাশনীর কর্ণধার এস. এম. আমিনুল ইসলাম মুকুলের কাছে বইটি এমন সুন্দর করে প্রকাশের জন্য।

আমার স্ত্রী প্রফেসর সাহানা রহমান বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত। বঙ্গবন্ধুর ওপর কিছু লিখলে, বললে, তিনি ভীষণ খুশি হন। আশা করছি এই বইটি দেখেও তিনি খুব খুশি হবেন। তাঁর সহযোগিতা না পেলে এই বই লেখা ও সংশ্লিষ্ট গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়া মোটেও সম্ভব হতো না। তাই তাঁর কাছেও আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। একইভাবে আমি কৃতজ্ঞ আমার তিন কন্যা অর্ণ কমলিকা, অর্চি মধুরিমা, প্রকৃতি শ্যামলিমার কাছে। তাদেরকে সময় না দিয়েই আমি ডুবে ছিলাম এই বইটির জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণায়। আশা করছি, তাঁরাও এক সময় বুঝতে পারবে কেন আমি এতটা নিমগ্ন ছিলাম এই গবেষণায়। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ বইটির নাম চূড়ান্তকরণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার জন্য। অনেক সতর্কতার পরেও বেশ খানিকটা অসম্পূর্ণতা থেকেই গেল। পাঠকদের পরামর্শ পেলে ভবিষ্যতে এসব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করব।

আতিউর রহমান
জানুয়ারি ২০০৯



শোনো, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের
ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।।

সেই সবুজের বুকচেরা মেঠোপথে
আবার এসে ফিরে যাব,
(আমার) হারানো বাংলাকে
আবার তো ফিরে পাব।
শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে
হায়রে এমন সোনার দেশ।।

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর : অংশুমান রায়



১ তিনিই বাংলাদেশ

শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। সে বাংলায় আগামীদিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলব।

(বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চ, ১৯৭২-এর বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ থেকে)

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের রয়েছে দীর্ঘ ঐতিহ্য। কিন্তু কখনো তা স্বাধীন দেশ হিসেবে তাঁর আত্মপরিচয় তুলে ধরতে পারেনি। আলেকজান্ডারের সঙ্গে আসা ইতিহাসবিদ, চীনের পর্যটক হুয়েন সুং (Huyen Sung) কিংবা মরোক্কোর ইবনে বতুতার বিবরণীতে গঙ্গাপারের বঙ্গের নাম বারবার উঠে এলেও বৃহৎ ভারতবর্ষের কোনো অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশ হিসেবেই তাঁর পরিচয় মেলে। উনিশ শতকের শুরুর দিকে পূর্ববাংলা মাত্র কয়েক বছরের জন্য আলাদা প্রদেশের পুরোভাগে থাকলেও তা ফের বৃহৎবাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ১৯০৫-১৯১১ পর্বে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের আঞ্চলিক শাসনের খানিকটা স্বাদ পাওয়ার পর হঠাৎ করেই তা শেষ হয়ে গেলে নানাভাবে ব্রিটিশ শাসকরা এ অঞ্চলের উঠতি এলিটদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রচেষ্টার অন্যতম এক উদ্যোগ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূর্ববাংলার উপেক্ষিত সংখ্যাগুরু মানুষের মন থেকে বঞ্চনার অভিযোগকে স্তিমিত করার জন্যই হয়তো আবার বাংলাকে ভাগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মূলত, অর্থনৈতিক মুক্তির আশায় ততদিনে পূর্ববাংলার সংখ্যাগুরু মানুষ পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে ফেলেছেন। স্বার্থান্বেষী সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকরা বাঙালি মুসলমানের আর্থসামাজিক বঞ্চনাকে কৌশলে দেশভাগের

প্রচারণার কাজে লাগতে সক্ষম হয়েছিলেন। অখণ্ড বাংলার পক্ষে সীমিত আন্দোলন হলেও শেষ পর্যন্ত তা দানা বাঁধেনি। মূলত, অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় পাকিস্তানের পক্ষ নিলেও অল্পসময়ের মধ্যে তাদের মোহভঙ্গ ঘটে। অমানবিক, অগণতান্ত্রিক, নিপীড়নবাদী পাকিস্তানি রাষ্ট্র পূর্ববাংলাকে 'বন্দি বাজার' করেই ক্ষান্ত হলো না তাঁর অধিবাসীদের মুখের ভাষা পর্যন্ত কেড়ে নিতে চাইল। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করার সিদ্ধান্তে বাঙালির মনে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সেই ক্ষোভ প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁরা দেশব্যাপী প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। আটচল্লিশে শুরু হওয়া ভাষাআন্দোলন ব্যাপক রূপ নিতে শুরু করল। এক পর্যায়ে হলো গুলি। ঝরে পড়ল অনেক তরুণ-তাজা প্রাণ। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালির আত্মপরিচয়ের বীজ বুনল সংগ্রামী তরুণেরা। তাদের এই আন্দোলনকে সংগঠিত করেছেন অনেকেই। তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্তের সন্তান। বলা চলে, তাঁরা ছিলেন কৃষি থেকে উদ্বৃত্তনির্ভর নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তের সচেতন প্রতিনিধি। আটচল্লিশের ১১ মার্চ ভাষাদিবসে বন্দী হয়েছিলেন আন্দোলনের অগ্রসৈনিক তরুণ রাজনীতিজ্ঞ শেখ মুজিব। মুক্তি পেয়ে তিনি আরও বেগবান করলেন ছাত্রদের রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন।

ফের গেলেন জেলে। জেলেও বসে ছিলেন না। যোগাযোগ রেখেছিলেন আন্দোলনের বড় বড় ছাত্রনেতা ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে। ধীরে ধীরে তিনিই ক্রমে হয়ে উঠলেন বাঙালির আশা-ভরসার প্রতীক। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের পর বাঙালিকে আর তাই পিছনে তাকাতে হয়নি। প্রতিটি আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন শেখ মুজিব। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি তিনি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদে, পরে জাতীয় আইন পরিষদে পূর্ববাংলার অবহেলিত জনগণের পক্ষে ব্যাপক আওয়াজ তোলেন। কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলার প্রতি যে অন্যায্য আচরণ করছিল তিনি তা প্রাঞ্জল ভাষায় পরিষদে তুলে ধরেন। তখনই তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, এভাবে চললে পূর্ববাংলা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের কাঠামোর ভিতরে থাকতে পারবে না। তাই বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে সুযোগ পেলেই তিনি জোরালো বক্তব্য তুলে ধরতেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি তিনি বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা উপস্থাপন করে হয়ে গেলেন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক (দেখুন পরিশিষ্ট ১)। সামরিক শাসক আইয়ুব খানকে তিনিই প্রথম কার্যকরভাবে চ্যালেঞ্জ করে বারবার জেলে গেলেন। এক পর্যায়ে সাহসী এই নেতাকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র প্রধান আসামি করা হলো। তিনিই বীর যিনি মৃত্যুকে ভয় পান না। শেখ মুজিবকে এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত করানো গেলে তিনি নিশ্চিত ফাঁসিতে ঝুলতেন। কিন্তু মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে অদম্য সাহসের সঙ্গে তিনি লড়েছেন স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে। ততদিনে

তিনি সারা পূর্ববাংলায় সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনীতিবিদে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। কার্যত জেলের তালা ভেঙেই ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের চূড়ান্তপর্বে শেখ মুজিবকে মুক্ত করে এনেছিলেন সংগ্রামী ছাত্র-জনতা। তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে তিনি হয়ে গেলেন 'বঙ্গবন্ধু'। পতন হলো স্বেচ্ছাচারী আইয়ুবের। ইয়াহিয়া খান নয়া সামরিক শাসক হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। নির্বাচন দিলেন। নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে বাঙালিকে ৬ দফার ছায়াতলে সমবেত করলেন বঙ্গবন্ধু। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ী হয়েও তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি এলিটদের ষড়যন্ত্রের কারণে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে পারলেন না। একাত্তরের মার্চ জুড়ে এই আন্দোলনে কার্যত স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনভার তিনি হাতে নিলেন। ব্যাংক, বীমা, পুলিশসহ সকল কর্মকর্তা তাঁরই নির্দেশে সে সময় চলেছেন। কিছুদিন আলোচনার ভান করে ইয়াহিয়া-ভুট্টো মিলে ২৫ মার্চ রাতে বাঙালির ওপর সামরিক হামলা পরিকল্পনা করল। এই আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সারা দুনিয়ায় 'বাংলাদেশ' আর 'শেখ মুজিব' শব্দ দুটি সমার্থকভাবে উচ্চারিত হতে লাগল। শুরু হলো দুঃখী মানুষের গৌরবান্বিত মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধু বন্দী হলেন। তখনই অন্নদাশঙ্কর রায় লিখলেন 'যতদিন রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান/ ততদিন রবে কীর্তি তোমার, শেখ মুজিবুর রহমান!' পশ্চিম পাকিস্তানে এক জেলের অভ্যন্তরে সামরিক আদালতে তাঁর বিচার হলো। তাঁকে ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হলো। এবারও তিনি মাথা নোয়ালেন না। সাহসের সঙ্গে মৃত্যুকে মোকাবিলা করলেন। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের চাপ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমর-সাফল্যের কারণে তিনি মৃত্যুর মুখ থেকে ফের বীরের মতো মাথা উঁচু করে ব্রিটেন ও ভারত হয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন। বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই রচিত হলো 'অন্ধকার থেকে আলোর পথে' তাঁর যাত্রার প্রথম পর্বের শেষ অঙ্ক। এরপর তিনি বাংলাদেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিলেন। সারা পৃথিবী থেকে তিনি পেলেন শুভেচ্ছা,

যারা বাংলাদেশকে লুট করেছে তাদের সঙ্গে কোনো আপোস নেই। দেশকে এবং দেশের মাটিকে ভালোবাসি বলে আমি রাজনীতিতে আছি। আমি অন্যের পয়সা চাই না। কিন্তু বাংলাদেশের পাওনা কড়াগণ্ডায় ফিরিয়ে দিতে হবে। দুঃখী বাংলার মানুষের মুখের হাসি ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজনবোধে জীবনদান করতে আমি প্রস্তুত আছি।

বঙ্গবন্ধু, নবগঠিত
পটুয়াখালী সদর দপ্তর
১১ জানুয়ারি, ১৯৭১

সমর্থন। কিন্তু বাংলাদেশকে যারা চাননি তারা নানা ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে থাকেন তাঁর সকল শ্রম ও চেষ্টা ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু তিনি ভয় পাননি। চমৎকার একটি সংবিধান রচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাসম্পন্ন দেশে রূপান্তরিত করার অঙ্গীকার করলেন। এই মহতি কর্মে নিয়োজিত থাকার সময় তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নেননি। সর্বক্ষণ কাজে ডুবে ছিলেন। বিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে শুরু করে সকল প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ, সকল দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, শরণার্থীদের পুনর্বাসন, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্বস্ত করে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার মতো কঠিন সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে করতে তিনি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত বিলিয়ে দিলেন। স্বাধীন দেশের প্রত্যাশা মেটান তো মোটেই সহজ কাজ ছিল না। সকলেই হয়তো আশা করেছিলেন, তাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা এক মুহূর্তেই তিনি তাঁর জাদুস্পর্শে মিটিয়ে দেবেন। এ চাওয়া যে বস্তুতপক্ষে কতটা অবাস্তব ছিল আমরা এখন তা ঠিকই বুঝি। কিন্তু সেদিন ছিল ভিন্ন সময়। তবুও তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর কর্মিষ্ঠ হাতের ছোঁয়া লাগিয়েছিলেন। অথচ অসহিষ্ণু তরুণ সমাজ, বাংলাদেশ-বিরোধী শক্তি, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও খাদ্য-পরিস্থিতি, নিরাপত্তাহীনতা–সব মিলে তাঁর কঠিন পথচলাকে আরও বাধার মুখে ফেলে দেয়। সাহসী মানুষ বঙ্গবন্ধু সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে ঠিকই এগিয়ে যাচ্ছিলেন। অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছিলেন যাতে বছর শেষে বাম্পার ফলন হয়। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। গণতন্ত্রের প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু জটিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তা দূর করার লক্ষ্যে জরুরি আইন জারি করলেন। গড়লেন একক রাজনৈতিক মোর্চা 'বাকশাল'। তিনি নিজেই বলেছেন এ ছিল সাময়িকভাবে পিছু-হটা। ঘনিষ্ঠজনদের মতে দ্রুতই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্তের একাংশ তাকে ভুল বুঝলেন। তবে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে এই কঠিন পর্যায় পার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তাছাড়া অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সমাজে বেশ খানিকটা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দানা বেঁধেছিল। এই আপাতবিভ্রান্তির চোরাগলি দিয়ে ঢুকে পড়ে ষড়যন্ত্রকারীর দল। সামরিক বাহিনীর ক্ষুদ্র একটি অংশকে সঙ্গে নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা রাতের অন্ধকারে বাঙালির একমাত্র ভরসাস্থল প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে ও তাঁর পরিবারের প্রায় সকল সদস্যকে হত্যা করল। তাঁর দুই কন্যা বিদেশে থাকায় বেঁচে গেলেন। এভাবেই শারীরিকভাবে নিঃশেষ হয়ে গেলেন বাঙালির জাতীয় বীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু বাঙালির মন থেকে তাঁকে মুছে ফেলার হাজার চেষ্টা বিফলে গেছে। আজ তিনি আরও বড় হয়ে বিপুলভাবে বাঙালির হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিন পরে হলেও পাঠ্যপুস্তকে বাঙালি জাতির পিতা হিসেবে তিনি তাঁর যথাস্থান ফিরে পেয়েছেন।

যারা তাঁর রাজনীতিকে সমর্থন করেননি তাঁরাও আজ বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাসের যথোপযুক্ত স্থানে দেখতে পেয়ে সন্তুষ্ট।

এদেশের নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশ সৃষ্টির আন্দোলনের সব কথা সেভাবে তুলে ধরতে পারিনি আমরা। এটা আমাদের জাতীয় ব্যর্থতা। কিন্তু তাই বলে তিনি হারিয়ে যাবার নন। কেননা তিনিই বাংলাদেশের প্রতীক। তাঁকে ছাড়া বাংলাদেশকে ভাবাই যায় না। সেই যে ছাত্রজীবন থেকে শুরু করেছিলেন তারপর একদিনের জন্যও বাংলাদেশের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেননি। আরও অনেক রাজনৈতিক নেতাই বাংলাদেশের জন্য সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু সংকটকালে তিনি যেমন করে বুক ফুলিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন বাঙালির মুক্তির জন্য তেমনটি আসলেই বিরল। আর সে কারণেই তিনি হতে পেরেছেন বাংলাদেশের আরেক নাম। গবেষক এস. এ. করিম ভুল লেখেননি যে, বঙ্গবন্ধুর সাহসী নেতৃত্ব ছাড়া বাংলাদেশ ঐ সময় স্বাধীন হতে পারত কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। তাঁর নিজের কথায় : 'In the final analysis, history is made by men and it is unlikely that Bangladesh would have won its independence when it did without the leadership of one man, Sheikh Mujibur Rahman, whose single concern during thirty odd years of ceaseless activity, spanning his entire adult life, was the promotion by every means the self-determination of his people'. (S.A. Karim, *Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy*, UPL, 2005, p.3)। এমন করে সর্বক্ষণ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য নিমগ্ন ছিলেন বলেই তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন বাঙালি 'জাতির পিতা' হিসেবে। স্বাধীনতার প্রধান রূপকার তিনি। সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বাঙালির মেজাজ, আবেগ, লড়াকু মন, প্রতিবাদ, প্রতিদান, মানবিকতা, নমনীয়তা, সাহস–সব বৈশিষ্ট্যেরই প্রতীক তিনি। এখনো তিনিই আমাদের আশা-ভরসার প্রতীক। অথচ এমন একজন জাতীয় বীরকে হত্যা করল এদেশেরই কতিপয় বিশ্বাসঘাতক। সে কারণেই জাতি হিসেবে বাঙালির দুঃখ যেন আর শেষ হচ্ছে না। জাতীয় এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের এই বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিতেই হবে। পাশাপাশি, পুরো জাতিকে প্রস্তুত করতে হবে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত এক কল্যাণধর্মী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার জন্য। ইতিহাস ফের আমাদের সেরকম রাষ্ট্র গড়ার সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা যেন এ সুযোগ হেলায় না হারাই। আমাদের সুকর্মের মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন চিরদিন। তাঁর নিকটেই আমাদের অস্তিত্বের ঋণ। আর সে কারণেই নিরন্তর মনে হয়, তিনিই বাংলাদেশ।



যে মানুষ স্বদেশের প্রতিচ্ছবি তাঁর জীবন ও জনকল্যাণ ভাবনা

রবীন্দ্রনাথ যেমন মানুষটির খোঁজ করছিলেন, তাঁর সন্ধান পেতে আমাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। তিনি এমন এক মানুষ হবেন যিনি সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হতে পারবেন, যাঁকে ঘিরে একটি স্বদেশি স্বপ্ন দানা বাঁধবে, যাঁকে কেন্দ্র করে সমাজের আত্মচেতনা প্রসারিত হতে থাকবে এবং কালক্রমে যিনি স্বীয় যোগ্যতা ও মানবিকতার বলে দেশের মঙ্গল ও গৌরবকে ধারণ করে দিকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পারবেন। এই প্রয়াস তাঁকে একদিনের জন্যও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য না দিতে পারলেও তাঁর আপন বল ও সহিষ্ণুতার গুণে তিনি আমাদের সকলকে এক সুতোয় বেঁধে ধীরে ধীরে আত্মমর্যাদার দিকে, আত্মপরিচয়ের দিকে এবং গৌরবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। একটি জাতির বেড়ে ওঠার এই আকাঙ্ক্ষা সুদীর্ঘকাল ধরে সচল থাকতে পারে। যুগে যুগে সমাজের 'অন্তরে বাহিরে' সেই আকাঙ্ক্ষা ঘুরপাক খেতে পারে। অনেক সংগঠক সেই আত্মপরিচয় বা জাতীয়তাবোধের স্বপ্নকে উসকে দিতে পারেন, তাকে লালন করতে পারেন, পোক্ত করতে পারেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও এমন একজনের প্রয়োজন হয় যিনি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সঞ্চিত দেশের শক্তিকে একত্র করে একটি মহাকাণ্ড বাঁধিয়ে দিতে পারেন। আমরা নিজে যা

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বদেশী সমাজ', রবীন্দ্র রচনাবলি ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩, পৃ. ৬৩৪)

তা 'সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে, সম্পূর্ণভাবে' (রবীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ. ৬৪০) হয়ে ওঠার কাজটিকে তিনি ত্বরান্বিত করতে পারেন। 'বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে'র এই মহাযজ্ঞ যিনি ঘটাতে পারেন, তাঁকে অবশ্যই এমন এক সফল সংগঠক হতে হবে, যিনি সমাজের নিচের থেকে উপর পর্যন্ত সবাইকে এক বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণ-বন্ধনে বাঁধতে পারেন। জনতার সঙ্গে নেতার এই আত্মিক বন্ধন তখনই সুদৃঢ় হয় যখন উভয়েই আন্তরিক থাকেন তাদের লক্ষ্যে। জনতা যখন বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে বিশেষ এই সংগঠক সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে তখনই তিনি হয়ে ওঠেন একজন ক্যারিসমেটিক বা জননন্দিত নেতা। এ প্রচেষ্টা যুগে যুগে অনেকেই করেছেন। কিন্তু সকলেই তাতে সফল হতে পারেননি।

আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে, আমাদেরই জীবদ্দশায় তেমন এক সফল মানুষের সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম। তখন খুবই সস্তায় আমরা আমাদের বুদ্ধি, আমাদের বিবেক, আমাদের রুচি, আমাদের আত্মসম্মান বিকিয়ে দিচ্ছিলাম, তখন তিনি সেই অধঃপতন রোধে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন। নিজের শক্তির ওপর আস্থা স্থাপন করে, নিজের দেশের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধায় অবিচল থেকে, দেশের বিচ্ছিন্ন সকল শক্তিকে একজায়গায় সংহত করে, অবজ্ঞার পাত্র জনসাধারণকে আত্মশক্তিকে বলীয়ান করে দুরূহ অথচ অসাধ্য নয়, এমন সুবিপুল এক আয়োজন তিনি সম্পন্ন করলেন। হাজার বছরের গ্লানি মুছে ফেলে মাথা উঁচু করে দিলেন, নিজের জাতীয় পরিচয় বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার এক অভাবনীয় সুযোগ আমাদের জন্য সৃষ্টি করে দিলেন এই বিশাল মাপের মানুষটি। তিনি ছিলেন এক সাধারণ মানুষের সন্তান। তাই কথা বলতেন তাদের ভাষাতেই। সাধারণের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে সর্বক্ষণ মর্মাহত করত। আজীবন তাই তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন স্বদেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সাধারণের শক্তিকে সংগঠিত করার জন্য। এদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠকরা নিশ্চয় শ্রদ্ধেয়। তারাও কৃষক ও সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু খণ্ড খণ্ড সেসব প্রচেষ্টার সূত্র ধরে একটি মহাজাগরণের সূচনা কিন্তু করতে পেরেছেন কেবল তিনিই। কারও কারও ঈর্ষার পাত্র, অনেকের ঘোর শত্রু, কারও কাছে আবার স্বপ্নের সম্রাট, সাধারণের হৃদয়জুড়ে থাকা এই তিনিই বাংলাদেশের আরেক প্রতিচ্ছবি–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙালি জাতির পিতা এবং বাংলাদেশের প্রধান স্থপতি। তাঁর শৈশব, যৌবন এবং কর্মজীবন খুবই ঘটনাবহুল। এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় তিনি কেমন করে দিনে দিনে বেড়ে উঠেছিলেন ইতিহাসের এই মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য। তার মানে এই নয় যে, তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ডই বিতর্কের

ঊর্ধ্বে। নিশ্চয়ই তিনি ফেরেশতা ছিলেন না। ছিলেন রক্ত-মাংসের একজন সাধারণ মানুষ। ভালো-মন্দ মিলিয়ে তিনি। সেই সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠবার সময় কোনো ভুলত্রুটি হয়নি, এ দাবি করা বোধহয় সঙ্গত হবে না। তবে তাঁর ক্ষেত্রে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের পাল্লাই বেশি ভারী। সাধারণের সম্মান প্রতিষ্ঠা ও তাদের কল্যাণচিন্তায় বিভোর এই সৎ মানুষটির অর্জন এত বিপুল যে, সীমিত কলেবরের এই অধ্যায়ে তা তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক গবেষণার। তাঁর বেড়ে ওঠার পরিবেশ, তাঁর সহযাত্রীদের মতামত, তাঁর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড, তাঁর বক্তৃতা, তাঁর সম্পর্কিত রচনাবলি ইত্যাদি সংগ্রহ ও বিচার বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে বড় মাপের একটি গবেষণা-প্রকল্প হাতে নেয়া খুবই জরুরি মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও তাঁর কর্মময় জীবনের বিশেষ বিশেষ অংশর ওপর আলোকপাত করে তাদের থিসিস বা অভিসন্দর্ভ রচনা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে সেরকম বস্তুনিষ্ঠ আয়োজন এখনো চোখে পড়ছে না। মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় বীরদের নিয়ে গবেষণার এই দৈন্য আমাদের স্বীকার করে নেয়াই ভালো।

এই অধ্যায়ে মোটাদাগে তাঁর জীবন ও কর্মের সামান্য কিছু প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হবে। এ প্রচেষ্টা খুবই অসম্পূর্ণ হলেও তাতে ধরা পড়বে— কী বিশাল হৃদয়ের এই মানুষটি জাতির দুঃসময়ে আমাদের কাণ্ডারি হয়েছিলেন, নিজের হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন 'বাংলাদেশ' নামের বিপুল সম্ভাবনাময় অথচ দুর্ভাগ্য এক মাতৃভূমিকে।

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা

শেখ মুজিবুর রহমান জন্মেছিলেন টুঙ্গিপাড়ার এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে। শেখ বুরহানউদ্দীনের বংশের উত্তরাধিকারী এই পরিবারের রয়েছে বিশাল ঐতিহ্য ও প্রভাব (দ্র. এস. এ. করিম, প্রাগুক্ত ইংরেজি বই পৃ. ৭-৮, ইউপিএল, ২০০৫)। জন্মতারিখ ১৭ মার্চ ১৯২০। শেখ লুৎফর রহমান ও সাহারা খাতুনের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান শেখ মুজিব। শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন একজন সরকারি চাকুরে। ৭ বছর বয়সে মুজিব তাঁর পূর্বপুরুষদের গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন। পরে (৯ বছর বয়সে) পিতার কর্মস্থল, গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে যান স্থানীয় মিশনারি স্কুলে। মাদারীপুরেও তিনি কিছুদিন লেখাপড়া করেন, পিতার বদলিজনিত কারণে। ১৪ বছর বয়সে মুজিব বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর একটি চোখ কলকাতায় অপারেশন করানো হয় এবং সে কারণে তাঁর লেখাপড়ার সাময়িক বিরতি ঘটে (সূত্র : ঐ, পৃ. ১৬)। চার বছর পর মুজিব পুনরায় স্কুলে

ভর্তি হন ১৭ বছর বয়সে। ১৮ বছর বয়সে নিকট-আত্মীয়া বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে তাঁর আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পন্ন হয়।

পিতা-মাতার আদরের 'খোকা', ভাইবোন ও গ্রামবাসীদের 'মিয়াভাই' শেখ মুজিবের ছোটবেলা কেটেছে প্রকৃতি ও মানুষের ভিতরে থেকে।

> 'গ্রামের সহজ সরল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন। ... ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনে ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করত। চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হতো। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসত। আর সারা দিন অভুক্ত অবস্থায় অনেক দূরে হেঁটে তাদের ফিরতে হতো। যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল ব্যাংক পাড়ায়, আব্বা তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধ-ভাত খাবার অভ্যাস ছিল এবং সকলকে নিয়েই তিনি খাবার খেতেন। দাদির কাছে শুনেছি আব্বার জন্য মাসে কয়েকটি ছাতা কিনতে হতো। কারণ আর কিছুই নয়, কোন ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ, রোদ বা বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে তাকে ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন। ... আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। আমার আব্বা যখন কাউকে কিছু দান করতেন তখন কোনো দিনই তাকে বকাঝকা করতেন না, বরং উৎসাহ দিতেন। ... আব্বার একজন স্কুলমাস্টার ছোট্ট একটা সংগঠন গড়ে তুলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান, টাকা, চাল জোগাড় করে গরিব মেধাবী ছেলেদের সাহায্য করতেন। অন্যতম সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন এবং অন্যদের উৎসাহ দিতেন। যেখানেই কোনো অন্যায় দেখতেন সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করতেন।' (দ্র. শেখ হাসিনা, 'শেখ মুজিব আমার পিতা', *বিচিত্রা*, ১৬ আগস্ট, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫)

তিনি যে দরিদ্র মানুষের বিপন্নতায় বিচলিত হতেন তাঁর প্রমাণ মেলে ছোটবেলার আরেকটি ঘটনা থেকে। একবার তাঁর গ্রামের চাষিদের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কৃষকদের জীবনে নেমে আসে অভাব-অনটন। অনেক বাড়িতেই দুবেলা ভাত রান্না বন্ধ হয়ে যায়। চাষিদের চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা। তাদের সন্তানেরা অভুক্ত। সারা গ্রামে এই প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা নিয়ে চাপা গুঞ্জন। কিশোর মুজিব এরকম পরিস্থিতিতে দুঃখ-ভারাক্রান্ত। কিন্তু কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। একটা কিছু করার জন্য তিনি ছটফট করছিলেন। সে সময়

যে পথটি তাঁর সামনে খোলা ছিল, তিনি তাই করলেন। নিজের পিতাকে তিনি তাদের গোলা থেকে বিপন্ন কৃষকদের মধ্যে ধান বিতরণের জন্য অনুরোধ জানালেন। তাদের নিজেদের ধানের মজুত কেমন, এই অনুরোধ তাঁর বাবা রাখতে পারবেন কিনা, সেসব তিনি ভাবেননি। কৃষকদের বাঁচিয়ে রাখার চিন্তাটিই ছিল তখন তাঁর কাছে মুখ্য (দ্র. Obaydul Haq, *Banglbandhu Sheikh Mujib : A Leaber With a Difference*, Radical Asia Publication, 1996 2nd edition, p. 13)।

সাধারণের জন্য এই কল্যাণচিন্তা তাঁর গোটা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে। সুযোগ পেলেই তিনি ছুটে গেছেন কৃষকের কাছে, শ্রমিকের কাছে। তাদের জন্য কিছু একটা করার তাগিদ দিতেন সবাইকে। সময় পেলেই কথা বলতেন ব্যক্তিগত কর্মচারী এবং নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে। তাঁরা যে বেতন পায়, তাই দিয়ে তাদের সংসার চলে কিনা, এরকম প্রশ্ন তিনি তাদের প্রতিনিয়তই করতেন এবং সাধ্যমতো সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতেন। তাঁর মানবিক গুণাবলি এই ক্ষুদ্র পরিসরে বলে শেষ করা সম্ভব নয়।

ছাত্র-রাজনীতিক ও অসাম্প্রদায়িক শেখ মুজিব

মুজিব-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর অধিকার-সচেতনতা। সারা জীবন তিনি তাঁর জন্মভূমির সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করেছেন, যার সূচনা সেই কৈশোরের দিনগুলোতে। স্কুলে ছাত্র থাকা অবস্থাতেই শুরু হয় তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকা। ১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জ সফরে যান অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী 'শেরেবাংলা' এ কে ফজলুল হক। সঙ্গে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। শেখ মুজিব তখন স্থানীয় মিশনারি স্কুলের ছাত্র। নেতৃবৃন্দ সেই স্কুল পরিদর্শনে আসেন। শেখ মুজিব স্কুলছাত্রদের পক্ষ থেকে তাদের কাছে স্কুলের ছাদ দিয়ে যে পানি পড়ত তা সারাবার এবং ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার দাবি তুলে ধরেন। অতিথিগণ কিশোর ছাত্রদের দাবি মন দিয়ে শোনেন এবং স্কুলের দৈন্যদশা নিরসনে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন (এস. এ. করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯)। স্কুল-জীবনেই তাঁর মধ্যে ভবিষ্যতের এক নেতার আবির্ভাবের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়। স্কুলের যেকোনো অনুষ্ঠান আয়োজনে তিনি থাকেন সামনের কাতারে। বয়সে বড় হওয়ায় সবাই তাকে মুজিব ভাই বলে ডাকত। তিনিও বিভিন্ন উপলক্ষে ছাত্রদের মুখপাত্র হিসেবে এগিয়ে আসতেন। সর্বদাই নেতৃত্বদান যেন তাঁর সহজাত ছিল। স্কুল জীবনে তাঁর সাহস ও কর্মোদ্দীপনা দ্রুতই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁরা তাকে গোপালগঞ্জের মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করেন। স্কুল ছাড়ার আগপর্যন্ত তিনি তাঁর এই দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবে পালন করছিলেন। (এস. এ. করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭)।

ছাত্রজীবনেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয় যখন তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান। সোহরাওয়ার্দী তখন মুসলিম লীগের নেতা। খুব সহজেই তিনি তাঁর নির্ভরযোগ্য সহকারী হয়ে যান। চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকেই তিনি বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস লীগের এবং নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিছুদিন পর তিনি নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ এবং নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালে তিনি এন্ট্রান্স (বর্তমানের এসএসসি) পাস করেন। এরপর তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মানবিক বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন এবং বেকার হোস্টেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। ইতিমধ্যে তিনি ১৯৪৪ সালে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদান করেন এবং তা সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ বছরেই তিনি কলকাতাস্থ ফরিদপুরবাসীদের একটি সংস্থা 'ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে শেখ মুজিব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সে বছর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে গোটা ফরিদপুর জেলায় যে প্রচারাভিযান চলে, তিনি সেটিরও সমন্বয় সাধন করেন। সোহরাওয়ার্দীর সহকারী হিসেবে তিনি ওই সময় সাধারণ মানুষকে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মুসলিম লীগকে 'গণতান্ত্রিক' ও সাধারণ জনতার দলে পরিণত করার জন্য পূর্ববাংলায় দুই বর্ষীয়ান নেতা সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম যে উদ্যোগ নেন, শেখ মুজিব মাঠ পর্যায়ে তাঁর বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়েও শেখ মুজিব নিজ এলাকা ফরিদপুরে অসাধারণ ভূমিকা রাখেন। রাজনৈতিক কর্মী মুজিব তাঁর তারুণ্যের সেই দিনগুলোতে সর্বদাই মাঠ পর্যায়ে কাজ করা পছন্দ করতেন, তত্ত্বকথা বা আদর্শিক বিষয়াবলি তাকে তেমন টানত না। ১৯৪৬ সালে আবুল হাশিম যখন নিজের বাড়িতে ছাত্র-কর্মী এবং দলীয় কর্মীদের জন্য একটি পাঠচক্রের আয়োজন করলেন, মুজিব সেখানে যোগ দিলেন দায়িত্বের অংশ হিসেবে। সেখানে দলীয় কর্মসূচির পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি, রাজনৈতিক সংগঠনের মূলনীতিসমূহ এবং গণসমর্থন লাভের কৌশল প্রভৃতি বিষয়ের ওপর আলাপ-আলোচনা হতো। এসব আলোচনায় মুজিব খুব কমই মনোযোগ দিতেন। '... সকাল হলে জিজ্ঞেস করতেন তাঁর জন্য করার মতো কোনো কাজ আছে কিনা।' (এস. এ. করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫)। পরবর্তী জীবনে

আমরা তাঁর যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাই, তা তিনি শুধু বই পড়ে বা একাডেমি থেকে অর্জন করেননি। তিনি রাজনীতির পাঠ নিয়েছেন গণমানুষের কাছ থেকে, জনসাধারণের কাতারে মিশে গিয়ে জীবনের পাঠশালা থেকে। তার মানে এই নয় যে, তিনি পড়াশোনা করতেন না। সময় পেলেই তিনি পড়তেন। পরবর্তীতে লক্ষ করা যায় যে, বিশাল এক ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল তাঁর। সেখানে ছিল দেশ-বিদেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তবে কোনো অর্থেই তিনি 'বুকিশ' ছিলেন না, ছিলেন কর্মবীর।

১৯৪৭ সালে শেখ মুজিব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। এ বছর জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হয় সিলেটের গণভোট। গণভোটে পাকিস্তানের পক্ষে শেখ মুজিব প্রায় পাঁচশ কর্মীর একটি দলের নেতৃত্ব দেন (এ. এম. এ. মুহিত, *মহাপুরুষদের কথা কাছে থেকে দেখা*, অনন্যা প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ৪৯)। ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে কলকাতায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। উল্কার মতো তিনি তখন ছুটে বেড়িয়েছেন দাঙ্গা দমনের জন্য। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দু-তিন দিন পর্যন্ত অভুক্ত থেকে নিরলসভাবে কাজ করেছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে। (শেখ হাসিনা, শেখ মুজিব আমার পিতা, *বিচিত্রা*, ১৬ আগস্ট, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪-৩৫)।

ভারত ভাগের সময় শরৎ বসু, সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম চেয়েছিলেন বাংলাকে অবিভক্ত রাখতে। তাদের এই প্রয়াসে বাদ সাধে ভারতের কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা এবং পূর্ববাংলার স্বার্থান্বেষী একটি গোষ্ঠী। শেখ মুজিব তাঁর নেতাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করার জন্য এই প্রস্তাবের পেছনে গণসমর্থন গড়ে তুলতে দলবল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন। জনগণকে তিনি বোঝাতে থাকেন কীভাবে যুক্ত-বাংলা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই কল্যাণ সাধন করতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় একদিন এক কর্মী তাঁর বক্তব্যের পর মন্তব্য করল যে, যুক্ত-বাংলাকে যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বছরে ৬৪ কোটি রুপি ভর্তুকি না দেওয়া হয় তাহলে এটি কঠিন আর্থিক সংকটে পড়বে। মুজিব বিষয়টির অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কিত এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো প্রস্তুত ছিলেন না। এ সময় সালাহউদ্দীন নামে অর্থনীতির এক ছাত্র তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তিনি পাল্টা যুক্তি দেখান যে, ঠিক ঐ মুহূর্তে বাংলা নয়াদিল্লীর কাছ থেকে যে বরাদ্দ পাচ্ছিল তাঁর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ রাজস্ব সে আয়কর ও শুল্কের মাধ্যমে নয়াদিল্লীকে প্রদান করছিল। অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলা তাঁর নিজস্ব রাজস্বেই চলতে সক্ষম। এক যুগ পরেও মুজিব তাঁর এই উপকারী বন্ধুর কথা স্মরণে রেখেছিলেন। তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে একই বিমানে ভ্রমণকালে মুজিব সেদিনের তরুণ সালাহউদ্দীনকে 'নবীন অর্থনীতিবিদ' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে এক যুগ

আগের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, কীভাবে সালাহউদ্দীন তথ্যভিত্তিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (এস. এ. করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯)।

যে পাকিস্তানের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন বাস্তবে সে রকমটা যে হবার নয়, সে কথা খুব দ্রুতই স্পষ্ট হয়ে যায় শেখ মুজিবের কাছে। ছেচল্লিশের দাঙ্গা-হাঙ্গামার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে আরও বেশি হতাশ করে। তাই ১৯৪৭ সালের জুন মাসেই ইসলামিয়া কলেজের সিরাজদ্দৌলা হলে ছাত্র যুবক ও অন্য কর্মীদের এক গোপন বৈঠক ডাকেন তিনি। ততদিনে তাঁর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞাবলে পাকিস্তানের অমানবিকতা ও অগণতান্ত্রিকতার বিষয়ে তাঁর মতামত স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তিনি তা প্রকাশও করেন। একই সঙ্গে তিনি মুসলিম লীগের রক্ষণশীল অংশের সঙ্গে প্রগতিবাদী ছাত্র ও যুব-কর্মীদের পার্থক্য চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হতে বলেন তাঁর কর্মীদের।

শেখ মুজিব ও ভাষা-আন্দোলন

অন্যতম ভাষাসৈনিক গাজিউল হক *ভাষা-আন্দোলনের আর্থসামাজিক পটভূমি* (আতিউর রহমান ও সৈয়দ হাশেমী, ইউপিএল, ১৯৮৯) বইয়ের জন্য দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান : ১৯৪৭ সালের ৬ এবং ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় গণতান্ত্রিক যুব কর্মীদের এক সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তসদ্দুক আহমদ। অন্যান্যের মধ্যে শামসুল হক (পরবর্তীতে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক) এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সম্মেলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা থেকে শুরু করে প্রায় পরদিন ভোর পর্যন্ত বিষয়-নির্বাচনী কমিটির বৈঠক চলে। বৈঠকে পরদিনের গৃহীতব্য প্রস্তাবগুলো আলোচিত হয় এবং পরবর্তীতে সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভাসম্পর্কিত প্রস্তাবগুলোসহ প্রায় সবকটি প্রস্তাবের আলোচনায় মুজিব ভাই বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো ছিল নিম্নরূপ :

'পূর্ব-পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে সে-সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।'

এখানে উল্লেখ্য, প্রস্তাবের শেষ অংশটি—'জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক'—সংযোজনের প্রস্তাব করেন সেদিনকার আপসহীন সংগ্রামী ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমার এবং তাঁকে সমর্থন করেন রাজশাহীর

আতাউর রহমান। সুতরাং, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ২২ দিন পর তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে যখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার প্রশ্নটি ওঠে এবং দাবি জানানো হয়, বঙ্গবন্ধু তখনো প্রথম সারির নেতৃত্বের কাতারেই ছিলেন।

যা হোক, শেখ মুজিব ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ভর্তি হয়েই জড়িয়ে পড়েন গণতান্ত্রিক যুবলীগের প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়ার সঙ্গে। ৪ জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম লীগের কর্তাব্যক্তিরা তাঁর এসব উদ্যোগকে ভালো চোখে দেখেননি। এর কিছুদিন পরই শুরু হয়ে যায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার আন্দোলন। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন আইন পরিষদে 'পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে' বলে ঘোষণা দিলে শেখ মুজিব তৎক্ষণাৎ এর প্রতিবাদ জানান। খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তব্যে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শেখ মুজিব মুসলিম লীগের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য কর্মতৎপরতা শুরু করেন। তিনি ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ২ মার্চ ভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে। এই বৈঠকে শেখ মুজিবের প্রস্তাবক্রমে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষা নিয়ে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রতিবাদ-সভা শেষে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য শোভাযাত্রা করে প্রাদেশিক সচিবালয়ে গমন করে। পুলিশ এই শোভাযাত্রার ওপর হামলা চালায়। শেখ মুজিবের সঙ্গে পুলিশের এক বড় কর্তার ধস্তাধস্তি হয় এবং তিনি গ্রেফতার হন। রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার হবার সূচনা ছিল এটি এবং পরবর্তী ২৩ বছর তা ছিল তাঁর এক নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা (এ. এম. এ. মুহিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০)। ১৫ মার্চ খাজা নাজিমউদ্দিন ছাত্রদের সঙ্গে ভাষা নিয়ে একটি আট দফা চুক্তি সম্পন্ন করেন এবং তাঁরই এক দফা অনুযায়ী সমুদয় বন্দী ছাত্রকে মুক্তি দেন। শেখ মুজিব তাই পাঁচ দিনের মাথায় মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পরপরই শেখ মুজিব ১৫০নং মোগলটুলীর শকওত আলী ভাইসহ ফজলুল হক হলে আসেন। সেখানে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন আট দফা চুক্তি পড়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, 'মেয়ারা (মিয়ারা) করছো কী? রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি কোথায়? এই চুক্তি আমি মানি না।' তাঁর প্রস্তাব মতো পরদিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে এবং সম্পাদিত

চুক্তির কয়েকটি স্থান সংশোধন করে সেই সংশোধিত প্রস্তাব সাধারণ ছাত্রসভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুজিবের বক্তব্য ছিল আট দফা চুক্তি অন্তঃসারশূন্য। এই চুক্তিতে রাষ্ট্রভাষার দাবিকে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপস করেছেন কিছু আপসকামী ছাত্রনেতৃবৃন্দ। আট দফা চুক্তি এবং সংশোধনী পাশাপাশি পড়লেই আট দফা চুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা এবং চুক্তিকারীদের আপসকামিতা প্রকট হয়ে ওঠে। আট দফা চুক্তিতে তদন্ত বিষয়ক প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীর ওপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা আর শিয়ালের নিকট মুরগি বর্গা দেওয়া প্রায় সমার্থক। এই প্রস্তাবটিতে নির্লজ্জভাবে প্রধানমন্ত্রীর তোষামোদও করা হয়েছে এবং এই কারণেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম সংশোধনীর প্রস্তাব করেন যাতে নিরপেক্ষ তদন্তেরই দাবি করা হয়। ভাষা সম্পর্কীয় প্রস্তাবটি পাঠ করলেও দেখা যাবে আট দফার ৩নং এবং ৪নং দফা দুটিতে প্রস্তাব উত্থাপন করার কথা বলা হয়েছে, প্রস্তাব গ্রহণের কথা অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা নেই। 'আন্দোলনে যাহাতে ফাটল বা অনৈক্য সৃষ্টি না হইতে পারে, সেই জন্য আমরা ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেলতলায় এক সাধারণ ছাত্রসভার আহ্বান করি। সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন।' (দ্র. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮২ পৃ. ৪৪)। সভায় পুলিশ হামলা চালায়। পুলিশি হামলার প্রতিবাদে শেখ মুজিব ১৭ মার্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান। এ বছরেরই ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরের কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য শেখ মুজিব আবারও গ্রেফতার হন (দ্র. মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ*, সময় প্রকাশন ২০০৪, পৃ. ১২)।

যেদিন আপনারা বাংলার মানুষের এই ভালোবাসা ও আস্থার অমর্যাদা করবেন, সেদিনই আপনাদের মুজিব ভাইয়ের, এবং আপনাদের প্রিয় আওয়ামী লীগের মৃত্যু হবে। আর সেই সঙ্গে চিরতরে নির্মুল হয়ে যাবে বাঙালির ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ।'

(বঙ্গবন্ধু, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের যৌথ অধিবেশন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, ঢাকা ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১)

১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্তি পান। মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ঘোষণা করলে শেখ মুজিব এই ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানান। ৩ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী-আন্দোলন একটি ছাত্র-কর্মচারীর মিলিত আন্দোলনে রূপ নেয়। অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করলে কর্তৃপক্ষ ১১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে আন্দোলনকে বানচাল করার চেষ্টা করে। কর্মচারীদের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে ২৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবকে অযৌক্তিকভাবে জরিমানা করে। তিনি এ অন্যায় নির্দেশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন (দ্র. মুনতাসীর মামুন, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১২)। শেখ মুজিবসহ ২৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় খুললে ১৭ এপ্রিল থেকে শুরু হয় আরও কঠিন আন্দোলন। এবার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের বিষয় একটি প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়াল। কর্তৃপক্ষ গোপনে জানালেন যে, কোনো রকম দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি দিলেই শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে। শেখ মুজিব এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ২০ এপ্রিল প্রচণ্ড বিক্ষোভ হলো এবং এই দিন অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হলো। শেখ মুজিব আবার জেলে গেলেন। মুচলেকা দিয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত প্রায় সবাই রেহাই পেলেন, কিন্তু কয়েকজন এই মুচলেকা দিতে অস্বীকার করলেন। শেখ মুজিব ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি ঘোষণা করলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আর তিনি পদার্পণই করবেন না। সে কারণেই তাঁর আইন পাস করাও আর হয়ে উঠল না (এ. এম. এ. মুহিত, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫১)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যার্থী হিসেবে তাঁর সংযোগ ছিন্ন হলো। কিন্তু বহু পরে আবার তিনি ফিরে আসছিলেন অন্য অধিকারে : শেষ পর্যন্ত চ্যান্সেলর হিসেবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে আসার কথা ছিল। সেদিনের মর্মান্তিক ঘটনার কথা আমরা সবাই জানি। ফিরে আসি ঊনপঞ্চাশে। শেখ মুজিবের মুক্তি পেতে তিন মাসেরও বেশি সময় চলে যায়। ২৩ জুন পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থাতেই শেখ মুজিব এ দলের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২৭ জুলাই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেল থেকে বেরিয়ে শেখ মুজিব আর শিক্ষাঙ্গনে রইলেন না, জাতীয় রাজনীতিতে তখন তাঁর পদচারণা শুরু হয়ে গেছে।

১৯৪৯-এর শেষার্ধে পূর্ববাংলায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা গেল। আওয়ামী মুসলিম লীগ খাদ্য-সংকট নিয়ে শুরু করল তাঁর প্রথম রাজপথের আন্দোলন। জেল থেকে বেরিয়ে শেখ মুজিব এ আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে গ্রেফতার হন ও পরে মুক্তি লাভ করেন (দ্র. মুনতাসীর মামুন, প্রাগুপ্ত, প. ১৩)। খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে

পুরোনো ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে ১১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হলো আওয়ামী মুসলিম লীগের বিরাট জনসভা। সভায় শেখ মুজিব মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, 'একজন অন্য একজনকে খুন করলে তার ফাঁসি হয়। যে নুরুল আমীন শত শত লোককে খুন করেছে তার কী হওয়া উচিত? তাকে এই মাঠে এনে জনতার আদালতে বিচার করে গুলি করে মারা উচিত।' সভাশেষে শুরু হলো মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ভুখা মিছিল। মিছিলের গতিরোধ করল পুলিশ এবং অনেক নেতাকে গ্রেফতার করল। মওলানা ভাসানী গ্রেফতার হলেন ১৪ তারিখে। শেখ মুজিব সতর্কতার সঙ্গে গ্রেফতার এড়িয়ে যান। কয়েক দিন আত্মগোপন করে তিনি চলে যান লাহোরে। তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর সাহায্য ও উপদেশে সেই সময় তিনি প্রায় দুই মাস পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপন এবং পরিস্থিতি মূল্যায়নে ব্যয় করেন (দ্র. এস. এ. করিম, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৮)। এই যোগাযোগ পরবর্তীতে তাঁকে খুবই সাহায্য করে। তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন ডিসেম্বরে এবং ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। মুসলিম লীগ সরকার সঠিকভাবেই তাঁকে একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিহ্নিত করে। পরবর্তী দুই বছর দুই মাস তিনি জেলে ছিলেন (দ্র. এ. এম. এ. মুহিত, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫২)।

১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলন যখন আবার দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে তখন শেখ মুজিব জেলে বন্দী থাকা অবস্থাতেও নিশ্চুপ ছিলেন না। আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন, মুক্ত সঙ্গী-সাথীদের পরামর্শ দিয়েছেন। ঐ বছর ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা করলেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। এর প্রতিবাদে বন্দী থাকা অবস্থায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দী মুক্তির এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস হিসেবে পালন করার জন্য শেখ মুজিব রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি এ দাবিতে জেলখানায় অনশন শুরু করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর শহিদ হন। শেখ মুজিব জেলখানা থেকে এক বিবৃতিতে ছাত্র-মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। একটানা ১৩ দিন অনশন অব্যাহত রাখেন। জেলখানা থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে তাঁকে ঢাকা জেলখানা থেকে ফরিদপুর জেলে সরিয়ে নেয়া হয় (দ্র. মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩)। ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলন খানিকটা স্তিমিত হয়ে এলে স্বাস্থ্যগত কারণে শেখ মুজিবকে ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেওয়া হয়। জেলখানার গেটে তাঁকে স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে আসা হয়। সেখানে আত্মীয়স্বজন তাঁর দায়িত্ব বুঝে নেন। চার

সপ্তাহ গ্রামের বাড়িতে বিশ্রাম নেয়ার পর তিনি আবার চলে আসেন তাঁর কর্মক্ষেত্রে, ঢাকায়। ২৭ এপ্রিল বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় পাঁচ শত প্রতিনিধি ভাষা বিষয়ক এক সম্মেলনে ঢাকা বার লাইব্রেরিতে মিলিত হন। শেখ মুজিব এই সম্মেলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এই সম্মেলন থেকেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হবে (দ্র. এস. এ. করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩)।

উপরের তথ্যগুলি থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, ভাষা-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল? মুক্তাবস্থায় কি জেলে বন্দী অবস্থায় রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে তিনি তাঁর আপসহীন সংগ্রামী নেতৃত্বের ছাপ রেখেছেন। আর সে কারণেই পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনেই তিনি ভাষা-আন্দোলনের মূল চেতনা অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি গড়ার স্বপ্নকে যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা

পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর আদর্শগত মতবিরোধের কারণে মওলানা ভাসানী মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। শেখ মুজিব ও অন্যদের নিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন তিনি গঠন করলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ। আরও পরে ১৯৫৫ অধিকতর সাম্প্রদায়িকতামুক্ত রাজনীতির স্বার্থে মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শামসুল হক এবং শেখ মুজিব গঠন করেছিলেন আওয়ামী লীগ। নতুন এই দলের সবচেয়ে সক্রিয় সংগঠক ছিলেন শেখ মুজিব। তিনি ছিলেন মওলানা ভাসানীর সবচেয়ে প্রিয় সহযোগী।

আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকের অসুস্থতার কারণে কিছুদিনের মধ্যেই শেখ মুজিবকে দলের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হয়। প্রায় দেড় বছর পর ১৯৫৩ সালের ১৬ নভেম্বর প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই কাউন্সিল অধিবেশনে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল আসন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনে সব বিরোধী দলকে নিয়ে সম্মিলিত জোট গঠনের। ৪ ডিসেম্বর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় এবং ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট গঠনে ছাত্রদের চাপ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয় (দ্র. এ. এম. এ মুহিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩)।

১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন। এর মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ পায় ১৪৩টি আসন। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জের আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী

নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। তিনি আরও অনেক কেন্দ্রে নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করেন। যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসেবে এ. কে. ফজলুল হক ২ এপ্রিল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৪ মে শেখ মুজিব নবনির্বাচিত সরকারের বয়ঃকনিষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে কৃষি, বন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন। শুরু থেকেই পরাজিত মুসলিম লীগের সাক্ষাৎশত্রু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে। এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পরপরই শেখ মুজিব নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাদের সতর্ক হতে বলেন। কিন্তু সেদিন তারা তাঁর সতর্কতায় কান দেননি। সাহস করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে না দাঁড়াতে পারার জন্য তিনি নেতাদের বলেছিলেন যে, এই নৈতিক সাহসের অভাবের জন্য তাদেরকে একদিন অনুতাপ করতে হবে (দ্র. ওবায়দুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০)। ৩০ মে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী শেরে বাংলা ফজলুল হককে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বর্ণনা করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা করলেন এবং গভর্নরের শাসন ৯২-ক ধারা জারি করলেন। ৩০ মে শেখ মুজিব করাচি থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রেফতার হন (দ্র. মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪)। ২৩ নভেম্বর তিনি জামিনে মুক্তি পেলে জেলগেটেই তাঁকে পুনরায় নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। প্রায় সাত মাস পরে ডিসেম্বরে তিনি মুক্তি পান (দ্র. এ. এম. এ মুহিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪)।

Do justice to the people, care for the sentiments of the people, respect the sentiments of the people, and allow them to decide.

(বঙ্গবন্ধু, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫, পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি)

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর শেখ মুজিব আরও সোচ্চার হন আইন পরিষদে। ১৯৫৫-৫৬ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত ওই পরিষদে তিনি যেসব বক্তৃতা করেন তা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তিনি সাধারণের কল্যাণচিন্তায় কতটা আন্তরিক ছিলেন। আর ফুটে ওঠে তাঁর স্বদেশচিন্তা। স্বদেশের বঞ্চিত

কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের কথা অন্তরের সবটুকু দরদ দিয়ে তিনি পরিষদে তুলে ধরেন। (দেখুন পরিশিষ্ট-১)।

১৯৫৫ সালের ৫ জুন শেখ মুজিব পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তবে তার আগেই সাংসদ হওয়ার অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। ২৩ জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। শেখ মুজিব গণপরিষদে তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্য থেকে শুরু করে অধিবেশনের শেষ পর্যন্ত যখনই সুযোগ পেয়েছেন পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও তার যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন। এর পাশাপাশি তিনি পূর্ববাংলার জনগণের নানা অধিকার আদায়ে সোচ্চার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি গণপরিষদের জনগুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য বিষয়ের অবতারণা করেন। সেসবের মধ্যে ছিল গভর্নর জেনারেলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বিরোধিতা, করাচির পাশাপাশি ঢাকাকে ফেডারেল রাজধানী করা, প্রাদেশিক গভর্নরদের বেতন হ্রাস, ক্ষমতাসীন দলের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরোধিতা, সংসদের দৈনন্দিন কার্যসূচি বাংলায় মুদ্রিত করার প্রস্তাব, সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান, বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে নাগরিকদের মতামত গ্রহণ, সংবিধানের ইসলামিকরণের বিরোধিতা, জনগণের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখার প্রস্তাব, প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা, রাষ্ট্রপতির অযাচিত হস্তক্ষেপের ক্ষমতার বিরোধিতা করা, যৌথভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার তাগিদ, রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার সংবিধানে নির্দিষ্ট করা, সরকারি চাকরিতে বাঙালিদের সমান অধিকার, জমিদারদের গরিব কৃষক শোষণ বন্ধ, জমিদারদের উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মাঝে বণ্টনের প্রস্তাব, সকল বিষয়ে পাকিস্তানের উভয় অংশের সমতা বিধান এবং সংসদে মহিলা-আসন বৃদ্ধির প্রস্তাব। (দ্র. মোনায়েম সরকার সম্পাদিত *বাঙালির কণ্ঠ*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮)।

'জুলুম মাৎ করো ভাই'

শেখ মুজিব পাকিস্তান গণপরিষদে তাঁর জীবনের প্রথম ভাষণেই পাকিস্তানকে একটি ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট তিনি গণপরিষদে তাঁর প্রথম সংসদীয় ভাষণে বাংলার জনগণের মনের কথাই প্রতিফলিত করেন। পূর্ববাংলার পরিবর্তে প্রস্তাবিত 'পূর্ব-পাকিস্তানে'র বিরোধিতা করে তিনি বলেন, 'বাংলা' নামের নিজস্ব

ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে। এটাকে পরিবর্তন করতে হলে জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই পরিবর্তন করতে হবে। তিনি সাংসদদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনারা যদি এটা [বাংলা] পরিবর্তন করতেই চান, আপনাদের বাংলায় ফিরে যেতে হবে এবং তাদেরকেই [জনগণকে] জিজ্ঞেস করতে হবে তারা এটা [পরিবর্তন] চায় কি না।' এরপর তিনি তাড়াহুড়ো এক ইউনিট করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য বলেন। এ বিষয়ে আপত্তি তুলে তিনি যুক্তি দেখান, পূর্ব-বাংলার জনগণ তখনই এটাকে মেনে নেবে যখন এর সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়, যৌথভাবে ভোট দানের বিষয় এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয় যুক্ত হবে। তিনি এক ইউনিটের বিষয়ে জনগণের মতামত নেয়ার জন্য আহ্বান জানান। এক ইউনিট করার ব্যাপারে জনগণের যে সায় নেই, জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি তা ভালোই জানতেন। একই সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর এ ব্যাপারে যে কায়েমি স্বার্থ রয়েছে সে বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন। তাই পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের চারটি প্রদেশকে এক করে পশ্চিম পাকিস্তান ঘোষণা করার বিলের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে শেখ মুজিব বলেছিলেন : '... জুলুম মাৎ করো ভাই। যদি এই বিল আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন তাহলে বাধ্য হয়েই আমাদের অসাংবিধানিক পথ বেছে নিতে হবে। আপনারা সাংবিধানিক পথে এগুবার চেষ্টা করেন। জনগণকে যদি সাংবিধানিক উপায়ে চলতে না দেন, তাহলে তারা অসাংবিধানিক পন্থায় এগুতে বাধ্য হবেন...।' এই বিলের ওপর সমাপ্তি আলোচনায় ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি আরও সোচ্চার কণ্ঠে বলেন, 'এদের কাছ থেকে মধু আমরা আশা করতে পারি না। তাদের কাছ থেকে বরাবরই বিষ আশা করতে পারি। পাকিস্তানের জনগণ আরও বিষ আশা করতে পারেন।' সবশেষে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, এই আইন পাশ হবার ফলে 'পাকিস্তান টুকরো টুকরো হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।' আদমজিতে দাঙ্গার পরপরই শেখ মুজিব সাংবিধানিক পরিষদের এক অধিবেশনে (৪ অক্টোবর ১৯৫৫) বলেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পরপরই এ দাঙ্গা হয় :

> 'জনাব মোহাম্মদ আলী, জনাব ফজলুল হককে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চান এবং আমাদের মন্ত্রীপরিষদ থেকে দূরে রাখতে চান। কিন্তু আমরা এই ষড়যন্ত্র সফল হতে দিইনি। আমরা মন্ত্রীপরিষদে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিই। যখনই জানা গেল যে, আওয়ামী লীগ ও জনাব ফজলুল হকের ঐক্য পুনরায় স্থাপিত হয়েছে তখনই এই দাঙ্গা বাধানো হয়। এই দাঙ্গা বাধার পর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে করাচি যেতে বলা হয়। আমরা দাবি করি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীকে পূর্ব-বাংলায় আসার জন্য। এরপর সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় ৫০ জন এম.এল.এসহ ২৫০০ জন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। একই সঙ্গে বলা হয় মওলানা ভাসানী একজন কমিউনিস্ট এবং তাঁকে

পাকিস্তানে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

জেনে রাখুন মওলানা ভাসানী দেশে ফিরে এসেছেন এবং দেশেই থাকবেন। আমরা তাঁর জন্য শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব। কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। কেউ যদি তা করে তবে তার পরিণতিও সে দেখতে পাবে। তখন তিনি লন্ডনে। আমিই তাঁকে দেশে ফেরার জন্য টেলিগ্রাম পাঠাই। পাকিস্তান অর্জনের জন্য তিনি অন্য সবার চেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁকে কমিউনিস্ট ঘোষণা করেছেন। এভাবেই তাঁরা তাঁকে অপমানিত করেছেন।...'

রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে এক বিতর্কে তিনি বলেন : '১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রতিবাদ-দিবস পালন করার কর্মসূচি দিয়েছিলাম। নাজিমউদ্দিনের সরকার সেদিন আমাদের উপর লাঠিচার্জ করেছে। ১৪৪ ধারা জারি করেছে। আমাকে এবং আমার বন্ধুদের জেলে পুরেছে। তিনি শুধু জানেন কী করে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করা যায়।' (দ্র. Ziaur Rahman, *Speeches of Sheikh Mujib in Pakistan Parliament*, 1955-56 : Vol 1, Hakkani Publishers, Dhaka, 1990. p. 167)।

গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা

অসাংবিধানিক পন্থা অবলম্বনের ভয় দেখালেও গণতন্ত্রের ওপর শেখ মুজিবের অবিচল আস্থা ছিল। গণতন্ত্রের জন্য তাঁর যে আকাঙ্ক্ষা, গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর যে আস্থা সেটির পরিচয় আমরা পাই যখন দৃষ্টি ফেরাই ঐ বছরেরই (১৯৫৫) ২২ সেপ্টেম্বর আইন পরিষদের অধিবেশনে দেওয়া তাঁর ভাষণের দিকে। গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকা উচিত নয়, সংসদে তিনি জোরালোভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, 'আমরা জনগণের প্রতিনিধি আর দেশের গভর্নর-জেনারেল ইংল্যান্ডের রানি কর্তৃক নিয়োগকৃত। এ অবস্থায় জনগণের সরাসরি প্রতিনিধি মন্ত্রীদেরই উচিত গভর্নর-জেনারেলকে উপদেশ দেওয়া এবং তিনিও মন্ত্রীদের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকবেন।' (দ্র. *Sheikh Mujib in Parliament, 1955-58* edited by Shahryar lqbal, Agamee Prakasani, 1997, P. 31)। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নন এই অভিযোগে তিনি গভর্নর ও গভর্নর-জেনারেলকে অসীম ক্ষমতা প্রদানের তীব্র বিরোধিতা করে ১ অক্টোবর সংসদে আবারো বলেন 'পাকিস্তানের জনগণ কীভাবে তাঁর কাছে ন্যায়বিচার আশা করতে পারে, তিনি তো তাদের প্রতিনিধিই নন। ... আমরা এমন কাউকে ক্ষমতা দিতে চাই না জনগণের কাছে যাঁর দায়বদ্ধতা নেই।' গভর্নর-জেনারেলের হাতে অসীম ক্ষমতা প্রদান করা হলে তার

কুফল সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন যে, গভর্নর-জেনারেল তার মর্জিমাফিক তথাকথিত অসন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে ৯২-ক ধারা বলবৎ করবেন এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ধরপাকড় করবেন।

এই দুই দিনের ভাষণেই শেখ মুজিব গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নয় এমন কাউকে ক্ষমতা প্রদানের কুফল তুলে ধরে গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং দেশের মঙ্গলের জন্য কোনো একক ব্যক্তির হাতে অসীম ক্ষমতা না দেওয়ার পক্ষে তিনি প্রস্তাব করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'ক্ষমতা আপনাদের নিজেদের হাতে নিন, মন্ত্রীপরিষদকে ক্ষমতা দিন, যারা জনগণের প্রতিনিধি। এমন কাউকে ক্ষমতা দেবেন না যাঁরা পাকিস্তানের জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নন।' (দ্র. ঐ, পৃ. ৭৯-৮২)। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতি তাঁর এই অবস্থার প্রতিফলন আবারও দেখা যায় ১৯৫৬ সালের ২১ জানুয়ারি সংসদে রাষ্ট্রপতিকে প্রস্তাবিত ক্ষমতাদান বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের সময়। শেখ মুজিব প্রেসিডেন্টকে আইনসভা ভেঙে দেওয়া, জরুরি পরিস্থিতি তলব করে সংবিধান স্থগিত রাখাসহ অসীম ক্ষমতা প্রদান করার সমালোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আপনারা সংসদীয় ধাঁচে সরকার গঠন করেছেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে দিচ্ছেন [সংসদ] বিলোপের ক্ষমতা, এটি পুরোপুরিই গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিরোধী।' রাজপথের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম করায় অভ্যস্ত শেখ মুজিব ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সংসদের অধিবেশনে গণতন্ত্রের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন এভাবে, 'নিশ্চিতভাবেই আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং এর জন্যই আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করছি। আমি জানি না কবে আমরা গণতন্ত্রের স্বাদ পাব; তবে, আমরা এর জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি।' (দ্র. ঐ, পৃ. ৪)

গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের অন্যতম প্রাথমিক শর্ত যে, জনগণের প্রতি ন্যায় বিচার করা, তাদের আবেগকে সম্মান দেখান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সে বিষয়টি শেখ মুজিব ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সংসদে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। করাচিকে ফেডারেল রাজধানী করা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, 'আমরাই ঠিক করব কোনটি হবে ফেডারেল রাজধানী গাদাপ নাকি করাচি। কারণ জনগণ আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে।' (দ্র. ঐ, পৃ. ৫৯-৬০)। শেখ মুজিব করাচির পরিবর্তে গাদাপকে রাজধানী করার চেষ্টাকে জনগণের সাথে প্রতারণা করে অভিহিত করে বলেন, 'জনগণকে ধোঁকা দিয়ে কিছু দিন টিকলেও পরিণামে সত্যটাই বেরিয়ে আসবে।' পূর্ববঙ্গে ফিরে গিয়ে এ ধোঁকাবাজির জন্য মাননীয় সদস্যগণ তাদের ঘরবাড়ি থেকেও বের হতে পারবেন না বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। এই বিষয়ে তিনি ৯ নভেম্বর

সংসদে আবারও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, জনগণের সঙ্গে এভাবে প্রতারণা করে পরিণামে কিছুই পাওয়া যাবে না। জনগণের ক্ষমতার ওপর এই আস্থার পাশাপাশি তাঁর বক্তব্যে ফুটে উঠেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দুর্দশা, দুর্ভোগের করুণ বাস্তবতা। প্রাদেশিক গভর্নরদের বেতন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর সংসদে তিনি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমরা সারা বিশ্বে ঘোষণা করছি যে, আমাদের এটি ইসলামি রাষ্ট্র এবং আমরা ইসলামি আদর্শ কায়েম করব। এখন এটি কোন ইসলামি আদর্শ যে আপনি গভর্নরকে ৬০০০ রুপি দিচ্ছেন, যেখানে দেশের গরিব মানুষেরা অনাহারে ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করছে।' তিনি বলেন, 'এদেশের গরিব কৃষক পাটচাষী আর তুলাচাষীদের অর্থ এবং সাধারণ লোকের ট্যাক্সের পয়সা থেকেই আমরা গভর্নরকে মাসে ৬০০০ রুপি বেতন দিচ্ছি।' (দ্র. মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, বাঙালির কণ্ঠ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৯-১০)। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বারবার গরিব মানুষের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে মন্ত্রীদের প্রতি আবেদন জানান তারা যেন কম বেতন নিয়ে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কিছুটা হলেও আত্মত্যাগ করেন। গরিবের সমস্যার কথা, কৃষকের সমস্যার কথা শেখ মুজিব সুযোগ পেলেই সংসদে তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেছেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সালে তিনি রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রীদের ইসলামের নামে সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'আপনারা যদি অর্থ উপার্জন করতে চান, তাহলে বাইরে গিয়ে অর্থ অর্জন করেন। কিন্তু যখন জনসেবার কথা বলে জনপ্রতিনিধি হয়ে আসবেন তখন গরিব মেরে ধনী হতে পারবেন না। গরিবরা ট্যাক্স দেয়, এটা তাদেরই অর্থ। তাদের অর্থ ভোগ করার কোনো অধিকার আপনাদের নেই।' তিনি ভূ-স্বামী ও জমিদারদের কৃষক শোষণের বিষয় তুলে ধরে বলেন, 'জমিদাররা ভূমিহীন কৃষকদের দেওয়া অর্থ দিয়ে তাদের বিলাসী জীবনযাপন করছে। আর এই কৃষকরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে না খেয়ে মরছে।' তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'আমরা পাকিস্তান এনেছি ধনীদের জন্য নয়, বরং দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য।' তিনি ধনিক শ্রেণির প্রতি আবেদন জানান, 'দয়া করে দরিদ্রদের আর শোষণ করবেন না। আপনারাও তাদের সম্মান আর ভালোবাসা পাবেন।' পাশাপাশি বর্তমান অবস্থাই যদি চলতে থাকে তাহলে তার পরিণতি সম্পর্কেও তিনি তাদের সতর্ক করে দেন, 'আর যদি তাদের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে যান, তাহলে শীঘ্রই এমন দিন আসবে যেদিন তারা আপনাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠবে।' ২১ ফেব্রুয়ারি সংসদে প্রদত্ত ভাষণে শেখ মুজিব আবারও গরিবের পক্ষে আবেদন জানান, 'মাননীয় গভর্নর-জেনারেল মাসে ১২০০০ রুপি পারিশ্রমিক নেবেন না। কিছু অর্থ গরিবদের কাছেও যাক, যারা ক্ষুধায় অনাহারে মারা যাচ্ছেন।' একই বক্তৃতায় তিনি পাকিস্তান অর্জনের কৃতিত্ব এই দরিদ্র শ্রেণিকে প্রদান করে বলেন, 'গরিব

লোকগুলোই পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিল। আর আপনারা পাকিস্তানের এই গরিব মানুষগুলোর সঙ্গেই খেলা করছেন।' তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান, 'পাকিস্তানকে একটি খাঁটি ও সহজ সরল পাকিস্তান হতে দেওয়া হোক।' (দ্র. *বাঙালির কণ্ঠ*, পৃ. ১১৩-১১৫)

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দুরবস্থার বর্ণনা, তার কারণ বিশ্লেষণ ও প্রতিকার দাবির পাশাপাশি শেখ মুজিব জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্যও সংসদে জোরালো বক্তব্য উপস্থিত করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, খসড়া সংবিধানে যেসকল মৌলিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেগুলো ক্ষমতাসীন সরকারের খেয়াল-খুশির অধীনস্ত। এর ভবিষ্যৎ কুফল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতের যে কোনো সরকার [এর ফলে] জনগণের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে এবং তাদের স্বাধীনতা নষ্ট করতে পারে।' তিনি 'জনস্বার্থে' বা 'পাকিস্তানের স্বার্থে' জনগণের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার যে বিধান সংবিধানে রাখা হয়েছে তার সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানের কোনো একটি ধারা দিয়ে জনগণকে একটি অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর অন্য কোনো একটি ধারার মাধ্যমে পূর্ব-প্রতিশ্রুত অধিকারটি খর্ব করেছেন। তিনি জনস্বার্থে বিনা বিচারে আটকাদেশের বিধানের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, 'দেশে বিচার বিভাগ আছে, প্রচলিত আইন আছে, কাউকে যদি শাস্তি দিতে হয় তাহলে অবশ্যই ন্যায্য বিচারের পরই তা দিতে হবে।'

If you want to earn money you can earn outside, but when you have come as representative of the people to serve the people, then you should not become rich at the expense of the poor, because it is the poor who give the taxes, it is their money; you have no right to enjoy at their expense.

(বঙ্গবন্ধু, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি)

বাক্‌স্বাধীনতা যেমন জনগণের মৌলিক অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তেমন জনগণের সেই অধিকার বাস্তবায়নের একটি স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পন্থা। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ শেখ মুজিব সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বাক্‌স্বাধীনতা নিশ্চিত

করার জন্য জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কারণ ক্ষমতাসীনরা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করতে চায়। একই বক্তব্যে তিনি মন্তব্য করেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে পাকিস্তানের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বা বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি হচ্ছে সে বিষয়ে জানার ও মতামত প্রকাশ করার অধিকার রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের রয়েছে। তিনি বলেন, 'মৌলিক অধিকারের প্রশ্নটি কেবল কোনো নির্দিষ্ট প্রদেশের নয়, বা কেন্দ্রেরও নয়, বরং এর সঙ্গে সকল প্রদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। পাকিস্তানের সকল জনগণের স্বার্থ এতে জড়িত।'

জনগণের মৌলিক ও নাগরিক অধিকার তুলে ধরার পাশাপাশি শেখ মুজিব পূর্ববাংলার জনগণের যেকোনো ধরনের মানবাধিকারের বিষয় উত্থাপনের ক্ষেত্রে সংসদের প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন। স্পিকারের বারবার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করার তাগাদা, প্রতিপক্ষের সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি বারবার পূর্ববাংলার মানুষের দাবির কথা, তাদের অধিকারের কথা, তাদের ন্যায্য পাওনার কথা আইনসভায় তুলে ধরেছেন।

জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ এবং তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন (১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫) : 'পূর্ববাংলায় ৩০ বছর আগে এক আন্দোলন হয়। এটা ছিল কৃষক-আন্দোলন। আমার নেতা মওলানা ভাসানী সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল-আসাম সম্মলন হয়। তখন জমিদারদের ৯০% ছিলেন হিন্দু। মালিক ফিরোজ খান ঠিকই দিয়েছেন এ তথ্য। তবে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, গরিব মানুষের শোষক ও শাসক হিসেবে তাদের পরিচয় একই। এ জন্যেই আমরা পূর্ব-বাংলার জমিদার ও জায়গিদারদের বিরুদ্ধে। হিন্দু জমিদারেরা কলকাতা রাজশাহী ও মধুপুরে ফুর্তি করছিলেন এবং মুসলমান জমিদারেরা দার্জিলিং ও শিলংয়ে একই কাজ করছিলেন। উভয়েই কৃষকদের শোষণ করছিলেন। আমরা তাই এদের কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে চাই না। দেশের গরিব কৃষকদের মাঝে ওই জমি আমরা বণ্টন করার পক্ষে।' (দ্র. জিয়াউর রহমান প্রাগুক্ত ইংরেজি বই. পৃ. ২৩৩)

একই দিন ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে ইসলামি অনুশাসনের প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে তিনি বলেন : 'স্যার, তারা ইসলামের কথা বলেন। কোথায় মওলানা আতাহার আলী? আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে চাই, যে-ব্যবস্থায় একজনের মালিকানায় থাকবে ৫০ হাজার একর জমি এবং তিনি তা ভোগ করে আরামে ঘুমাবেন, অন্যদিকে তাঁরই বাড়ির পার্শ্বে আরেকজন মানুষ ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে মারা যাবে তাকে কি ইসলামি গণতন্ত্র বলা চলে? এটাই কি ইসলাম? দয়া করে

ইসলামের অপমান করবেন না। সে অধিকার আপনাদের নেই। এই যদি হয় ইসলামের ধরন, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এটাকে মানবে না। তারা ইসলাম থেকে পালিয়ে বেড়াবে। সুতরাং, ইসলামকে এমন নির্লজ্জভাবে ব্যবহার না করার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি। মওলানা মওদুদী কিছু দিন আগে পূর্ব-বাংলায় গিয়েছিলেন এবং ফতোয়া দিয়ে এসেছেন যে, জমিদারদের জমির ক্ষতিপূরণ না দিলে তা ইসলাম-বিরোধী কর্ম হবে না। স্যার, আমি বুঝতে পারি তিনি কেন এই ফতোয়া দিয়েছেন। ফতোয়া আদায় করা খুব কঠিন কাজ নয়। আমরা যখন পাকিস্তানের পক্ষে লড়ছিলাম তখন, বিশেষ করে সিলেটের গণভোটের সময় আমার কিছু মৌলানা বন্ধু ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিলে সেটি হবে ইসলাম-বিরোধী কাজ।' (দ্র. জিয়াউর রহমান, ঐ, পৃ. ২৩৫)

সংসদে দেওয়া তাঁর এইসব বক্তৃতা থেকে বোঝা যায় প্রতিটি প্রশ্নেই তিনি গরিবদের পক্ষে ছিলেন। কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি সর্বক্ষণ লড়েছেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি বরাবরই ছিলেন।

২১ জানুয়ারি ১৯৫৬, শেখ মুজিব সংবিধানের ইসলামিকরণ প্রসঙ্গে আপত্তি তুলে বলেন, 'পাকিস্তান পাকিস্তানিদের, পাকিস্তান কেবল মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি হয় নাই।' তিনি সংবিধান-প্রণেতাদের উদ্দেশে বলেন যে, তাঁরা যদি ইসলামের প্রতি আন্তরিক ও একনিষ্ঠ হন তাহলে তাদের উচিত হবে সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে এমন একটি ইসলামি সংবিধান রচনা করা যেখানে সকলের জন্য সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হবে। শেখ মুজিব সংবিধান-প্রণেতাদের চ্যালেঞ্জ করে বলেন, ইসলামের কোন আইনে আছে যে, একজন মুসলমান ১০-১৫ হাজার একর জমির মালিক হবে, আর পাশাপাশি আরেক মুসলমান না খেয়ে ঢাকা বা করাচির রাস্তায় মরে পড়ে থাকবে। শেখ মুজিব ভূমিহীনদের মাঝে জমিদারদের অতিরিক্ত জমি বণ্টন করে দেওয়ার সুপারিশ করেন। একই বিষয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি আবারও বক্তব্য দেন।

'জনগণের বিচার পাওয়ার অধিকার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করায়।' ১৯৫৬ সালের ২১ জানুয়ারির ভাষণে তিনি এ বিষয়টি তুলে ধরার পাশাপাশি বলেন যে, শাসকশ্রেণি ও সুবিধাভোগী শ্রেণি নিজেদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করছে। একই বিষয়ে তিনি ৬ ফেব্রুয়ারি আবার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সেদিন তিনি প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা প্রদানের জোরালো দাবি তোলেন। সেদিনের ভাষণের শুরুতে তিনি দেশের সকল মানুষের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান জনান। তিনি দাবি তোলেন, 'জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চাকরির নিশ্চয়তা দিতে হবে। সংবিধানে এর নিশ্চয়তা দিতে হবে।'

শেখ মুজিব বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা প্রসঙ্গে সংসদে বক্তব্য দেন ১৯৫৬ সলের ২১ জানুয়ারি, ৭ ফেব্রুয়ারি ও ১৬ ফেব্রুয়ারি। তিনি সরকারি ভাষা ও রাষ্ট্রভাষার মধ্যে বিভাজনরেখা টেনে বলেন, সংবিধানে সরকারি ভাষা ও জাতীয় ভাষা শব্দমালা ব্যবহার করে জনগণকে, বিশেষত পূর্ববাংলার মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। তিনি স্পিকারের কাছে জানতে চান তাঁর নির্দেশে বাংলাকে অবহেলা করা হচ্ছে। পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ৫৬ ভাগ লোকই বাংলা ভাষায় কথা বলে, এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি হুঁশিয়ার করে দেন যে, রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রশ্নে কোনো ধোঁকাবাজি করা যাবে না। তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বোচ্চ ১০ বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করেন। শেখ মুজিব সংবিধানে সকল জাতিগোষ্ঠীর একত্রে ভোট প্রদানের ব্যাপারে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদানের দাবি জানান। এই বিষয়ে তিনি ২১ জানুয়ারির পর ২১ অক্টোবরও বক্তব্য উপস্থিত করে বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের মানুষ সংখ্যালঘুদের সঙ্গে একসঙ্গে ভোট দিয়ে এসেছেন, এমনকি এই সংসদে আমরা যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছি, তারাও জনগণের যৌথভাবে ভোট প্রদানের মধ্য দিয়েই নির্বাচিত হয়েছি।'

শেখ মুজিব ২১ জানুয়ারির বক্তব্যে বিভিন্ন তথ্যের আলোকে তুলে ধরেন কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় অব্যবস্থাপনার দরুন পূর্ববাংলার লাভজনক রেলওয়ে কোম্পানি লোকসানি খাতে পরিণত হয়েছে। তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষপ্রান্তে এসে ২১ দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন প্রসঙ্গে জোরালো দাবি জানান। তিনি আইনমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'আপনি যদি ২১ দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন করেন, আমরা আপনাকে সাহায্য করব, আপনার সঙ্গে যোগ দেব। কিন্তু আপনি যদি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যান তাহলে কেবল পূর্ববঙ্গে নয়, এই পশ্চিম পাকিস্তানেও জনমত সংগঠিত করে আমরা এই স্বৈরতান্ত্রিক অগণতান্ত্রিক সংবিধানের বিরুদ্ধাচরণ করব।' এই বিষয়ে তিনি ১৩ ফেব্রুয়ারি আবার প্রশ্ন তোলেন, 'আমি মাননীয় পররাষ্ট্র-মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে চাই আপনারা কি ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে এই সংবিধান প্রণয়ন করছেন? আর কত দিন জনগণকে ধোঁকা দেবেন? আর না, পূর্ব-বাংলার মানুষ এখন অনেক বেশি রাজনৈতিকভাবে সচেতন, তারা সব কিছু বোঝে?'

৪ ফেব্রুয়ারি সংসদে শেখ মুজিব বলেন যে, খসড়া সংবিধানে ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দল গঠনের গণতান্ত্রিক অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, যেকোনো সময় ক্ষমতাসীন দল বলতে পারে সংবিধানে রাজনৈতিক দল গঠনের কোনো বিধান নেই, তাই রাজনৈতিক দল গঠন করা যাবে না। তিনি সরকারি চাকরিতে বাঙালিদের সমান অধিকার

We are here to decide the issue, what should be the Federal Capital, whether Gadap or Karachi. The people have sent us here. We are the representatives of the people here who have to decide whether it will be Karachi, Hyderabad, Peshawar or Lahore.

(বঙ্গবন্ধু, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫, পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন : এসেম্বলী চেম্বার, করাচি)

দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত সক্ষমতা না আসে ততক্ষণ বাঙালিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। পূর্ব-বাংলার প্রতি বিমাতাসুলভ কোনো আচরণ করা যাবে না।' সকল বিষয়ে সমতা প্রসঙ্গে তিনি আবার ৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিরক্ষা বিষয়ে সৃষ্ট বৈষম্য দূর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে জোরালো বক্তব্য রাখেন। শেখ মুজিব পাকিস্তানের উভয় অংশে সমতা বিধানের ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার জনগণের পরিবর্তিত মনোভাব সকলকে জানিয়ে দেন, 'যার উপর ভিত্তি করে আমরা পাকিস্তানের উভয় অংশের সমতার ক্ষেত্রে সম্মত হয়েছিলাম সেই মৌলিক নীতিমালাই তারা [পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী] ভঙ্গ করেছে। সেজন্য আমরা এখন সমতা চাই না। আমরা পূর্ব-পাকিস্তানিরা সংখ্যায় বেশি, তাই আমরা জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি চাই।' শেখ মুজিব ২১ জানুয়ারি বলেছিলেন, জনগণ তাদেরকে ২১ দফার জন্যই ভোট দিয়েছেন এবং সেই দফাসমূহের একটি হচ্ছে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। তিনি তখন থেকেই কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রার ভার অর্পণ করে প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকেন। ৮ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'বিগত নির্বাচনে আমরা জনগণের কাছে এই ওয়াদা করেছিলাম যে আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে এই তিনটি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, বাকি সব বিষয়ের ক্ষমতা যাবে প্রাদেশিক সরকারের কাছে।' একই দিনে পূর্ববাংলার শিল্পায়নে কেন্দ্রের সমর্থন চেয়ে শেখ মুজিব বলেছিলেন যে, পূর্ববাংলায় শিল্প প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। পরে ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি তাঁর ভাষণে পূর্ববাংলার জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান, 'পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইদের সঙ্গে বসে কীভবে পূর্ববাংলার কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন ঘটান যায় তার পথ খুঁজে বের করুন।'

শেখ মুজিব সংসদে পাকিস্তানের দুই অংশের সমতার কথা বারবার বলেছেন, বলেছেন রাষ্ট্রের সব নাগরিকের সমান অধিকারের কথা। তাঁর এই সাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাদ পড়েনি নারীও। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পদক্ষেপ হিসেবে তিনি ২৮ ফেব্রুয়ারি সংসদে মহিলা-আসন বৃদ্ধির প্রস্তাব করে বলেন, 'আমরা যেখানে পূর্ব-বাংলার আইন পরিষদে মহিলাদের জন্য ১২টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছি, সেখানে জাতীয় পরিষদে তাদের জন্য ২০টি আসন সংরক্ষিত থাকলে ক্ষতি কী, কারণ তারা [মেয়েরা] পাকিস্তানের জনসংখ্যার অর্ধেক। তারাও পাকিস্তানে সমান নাগরিক।'

পাকিস্তান গণপরিষদে শেখ মুজিবের ভাষণমুখর অধ্যায়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পূর্ববাংলার জনগণের স্বাধিকার আদায়ের জন্য তিনি নিরন্তর বাক্-সংগ্রাম করে গেছেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনসহ ২১ দফার বিভিন্ন দফা তিনি একাধিকবার সংসদে তুলে ধরেছেন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে। পূর্ববাংলার জনপ্রতিনিধিদের প্রতি বারবার তিনি এই আহ্বান জানিয়েছেন যে তারাও যেন পূর্ববাংলার মানুষের অধিকারের ব্যাপারে একাট্টা হন।

১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করে দলের নতুন নামকরণ হয় 'আওয়ামী লীগ' এবং শেখ মুজিব পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই আদর্শিক পরিবর্তনে শেখ মুজিব ও সোহরাওয়ার্দীর সবিশেষ ভূমিকা ছিল (এ. এম. এ. মুহিত, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৪)। ১৯৫৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে সংবিধান পাশ হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য এর প্রতিবাদে ওয়াক আউট করেন। আওয়ামী লীগের আপত্তির বিষয় ছিল–প্রতিনিধিত্বে দুই অঞ্চলের মধ্যে সমতার নীতি ও যুক্ত নির্বাচনের জন্য সুস্পষ্ট বিধির অভাব, রাষ্ট্রপতির মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অভাব। ১৪ জুলাই আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব আনেন শেখ মুজিব। ৪ আগস্ট ভাসানী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করা হয়। চকবাজার এলাকায় পুলিশ গুলি চালালে ৩ জন নিহত হন। রক্তের বিনিময়ে আন্দোলন সফল হলো। আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে গঠিত প্রাদেশিক সরকারের পতন হলো। পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর ফজলুল হকের আহ্বানে আতাউর রহমান

খানের নেতৃত্বে গঠিত নতুন মন্ত্রিসভায় (৬ সেপ্টেম্বর, '৫৭) শপথ গ্রহণকারী ৬ জন মন্ত্রীর একজন হলেন শেখ মুজিব। তিনি শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন (মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫)। ১৯৫৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। এ ব্যাপারে ভাসানীর সমালোচনায় তিনি ভীষণ বিরক্ত হলেন। এসময় শেখ মুজিব এই দুই প্রবীণ নেতাকে এক মঞ্চে রাখার ব্যাপারে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। কেননা তিনি জানতেন, পূর্ববাংলার কোনো মঙ্গল সাধন বা অমঙ্গল ঠেকাতে হলে এই দুই নেতার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন (জিয়াউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০)। কাগমারী সম্মেলনে শেখ মুজিবের সমালোচনা হলো। তাঁর ব্যাপারে প্রস্তাব গৃহীত হলো যে, তিনি একই সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক থাকতে পারবেন না। তাঁকে যেকোনো একটি পদে ছেড়ে দিতে হবে। নির্মোহ শেখ মুজিব মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেন। ক্ষমতার লোভ ত্যাগ করে তিনি দলের সাংগঠনিক তৎপরতার দিকে মনোনিবেশ করলেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করেন। 'এ বছরের ৭ আগস্ট তিনি চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারি সফর করেন।' (মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫)। সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে তাঁর এই আদর্শের প্রতি পক্ষপাতিত্বই শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় পুঁজি বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

আইয়ুব খানের আবির্ভাব

১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর ওপর আক্রমণ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যুর পর ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক শাসন জারি করলেন। সামরিক শাসন জারি করেই সম্ভাব্য প্রতিবাদীদের গ্রেফতার করা হয়। মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিব ১২ অক্টোবর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। ক্ষমতায় এলেন জেনারেল আইয়ুব খান। প্রায় ১৪ মাস শেখ মুজিব কারাবাস যাপন করেন। এসময় একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। ১৯৫৯ সালের ৫ অক্টোবর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলো। তবে তাঁর গতিবিধির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। নিজগৃহ ঢাকায় এক হিসেবে তিনি অন্তরীণ রইলেন। হাইকোর্টে রিট আবেদন করে ১৯৬১ সালের ৭ ডিসেম্বর তিনি মুক্তি পান। মুক্তি পেয়েই সামরিক শাসন ও আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে শেখ মুজিব গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করেন। এই সময়েই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্রনেতৃবৃন্দ দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন (মুনতাসীর

মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬)। ১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি আবার জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হলেন। ২ জুন চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে ১৮ জুন শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করেন। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি আন্দোলনে নেমে পড়েন। ২৫ জুন তাঁর উদ্যোগে নয়জন রাজনৈতিক নেতা আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দেন। ৫ জুলাই পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিব আইয়ুব-সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ১৮ আগস্ট সোহরাওয়ার্দী জেল থেকে মুক্তি পেলে এই আন্দোলন আরও জোরালো হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব লাহোরে যান। এখানে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হয় (দ্র. মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬)। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার। অক্টোবর মাসে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সারা পূর্ববাংলা সফর করেন। '১৯৬৩ সালের শুরুতেই সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে পড়লে এনডিএফের কার্যক্রমে ভাটা পড়ে। শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর জীবিতাবস্থাতেই এনডিএফ-এর কার্যক্রম বন্ধ করে আওয়ামী লীগের পুনর্গঠনের চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে এনডিএফ একেবারেই ভেঙে যায়' (এ. এম. এ. মুহিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬)।

১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই সভায় দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার-ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় সংবলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১১ মার্চ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে দাঙ্গাপ্রতিরোধ-কমিটি গঠিত হয়। দাঙ্গার পর আইয়ুব-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

২৬ জুলাই ঢাকায়ে বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গের এক সম্মেলনে শেখ মুজিবের উদ্যোগে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দল বা কঅপ (কোম্বাইড অপজিশন পার্টি) গঠিত হলো। বছরের মাঝামাঝি সময় থেকেই শুরু হলো ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতি। বিরোধীদলীয় প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহ্‌র পক্ষে শেখ মুজিব নির্বাচনী সভা সমাবেশ করার ফাঁকে এ অঞ্চলের মানুষের দুঃখ-বঞ্চনার কথাও বলতে থাকেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন আগে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৫ সালে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় তাঁকে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ষাটের দশকের প্রথমার্ধ জুড়ে গ্রেফতার ও কারাবাস ছিল শেখ মুজিবের নিত্যসঙ্গী।

১৯৬২ সালের কথা। জেল থেকে বেরিয়েই শেখ মুজিব দেশজুড়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করেন। তিনি পশ্চিম-পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে সভা-সমিতি করেন এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি আন্দোলনের স্বার্থ বিবেচনা করে যুক্তরাজ্যও সফর করেন। তদানীন্তন প্রাদেশিক গভর্নর আব্দুল মোনেম খান ১৯৬২ সালের অক্টোবর নিযুক্তি পেয়েই শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্যাতন করতে মনস্থ করেন। তার বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র মামলা দায়ের হতে থাকে। আজ তিনি সিলেটে বক্তৃতা দিয়ে কাল গিয়ে যশোরে আদালতে হাজিরা দেন বা ময়মনসিংহে এক মামলায় জামিন পেয়ে বরিশালে পরের দিন আরেক মামলায় হাজিরা দেন। সব মোকদ্দমাই ছিল অযথা ও ভিত্তিহীন। ১৯৬৬ সালের মে মাসে এই নিগ্রহ নির্যাতন বন্ধ করা হয়, কারণ তখন তাঁকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। এক হিসেবে দেখা যায় যে, প্রায় সাড়ে তিন বছরে তাঁকে ৭৭টি মামলার আসামি হতে হয়েছিল। এই সব মামলার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমত তাঁকে হয়রানি করা এবং দ্বিতীয়ত তাঁর জনসংযোগ ও প্রচার কাজ বানচাল করা (এ. এম. এ. মুহিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭)।

শেখ মুজিবের ৬ দফা

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোর তাসখন্দ চুক্তি-বিরোধী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব এই আলোচনায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে এজেন্ডাভুক্ত করার দাবি তোলেন। কিন্তু তাঁর দাবি সেখানে অগ্রাহ্য হয়। শেখ মুজিব এজন্য সম্মেলন বর্জন করে ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে একটি সংবাদ-সম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তানের দাবি হিসেবে '৬ দফা কার্যক্রম নিজে বাঁচো ও অপরকে বাঁচতে দাও'-এর ঘোষণা দেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ (দেখুন পরিশিষ্ট-৩)। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ফেডারেল সংসদীয় সরকার, শুধু প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ে ফেডারেল সরকারের দায়িত্ব, দুইটি এলাকার জন্য স্বতন্ত্র মুদ্রা-ব্যবস্থা, অঙ্গরাজ্যে রাজস্ব নীতি ও কর প্রয়োগের সব ক্ষমতা, অঙ্গরাজ্যের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিজে নির্ধারণ ও বহির্বাণিজ্যের জন্য পৃথক হিসাব এবং অঙ্গরাজ্যের যথোপযুক্ত দেশরক্ষা-

ক্ষমতা ও সেনাবাহিনী বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতাই ছিল ৬ দফার মূল দাবি। ৬ দফা কার্যক্রম আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদ ৬ মার্চ অনুমোদন করে এবং ১৮/১৯ মার্চ কাউন্সিল অধিবেশনে তা গৃহীত হয় (এ. এম. এ. মুহিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭)। ৬ দফার আন্দোলনে দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক, কামারুজ্জামান প্রমুখ) ছাড়াও দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন তিনি সর্বক্ষণ পেয়েছিলেন। এ পর্যায়ে শেখ মুজিব ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ করেন। ৬ দফার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় পাকিস্তান সরকার ভীত হয়ে পড়লে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান '৬৬-এর মার্চে রাজশাহীতে এবং পরে ঢাকায় বক্তৃতাকালে এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচেষ্টা বলে আখ্যা দেন। পাশাপাশি তিনি শেখ মুজিবের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। ২০ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপনী অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব বলেন, 'কোনো হুমকিই বাংলার মানুষকে ৬ দফা দাবি থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।' এই পরিস্থিতিতে বেসামাল সরকার দমননীতি শুরু করলে শেখ মুজিব বলে উঠলেন, 'ওরা এতই অর্বাচীন যে আমাকে জেলের ভয় দেখায়। ওদের আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, অতীতেও জেল খেটেছি, মামলার আসামি হয়েছি; এবারও জেল খাটতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের কোনো দাবি বা ন্যায্য পাওনার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমান আপস করতে জানেন না। কারও অস্ত্রের ভাষার যথার্থ জবাব দিতে পারেন জনগণ।' এ সময় তাঁকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেফতার করা হয়। তিনি এ বছরে ৩ মাসে আটবার গ্রেফতর হন। ৮ মে নারায়ণগঞ্জ পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতার শেষে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ৭ জুন শেখ মুজিব ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে শ্রমিকসহ বেশ কয়েকজন নিহত হন (মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭)। ১৯৬৬ সালের ৮ মে গ্রেফতার হবার পর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের একটি নির্জন, স্যাঁতসেঁতে সেলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা হয় তাঁকে। এ সময় বহির্বিশ্বের, এমনকি আত্মীয়স্বজনের খবর থেকেও তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন। গভর্নর আব্দুল মোনেম খান এ সময় সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, 'যতদিন আমি ক্ষমতায় আছি শেখ মুজিবকে আর কারাগারের বাইরে আসতে হবে না।' কিন্তু ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে তাঁকে জেলে রাখা সম্ভব হয়নি।

আগরতলা মামলা ও শেখ মুজিব

এরই মধ্যে ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি বিচারের রায়ে বেকসুর খালাস পেয়ে তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু মুক্তির স্বাদ তিনি পেলেন না। জেল গেট পার হয়েই তিনি দেখতে পেলেন সামরিক বাহিনীর একটি দল অপেক্ষা করছে। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না কী তাদের উদ্দেশ্য। বঙ্গবন্ধুর জীবনে এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। আবারও তাঁকে বন্দী করে ঢাকা সেনানিবাসের অপেক্ষাকৃত আরও স্যাঁতসেঁতে একটি কক্ষে রাখা হলো। শুরু হলো তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলার তদন্তকাল শেষ করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের কাজ তখন সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। '... মামলার তদন্তাদি কার্য শেষ করিয়া আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট করিবার পর পূর্ব-বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয়, সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত এবং তথাকথিত ঘটনার সময়ের আগাগোড়া জেলখানায় বন্দী, তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নূতন করিয়া মামলার আসামী তো করা হইলই, একনম্বর আসামী করা হইল।' (দ্র. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিভাবে মহল, ১৯৯৫, পৃ. ৪৭৯)। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে অতি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মধ্যে সুরক্ষিত একটি ক্ষুদ্র বাংলোতে উক্ত মামলাটির বিচারকার্য শুরু হয় (মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮)। মামলায় শেখ মুজিবের পক্ষে প্রধান কৌসুলি ছিলেন অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম খান এবং একটি সেশনের জন্য ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত আইনবিদ টমাস উইলিয়াম্‌স্ (কিউ.সি)-কেও আনা

আমাকে গ্রেফতার করে কোনো লাভ হবে না। যেমন অতীতেও লাভ হয়নি। আমাকে হত্যা করা হলে হাজারো শেখ মুজিব প্রতিরোধের জন্যে এগিয়ে আসবে। ওরা জানে, ওরা শেষ হয়ে গেছে এবং এই উপলব্ধি আমাকে আনন্দ দিচ্ছে। ওরা যদি আমাকে হত্যা করে এবং তোমাদেরকে আমার লাশ দেখতে দেয়, তখনো দেখবে, আমার মুখে হাসির রেখা ফুটে রয়েছে।

(সিদ্দিকুর রহমান অনূদিত রবার্ট পেইনের 'দি টর্চাড অ্যান্ড দি ড্যাম্‌ড' অনুবাদ 'সেই দুঃসময়', পৃষ্ঠা ১৯)

হয়েছিল। তাঁকে সহায়তা করেছিলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এবং মওদুদ আহমদ।

অভিযুক্তদের অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল কক্ষে প্রবেশের বিষয়টি আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। শেখ মুজিব তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে প্রতিদিন দৃপ্ত পদক্ষেপে আদালত-কক্ষে প্রবেশ করতেন। বরাবরই তিনি শঙ্কাহীন, অকুতোভয়। ১৯৬৯ সালের ২৮ জানুয়ারি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে শেখ মুজিব আদালতে লিখিত জবানবন্দী দিলেন। তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়লেন সারা দেশের মানুষ। তারা শেখ মুজিবের মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ-সমাবেশ ও মিছিল করতে থাকেন। মওলানা ভাসানীও নেমে এলেন রাজপথে। তীব্র আন্দোলনের মুখে বিশেষ আদালত সরকারি নির্দেশে শুনানির ক্ষেত্রে ঘন ঘন বিরতি দিতে শুরু করল। স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থানের এক পর্যায়ে যুক্ত হলো ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবি। সারা দেশে হরতাল ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র-জনতার মিছিল-সমাবেশ চলতে থাকল। পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান আসাদ নিহত হলেন। ২৪ জানুয়ারি ছাত্রসমাজ ও ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে আরও নিহত হলেন কিশোর মতিউর রহমান, শেখ রুস্তম আলী ও মকবুলসহ আরও কয়েকজন। প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন চলাকালে সেনানিবাসে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কাজ ব্যাহত হতে লাগল। এ সময় ট্রাইব্যুনাল কক্ষের মধ্যে বিধি অনুযায়ী যে পরিবেশ থাকার কথা, তা ছিল না। বিচার চলাকালে ট্রাইব্যুনাল কক্ষে মাঝে মাঝে গুঞ্জরণ হাস্যরোল শোনা যেত। এমনকি ব্যঙ্গাত্মক উক্তিও কানে আসত। বাইরের আন্দোলনের ফলে বিচারকগণও আগের মতো কক্ষে বিশেষ কড়াকড়ি আরোপ করতেন না (দ্র. ফয়েজ আহমদ, *আগরতলা মামলা : শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ*, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃ. ৩২)। এদিকে কামাল উদ্দিনসহ রাজসাক্ষীদের তিনজন আদালতে বৈরী সাক্ষীর ভূমিকা পালন করায় প্রকৃতপক্ষে ষড়যন্ত্রমূলক মামলাটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারি দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে 'গোলটেবিল বৈঠক' আহ্বান করলেন। আওয়ামী লীগ থেকে জানানো হলো যে, তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিলে তারা কেউ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন না। বেকায়দায় পড়ে আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দিতে চাইলেন। কিন্তু শেখ মুজিব জানিয়ে দিলেন যে, মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের পরই কেবল মুক্ত মানুষ হিসেবে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে পারেন। তিনি বলেলেন, 'I cannot and shall not go leaving the others in prison' (obaydul Huq,

Banglbandhu Sheikh Mujib : A Leader with a Difference, Radical Asia Publicationsm, 1996)। ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে নির্মমভাবে হত্যা ও ১১ নম্বর আসামি ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হককে গুলিবিদ্ধ ও গুরুতর আহত করার ফলে বিক্ষুব্ধ জনতা বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো রাস্তায় নেমে আসে। বাধ্য হয়ে সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' শিরোনামের মিথ্যা মামলাটি নিঃশর্তভাবে প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

'বঙ্গবন্ধু' উপাধি লাভ

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ডাকসু এবং পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে বিশাল এক সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করে। ওই সভায় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। সে দিনটির স্মৃতিচারণ করে তোফায়েল আহমদ বলেছেন, 'সেদিন আমরা কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে ১০ লক্ষাধিক লোকের সামনে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করি। ...আমি সভাপতির ভাষণে বাঙালি জাতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আমরা জাতির পক্ষ থেকে নেতাকে একটি উপাধি দিতে চাই। তখন ১০ লক্ষাধিক লোক ২০ লক্ষাধিক হাত তুলে আমাকে অনুমতি দিয়েছিল।' (দ্র. *বিচিত্রা*, ২৫ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ১৬ আগস্ট ১৯৯৬/১ ভাদ্র ১৪০৩, পৃ. ৪৫) এই সভায় ভাষণদানকালে শেখ মুজিব বলেন, 'আমি সরকারের সঙ্গে প্রস্তাবিত রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে দেশের উভয় অংশের পক্ষ থেকে দেশবাসীর অধিকারের দাবি উত্থাপন করব। উত্থাপিত দাবি যদি গ্রাহ্য করা না হয় তবে সে বৈঠক থেকে ফিরে এসে দাবি আদায়ের জন্য আমি দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তুলব। ... সংগ্রাম করে আমি আবার কারাগারে যাব, কিন্তু মানুষের প্রেম-ভালোবাসার ডালি মাথায় নিয়ে দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। বঞ্চিত বাঙালি, সিন্ধী, পাঞ্জাবি, পাঠান আর বেলুচের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কায়েমি স্বার্থবাদীদের শোষণ থেকে দেশের উভয় অংশের জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ হলো আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক আজাদী। আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সার্বভৌম পার্লামেন্ট চাই এবং রাজনীতি, অর্থনীতি, চাকরি-বাকরি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বপর্যায়ে জনসংখ্যার অনুপাতে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব চাই। আমি শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি চাই। কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য চাই। সাংবাদিকদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই।' (দ্র. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯)

গোলটেবিল বৈঠক

১০ মার্চ ১৯৬৯ রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। বঙ্গবন্ধু সেই বৈঠকে যোগদান করেন। এর আগে ৭ মার্চে লাহোর ড্যাকের (Democratic Action Committee) অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু পাঁচটি প্রস্তাব পেশ করেন। এগুলোর মধ্যে ছিল প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, ফেডারেল প্রকৃতির সংসদীয় গণতন্ত্র, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং পশ্চিম-পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিলকরণ। গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ারও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বৈঠকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবি উপস্থাপন করে তিনি বলেন, 'গণঅসন্তোষ নিরসনে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।' (দ্র. মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮)। গোলটেবিল বৈঠকে বক্তৃতাকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, 'এক চরম সংকটের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সমগ্র জাতির ভিত্তিমূল আজ প্রকম্পিত। ... জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কণ্ঠে যেসব দাবি-দাওয়া আজ ধ্বনিত হচ্ছে, যত্নসহকারে সেগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, তার মূলে মাত্র তিনটি প্রশ্ন নিহিত। প্রথমটি হলো, রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার অবলুপ্তি। দ্বিতীয়টি, সীমাহীন অর্থনৈতিক অন্যায়-অবিচার। যার ধকল পোহাতে হচ্ছে এ দেশের সকল শ্রমিক-কৃষক-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষকে–মোট কথা জনসাধারণকে। ... তৃতীয় কারণ হলো, পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি সমানে অবিচার করা হচ্ছে–এই উপলব্ধি।' (দ্র. মোনায়েম সরকার সম্পাদিত *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪)

তবে ঐ বৈঠক কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনেনি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীতিবিদরা বঙ্গবন্ধুর দাবির মূল্যায়ন না করার ফলে গোলটেবিল বৈঠক থেকে ১৩ মার্চ বের হয়ে আসেন তিনি। আইয়ুব খান আশা করেছিলেন, ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে শেখ মুজিবকে হয়তো টলানো যাবে। সেজন্য তিনি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু নিজের দাবি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র নমনীয়তা প্রদর্শন করেননি। বঙ্গবন্ধু ঢাকা ফিরে ১৪ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, 'দেশবাসী আশা করেছিল যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিগত ২১ বছরের শাসন ও শোষণের ফলে আমাদের নেতৃবৃন্দের চৈতন্যোদয় হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, তাদের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।'

রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় আইয়ুব খানের সকল আশার প্রদীপ নিভে গেল। তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে ২৪ মার্চ তাঁকে চিঠি লিখলেন। পরদিন ২৫ মার্চ বেতারভাষণের মাধ্যমে তিনি তার ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা দেশবাসীকে জানালেন। বেতারে আইয়ুব খানের ভাষণ শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট পরই ক্ষমতা গ্রহণ করেন ইয়াহিয়া খান এবং একই সঙ্গে দেশ জুড়ে জারি করলেন সামরিক শাসন। ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বেতারভাষণে তিনি বললেন, 'অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আমি আপনাদিগকে জানিয়ে দিতে চাই যে, দেশে একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া আমার আর কোনো অভিলাষ নাই। ... প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাজই হবে দেশকে একটি সচল শাসনতন্ত্র প্রদান করা।' অত্যন্ত চালাকির সঙ্গে ইয়াহিয়া খান আবার ঘোষণা করলেন, যত শীঘ্র সম্ভব দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন-পদ্ধতি পরিবর্তন এবং ভোটার তালিকা অবশ্যই সংশোধন করা হবে। '৭০ সালের ২ জুলাই আবার তিনি এই মর্মে ঘোষণা দিলেন, সবকিছু স্বাভাবিক হলে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে এক মুহূর্তও দেরি করা হবে না। সামরিক শাসনের আওতায় দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা প্রায় বন্ধই ছিল। সভাসমাবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এমন সময়েও বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত কৌশলে তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তিনি ঘরোয়া পরিবেশে কর্মী-সভার আয়োজন করে প্রচার চালাতেন। দিন-রাত ঘুরে বেড়াতেন দেশের এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্তে। ৬ দফার পক্ষে জনমত সংগঠিত করার পাশাপাশি তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতার অংশ হিসেবে এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১২ অক্টোবর তিনি গঠন করলেন 'জাতীয় শ্রমিক লীগ'। বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান, অবিলম্বে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও কর্মী হয়রানি বন্ধের আহ্বান জানালেন। জনগণের চাপে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান '৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক বেতারভাষণের মাধ্যমে '৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং ১ জানুয়ারি ১৯৭০ থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলেন।

যেসব দল বা মহল নির্বাচনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল তাদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ১৯৭০ সালের ২৯ জানুয়ারি রাজশাহীর এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ধর্ম ও শান্তির জিগির তুলে যারা পাকিস্তানের শোষণযন্ত্র কায়েম করতে চায় তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। দেশের কোনো সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই। আমার সংগ্রাম কায়েমি স্বার্থবাদী শোষক

ও জালেমের বিরুদ্ধে। যে শোষক ও জায়গীরদারদের দল ২২ বছর আপনাদের রক্ত চুষে খেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলুন।'

সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক আয়োজিত 'রাজনৈতিক সম্প্রচার' শীর্ষক বক্তৃতামালায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বক্তা ছিলেন (দ্র. মোনায়েম সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬৯)। ২৮ অক্টোবর ১৯৭০ বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে অর্থনীতি, শিল্প-কারখানা স্থাপন, বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, বিশেষ করে মুদ্রাস্ফীতির পার্থক্য, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি ব্যাংক-বীমা ও বিভিন্ন কোম্পানিসহ অর্থনীতির যাবতীয় মূল চাবিকাঠি জনগণের মালিকানায় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি কর-ব্যবস্থাকে গণমুখী করা, ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে সমর্থন দেওয়া, এই শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং একে ঋণ সুবিধা দেওয়ার দাবি করেন। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তোলা, শিল্প-কারখানাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দিয়ে পল্লীর মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার ওপর তিনি জোর দেন। এ ছাড়া তিনি পাট ব্যবসায়ের জাতীয়করণ, পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ এবং পাট গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি চা, তামাক, আখ, তুলাসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসলের উৎপাদন ও মানোন্নয়নের ওপরও জোর দেন। তিনি জনগণের ক্ষমতা অর্জনের জন্য তাঁর দলের শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, 'মানুষের উপর শোষণ, অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটাতেই হবে।' (ঐ, পৃ. ১৬০-১৬৯)। তিনি বাঙালিদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ বিশ্লেষণ করে বলেন, 'আজকে জাতীয় সংকটের প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, জনগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত। তৃতীয়ত, অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে।' (ঐ, পৃ. ১৬০-১৬৯)। তিনি তাঁর বক্তব্যে একদিকে যেমন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের কথা তুলে ধরেন, তেমনি পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্যের কথাও তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে অসহায় দরিদ্র কৃষক, বাঁচার তাড়নায় অভিবাসী জনসাধারণ এবং শ্রমজীবী মানুষের নিদারুণ কষ্টকর জীবনযাপনের কথা। তিনি সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা বর্ণনা করে বলেন, 'দেশের মোট শ্রমশক্তির এক-পঞ্চমাংশ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার, জীবনযাত্রার দ্রুত ব্যয়বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে

বাংলাদেশ একটি কবরস্থানে রূপান্তরিত। তিনি কল্পনার দৃষ্টিতে দেখছেন লাশ মাটির ওপরে পড়ে আছে। নর-নারী এবং শিশুদের হাড় গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বুলেটের ক্ষত থেকে বিন্দু বিন্দু করে রক্ত ঝরছে। তাদের অসহায় কাতর মুখাবয়ব যেনো আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

(সিদ্দিকুর রহমান অনূদিত রবার্ট পেইনের 'দি টর্চার্ড অ্যান্ড দি ড্যাম্ড' অনুবাদ 'সেই দুঃসময়', পৃষ্ঠা ২৫৮)

শিল্পশ্রমিক ও মেহনতি সম্প্রদায়ের উপর।' বার্ষিক উন্নয়নকর্মসূচির বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে দৃষ্টিকটু বৈষম্য হয় সেটি তিনি বক্তৃতায় তথ্যসমেত তুলে ধরেন। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বাঙালিদের বঞ্চনার চিত্রও তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট উঠে আসে। এরকম বৈষম্যময় প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব তাঁর দলের প্রস্তাবিত ৬ দফা কর্মসূচির যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন, 'আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচি, যে-কর্মসূচি ১১ দফা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সে কর্মসূচি আঞ্চলিক অন্যায়-অবিচার নির্মূলের বাস্তব সমাধানের পথ নির্দেশ করেছে।' বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর দলের গণমুখী পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন এবং প্রত্যয়ী কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'জাতি হিসেবে আমাদের সামনে যে-চ্যালেঞ্জ এসেছে আমরা সাফল্যের সঙ্গে তার মোকাবিলা করবই। প্রকৃত ও প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে...।' অর্থনৈতিক বঞ্চনার নানা বিষয় উল্লেখ করার সময় পূর্ববাংলার আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন দাবি তিনি উত্থাপন করেন। '... বিজলী সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। একটি সম্প্রসারিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে গ্রামে গ্রামে বিজলী সরবরাহ করতে হবে। এর দ্বারা পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরে আমরা পাঁচ শত কিলোওয়াট বিজলী উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আণবিক শক্তি এবং জামালগঞ্জে কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। তৃতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা। যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টি আমরা

অগ্রাধিকার দিই। ... শতকরা ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল, বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দানের জন্য একটি 'ওয়ার্কস প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণীর জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে' (দ্র. মোনায়েম সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬৯)। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে আরও বলেন, 'আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পল্লী-চিকিৎসাকেন্দ্র এবং প্রতি থানা সদরে একটি করে হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপনের দরকার। চিকিৎসা গ্রাজুয়েটদের জন্য 'ন্যাশনাল সার্ভিস' প্রবর্তনের প্রয়োজন। পল্লী এলাকার জন্য বিপুলসংখ্যক প্যারা-মেডিকেল পার্সোনালদের ট্রেনিং দেওয়া দরকার।' (দ্র. রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, *বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ : বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত বক্তৃতা ও বিবৃতি*, কথন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯. পৃ. ২৪)। নির্বাচনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু সারা দেশে ব্যাপক নির্বাচনী সফর করেন। সেসব দিনে ছোট-বড় নির্ধারিত-অনির্ধারিত অসংখ্য জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন তিনি। ৩০ অক্টোবর ১৯৭০, ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে তিনি এমনি এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি আসন্ন নির্বাচনকে শুধুই ক্ষমতা লাভের নির্বাচন নয় বলে উল্লেখ করে বলেন, 'এই নির্বাচনে স্বাধীনতার পর থেকে শোষিত ও অবহেলিত বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হবে।' একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বাংলার উর্বর মাটিতে যেমন সোনা ফলে, ঠিক তেমনি পরগাছাও জন্মায়! একইভাবে বাংলাদেশে কতকগুলো রাজনৈতিক পরগাছা রয়েছে, যারা বাংলার মানুষের বর্তমান দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী। ... আসন্ন নির্বাচনে এসব রাজনৈতিক পরগাছাদের শুধু উৎপাটিতই করা হবে না, তাদেরকে চিরতরে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হবে এই বাংলার মাটি থেকে।' তিনি ঘোষণা করেন, 'নির্বাচনের পর স্বার্থবাদী মহল আবার ষড়যন্ত্র চালানোর চেষ্টা করলে তাদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য আমি গণ-আন্দোলনের ডাক দেব। বাংলার মানুষের কল্যাণ এবং মুক্তির জন্য এটা আমার শেষ সংগ্রাম।' নির্বাচনের ডামাডোলে সংখ্যালঘু নাগরিকেরা যেন কোনো নিপীড়নের শিকার না হন সেজন্য তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন,

'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা পাকিস্তানি যে কোনো নাগরিকের মতোই সমান নাগরিক এবং সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী।' (দ্র. মোনায়েম সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬৯)

১৭ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও বঙ্গবন্ধু

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘটে যায় এক মহাপ্রলয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উত্তরবঙ্গে তাঁর নির্বাচনী সফর অসমাপ্ত রেখে ছুটে আসেন ঢাকায়। ঘূর্ণিদুর্গত আর্তমানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ১৭ নভেম্বর তিনি ছুটে যান দুর্গত অঞ্চলে। ফেরেন ২৬ নভেম্বর। ঢাকায় ফিরেই তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে সরকারের ঢিলেঢালা ও অপর্যাপ্ত পদক্ষেপের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্যোগ থেকে জনসাধারণের জানমাল রক্ষায় উপদ্রুত এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিতে বাঁধ নির্মাণ, আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও উন্নততর হুঁশিয়ারি সঙ্কেত ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দুর্গত মানুষের পাশে এসে সময়মতো না দাঁড়ানোর জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানি এলিট শ্রেণি উভয়ের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'ভাগ্যের পরিহাস, যে সময় পশ্চিম পাকিস্তান বাম্পার ক্রপ উপভোগ করছে, সে সময় দুর্গত এলাকায় প্রথম খাদ্যবাহী জাহাজ এসেছে বিদেশ থেকে।' তিনি সখেদে বলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানে যে সমস্ত বস্ত্রশিল্প এ যাবৎকাল বাংলাদেশকে তাদের প্রধান বাজার হিসেবে ব্যবহার করেছে, তাদের কেউই এ পর্যন্ত মৃতের সৎকারের জন্য এক গজ কাপড় দেয়নি।' তিনি প্রশ্ন রাখেন, 'এ জন্যই কি বিগত দুদশক ধরে আমরা আমাদের সম্পদের শতকরা ৭২ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করেছি?'

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'দেখেশুনে আজ আমাদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, বাংলাদেশকে যদি প্রকৃতির ধ্বংসলীলার হাত থেকে বাঁচাতে হয়, তাহলে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে হবে। এছাড়া আমাদের নিজস্ব অর্থনীতি পরিচালনার জন্যে অবশ্যই আমাদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা থাকতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের শাসনভার আমাদের হাতেই থাকতে হবে। আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের মালিক-মোক্তার আমাদেরই হতে হবে। আমাদের সম্পদ কীভাবে ব্যয়িত হবে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও ক্ষমতা থাকতে হবে আমাদের। ... শাসকদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন যে, জনগণের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করা যাবে, তারা হুঁশিয়ার হোন, বাংলাদেশ আজ জেগেছে।' সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন,

'বাঙালিরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের লাখ লাখ ভাইকে বিসর্জন দিয়েছে। বাংলাদেশের সার্বিক মুক্তির জন্য আমরা আরও ১০ লাখ প্রাণ বিসর্জন দিতে পারব।' এ কথার মাধ্যমে তিনি দৈহিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বোঝাতে চাচ্ছেন কিনা জানতে চাওয়া হলে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'আমি এখনই তা বলছি না। ভবিষ্যৎই তা বলবে। আমার দল একটি গণতান্ত্রিক দল। আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনই শুরু করব। কিন্তু তারা যদি অনিয়মতান্ত্রিক পথ বেছে নেয়, তাহলে জনগণ তাদের নিজেদের পথই অনুসরণ করবে।'

১ ডিসেম্বর ১৯৭০ গণমাধ্যমে দেওয়া তাঁর নির্বাচনী আবেদনে বঙ্গবন্ধু জনগণকে বিভক্তি, স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও মতাদর্শের অনৈক্য পরিহার করার আহ্বান জানান। আর তা না হলে, তাঁর মতে, যারা এদেশের মানুষের ভালো চান না ও এখানকার সম্পদের ওপর ভাগ বসাতে চান তাদেরই সুবিধা হবে এবং এর ফলে বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যহত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিন পিছিয়ে যাবে। তিনি জানতেন, জনগণের ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এই নির্বাচন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই সারা দেশের মানুষকে তীব্র সঙ্কট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত করার সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। নিজের প্রাণের বিনিময়ে এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করার এবং সকলের জন্য আগামী দিনগুলোকে সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার আকঙ্ক্ষা তিনি ধারণ করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সযত্নে লালিত স্বপ্ন দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন, 'দেশবাসীর জন্য যে কল্পনার নকশা এতদিন ধরে মনের পটে এঁকেছিলাম, সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নের পথ প্রশস্ত করে [তাদের] দুঃখের বোঝা যদি কিছুটাও লাঘব করে যেতে পারি–তাহলে আমাদের সংগ্রাম সার্থক হবে।'

বাংলার মানুষের স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যে দরকার সেটা শেখ মুজিব ভালোই জানতেন। তাই তিনি জনগণের প্রতি জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের ১৬২টি আসনের প্রত্যেকটিকে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনাদের চাহিদামতো শাসনতন্ত্র পাস করিয়ে আনতে হলে অনিচ্ছুক প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় আমার চাই নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি আপনারা আমাকে জাতি, ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে দেন, তাহলে ওয়াদা করছি আপনাদের স্বার্থ ও অধিকার আমি আদায় করে আনবই।' তিনি ক্ষমতার প্রত্যাশী ছিলেন না। তবে শক্তির প্রত্যাশী ছিলেন, কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন অনিচ্ছুক মহলের হাত থেকে দেশবাসীর স্বার্থ ও অধিকার ছিনিয়ে আনতে শক্তি প্রয়োজন ছিল তাঁর। তাই

এজন্য তিনি ভরসা করতেন জনতার শক্তির ওপর এবং বলাই বাহুল্য জনতা তাঁকে নিরাশ করেননি।

আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানে ৭ ডিসেম্বরের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ১৫৩টি আসনের মধ্যে ১৫১টি (উপকূলীয় অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়কবলিত স্থগিতকৃত আসন বাদে) আসন লাভ করে। বঙ্গবন্ধু ঢাকার ২টি আসন থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হন। প্রাদেশিক কাউন্সিল মুসলিম লীগ-প্রধান খাজা খায়েরউদ্দিন ১ লাখের বেশি ভোটে তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরাট সাফল্য ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০ শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ অফিসে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের গণজাগরণকে স্বাগত জানান এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান হিসেবে তাঁর বিবৃতির শেষে 'জয় বাংলা' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তিনি তাঁর দলের এই অভূতপূর্ব সাফল্যকে 'জনসাধারণের প্রথম মহান বিজয়' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, 'আওয়ামী লীগের এই বিজয় প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের লাখ লাখ নির্যাতিত মানুষেরই বিজয়। আমরা মনে করি, কায়েমি স্বার্থবাদীদের শোষণ ও প্রকৃতির অভিশাপ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্যে আমাদের সব শক্তি ও সহায়সম্বল নিয়োজিত করার পবিত্র ওয়াদা করাই হলো জনসাধারণের এই বিজয় উৎসব উদ্‌যাপনের একমাত্র উত্তম পন্থা।' তিনি সকলকে অতীতের সমস্ত তিক্ততা, বিভেদ এবং শত্রুতা ভুলে গিয়ে নির্যাতিত মানুষের দুর্গতি লাঘবে, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির জন্য সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গণঐক্যের দৃঢ় ভিত্তির উপরই একমাত্র আমাদের সমাজের পুনর্গঠন এবং অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষের মধ্যে অবিচার দূর করার কার্যকরী কর্মসূচি রচিত হতে পারে।'

দেশের সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি-কান্না-সুখ দুঃখকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্য শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

(—বঙ্গবন্ধু: সাপ্তাহিকী পূর্বাণীর ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭০)

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয়বারের মতো ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্যে ১০ ডিসেম্বর রাতে চট্টগ্রামের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। সপ্তাহব্যাপী এ সফরে তিনি নৌকায় ও পায়ে হেঁটে বিধ্বস্ত এলাকার অনেকাংশ সফর করেন, প্রতিদিন অসংখ্য সভায় বক্তৃতা দেন, দলীয় ত্রাণতৎপরতা তদারক করেন। ১১ ডিসেম্বর সন্দ্বীপ হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি আরও একবার আওয়ামী লীগের বিজয়কে 'সাত কোটি বাঙালির জয়' হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, '... ইনশাআল্লাহ্ আমরা এমন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করব যার ফলে বাঙালিদের শোষণের যুগের অবসান হবে। যদি নির্বাচনে জনগণ অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিত তাহলে তাদের কুকুর-বিড়ালের মতো মরতে হতো। এখন কেমন করে বাংলার দাবি ঠেকিয়ে রাখা হয় সেটা আমি দেখব।' তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য নিকট অতীতে ('৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান) জনগণ যে আত্মত্যাগ করেছে, তা তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে বলেন, 'প্রয়োজন হলে সে ঋণ শোধ করার জন্য আমিও রক্ত দান করবো।' তিনি ঘূর্ণিঝড়-পীড়িত দুর্গত অঞ্চলে রিলিফ কর্মকাণ্ডে যেন কোনো রকম অনিয়ম না হয় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, '[সকলের] স্মরণ রাখা উচিত যে আইয়ুব খানের দিন শেষ হয়ে গেছে। আমরা প্রতিটি পয়সার হিসেব নেব।'

৯ ডিসেম্বর ১৯৭০ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে নির্বাচনে তাঁর দলের সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠান। নির্বাচনী সাফল্যে ভুট্টোও বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানান। বঙ্গবন্ধু জবাবে ভুট্টোকেও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অভিনন্দনের জবাবে তিনি বলেন, 'একমাত্র ৬ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রণীত শাসনতন্ত্রই অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে।'

প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭০ বঙ্গবন্ধু সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমাদের ৬ দফা কর্মসূচির পক্ষে এক ঐতিহাসিক রায় প্রদানের জন্য আমি জনসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এই রায় বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। ৬ দফা কর্মসূচি ছাড়া কোনো শাসনতন্ত্র হতে পারে না।' তিনি ক্ষুধা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে সম্ভাব্য সবকিছু করার আশ্বাস দেন। অল্পদিনের ব্যবধানে পরপর দুই জন আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে শেখ মুজিব সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে, এ ব্যাপারে ত্বরিত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে এবং তারা

এই সকল গণবিরোধী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানতে পারে। তাজউদ্দীন আহমদ ও ড. কামাল হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭০ সকালে শেখ মুজিব পাবনা রওয়ানা হন। পাবনা পৌঁছে তিনি নিহত আওয়ামী লীগ নেতা আহমদ রফিকের সমাধিতে ফাতেহা পাঠ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিতে তাঁর বাসভবনে যান। বিকেলে পাবনার পুলিশ ময়দানে আহমদ রফিকের স্মরণে প্রায় লাখ লোকের এক শোকসভায় শেখ মুজিব বলেন, 'আমার দল যীশুর নীতিতে বিশ্বাসী নয়। আমি একজন মুসলমান এবং আমি জানি কী করতে হয়। ঢিলটি মারলে যে পাটকেলটি খেতে হয়, আমি সে-নীতিতে বিশ্বাসী।' তারপরও তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান ধৈর্য ধারণ করতে এবং অপেক্ষা করে দেখতে যে এই ব্যাপারে সরকার কী করে। উস্কানিমূলক হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও তাঁর এই শান্তি বজায় রাখার আহ্বান থেকে নিয়মতান্ত্রিক পন্থার প্রতি তাঁর আগ্রহ আরও একবার ফুটে ওঠে।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশনের সাংস্কৃতিক ও চলচ্চিত্র-বিষয়ক সাপ্তাহিকী *পূর্বাণী*র ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭০ ঢাকার হোটেল পূর্বাণীতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে *পূর্বাণী* উচ্চকণ্ঠ সমালোচক ছিল। আইয়ুব আমলে *পূর্বাণী*র প্রকাশনা দীর্ঘদিন সরকারি নির্দেশে বন্ধ রাখা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে ভাষা, সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি শিল্পী-সাহিত্যিকদের দায়িত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি জনগণের স্বার্থে এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য সাহিত্যিকদের প্রাণ খুলে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'দেশের সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্য শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।' জীবনকে এমন সামগ্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে দেখতে পারতেন বলেই তিনি হতে পেরেছিলেন পুরো জাতির ভরসার প্রতীক। হয়েছিলেন বাঙালির স্বপ্নের সওদাগর।

নির্বাচনী ফলাফলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বঙ্গবন্ধুর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা

নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের আশাতীত সাফল্যে ক্ষমতালোভী পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। নির্বাচনের ফলাফল বানচালের জন্য তিনি সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে গোপন আঁতাত ও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার

মুখে সব ধরনের ষড়যন্ত্র একের পর এক ভেস্তে যেতে লাগল। ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে আনুমানিক ২০ লাখ মানুষের এক সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণ জনগণের সামনে শপথ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নৌকার আকৃতিবিশিষ্ট প্রায় ১২ ফুট উঁচু ও ১২০ ফুট দীর্ঘ মঞ্চ থেকে সভা শুরু হওয়ার আগে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতীক হিসেবে বঙ্গবন্ধু ৬টি ও ১১টি কবুতর উড়িয়ে দেন। ঢাকায় এ যাবৎকালের বৃহত্তম জনসমাবেশে ১৫১ জন এম এন এ এবং ২৬৭ জন এম পি এ-কে শপথ বাক্য পাঠ করানোর পর বঙ্গবন্ধু বিবিধ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ৫০ মিনিটের একটি নীতিনির্ধারণী ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে, তাঁর দল যদি সরকার গঠন করে তবে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করা হবে। ধনীকে আরও ধনী এবং গরিবকে আরও গরিব হতে দেওয়া হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেওয়ার ঘোষণা দেন। সকল খাসজমি বাস্তুহারাদের মধ্যে বণ্টন করার এবং চর এলাকায় ও বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। তিনি বলেন, 'আমি কৃষক এবং শ্রমিকদের কথা দিচ্ছি, আওয়ামী লীগ তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কারণ আমি বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগের মাথা কেনার মতো ক্ষমতা পুঁজিপতিদের নেই। এরা কেউ এমনকি আমি নিজেও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি তবে আমাদের জীবন্ত কবর দেবেন।' তিনি পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ঘোষণা করেন। তিনি বৃহৎ শক্তিবর্গকে অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করে দরিদ্র দেশগুলোর সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সকল ধর্মাবলম্বীর সমানাধিকারের পাশাপাশি তিনি নারীদের অধিকার সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রেও তাঁর দলের অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করেন। শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষেত্রে তাঁর দলকে দেওয়া জনগণের ম্যান্ডেট প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। শুধু বাংলারই নই। আমরা সারা পাকিস্তানেরই মেজরিটি। আমরা যে শাসনতন্ত্র রচনা করব সেটাই জনগণ গ্রহণ করবে এবং তা বানচালের অধিকার কারো নেই। মরহুম নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছেন, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই শেষ কথা। আর সে রায় আমরা পেয়েছি।' তিনি আরও ঘোষণা করেন, '৬ দফা ও ১১ দফা এখন আর আওয়ামী লীগের সম্পত্তি নয়, বাংলার জনগণ গত নির্বাচনে ৬ দফার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ৬ দফার পরিবর্তন আর পরিবর্ধনের কোনো ক্ষমতা বা অধিকার এখন আর আওয়ামী লীগ বা আমার নেই। কিন্তু সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা নেব না এ ধরনের কথা আমরা বলি না। আমরা অবশ্যই তাদের সহযোগিতা কামনা করি। কিন্তু একটি কথা আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই–নীতির প্রশ্নে কোনো

আপস নাই।' তিনি সরকারি চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের বঞ্চনার বিষয় তুলে ধরেন এবং শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমাদের সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে নয়। বরং যে-সব শোষকদের কারণে বাংলার মানুষ গৃহহারা হয়েছে, বাস্তুহারা হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। এসব শোষকদের সাথে আপস নেই।' ইস্পাত-কঠিন এই বক্তাই তাঁর বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে এসে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'প্রধানমন্ত্রী হবার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আজকে দিয়েছেন, তা আমি সারা জীবন মনে রাখব। অত্যাচার, নিপীড়ন এবং কারাগারে নির্জন প্রকোষ্ঠকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু জনগণের ভালোবাসা যেন আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে।'

শপথনামায় সংসদ সদস্যরা বললেন : 'শাসনতন্ত্রে ও বাস্তব প্রয়োগে ৬ দফা কর্মসূচিভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও ১১ দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটাতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব। ... সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে যে-কোনোরূপ ত্যাগ স্বীকার করত আপসহীন সংগ্রামের জন্য আমরা সদা প্রস্তুত থাকিব।' শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, '... এ বিজয় নস্যাতের ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে আমি যদি চিরতরে আপনাদের ছেড়ে চলে যাই, আমার মৃত্যুর পর বঞ্চিত দেশমাতৃকা আর গরিব-দুঃখী মানুষের মুখের দিকে চেয়ে আপনারা কি পারবেন না আন্দোলন করে দাবি আদায় করতে?' (দ্র. রামেন্দু মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫৫)

পরের দিন ৪ জানুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'এবারকার নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের রায়ের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে যে, বাংলাদেশের সম্পদ এবং বাঙালির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার আর কোনো মতেই দাবিয়ে রাখা যাবে না।' তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'জনগণের স্বাধীনতার ফলভোগকে নিশ্চিত করার জন্য আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে।' তিনি আরও বলেন, 'যদি ৬ দফা আদায়ের সংগ্রামকে ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়, তবে কয় দফা দিতে হবে তাও আমার জানা আছে।' দেশে যদি বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সে বিপ্লবের ডাক তিনিই দেবেন এ কথা জানিয়ে দিয়ে তিনি বলেন যে, 'প্রতিবিপ্লবী কয়েকটা স্লোগান বা রাতের অন্ধকারে নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে বিপ্লব হয় না, বিপ্লবের উদ্ভব হয় মাটি থেকে।'

৭ জানুয়ারি ১৯৭১ রাতে গোলাম মোস্তফা নামের এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আটক করা হয়।

তার কাছে ছোরা পাওয়া যায় এবং পুলিশের কাছে সে স্বীকার করে যে শেখ মুজিবকে হত্যার জন্যে তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এ ঘটনায় বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ ঘটনার সংবাদ শুনে স্বস্তি প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধুর কাছে বার্তা পাঠান। বরিশাল, পটুয়াখালী ও নোয়াখালীর ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত অঞ্চলে ৬ দিনের সফরে বঙ্গবন্ধু ঘটনার দিন রাতে লঞ্চযোগে মঠবাড়িয়া রওনা হয়ে যায়। দুর্গত এলাকার ৯টি জাতীয় ও ২১টি প্রাদেশিক পরিষদের স্থগিত নির্বাচন ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর এ সফর ছিল এ এলাকায় তাঁর শেষ নির্বাচনী সফর। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১১ জানুয়ারি ঢাকা আসেন। বঙ্গবন্ধুও তাঁর সফর সংক্ষিপ্ত করে একই দিন ঢাকা ফিরে আসেন। এ সফরে বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন অগণিত সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। ১১ জানুয়ারি তিনি নবগঠিত পটুয়াখালী জেলার সদর দফতরের জনসভায় এক ভাষণে জনগণকে সতর্ক করে দেন যে, কায়েমি স্বার্থবাদী ও শাসকগোষ্ঠী একের পর এক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলেছেন।

রিলিফ দ্রব্য বিতরণে বিশৃঙ্খলাকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, 'এই ব্যাপারে কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতি কিংবা অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।' আরও বলেন, 'যারা বাংলাদেশকে লুট করেছে তাদের সঙ্গে কোনো আপস নেই। দেশকে এবং দেশের মাটিকে ভালোবাসি বলেই আমি রাজনীতিতে আছি। আমি অন্যের পয়সা চাই না। কিন্তু বাংলাদেশের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় ফিরিয়ে দিতে হবে। দুঃখী বাংলার মানুষের মুখের হাসি ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজনবোধে জীবন দান করতে আমি প্রস্তুত আছি।'

পূর্ব-পাকিস্তান সঙ্গীতশিল্পী সমাজ বঙ্গবন্ধুর সম্মানে ২৪ জানুয়রি, ১৯৭১ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে এক সংবর্ধনার আয়োজন করে। শিল্পীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত মানপত্রে শিল্পী আব্দুল আহাদ বঙ্গবন্ধুকে 'বঙ্গ-সংস্কৃতির অগ্রদূত' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পরপরই আইয়ুব সরকার রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। কতিপয় বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতির মাধ্যমে সরকারের এই পদক্ষেপ সমর্থন করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী ও তাঁবেদার শিল্পীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাদের এই ধরনের কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর উপলব্ধি ছিল, 'সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুখ-শান্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি।' তিনি '৫২-র ভাষা-আন্দোলনকে শুধু বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি

আদায়ের আন্দোলন না বলে, তাকে বাংলার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি ধর্মের নামে ভাড়াটিয়া সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়াকে মানুষের আত্মার স্পন্দন পিষে মারার শামিল বলে উল্লেখ করেন। সেই সময়ে দাঁড়িয়েই বঙ্গবন্ধু যেন মুক্তির জন্য সর্বোচ্চ যুদ্ধের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন যা তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল : 'মনে রাখবেন বিপদ আমাদের কাটে নাই। লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয় নাই। চরম সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেদিনের জন্য প্রস্তুত হন।'

বাংলার উর্বর মাটিতে যেমন সোনা ফলে, ঠিক তেমনি পরগাছাও জন্মায়! একইভাবে বাংলাদেশে কতকগুলো রাজনৈতিক পরগাছা রয়েছে, যারা বাংলার মানুষের বর্তমান দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী। ...আসন্ন নির্বাচনে এসব রাজনৈতিক পরগাছাদের শুধু উৎপাটিতই করা হবে না, তাদেরকে চিরতরে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হবে এই বাংলার মাটি থেকে।

(—বঙ্গবন্ধু: নির্বাচনী জনসভা, জয়দেবপুর ৩০ অক্টোবর, ১৯৭০)

পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার জন্য পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৫ জন বিশিষ্ট সদস্যসহ ২৭ জানুয়ারি ১৯৭১ করাচি থেকে ঢাকা আসেন। আওয়ামী লীগ-প্রধানের বাসভবনে প্রথম দফা, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ভুট্টোর সুইটে দ্বিতীয় দফা এবং পুনরায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে তৃতীয় দফা মুজিব-ভুট্টো আনুষ্ঠানিক ও শেষ আলোচনা হয়। মুজিব-ভুট্টোর এই বৈঠক ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু তাঁর আলোচনায় ৬ দফার ভিত্তিতে দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তৃতীয় দফা আলোচনা শেষে ২৯ জানুয়ারি শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন, 'দেশবাসী আজ সম্পূর্ণ সচেতন ও জাগ্রত এবং ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্নভিন্ন করে কায়েমি স্বার্থবাদকে খতম করার ক্ষমতা দেশবাসী রাখে।' তিনি দেশের অবনতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

মৌলভীবাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ মৌলভীবাজারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ও রমনা লালবাগ থেকে

প্রাদেশিক পরিষদে নব নির্বাচিত সদস্য গাজী গোলাম মোস্তফাকে সংবর্ধনা জানান হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, আওয়ামী লীগ একাই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারে কারণ তারা সারা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি তাঁর ভাষণে জনসাধারণের দুরবস্থার বর্ণনা দেন এবং বলেন, 'সাধারণ মানুষ কীভাবে যে বেঁচে আছে তা কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশে ৭০ থেকে ৮০ লাখ মানুষ বর্তমানে বেকার। প্রদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়ে ধ্বংসলীলা এবং চক্রান্তকারীরা ও শোষণকারীরা এত বেশি সমস্যার সৃষ্টি করেছে যে, আমার দল ক্ষমতায় আসলেও সঙ্গে সঙ্গে সেসব সমস্যার সমাধান খুব কঠিন হবে। বাংলাকে আজ একটি বাজার ও উপনিবেশে পরিণত করা হয়েছে। আমরা আমাদের জনসাধারণকে মরতে বা শোষিত হতে দিতে পারি না। আমার দল শোষণকারীদের হাত থেকে সম্পদ ফিরিয়ে আনবে এবং তা জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেবে।' তিনি এক সময় বলে ওঠেন, 'বাংলার মানুষের ভালোবাসার প্রতিদানে আমার দেবার কিছু নাই। একমাত্র প্রাণ দিতে পারি। আর তা দেওয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত আছি।' (দ্র. মোনায়েম সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-২১৩)

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নব নির্বাচিত সদস্যদের দুদিনব্যাপী এক যৌথ অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। নির্বাচনের পর এম এন এ এবং এম পি এ-দের এটাই প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক। ঢাকায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির এক বৈঠকও আগের দিন অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় প্রধান তাঁর ভাষণে জনগণের প্রতি নব নির্বাচিত সদস্যদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে প্রণীত শাসনতন্ত্রেই দেশ ও জনগণের কল্যাণ নিহত আছে বলে তাঁর বিশ্বাসের কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা জাতির কাছে ওয়াদাবদ্ধ আছি ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র তৈরি করার জন্য। কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা আমাদের ওয়াদার সঙ্গে বেইমানি করতে পারি না।' ৬ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হলে দেশের সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপকার হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি সমগ্র পাকিস্তানে শোষিতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই ৬ দফার গুরুত্ব তুলে ধরেন। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তিনি জানান যে, তাঁর দল ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে না। জনগণের অধিকার আদায়ের জন্যই আওয়ামী লীগ রাজনীতি করে। তিনি তাঁর সহকর্মীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'জনগণ অনেক আশা, অনেক আস্থা নিয়ে আপনাদের নির্বাচন করেছেন। চরমমূল্যের বিনিময়ে হলেও সেই আশা ও

আস্থার মর্যাদা করতে হবে।' তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন, 'যেদিন আপনারা বাংলার মানুষের এই ভালোবাসা ও আস্থার অমর্যাদা করবেন, সেদিনই আপনাদের মুজিব ভাইয়ের, আপনাদের এবং আপনাদের প্রিয় আওয়ামী লীগের মৃত্যু হবে।' এক্ষেত্রে তিনি চরম পরিণতির কথাও উল্লেখ করেন, 'আর সেইসঙ্গে চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে বাঙালির ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ।'

১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ভাষা-আন্দোলনের স্মরণ-সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। তাঁর ভাষণে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ, গণমানুষের ও স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ইতিহাস রচনা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনিবার্যতা ও জনগণের দাবি আদায়ের জন্য রাজনীতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ উঠে আসে। তিনি বলেন, দাবি আদায়ের জন্যই তাঁর দল ক্ষমতায় যেতে চান। ক্ষমতা পেলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের আকাঙ্ক্ষা পুনরায় তিনি ব্যক্ত করেন। আরও বলেন, 'আমাদের ''জয় বাংলা'' স্লোগানের মধ্যেই প্রদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি নিহিত আছে। তবে দাবি আদায় না হলে আমরা ক্ষমতা ছেড়ে চলে আসব।'

পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি-প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মূলতানে এক জনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্বের জন্য সরকারের সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আগের দিনই জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বানে দেরির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, জাতীয় সংসদের অধিবেশন ৩ মার্চ ঢাকায় শুরু হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারি পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো বলেন, ৬ দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ তাদের অবস্থান পরিবর্তন না করলে তাঁর দল ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন না। ১৯ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন। প্রেসিডেন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান প্রাদেশিক গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বঙ্গবন্ধু এসব ঘটনার মধ্যে একটা চক্রান্ত দেখতে পান। তিনি ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের বলেন, 'জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচালের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করা হচ্ছে।' বঙ্গবন্ধু মত প্রকাশ করেন যে, জনগণের প্রতি দায়িত্বশীলতার বোধ থেকে আওয়ামী লীগ নীরব রয়েছে। গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিতে বিশ্বাসী বলেই তাঁর দল চায়

শাসনতান্ত্রিক সমস্যাগুলো জাতীয় পরিষদের বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হোক। শেখ মুজিব তাঁর বক্তব্যে আবারও তুলে ধরেন, কীভাবে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল হতে পশ্চিমাঞ্চলে সম্পদ ও পুঁজি পাচার করা হয়েছে, বৈদেশিক সাহায্য, বৈদেশিক আয় ও আমদানির সিংহভাগই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে। কীভাবে মুষ্টিমেয় পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের জন্য পূর্ব-বাংলাকে সুরক্ষিত বাজার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। শেখ মুজিব অভিযোগ করেন যে, পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি জনগণকে সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। তিনি জনগণের শক্তির ওপর আস্থা প্রকাশ করে বলেন, জনগণ সবরকম স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছে। তিনি সম্ভাব্য স্বৈরাচারীর প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'যদি কেউ স্বৈরাচারী হতে চান, তিনি যেন ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন।' আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের শপথ গ্রহণ করে তিনি বলেন, 'আমাদের আগামী বংশধরদের যাতে উপনিবেশে বাস করতে না হয়, যাতে তারা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাধীনভাবে এবং মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারে সে জন্য প্রয়োজন হলে আমাদের জীবন বিসর্জন দেওয়ার প্রতিজ্ঞা আবার নতুন করে গ্রহণ করছি।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ প্রাদেশিক পরিষদ ভবন-প্রাঙ্গণে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দেওয়া এক সংবর্ধনা-সভায় রাষ্ট্র পরিচালনা, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির প্রসঙ্গে বেশ কিছু নৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে দলমত নির্বিশেষে সকল নির্বাচিত সদস্যের অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়ে সেদিন তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর দল সর্বক্ষণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এতৎসংক্রান্ত সকল সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালাবে। আরও বলেন, ৬ দফা জনগণের ম্যান্ডেট থেকে তাদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে এবং ৬ দফা শুধু বাংলার মানুষের জন্য নয়, পাকিস্তানের অন্যান্য শোষিত মানুষের জন্যও মঙ্গল বয়ে আনবে। পাকিস্তানের পুঁজিবাদী শোষণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলার ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের তারা গ্রাস করে ফেলেছে। তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যাংক-বীমা এই শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সে কারণেই তিনি সে সময় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, বাংলাকে ঐসব পুঁজিপতির সংরক্ষিত বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়ে পাকিস্তান সরকার বাঙালির পাট ও চায়ের রফতানি-বাজার নষ্ট করে ফেলেছে, আর সে কারণেই তিনি বাংলার হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণভার দিতে চান। বাংলা এই নিয়ন্ত্রণভার পেলে আর এখানে ২২ পরিবার সৃষ্টি হবে না। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের ২৩ বছরের শোষণের কথা উল্লেখ করে বলেন,

'বাংলার মানুষের উদারতার সুযোগ নিয়ে সারা বাংলাদেশকে লুট করা হয়েছে। যাদের ৫ লাখ টাকা ছিল তারা এখন ৫ কোটি টাকার মালিক হয়েছে। এই টাকা আসমান থেকে আসেনি। পাকিস্তানের নামে দরিদ্র জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে এই পুঁজি সৃষ্টি হয়েছে।' সাধারণ মানুষের দুঃখের কথা সেই চরম রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেও তিনি মেলে ধরতে ভুলে যাননি, 'ঢাকার অলিগলি বাস্তুহারা মানুষে ভরে গেছে। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সব জিনিসের দাম আছে, দাম নেই শুধু মানুষের। ছেঁড়া কাপড় বা রুটির টুকরো ফেলে দিলে লোকে তা কুড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু নেয় না মানুষকে।'

পাকিস্তানের শাসনামলে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশি সাহায্য এসেছে তার শতকরা ৮০ ভাগই খরচ করা হয়েছিল পশ্চিম-পাকিস্তানে। তাই বাংলার মানুষ তাদের অর্থনৈতিক দৈন্য কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। আর সে কারণেই তিনি সেদিনের সে সংবর্ধনা-সভায় দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, এই শোষণের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে হলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আদায় করতেই হবে। আর গণতান্ত্রিক উপায়েই তিনি তা করতে চেয়েছেন।

কিন্তু ১ মার্চ দুপুরে তাঁর সেই প্রত্যাশাকে ধূলিসাৎ করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রস্তাবিত গণপরিষদ-অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলেন। বঙ্গবন্ধু এ ঘোষণার তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে পূর্বাপর ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতার অংশ বলে অভিহিত করেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, পুরোনো ষড়যন্ত্র আবার শুরু হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে শোষণের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বাংলাদেশকে উপনিবেশ ও বাজার হিসেবে শোষণ করার জন্য এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। পরের দিন (২ মার্চ) বঙ্গবন্ধু দুঃখ করে বলেন, যে বিমানে করে নির্বাচিত সংসদ-সদস্যদের ঢাকা আনার কথা, সেই বিমানেই আনা হচ্ছে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র। বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার এই ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি। আর বাঙালির প্রতিরোধের ক্ষমতা ও তাদের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষার কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন এই বলে যে, বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত গণজাগরণ সারা বিশ্বের সামনে প্রমাণ করবে যে, বাঙালিরা আর উৎপীড়িত হতে চায় না। তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচতে চায়। বাংলা আর কারও উপনিবেশ বা বাজার হয়ে থাকবে না। ২ মার্চেই তিনি 'স্বাধীনতা' শব্দটি উচ্চারণ করেন। সরকারি কর্মচারীসহ সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি মানুষকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতি অনুগত থাকার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু। গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা না করারও আহ্বান জানান। তবে শান্তি শৃঙ্খলা যাতে কোনোমতেই বিঘ্নিত না হয় সেজন্য হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেন।

৩ মার্চ পল্টন ময়দানে এক জনসমাবেশে তিনি আবার লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেন যে, এসব ধ্বংসাত্মক কাজে যারা জড়িত তারা বাংলার অধিকার আদায়ের আন্দোলন নস্যাৎ করতে চায়। তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলেন। সেনাশাসনের অবসান না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে খাজনা ও ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানান। বাড়াবাড়ি না করার জন্য তিনি সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, বাংলার মানুষ মরতে প্রস্তুত আছে। 'যারা আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে এবং ভোট দিয়েছে আমি মরে গেলেও আমার আত্মা তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি যখন দেখতে পাবে, তখন শান্তি পাবে। ৭ কোটি মানুষকে হত্যা করতে পারবেন না। আমি না থাকলেও বাংলার মানুষ তাদের লক্ষপথে এগিয়ে যাবে।' ১০ মার্চ রাজনীতিকদের সঙ্গে ইয়াহিয়া প্রস্তাবিত বৈঠক প্রত্যাখ্যান করে ৩ মার্চেই বঙ্গবন্ধু আরেকটি বিবৃতি দেন। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেন, যাদের চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধির কারণে বাংলাদেশের নিরাপরাধ ও নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে, তাদের সঙ্গেই বৈঠকে বসতে বলা হচ্ছে।

মার্চের ৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু তাঁর ডাকে বাংলার মানুষ যে তেজোদ্দীপ্তভাবে সাড়া দিয়েছিল সেজন্য তাদের অভিনন্দন জানান। যে সাহস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁরা প্রতিবাদ করছে তা বিশ্ববাসীর কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য দুঘণ্টার জন্য ব্যাংক খোলা রাখার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে বলা হয় দেশের বাইরে কোনো রকম টাকা পাঠান যাবে না।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে এক গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাময় ভারসাম্যপূর্ণ আহ্বান জানান। কার্যত ঐ আহ্বানে সাড়া দিয়েই সাড়ে সাত কোটি বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেদিন লাখ লাখ মুক্তিপাগল মানুষকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেছিলেন, শহিদের রক্ত মাড়িয়ে সংসদ অধিবেশনে তিনি যাবেন না। সেই জনসভায় দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছিলেন, দাবি মানা হলে তবেই তিনি বিবেচনা করে দেখবেন পরিষদে যোগ দেবেন কিনা। সকল মানুষকে তিনি সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবিলার জন্য ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেন। আসন্ন সংগ্রাম যে স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম সে কথাগুলো বলেই তিনি ৭ মার্চের ভাষণ শেষ করেন। মুহুর্মুহু করতালি ও চিৎকারের মাধ্যমে লাঠি উঁচিয়ে লাখ লাখ জনতা সেদিন বঙ্গবন্ধুর সেই হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। বিশ্ব ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে এটি

স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বাঙালি হিসেবে এটা আমাদের সত্যিই গর্বের একটা বিষয় যে, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণটিকে ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহাসিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। (দেখুন পরিশিষ্ট-৩)।

১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু আরেক দীর্ঘ বিবৃতিতে বাঙালিদের চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে গভীর আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বলেন যে, স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার লক্ষ্যে এবং মুক্তি অর্জনের জন্য বাংলাদেশের মানুষ শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশের মানুষের দৃঢ় মনোবল সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস হিসেবে গণ্য হবে।

সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি আপনাদের মাঝে নাও থাকতে পারি। মানুষকে তো একদিন মরতেই হয়। আমি জানি না, আবার কবে আপনাদের সামনে দাঁড়াতে পারবো। তাই আজ আমি আপনাদের এবং সারা বাংলার মানুষকে ডেকে বলছি, চরম ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হন। বাঙালি যেন আর অপমানিত লাঞ্ছিত না হয়। শহীদদের রক্ত যেন বৃথা না যায়।

(—বঙ্গবন্ধু: কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ঢাকা ২০-২১ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত, ১৯৭১)

১৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু সামরিক আদেশ জারির বিরুদ্ধে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন : 'যারা এ ধরনের সামরিক আইন জারি করছেন, তাঁদের এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করা উচিত যে, এ ধরনের ভীতি প্রদর্শনের কাছে নতি স্বীকার না করার দৃঢ় সংকল্পে জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ। যে কোনো ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও জনতার সংগ্রাম চলবেই।'

১৪ মার্চ প্রদত্ত বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন, শক্তির জোরে যারা শাসন করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প ও সংঘবদ্ধ জনশক্তি কেমন করে মুক্তির দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলে, বাংলাদেশের জনগণ এরই মধ্যে তা প্রমাণ করেছে। তিনি দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেন যে, 'জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের মুক্তমানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে আর মর্যাদার সঙ্গে বাস করার নিশ্চয়তা দিয়ে যেতে চাই।' এক সাংবাদিককে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, 'যতদিন জনগণের মুক্তি না আসে এবং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচবার অধিকার অর্জিত না হয়, ততদিন সংগ্রাম চলবে।'

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ছিল ১৭ মার্চ। সেদিন এক বিদেশি সাংবাদিককে তিনি বলেছিলেন যে, 'দেশের মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই, যখন কেউ ভাবতেও পারে না মরার কথা তখনো তারা মরে, সেই দেশে জন্ম বা মৃত্যু দিবসে কি-বা আসে যায়। আমার জনগণই আমার জীবন।' তাঁর কথাতে কোনো বিপদের পূর্বাভাস রয়েছে কিনা সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, সাড়ে সাত কোটি মানুষ যখন পাহাড়ের মতো তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছেন তখন তাঁর চেয়ে সুখী মানুষ আর কে হতে পারে? তিনি সেদিন খুবই প্রত্যয় কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত উৎসর্গ করব। জনগণের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। বাংলাদেশের মানুষ ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করছে। সুতরাং, তাদের স্বাধিকারের প্রশ্নে কোনো আপস চলে না। জনগণ তাদের এ সংগ্রামে বিজয়ী হবেই।'

১৮ মার্চ বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে যেসব কথা বলেন তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধের পথই বেছে নিয়েছেন। জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, 'আঘাত এলে প্রত্যাঘাত করতে হবে। প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তুলুন।'

এর পরের দিন ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে সেনাবাহিনী প্রতিরোধকারী জনগণকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। বঙ্গবন্ধু বিক্ষুব্ধ জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, বুলেট আর গ্রেনেড দিয়ে বাঙালির মুক্তি-আন্দোলন স্তব্ধ করা কোনো শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। সেদিনই তিনি এক বিবৃতিতে মন্তব্য করেন যে, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচার তাগিদে যেকোনো ত্যাগের জন্য জনগণ দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ। তিনি বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণ ফয়সালা চাই। তবে তার মানে এই নয় যে, কেউ আমাদের গোলাম করে রাখবে।' বাঙালির সুশৃঙ্খল সংগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সারা বিশ্ব আমাদের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করছে। মুক্তি না আসা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে, শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

২২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যে বিপুল সংখ্যক মিছিল আসে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে কিন্তু মনে হয় না যে, শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনায় কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল। তাঁর ভাষণের মূল কথাই ছিল, বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে ঐক্যবদ্ধ বাঙালিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। তাঁর কথা থেকে মনে হয়, বাংলাদেশের স্বাধিকার মেনে নিলেই কেবল পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে এরকম একটি ইঙ্গিত তিনি ইয়াহিয়াকে দিয়ে এসেছিলেন। কেননা, তিনি বারবরই যে-কথাটি

সেদিন বলেছেন তা হলো, সাড়ে সাত কোটি বাঙালি নৈতিক ও বৈধভাবে বাংলার নিয়ন্ত্রণভার তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন।

২৩ মার্চ ধানমণ্ডির বাসভবনের সামনে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও আমরা দাবি আদায় করবই। জনগণের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলতেই থাকবে এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি আত্মার একটি আত্মাও বেঁচে থাকা পর্যন্ত আরও রক্ত দিতে প্রস্তুত থাকব।' (দ্র. *দৈনিক আজাদ* এবং *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৪ মার্চ ১৯৭১)। লাহোর প্রস্তাব দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আওয়ামী লীগ গণবাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমরা বাংলাদেশের জনগণকে মুক্ত করবই এবং এ ব্যাপারে কারও কাছে আমরা নতি স্বীকার করব না।' আরও বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিই চলমান আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য।

২৪ মার্চ বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছিল আলোচনার নামে শাসকগোষ্ঠীর হীন মতলব সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন। কারণ তিনি ঘোষণা করেন যে, জোর করে কোনো সিদ্ধান্ত চাপানোর চেষ্টা করলে তিনি এবং বাঙালিরা তা কিছুতেই মানবেন না। সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাবার যে চেষ্টা বিশেষ মহল চালাচ্ছিল সে সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে দেন তিনি। বলেন যে, তাঁর নিজের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। কঠোরতর সংগ্রামের নির্দেশ দেওয়ার জন্য বেঁচে থাকবেন কিনা তাও তিনি জানেন না। তবে দাবি আদায়ের জন্য দেশবাসী যেন সংগ্রাম চালিয়ে যায়। প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছিলেন : 'কোনো ষড়যন্ত্রই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা রক্ত দিয়েছি, প্রয়োজন হলে আরও রক্ত দেব। আমাদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।'

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা-ঘোষণা ও গ্রেফতার

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন আক্রান্ত হওয়ার আগে সেনা-অভিযান শুরু হওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস্-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচারের জন্য চট্টগ্রামে একটি বার্তা পাঠান। সেই বার্তায় তিনি বাংলাদেশের মানুষকে যে যেখানে রয়েছেন সেখান থেকেই যার যা আছে তাই নিয়ে দখলদার বাহিনীকে স্বভূমি থেকে উৎখাতের আহ্বান জানান। (দ্র. বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশনা *বঙ্গবন্ধু স্পিকস্*, ১৯৭২)। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন। ঢাকা বেতার ততক্ষণে পাকিস্তানি বাহিনীর দখলে চলে যাওয়ায় বলধা গার্ডেনে রক্ষিত ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে তিনি তাঁর এই ঘোষণাটি চট্টগ্রাম বেতারে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন [বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত (ইংরেজিতে) ঘোষণাপত্রটিসহ বিস্তারিত আলোচনা

আছে, 'স্বাধীনতা নিয়ে অযথা বিতর্ক অধ্যায়ে]। রাত ১টা ২০ মিনিটের দিকে একদল পাকসেনা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। এর তিন দিন পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় করাচিতে।

পাকিস্তানের কারাগারে নির্ভীক বঙ্গবন্ধু

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশি-বিদেশি প্রচারমাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে লাগলেন যে, শীঘ্রই দেশদ্রোহিতার অপরাধে সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচার হবে। এর পরপরই পাক-কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বেগম মুজিবের সামনে এই মর্মে টোপ ফেলা হলো যে, তিনি যদি তাঁর স্বামীকে ভারতের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়ে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে হাতিয়ার জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করাতে পারেন, তবে তাঁর স্বামীকে মুক্তি দেওয়া হবে: অন্যথায় তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হবে। কিন্তু পাক-সরকারের এই প্রস্তাব বেগম মুজিব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'বাংলার স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়ে আমি আমার স্বামীকে বাঁচাতে চাই না।'

সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রক্রিয়া চলতে লাগল। প্রাণ বাঁচানোর প্রলোভন দেখিয়ে বারবার চেষ্টা করা হলো বঙ্গবন্ধুকে আয়ত্তে আনার জন্য, বাংলার স্বাধীনতা বানচাল করার জন্য। কিন্তু নির্ভীক বঙ্গবন্ধু প্রতিবারই হাসিমুখে মৃত্যুর জন্য তাঁর প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এক সময় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে দিয়ে আপসের প্রস্তাব পাঠাবার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাকে সাক্ষাৎ দিতে কোনোমতেই রাজি হলেন না। অবশেষে ১১ নভেম্বর সকাল ৮টার দিকে বঙ্গবন্ধুকে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও জেনারেলের আকবরের সামনে হাজির করা হলো। ইয়াহিয়ার ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধু তাঁর কাছে এসে প্রাণের ভয়ে নরম হয়ে যাবেন এবং সেই সুযোগে তাঁর কাছ থেকে আপসের প্রস্তাব পাওয়া যাবে। তিনি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন বঙ্গবন্ধুর দিকে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বললেন, 'দুঃখিত, ও হাতে বাঙালির রক্ত লেগে আছে, ও হাত আমি স্পর্শ করতে পারব না।' ডিসেম্বরের ২ তারিখে লায়ালপুর সামরিক কারাগারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেষবারের মতো বঙ্গবন্ধুর কাছে দূত পাঠালেন এই বলে যে, তিনি যদি ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করেন, তবে তিনি [ইয়াহিয়া] ৬ দফাসহ শেখ মুজিবের সকল প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি আছেন। বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়ার শেষ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন। ততদিনে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে শুরু করে দিয়েছে বাংলাদেশে নৃশংস অত্যাচার। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপ্রধান করে স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার শত্রুর মোকাবিলা করতে

থাকে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা মাতৃভূমির মুক্তির জন্য প্রাণপণ যুদ্ধে লিপ্ত।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর যৌথকমান্ডের কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। পাক দখলদার বাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়। ইয়াহিয়া খান বাধ্য হলেন ভুট্টোকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভুট্টো ৩ জানুয়ারি ১৯৭২ করাচির এক জনসভায় ঘোষণা দিলেন যে, শেখ মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হবে। ৬ জানুয়ারি ভুট্টো জানোলেন, শেখ সাহেবের ঢাকায় ফেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পান। পিআইএ'র একটি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ নেতা ড. কামাল হোসেনকে লন্ডন পাঠানো হয়। ভুট্টো বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বিদায় জানান। ৮ জানুয়ারি ভোরে বঙ্গবন্ধু লন্ডনে পৌঁছান। তাঁর হোটেলের সামনে জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজি নাই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই।' তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সমর্থনদানকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানান। জেলখানার দুঃসহ স্মৃতি বর্ণনা করেন। বাংলাদেশে নির্মম হত্যাযজ্ঞ ঘটানোর জন্য পাকিস্তানি সৈন্যদের দায়ী করে বলেন, 'হিটলার যদি আজ বেঁচে থাকত বাংলাদেশের হত্যাকাণ্ডে সেও লজ্জা পেত।' মুক্তিদানের প্রাক্কালে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তাঁকে পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে যেকোনোভাবে একটি সম্পর্ক বজায় রাখতে অনুরোধ করেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি তাঁকে বলেছি আমার দেশবাসীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা না করে আমি কিছু বলতে পারব না।' (দ্র. মোনায়েম সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬)।

বিশ মিনিট ধরে শেখ মুবিজুর রহমান জেলের গরাদ দিয়ে বাজপাখিটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি পুলকিত বোধ করেন। কারণ বাজপাখিটি তার স্বাধীনতায় উল্লসিত। সূর্যের দিকে যখন তার পাখা ছড়িয়ে দিয়েছে কতো সুন্দরই না মনে হচ্ছিলো তখন। তাকে আরো রহস্যময় মনে হয়েছে কারণ সে ইচ্ছে মতো নিজের আকৃতি পরিবর্তন করতে সক্ষম। মাঝে মাঝে জেলখানার চত্বরে দ্রুত বয়ে যাওয়া ছায়ার দীপ্তি দেখছেন, বাজপাখির ছায়া।।

(সিদ্দিকুর রহমান অনুদিত রবার্ট পেইনের 'দি টর্চাড অ্যান্ড দি ড্যাম্ড' অনুবাদ 'সেই দুঃসময়', পৃষ্ঠা ১৯২)

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সকালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের আগ্রহে ব্রিটেনের রাজকীয় বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে করে বঙ্গবন্ধু নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছালে রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানালেন। বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু বললেন, অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে। এ যেন অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা। তিনি আরও বললেন, 'আমাদের বিজয়কে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার যে বিরাট কাজ এখন আমাদের সামনে, তাতে যোগ দেওয়ার জন্য আমি ফিরে যাচ্ছি আমার মানুষের কাছে।' এ কাজেও তিনি ভারতবাসীর সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছিলেন।

স্বদেশে বঙ্গবন্ধু

১০ জানুয়ারি অপরাহ্নে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ বিমানযোগে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিমানবন্দর অবতরণ করেন। বিমানবন্দর জনসমুদ্রে পরিণত হয়ে যায়। বিমানবন্দর থেকে সারা পথ প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্য দিয়ে রেসকোর্স ময়দানের দিকে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। সেখানে অপেক্ষমাণ জনসমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে আবেগাপ্লুত বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে।' তিনি জনগণকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'বিশ্ববাসীকে আমরা দেখাতে চাই, বাঙালিরা কেবল স্বাধীনতার জন্যই আত্মত্যাগ করতে পারে তাই না, তারা শান্তিতেও বাস করতে পারে, তিনি নতুন স্বাধীন দেশের অসংখ্য সমস্যা সমাধানে জনগণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ কামনা করলেন। তিনি মুক্তভূমিতে জনতার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতেই জানিয়ে দিলেন যে, নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। পাকিস্তানের সঙ্গে ন্যূনতম সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য পাক-প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর আবেদন নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেন, 'আমি তখন বলেছিলাম আমি আমার মানুষের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কিছুই বলতে পারছি না। আজ আমি বলতে চাই–ভুট্টো সাহেব, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সঙ্গে আর না।' শেখ মুজিব বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যদি কেউ হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবেন।

১০ জানুয়ারি রাতেই বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১২ জানুয়ারি দেশে রাষ্ট্রপতি শাসনের পরিবর্তে সংসদীয় শাসনকাঠামোর প্রবর্তন করে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয়। ১৩ জানুয়ারি প্রথম মন্ত্রিপরিষদের সভায় জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বীরোচিত অংশগ্রহণকারী কৃষকদের বাঁচার সংগ্রাম, গ্রামাঞ্চলে বর্বর বাহিনীর ধ্বংসলীলা এবং লাখ লাখ মানুষের গৃহহারা হওয়ার

কথা চিন্তা করে ১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বকেয়া ও সুদ সমেত কৃষিজমির সব রকম খাজনা মওকুফ করা হয়।

বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু নতুন সমাজ গড়ে তোলা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি আশা করব, অতীতে আপনারা যেভাবে দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তাকে পরাভূত করেছিলেন, গভীর প্রত্যয় ও সাহস নিয়ে তেমনি বর্তমান সংকটের মোকাবিলা করবেন। আমরা পুরাতন আমলের জীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে নতুন সমাজ গড়ে তুলব।' বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে মানুষে মানুষে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য থাকবে না। সম্পদের বণ্টনব্যবস্থায় সমতা আনতে হবে এবং উচ্চতর আয় ও নিম্নতম উপার্জনের ক্ষেত্রে যে-আকাশচুম্বী বৈষম্য এতদিন ধরে বিরাজ করছিল সেটা দূর করার ব্যবস্থাদি উদ্ভাবনের জন্য আমি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করার জন্য বিবেচনা করছি। আজ আমরা বিশ্বসভ্যতার এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। একটি নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্নে আমরা বিভোর, একটি সামাজিক বিপ্লব সফল করার প্রতিশ্রুতিতে আমরা অটল; আমাদের সমস্ত নীতি, আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এ কাজে নিয়োজিত থাকবে।' শর্তহীন বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'দেশ গড়ার কাজে কেউ আমাদের সাহায্য করতে চাইলে তা আমরা গ্রহণ করব। কিন্তু সে সাহায্য অবশ্যই হতে হবে নিষ্কণ্টক ও শর্তহীন। আমরা জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সব জাতির সমমর্যাদার নীতিতে আস্থাশীল। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করবেন না, এটাই আমাদের কামনা।' উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরও বললেন, 'আমি এমন এক নীতি নির্ধারণ করতে চাই যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারবেন। এই বলিষ্ঠ শ্রেণির কর্তব্যবোধের উপর আমরা অনেকখানি নির্ভর করছি। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আবহমানকাল ধরে যে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে, তা আমাদের নতুন নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ থেকে অনেকখানি বিলুপ্ত হবে। শ্রমিক কর্মচারীকে আর সর্বদা মালিকের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত থাকতে হবে না। কেননা, বর্তমানে তাদের মালিক হলো বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ, যারা মালিক ও ম্যানেজারদের হাতে বিশ্বাস করে নিজেদের সম্পত্তি জমা রেখেছে।'

১০ এপ্রিল বাংলাদেশ গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাব উপস্থাপন করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়। শেখ মুজিব তাঁর বক্তব্যে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে বলেন, 'আজ আমরা যে

সংবিধান দেব, তাতে মানুষের অধিকারের কথা লেখা থাকবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।' তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থী মানুষের প্রতি ভারতের জনগণ ও সরকারের সহৃদয় আচরণের কথা স্মরণ করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শেখ মুজিব জাতীয় সংসদের স্পিকারকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

মহান মে দিবসে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু। তিনি পুঁজিবাদী শোষণের বাধা পেরিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র কায়েম করা। এই ব্যবস্থায় দেশের সমুদয় উৎপাদিত ও প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষক-শ্রমিক ও সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করা হবে।' সমাজতন্ত্র কায়েমে শ্রমজীবী মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিকরা যে ভূমিকা পালন করেছেন, সে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের আমূল পরিবর্তন করতে হবে।' তিনি জনগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আমরা জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সজাগ রয়েছি এবং পরিকল্পিত উপায়ে এ সমস্যার মোকাবিলার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছি।'

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারের বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এসব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, বেসরকারি ডিলার এজেন্ট ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে অসাধু কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে পারমিট বাতিলের হুমকি, সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা, স্বল্প বেতনের কর্মচারীদের জন্য সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি। জনগণের দুরবস্থা ও তা লাঘবে সরকারের আন্তরিক কর্মপ্রয়াস বর্ণনার পাশাপাশি তিনি জনগণকে আহ্বান জানান, 'আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে, উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। দেশের সম্পদ বাড়িয়ে আমরা জীবনযাত্রার প্রকৃত মান উন্নয়ন করতে সফল হব।' তিনি বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্য জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে সর্বশক্তি নিয়োগের আশ্বাস দেন। তাঁর কাছে জনগণের আকাশচুম্বী প্রত্যাশার কথা তিনি জানতেন, একই সঙ্গে উপলব্ধি করতেন নিজের সীমাবদ্ধতাও। সেজন্যই তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'কিন্তু আমি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে নিয়ে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিনি যে রাতারাতি সবকিছু ঠিকঠাক করে দেব।'

৯ মে রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু দেশে বিরাজমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে সন্ত্রাস ও ডাকাতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন, 'ইচ্ছে হয় ওদের পেটের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে কালোবাজারির পয়সা বের করে আনি।' জনসাধারণের খাদ্যাভাব, শিক্ষার দুরবস্থা প্রভৃতি

নিরসনে নিজের অসহায়ত্ব প্রদর্শন করে তিনি বলেন, 'আমার তো কিছুই নেই। আমি গরিব মানুষের উপর ট্যাক্স বসাতে পারি না। আজ পর্যন্ত তো আমি এক পয়সা ট্যাক্স বাড়াইনি। তাহলে চলবে কি করে?' পরক্ষণে তিনি নিজেই এর সমাধান দেন, 'আপনাদের কাজ করতে হবে। ছেলেদের কাজ করতে হবে।' তিনি শর্তাধীন বিদেশি সাহায্য এনে দেশকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাতে চাননি, ভবিষ্যৎ বংশধরদের গোলাম বানিয়ে রাখতে চাননি। এ ব্যাপারে তিনি জনগণকে নিয়েই চলেছেন, 'আমি আপনাদের ১০০ কোটি টাকার রিলিফ দিয়েছি। তবুও বলছি, আমি [আগামী] তিন বছর আপনাদের কিছু দিতে পারব না। আপনারা যদি রাজি থাকেন তবে হাত তুলে দেখিয়ে দেন।' তিনি ছাত্রদের ঠিকমতো পড়াশোনা করে দেশ গড়ার উপযোগী মানুষ হওয়ার আহ্বান জানান। খাদ্যঘাটতি নিরসনে কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম করার আহ্বান জানিয়ে শেখ মুজিব এ ব্যাপারে তাঁর সরকারের যথাসম্ভব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে বিপর্যস্ত দেশের সামাজিক অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়েন, 'কী করে আমি চালাব? আমি তো বুঝতে পারি না। আমি তো পাগল হয়ে যাই। আমি কী করে কী করব? আমার তো চিন্তায় ঘুম হয় না।' নিজের চাওয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন, তিনি চান বাংলার মানুষের পেট ভরে ভাত, বেকারের কাজ, মানুষের সুখ। নিজের প্রাপ্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ভাইয়েরা, আমি পেয়েছি আমার যা পাবার। আমার চেয়ে বেশি কোনো দেশে কোনো নেতা কোনো দিন পায়নি। সেটা হলো আপনাদের ভালোবাসা।'

ঐতিহাসিক ৭ জুন তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে স্মৃতিচারণ করে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা ঘোষণা করার পর থেকে '৭১-এর চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত সংগ্রামের বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সহকর্মীদের চাপে ও বহির্বিশ্বে বাংলার স্বীকৃতি আদায়ের জন্যই তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব নিতে বাধ্য হয়েছেন। স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে আপসহীন নেতা দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন, তিনি বেঁচে থাকতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো বহিঃশক্তিকে হস্তক্ষেপ করতে দেবেন না। পাশাপাশি বন্ধুরাষ্ট্রের প্রতি সহযোগিতার মনোভাবও যে তাঁর রয়েছে সেটি উল্লেখ করতে গিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতের উদাহরণ টানেন। বাংলার মানুষের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমি তাদের জন্য কোনো কাজে হাত দিয়ে কখনো হাল ছাড়ি না।' তিনি ব্যাংক-বীমা, শিল্পকারখানা জাতীয়করণের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বলেন, 'এগুলো জাতীয়করণের অর্থ হলো শোষণের চাবিকাঠি ধ্বংস করে দেওয়া।'

তিনি চোরাকারবারী ও মজুতদারদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন, 'আমি বহন করে দুনিয়ার নানা দেশ থেকে জিনিসপত্র আনছি আমার গরিব-দুঃখীদের জন্য। সেই জিনিস যারা লুটপাট করে খাচ্ছে, তাদের রক্ষা নেই।' তিনি প্রয়োজনে কারফিউ দিয়ে এদের ওপর দমন-অভিযান চালাবেন বলে হুমকি দেন। শোষণহীন সমাজ ও সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য সমাজতন্ত্র কায়েমের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'সমাজতন্ত্রে আমি দুনিয়া থেকে ভাড়া করে আনতে চাই না, এ সমাজতন্ত্র হবে বাংলার মাটির সমাজতন্ত্র।' তিনি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার কথা বলেন, 'সমাজতন্ত্র যেখানে আছে সেদেশে গণতন্ত্র নেই। দুনিয়াকে আমি বাংলার মাটি থেকে দেখাতে চাই যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমি সমাজতন্ত্র কায়েম করব।' রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর যে টান, সেই দুর্নিবার আকর্ষণের প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর বক্তব্যে, 'আমি ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমি জনগণকে ভালোবাসি, আমি জনগণকে ভয় পাই না। দরকার হলে আবার ভোটে যাব। গণতন্ত্র বাংলায় অবশ্যই থাকবে।' গণতন্ত্রের পাশাপাশি রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চেহারাও ছিল বঙ্গবন্ধুর আরাধ্য। তাই ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন, 'ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার, আলবদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না।' তিনি শ্রমিকদেরকে প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করে তাদের প্রতি আবেদন জানান, 'শ্রমিক ভাইয়েরা, আল্লাহর ওয়াস্তে একটু উৎপাদন করো।' তিনি বক্তৃতাবাজি না করে গ্রামে ফিরে গিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার, কাজ করার উপদেশ দেন।

১৬ জুলাই ১৯৭২ ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের নীতিমালা ও আদেশ, কতিপয় সংবাদপত্রের সাম্প্রদায়িকতা-চর্চা, শ্রমিক ধর্মঘট বন্ধ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সংবিধানের চারটি মৌল ভিত্তির বিষয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে। তা সত্ত্বেও সংবাদপত্র যে স্বাধীনতা ভোগ করছে তা কোনো কালে কোনো দেশের হয়নি। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের যেমন একটি জনকল্যাণমূলক নীতিমালা রয়েছে, সাংবাদিকতারও তেমনি একটি নীতিমালা রয়েছে। কোনো একটি সংবাদপত্রের সাম্প্রদায়িকতা-চর্চার উদাহরণ তুলে তিনি সাংবাদিকদের সামনে প্রশ্ন রাখেন : 'যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমার দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, এখানে বসে কেউ যদি তার বীজ বপন করতে চান তাহলে তা কি আপনারা সহ্য করবেন?' শ্রমিক ধর্মঘট বন্ধ করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আপনারা বিশ্বাস করুন, কারও অধিকার কেউ নষ্ট করুক এই আমি কখনো চাই না। আমি জীবনভর

আন্দোলন করেছি এবং আন্দোলনের ভেতর দিয়েই আমি এতদূর এগিয়ে এসেছি। সেজন্য আমি কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করতে চাই না।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর ঢাকায় গণপরিষদের অধিবেশনে বিভিন্ন শোকপ্রস্তাব এবং খসড়া সংবিধান বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শুরুতেই তিনি বাংলার মাটিতে হানাদার বাহিনীর আক্রোশ ও যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন, 'আর দুনিয়ায় এমন ইতিহাস যদি কেউ দেখাতে পারে, এত বড় বিপ্লবের পরে, এত বড় ধ্বংসস্তূপের পরে যেখানে হাজার হাজার, লাখ-লাখ লোকের কাছে বন্দুক ছিল, কামান ছিল, মেশিনগান ছিল, যেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করবার পরে অনেকের কাছে অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল, সেক্ষেত্রে আমার বাংলার মানুষকে মোবারকবাদ না দিয়ে পারবে না। তারা বলল, বিপ্লবের পরে বাংলাদেশে দ্বিতীয় গণহত্যা হবে। কিন্তু বাংলার মানুষ আমার জেল থেকে ফিরে আসার পরে তারা চেষ্টা করে, সহযোগিতা করে, বাংলার মাটিতে গণহত্যা হতে দেয় নাই। এমনকি, যারা আমার বাংলার মানুষকে হত্যা করেছিল, তাদেরকেও হত্যা করতে দেয় নাই। দুঃখের বিষয়, এখন তাদের প্রশংসা না করলে আমাদের গালি খেতে হয়।' (দ্র, *বাঙালির কণ্ঠ*, পৃ. ৩৩৬)। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে বঙ্গবন্ধু জনগণের রুখে দাঁড়াবার সম্ভাবনার ওপরে আলোকপাত করে বলেন, 'দরকার যদি হয়, সরকার এমন থাবা দেবে, সে থাবায় কয়েকদিনের মধ্যে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' বঙ্গবন্ধু স্বল্পতম সময়ে সংবিধান প্রণয়নের জন্য সংবিধান কমিটিকে মোবারকবাদ জানিয়ে আবারও সংবিধানের চারটি স্তম্ভের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সংবিধান চূড়ান্ত করার পর ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব বলেন, 'এটা দুনিয়ার

আমাদের নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান শত্রু চোরকারবারী (স্মাগলার), কালোবাজারী, মুনাফাবাজ ও ঘুষখোরের দল। মানুষ যখন অনাহারে মারা যায়, তখনো এই সব নরপশুর দল বাংলার দুঃখী মানুষের মুখের গ্রাস অন্যত্র পাচার করে দিয়ে থাকে। বিদেশ থেকে ধার-কর্জ, এমন কি ভিক্ষা করে আনা পণ্য ও বাংলার সম্পদ মজুদের মাধ্যমে এরা মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। এদের কোন জাত নেই, নেই কোন দেশ। এই সব নরপশুদের উৎখাতে আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই।

(—বঙ্গবন্ধু; জাতীয় দিবস উপলক্ষে ভাষণ, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৪)

ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়, বিশেষ করে আমাদের এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গদি যারা একবার পায় তারা আর সেই গতি ছাড়তে চায় না। তাড়িয়ে না দিলে গদি ছাড়ে না। অথচ আমার গণপরিষদ সদস্যরা সংবিধান দিয়ে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবেন।'

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। এ উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বিপ্লবের পর ৯ মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেওয়া, মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়ার অর্থ হলো আমরা জনগণের উপর বিশ্বাস করি।' ক্ষমতা কুক্ষিগত না করে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পর তাঁর দল যে আবার জনরায়ের দ্বারস্থ হচ্ছে সেটি উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা চেয়েছি মানুষের অধিকার। এই অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিল। তাই আজ শাসনতন্ত্র দিয়েছি।' জনগণকেই শক্তির উৎস বলে অভিহিত করেন তিনি। বলেন যে, জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চরম মরণপণ সংগ্রামে। তিনি আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। তিনি বললেন যে, একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না; সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কেমন আবহাওয়া, কী ধরনের অবস্থা, কোন ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা–সবকিছু বিবেচনা করে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে। তিনি দাবি করলেন, বিগত ৯ মাসে তাঁর সরকার যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে তা দুনিয়ার কোনো দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সোশ্যালিজম এনেছে তারাও সেগুলো করতে পারেনি। তিনি উল্লেখ করেন যে, কোনো কিছু প্রচলন করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই, সেটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার সমুন্নত রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করে ঘোষণা করেন, 'কেউ যদি বলে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলব সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটিকয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।' বঙ্গবন্ধু সরকারি কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, সরকারি কর্মচারীদের জনগণের মাঝে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম সেবক, ভাই। বঙ্গবন্ধু দুঃখ করে বলেন যে, শিক্ষিত লোকেরাই ব্ল্যাক মার্কেটিং হাইজ্যাকিং আর স্মাগলিংয়ের সঙ্গে জড়িত। তিনি জানতেন বাংলার কৃষক, বাংলার দুঃখী মানুষগুলো অসৎ নয়। তিনি সখেদে বলেছেন, 'আমরা যারা শিক্ষিত, আমরা যারা বুদ্ধিমান, ওষুধের মধ্যে ভেজাল দিয়ে বিষাক্ত করে মানুষকে খাওয়ায় তারাই।'

দুর্নীতিসহ নানা অন্যায় প্রতিরোধে জন-অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'শুধু আইন দিয়ে, শুধু শক্তি দিয়ে, দুর্নীতি দমন করা যায়

না। এজন্য এমনভাবে জনমত সৃষ্টি করতে হবে, যেমনভাবে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত জনমত সৃষ্টি করে আন্দোলন করেছিলাম। ... তেমনিভাবে বাংলার মাটিতে জনমত সৃষ্টি করতে হবে দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর ও শোষকদের বিরুদ্ধে।' বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে উন্নতির জন্য উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ দেন, গঠনতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী দলের সদস্যপদ ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দেন, দেশ গড়ার সংগ্রামে সকলকে আহ্বান জানান এবং সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সোনার মানুষের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিজয় দিবস (১৯৭৩) উপলক্ষে জনগণের উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশন ১৫ ডিসেম্বর প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন,

'...১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমাপ্তি। এই একই দিনে আমাদের দেশ গড়ার সংগ্রাম শুরু। স্বাধীনতা-সংগ্রামের চাইতে দেশ গড়ার সংগ্রাম বেশি কঠিন। দেশ গড়ার সংগ্রামে আরও বেশি ত্যাগ, আরও বেশি ধৈর্য, আরও বেশি পরিশ্রম দরকার।...'

'উনিশ শ' একাত্তর থেকে উনিশ শ' তেহাত্তর–সময় হিসেবে মাত্র দুবছর। এ দুবছরে আমরা কী পেয়েছি আর কী পাই নাই, আজ তারও খতিয়ান এবং আত্মবিশ্লেষণের দিন। আমি বড় দাবি করি না। আমরা কোনো ভুল করি নাই বা কোনো কাজে ত্রুটি করি নাই এমন কথা বলি না।... আমেরিকা পৃথিবীর সবচাইতে ধনী দেশ। এই আমেরিকাকেও স্বাধীনতা লাভের পর দুদুটি গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করতে হয়েছে। আজকের অবস্থায় পৌঁছাতে আমেরিকার সময় লেগেছে এক শ' বছর।... আমাদের সাফল্য যেমন আছে, তেমনি আছে ভুলভ্রান্তি। কিন্তু মাত্র দুবছরে ভুলভ্রান্তির তুলনায় বাংলাদেশের সাফল্য ও অগ্রগতি আপনারা নিজেরা নিজেদেরকে মনে একবার বিচার করে দেখুন–সেই আমার অনুরোধ। ...দেশের সকল ব্যাংক ও বীমা ব্যবসা এখন আপনাদের। কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শতকরা ৮০ ভাগের মালিক আপনারা। এখন উৎপাদন বাড়িয়ে, সকলে মিলে কাজ করে এ কথাটাই বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে, বাঙালি জাতি স্বাধীনতার আমানত রক্ষার উপযুক্ত।...'

'... পাকিস্তানি শত্রু আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আরও শক্তিশালী শত্রু। এই শত্রু হলো অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা, বেকারত্ব ও দুর্নীতি। এই যুদ্ধের জয়

সহজ নয়। ... আমাদের এবারের সংগ্রাম–অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম। আমি যে সুখী ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি, সংগ্রাম করেছি এবং দুঃখ নির্যাতন বরণ করেছি, সেই বাংলাদেশ এখনো আমার স্বপ্নই রয়ে গেছে। গরিব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে যতদিন-না হাসি ফুটবে, ততদিন আমার মনে শান্তি নেই। এই স্বাধীনতা আমার কাছে তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলাদেশের কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে। তাই আসুন, এই দিনে অভাব, দারিদ্র্য, রোগ, শোক ও জরার বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করি। সংগ্রাম ঘোষণা করি চোরাচালানি, কালোবাজারি, অসৎ ব্যবসায়ী, দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোরদের বিরুদ্ধে।' (দ্র. মিজানুর রহমান সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, নভেল পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৮৮ পৃ. ১১৯-১২২)

১৯৭৩ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৩ আসন লাভ করে। ৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। ৬ সেপ্টেম্বর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু আলজেরিয়া যান। ১৭ অক্টোবর তিনি জাপান সফর করেন।

১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'জনগণকে ছাড়া, জনগণকে সংঘবদ্ধ না করে, জনগণকে আন্দোলনমুখী না করে এবং পরিষ্কার আদর্শ সামনে না রেখে কোনো রকম গণ-আন্দোলন হতে পারে না এবং সেখানে কোনো বিপ্লব হতে পারে না।' যারা সন্ত্রাসে ভর করে বিপ্লব করতে চায় ভবিষ্যতে তাদের ভুল ভাঙবে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'সময় থাকতে ভুল না ভাঙলে তাদের ক্ষতি বেশি হবে। জনগণের ক্ষতি তো হবেই, কিন্তু তাদেরও ক্ষতি হবে।' বঙ্গবন্ধু আন্দোলনের জন্য আদর্শবাদী, নিঃস্বার্থ কর্মী, ত্যাগী মানুষ এবং সর্বোপরি জনগণের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমর্থন থাকা জরুরি বলে অভিহিত করেন। তিনি দলীয় কর্মীদেরকে সংঘবদ্ধ জনতার সাথে মিলেমিশে কাজ করে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর আহ্বান জানান। জনগণের নেতা তাঁর কর্মীদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, 'জনগণ যদি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, সেই জন্য বাংলার জনগণ দায়ী হবে না, দায়ী হবেন আপনারা।' তিনি ছাত্রদের আত্মসংযম করতে বলেন, আত্মশুদ্ধির পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'মনে রাখবা আত্মসমালোচনা করতে না পারলে নিজেকে চিনতে পারবে না।' বঙ্গবন্ধু তাঁর দলীয় কর্মীদেরও

আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির আহ্বান জানান। তিনি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন জীবনভর তাঁকে সমর্থন দেওয়ার জন্য। তিনি তাদের বলেন, 'বুকে হাত দিয়া খোদার উপর নির্ভর কইরা বলো যে, আমরা মানুষকে ভালোবাসি। আমরা ২৫ বছর সংগ্রাম করেছি। আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। আমরা ইতিহাস রাখব। আমরা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করব। আমরা দেশকে মুক্ত করব।' তিনি নব্য বিপ্লবীদের বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে বিপ্লবের ধরন সম্পর্কে শিক্ষা নেয়ার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করা প্রসঙ্গে বলেন, 'একদল লোক গণতান্ত্রিক পন্থাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করছে। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছি। ৬ বছর পর নির্বাচন করো। যদি নির্বাচনে তোমরা কেউ আসতে পারো, যেকোনো দল মেহেরবানি করে চলে আসো। আওয়ামী লীগ গদি ছেড়ে চলে যাবে।' তিনি আওয়ামী লীগের কর্মীদের বাংলার দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি তাদের উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান, 'দুর্নীতি উৎখাত করতে হবে। শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। এদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। তাহলে তোমাদের আদর্শ পূর্ণ হবে, এর আগে নয়।' দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন সমাজ গড়ে তোলার জন্য তাঁর কর্মীদের আহ্বান জানান, দুর্নীতি আমরা দেখব না, দুর্নীতি আমরা করব না, 'দুর্নীতি এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেব। তোমরা পারবা না এদেশের মানুষকে ভালোবাসবার?' এ ব্যাপারে তাঁর প্রত্যয় যে কত দৃঢ় তার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর পরবর্তী বক্তব্যে, 'না পারো, আমাকে বিদায় করে দাও। আমি কিছু চাই না তোমাদের কাছ থেকে।'

নির্বাচনের পর স্বার্থবাদী মহল আবার ষড়যন্ত্র চালানোর চেষ্টা করলে তাদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্যে আমি গণআন্দোলনের ডাক দেবো। বাংলার মানুষের কল্যাণ এবং মুক্তির জন্য এটা আমার শেষ সংগ্রাম।

(—বঙ্গবন্ধু; নির্বাচনী জনসভা, জয়দেবপুর, ৩০ অক্টোবর, ১৯৭০)

শেখ মুজিব তাঁর দেশের মানুষের সাথে আবেগগতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি সব সময় বলতেন প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য তিনি রাজনীতি করেন

না, কারণ ইচ্ছে করলে তিনি অনেক আগেই প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। তাই তিনি বলেন, 'এ প্রধানমন্ত্রীত্ব যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না।' বলেন, 'আমার যৌবন কারাগারের অন্তরালে কাটিয়ে দিয়েছি এদেশের মানুষের জন্য। আমি ওদের কাছে থাকতে চাই, ওদের সাথে মরতে চাই, এর বেশি আমি আর কছুই চাই না।' তিনি তাঁর কর্মীদের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামের আহ্বান জানান : 'তোমাদের জীবন থাকতে যেন বাংলার মাটিতে আর কেউ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপণ করতে না পারে।' বঙ্গবন্ধু সব সময় স্বনির্ভর উন্নয়নের কথা ভাবতেন। বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে এক ধরনের অনীহা সব সময়ই তাঁর বক্তব্যে ফুটে উঠত, আমাদের যদি কেউ কিনতে চান তাহলে ভুল হবে, কেউ যদি সাহায্যের নামে আমাদের দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তবে ভুল হবে। 'আমরা শোষিত মানুষ। বহু ত্যাগ করেছি, বহু রক্ত দিয়েছি। দরকার হয় আরও দেব। কিন্তু আত্মসম্মান বিক্রি করে আমরা কারও কাছে সাহায্য চাই না।'

১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাঙালি নেতা হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন। সব মানুষের পৃথিবী গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বের সকল জাতির সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন।' তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত তাঁর স্বদেশের কথা তুলে ধরেন। তিনি দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে তাঁর দেশের লড়াই করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি পুলিশ বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আপনারা স্বাধীন দেশের পুলিশ। ... আপনাদের কর্তব্য জনগণের সেবা করা, জনগণকে ভালোবাসা, দুর্দিনে জনগণকে সাহায্য করা।' জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় সরকার চলে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সবাইকে রাখা হয়েছে জনগণের সেবা করবার জন্য।' তিনি তাঁদের বলেন, আপনাদের প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চাপে, আমার সহকর্মীদের ঘাড়ে চাপে। এজন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল, আমার অনুরোধ রইল, আমার আদেশ রইল, আপনারা মানুষের সেবা করুন।' তিনি তাদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান, 'আপনারা একবার আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করুন, আমরা দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থাকব। প্রতিজ্ঞা করুন, আমরা দুর্নীতিবাজদের খতম করব। ... আজকে

আপনারা আরও প্রতিজ্ঞা করুন, আমরা এমন পুলিশ গঠন করব যে পুলিশ হবে মানুষের সেবক, শোষক নয়।'

বাকশাল

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু সংসদে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী বিল পেশ করলেন। দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্ভিক্ষাবস্থা, সীমাহীন ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চোরাকারবারি, মজুতদারি, সর্বোপরি জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তাহীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কার–বিকেন্দ্রীকরণ, গণতন্ত্রায়ণ এবং সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে একতাবদ্ধ এবং একই রাজনৈতিক প্লাটফর্মে সমবেত, সংহত ও সংঘবদ্ধ করে খণ্ডিত, বিক্ষিপ্ত, অসংলগ্ন ও পরস্পরবিরোধী কর্মতৎপরতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানোর উদ্দেশ্যে গঠন করলেন 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' সংক্ষেপে বাকশাল। তিনি তাঁর ভাষণে অধিকার সংরক্ষণে দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রসঙ্গে বললেন, প্রত্যেক দেশে নিয়ম আছে যদি আপনাকে অধিকার ভোগ করতে হয় অন্যের অধিকারকেও রক্ষা করতে হবে; If you have a liberty, you have responsibility-এ কথাটি ভুললে চলবে না। কিন্তু রেসপনসিবিলিটি নেবে না আর সেখানে যেয়ে সরকারি কর্মচারীর মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করবে।' তিনি স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ hot bed of international clique-এ পরিণত হয়েছে বলে উল্লেখ করে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন, '২৫ বছর মাথা নত না করে বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রাম করেছি, আমাদের রক্ত থাকতে এ দেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারো নাই।' তিনি বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপে ও দেশ জুড়ে ভয়াবহ বন্যায় দেশীয় অর্থনীতি ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে বলে উল্লেখ করেন। বাংলার দুঃখী মানুষের কাছে শিক্ষিত সমাজের ঋণ প্রসঙ্গে বলেন, 'তোমরা পেয়েছো শিক্ষার আলো, যে শিক্ষা পেয়েছো [তা] বাংলার জনগণের টাকায়। তুমি কি ফেরত দিয়েছো বাংলার দুঃখী মানুষকে, যে দুঃখী মানুষ না খেয়ে মরে যায়?' শিক্ষিত সমাজই সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত উল্লেখ করে তিনি আবারও বলেন, 'আমরা যে ৫% শিক্ষিত সমাজ, আমরা হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে করাপ্ট পিপল।' দুর্নীতিবাজদের অপতৎপরতার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন, যেকোনো মূল্যে বাংলার মাটি থেকে এদের উৎখাত করতে হবে। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য শাসনতন্ত্রের সংশোধন করেছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'যারা জীবনভর সংগ্রাম করেছে, একথা যদি কেউ মনে করে যে জনগণের ভোটের অধিকার আমরা কেড়ে নিয়েছি–no, আজ এখানে যে সিস্টেম করা হয়েছে তাতে পার্লামেন্টের মেম্বারদের জনগণ দ্বারা

জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে।' দেশে সুষ্ঠু শাসন কায়েমের জন্য, জনগণকে অনাচার-অত্যাচার থেকে রক্ষা করে শান্তিময় জীবনদানের জন্য এটা তার 'second revolution' উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এই revolution-এর অর্থ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটান। এর অর্থ অত্যাচার, অবিচার ও নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।' নতুন বিপ্লব শুরু করার জন্য তিনি জনগণের অংশ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন : 'নতুন জীবন সৃষ্টি করতে হবে। উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে মোবিলাইজ করতে হবে। মানুষ ভাল। বাংলার মানুষের মতো মানুষ আর কোথাও নাই। বাংলার গরিব, বাংলার কৃষক ভাল, বাংলার শ্রমিক ভালো।' তাঁর বাকশাল-পরবর্তী কথাগুলো একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় মূলত জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক শান্তি অর্জনের লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী এই মানুষটির মনেও নিশ্চয়ই এমন কঠিন ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে মনে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। নিকটজনদের তিনি বলেছেন, এটি ছিল সাময়িক ছন্দপতন। পরিস্থিতি খানিকটা থিতু হলেই তিনি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে আসবেন। কিন্তু তাঁর এই সদিচ্ছার কথা, বাস্তবতার নিরিখে গৃহীত নতুন এই কর্মসূচিকে, খুব ভালোভাবে জনগণকে বোঝানো হয়নি। ফলে তাঁর এই ব্যতিক্রমী কার্যক্রমের প্রবল সমালোচনা হয়। বিশেষ করে, জনগণের জন্য আপ্রাণ বুভুক্ষু তাঁর সহযাত্রী মধ্যবিত্তশ্রেণি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তাঁর ওপর। তবে সাধারণ মানুষের মনোভাব ছিল ভিন্ন। তারা তাঁকে কঠোর হতে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। তবে এই পথটি যে তাঁর স্বাভাবিক পথ নয় সেটিও তাঁরা বুঝতে পারলেন। তাই এক ধরনের বিভ্রান্তি থেকেই যাচ্ছিল।

১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি বিগত ৪ বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলার পুনর্বাসনে সরকারি কর্মতৎপরতার বিবরণ দেন। তিনি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে, দুর্নীতিবাজদের উৎখাত করার কথা বলেন। ভাষণকালে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে কর ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ, যে ব্ল্যাকমার্কেটিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। ... ঘরে ঘরে আপনাদের দুর্গ গড়তে হবে। সে দুর্গ গড়তে হবে দুর্নীতিবাজদের খতম করার জন্য। বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচন করার জন্য। এই দুর্নীতিবাজদের যদি খতম করতে পারেন

তাহলে বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ দুঃখ চলে যাবে। এত চোরের চোর, এই চোর যে কোথা থেকে পয়দা হয়েছে তা জানি না। পাকিস্তান সব নিয়ে গিয়েছে কিন্তু এই চোরদের তারা নিয়ে গেলে বাঁচতাম।'

সমাজে কৃষক, শ্রমিক, রিকশাওয়ালা, মজদুরদের মর্যাদা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শিক্ষিতদের উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ওদের সম্মান করে কথা বলুন, ইজ্জত করে কথা বলুন, ওরাই মালিক, ওদের দ্বারাই আপনার সংসার চলে। ... আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছে কে? ডাক্তারি পাস করায় কে? ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করায় কে? সায়েন্স পাস করায় কে? বৈজ্ঞানিক করে কে? অফিসার করে কে? কার টাকায়? বাংলার দুঃখী জনগণের টাকায়।... আপনি দিচ্ছেন কী? কী ফেরত দিচ্ছেন? আত্মসমালোচনা করুন। বক্তৃতা করে লাভ নেই।'

'...আমার যুবক ভাইয়েরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে, তার উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই...।'

বঙ্গভবনে বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে বঙ্গবন্ধু বলেন যে ক্ষমতার জন্য নয়া সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়নি। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে নির্বাচন দিয়েই ৯৭% ভোট আউট-অব থ্রি হানড্রেড ফিফটিন, থ্রি হানড্রেড সেভেন সিটস আওয়ামী লীগের ছিল। যদি তার পরেও ইলেকশন দিতাম, এখনো বিশ্বাস করি, দুই-এক পারসেন্ট বাদ যেতেও পারে। কিন্তু ৯০%-এর কম পাবে না আমাদের পার্টি। সেজন্য এই সিস্টেমে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের অনেক দিন ছিল না, যদি ক্ষমতায় থাকতে চাইতাম।' তিনি দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে দেশের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পলিসির অবনতি হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। এরপর বঙ্গবন্ধু নতুন প্রবর্তিত সিস্টেমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে বলেন, 'যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে, তারা এসে একতাবদ্ধ হয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে পারে। এজন্য আজকে এটা করতে হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় বাংলাদেশবাসী এটাকে গ্রহণ করেছে।' এ পর্যায়ে তিনি বাকশালের জেলাভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো ও এর বিকেন্দ্রীয়করণের নানান দিক তুলে ধরেন। তিনি সকলকে মানসিকতা পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'প্রতিটি কাজই আমার, মাটি কাটা আমার কাজ, ফ্যাক্টরিও আমার কাজ, রাস্তা বানানোও আমার কাজ।' তিনি দেশের উন্নয়নের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততার উপর জোর দেন। বলেন যে, আমার মাটির সাথে, আমার মানুষের সাথে, আমার কালচারের সাথে, 'আমার

ইতিহাসের সাথে যুক্ত করেই আমার ইকোনোমিক সিস্টেম গড়তে হবে।' তিনি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবকে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ধাপ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি ভুল নিশ্চয়ই করব, আমি ফেরেস্তা নই, শয়তানও নই। আমি মানুষ, আমি ভুল করবোই। আমি ভুল করলে আমার মনে থাকতে হবে, আই ক্যান রেকটিফাই মাইসেলফ।'

১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত জেলা-গভর্নরদের প্রশিক্ষণ-কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'জনগণ থেকে আমাদের শাসনকাঠামো অনেকটা বিচ্ছিন্ন।' তিনি গণমুখী শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গঠনের আহ্বান জানালেন, 'আমাদের মানুষকে চিনতে হবে, জানতে হবে। তাদের সাথে মিশত হবে, তাদের মনোভাব জানতে হবে। তাদের ইতিহাস এবং অন্য যা কিছু আছে, সংস্কার ইত্যাদি, অনেক কিছুই এ দেশের মানুষের আছে, সে সব বিবেচনা করে একটা পন্থা অবলম্বন করা দরকার।' তিনি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'শুধু সরকারি অর্থেই জনগণের মঙ্গল হয় না, উন্নতির কাজ হয় না। জনগণকে একতাবদ্ধ করতে হবে। আপনাদের জনগণকে মোবিলাইজ করতে হবে। সেজন্য জনগণের জন্য অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে।' তিনি সামাজিক পুঁজির গুরুত্ব ভালোই বুঝতেন। তাই তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষকে কোনো কাজ করতে বললে তারা 'না' বলে না। বাংলার মানুষ যদি বোঝে যে এই কাজে তাদের উন্নতি হয়, তবে তারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।' তিনি জনগণের কাছে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে নবপ্রবর্তিত বাকশালের বিভিন্ন প্রশাসনিক দিক তুলে ধরেন এবং জনকল্যাণের জন্য, দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য ও মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্যই যে এই শাসনব্যবস্থা তার উল্লেখ করেন। তাঁর অফিসারদের ভেবেচিন্তে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনারা আমার কথা জীবনভর শুনেছেন। আজো শুনুন। দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে দেশের জন্য কাজ করুন। সিস্টেমটাকে আমাদের সাকসেসফুল করতেই হবে।'

এই হৃদয়-নিংড়ানো কথাগুলোর সঙ্গে দ্বিমত পোষণের সুযোগ খুব সামান্যই। সাধারণ মানুষের কল্যাণচিন্তায় বিভোর বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার অবকাশ খুব একটা নেই। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় অনুকূল ছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে। কেননা সে সময় সমস্যা দেখা দেয় একদলীয় বনাম বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সরকারের প্রশ্নে। বঙ্গবন্ধু নিজেই

সারাটা জীবন ধরে সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। বৃহত্তম এই পথের অনুসারীও তিনি ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে কিংবা অন্য কোনো কারণে তাঁকে একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করতে হয়। এর ফলে এলিটদের একটি অংশ নাখোশ হন। আর এই বাকশালকে ইস্যু বানিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে কটাক্ষ করা হয়। তাঁর অনেক গুণগ্রাহীও এই ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেননি। কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং আরও অনেকেই এ ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন না। তবে তাঁরা এই ব্যবস্থার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অবদানকে খাটো না করেও নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না সামগ্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর এর প্রভাবের প্রশ্নে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্প্রতি জানিয়েছেন, 'আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে বাকশাল গঠনের মাধ্যমে আমরা গণতন্ত্রের পথ থেকে প্রথমবারের মতো সরে গেলাম। যে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য তিনি জীবনে এত মূল্যবান সময় কারাগারে কাটালেন সেখান থেকে সরে যাওয়া মর্মান্তিক হয়েছে। বাকশাল গঠনে তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কোনো প্রশ্ন তুলব না। কারণ তিনি বলেছিলেন যে, বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে তিনি এটা করেছেন। তবে দেশের জন্য এই বাকশাল সুফল বয়ে আনেনি বা সুফল পাওয়ার সময় পাওয়া যায়নি (আনিসুজ্জামান, 'যদিও বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস অনুপস্থিত ছিলেন তাঁর প্রেরণা কার্যকর ছিল', *বিচিত্রা*, ১৬ আগস্ট ১৯৯৬, পৃ. ৪০)। অথচ এ ব্যবস্থা চালু করার জন্য তৎপর ছিলেন খন্দকার মোশতাকসহ চিহ্নিত প্রতিক্রিয়াশীলরা। এই বিভ্রান্তির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন তাঁরই ছায়াতলে ঘাপটি মেরে থাকা ষড়যন্ত্রীর দল। ওই ষড়যন্ত্রীদের পালে আরও হাওয়া দেন অতিবিপ্লবীরা। তৈরি হয় এক অনিশ্চিত পরিবেশ। এমনি এক অস্থির সময়ের কোনো এক মুহূর্তে ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর ওপর হানে

সমাজতন্ত্র আমি দুনিয়া থেকে ভাড়া করে আনতে চাই না, এ সমাজতন্ত্র হবে বাংলার মাটির সমাজতন্ত্র। এ সমাজতন্ত্র বাংলার মানুষের সমাজতন্ত্র, তার অর্থ হলো শোষণহীন সমাজ, সম্পদের সুষম বণ্টন। বাংলাদেশে ধনীদের আমি আর ধন সম্পদ বাড়াতে দেব না। বাংলার কৃষক, মজদুর, বাংলার বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক এ দেশে সমাজতন্ত্রের সুবিধা ভোগ করবে।

(–বঙ্গবন্ধু; সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ৭ জুন, ১৯৭২।)

চরম আঘাত। হঠাৎ করেই বাঙালি জাতিকে বিশাল হৃদয়ের এই মানুষটির নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়। তিনি ভুল করে থাকলে জনগণই তাঁকে শুধরে দিতে পারতেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা সে সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিল না। বাঙালির কপালে জঘন্যতম এক কলঙ্ক লেপন করে দিয়ে খুনিরা দেশটির অগ্রযাত্রা দীর্ঘদিনের জন্য পিছিয়ে দিল। আজীবন সাধারণের কল্যাণ চেয়েছেন যে মানুষটি তাঁকেই সপরিবারে হত্যা করা হলো তাঁরই প্রিয় বাংলাদেশের মাটিতে। অথচ শত্রু পাকিস্তানিরাও এমন আঘাত করতে সাহস পায়নি। তাঁর এই অস্বাভাবিক মৃত্যু বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অভিশাপ হিসেবেই থেকে গেছে। এই অভিশাপ কাটিয়ে কিছুতেই বাঙালি সুস্থির হয়ে সামনের দিকে এগুতে পারছে না। সংকট যেন কাটছেই না।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান শহিদ হওয়ার পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। গণতন্ত্রকে হত্যা করে মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। কেড়ে নেয়া হয় জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার। বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য হত্যাকারীদের বিচারের বিধান রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে জাতির পিতার আত্মস্বীকৃত খুনিদেরকে বিচারের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য এক সামরিক অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স) জারি করা হয়। (মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫)

দেরিতে হলেও বাংলাদেশ আবার সুস্থতার দিকে, মানবিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সভ্য জাতির কলঙ্ক ইনডেমনিটি বিল আজ বিলুপ্ত। বঙ্গবন্ধু আজ আবার জাতির ললাটজুড়ে জ্বলজ্বল করছেন। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও তিনি ধীরে ধীরে আমাদের জাতীয় মননের মূল স্রোতে ফিরে আসছেন। তিনি যে কৃষকের কথা বলতেন, শ্রমিকের কথা বলতেন, যুবকের কথা বলতেন তাদের সকলের অনুকূলে উন্নয়নের স্রোতধারাকে প্রবাহিত করে সাধারণের কল্যাণের দিকে দ্রুত ধাবমান হতে পারলেই কেবল বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাঙালির ঋণ আংশিক শোধ হবে।

মূল্যায়ন

উপরের এই বিশদ আলোচনা থেকে আমরা বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে মোটা দাগে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি।

ক. প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু

সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ধ্যান। সে-লক্ষ্য পূরণে তিনি তাঁর সমসাময়িক সকল নেতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, 'রাজনীতিতে তিনি ছিলেন এক মহাকাব্যের

নায়ক। সেই মহাকাব্য হচ্ছে পাকিস্তান রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং পরিণতিতে একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।' (দ্র. *বিচিত্রা* ২৫ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ১৬ আগস্ট ১৯৯৬/১ ভাদ্র ১৪০৩, পৃ.৩৮-৩৯)

'... শেখ মুজিব প্রবর্তিত এই জাতীয়তাবাদ ১৯৪৭ ও ১৯০৫ সালের জাতীয়তাবাদ থেকে ভিন্ন চরিত্রের। আসলে জাতীয়তাবাদ সব সময় প্রগতিশীল হয় না, অনেক সময় তা প্রতিক্রিয়াশীলও হতে পারে। পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে যে জাতীয়তাবাদ সক্রিয় ছিল তার একটি আগ্রাসী ভূমিকা আমরা লক্ষ করি। সে জাতীয়তাবাদ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল, তার অধিকার হরণ করেছিল। অপরদিকে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে লক্ষ্য করে যে জাতীয়তাবাদ সামনে আনা হয়েছিল, তাঁর একটি সাম্প্রদায়িক চরিত্র ছিল। বাঙালি মধ্যবিত্তকে তা অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারেনি। আলোচ্য জাতীয়তাবাদীরা শ্রেণীর বিভাজন অতিক্রম করতে পারলেও সম্প্রদায়ের বিভাজনকে ছাপিয়ে যেতে পারেননি।' (*বিচিত্রা*, ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯)। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তিকামী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথভাবে ধারণ করেছিলেন। তিনি তাঁর আন্দোলনে মধ্যবিত্তের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তাদের আকাঙ্ক্ষাকে যুক্ত করেছেন। একই সঙ্গে সাধারণ স্বপ্নকেও ধরতে পেরেছেন। মধ্যবিত্তের সংসারে বেড়ে ওঠা শেখ মুজিবের রাজনৈতিক চিন্তায় সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার আদল সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন তার শক্তি এসেছে জনগণের কাছ থেকেই। বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, উঠতি মধ্যবিত্ত–সকলের আকাঙ্ক্ষাকে তিনি একই সঙ্গে ধারণ করেছিলেন।

খ. সফল রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই-ই ছিল। প্রশাসক শেখ মুজিবের সাফল্য নিয়ে নানা বিতর্ক সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর সাফল্যের পাল্লাই ছিল বেশি ভারী। প্রশাসক হিসেবে তিনি মোটেই ব্যর্থ ছিলেন না। তাঁর একান্ত সচিব ড. ফরাসউদ্দিনের বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যাচ্ছে যে, তিনি ছিলেন সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের এক সফল নায়ক। তাঁর প্রশাসনিক চিন্তার মূলেও ছিল সাধারণ মানুষ, মানবিক গুণাবলি তাঁর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকেও প্রভাবিত করত। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্যোজাত দেশের পুনর্গঠন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব ছিল অপরিমেয়। মাত্র এক বছর সময়ের মধ্যে তিনি জাতিকে একটি উত্তম ও প্রগতিশীল সংবিধান উপহার দিয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের অবদান অনস্বীকার্য। মাত্র ১৮ মাসের মাথায় প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশে একটি

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন। অর্থনৈতিক সাম্যের লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়ে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে তাঁর এ সাফল্য সদ্যোজাত, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের, একটি দেশের পক্ষে ছিল অকল্পনীয়। স্বাধীনতা অর্জনের অল্পকালের মধ্যে জাতিকে একটি সুন্দর সংবিধান উপহার দেওয়ার প্রশংসা করে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন যে, 'এটা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় এ কারণে যে, এ অঞ্চলের বিশেষত আমাদের নিজেদের রাজনৈতিক ঐতিহ্য এটা নয়। এখানকার ঐতিহ্য এই যে, বরং বিনা সংবিধানে যতদিন রাজনৈতিক ক্ষমতা আঁকড়িয়ে থাকা যায়। পাকিস্তানে আমাদের রাজনৈতিক পূর্বগামীরা শাসনতান্ত্রিক সংবিধান রচনায় পাকা নয় বছর লাগিয়েছিলেন। অধিকতর গণতন্ত্রসচেতন আমাদের প্রতিবেশী ভারতও তিন বছরের আগে সংবিধান রচনা করতে পারেনি।' (দ্র. *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৫)। অথচ বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক সদিচ্ছার কারণেই স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সফল পরিসমাপ্তি হয়েছিল।

নয় মাসের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন দেশে ব্যাংকে টাকা ছিল না, মানুষের ঘরে চাল ছিল না, এক কোটি লোক ছিল গৃহহারা, লাখ লাখ বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বন্দর ছিল না, প্লেন ছিল না, বাস-ট্রাক ছিল না। বৈরী আন্তর্জাতিক পরিবেশে তেল সংকট-উত্তর বাংলাদেশে খাদ্য আমদানিতে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। চুয়াত্তরে দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। বঙ্গবন্ধু এজন্য খুবই বিচলিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, দেশের ভেতরে অবকাঠামোর অভাব, আমলাতান্ত্রিক অসহযোগিতা ইত্যাদি কারণে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সবকিছুই পুনর্গঠন করেছিলেন, ১৪২টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন। বাংলাদেশ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন, জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ এবং ওআইসির সদস্য হয় এবং এসবই সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর শুধু পুনর্বাসন নয়, নতুন করে অগ্রযাত্রার মজবুত ভিত্তি রচনা করবার জন্য। চমৎকার একটি সংবিধানের মাধ্যমে সাম্যের অর্থনীতি গড়ার অঙ্গীকার ছাড়াও তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উন্নয়নের সুদূরপ্রসারী দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কৃষির উন্নতিই ছিল তার প্রথম অগ্রাধিকার। তিনিই প্রথমবারের মতো ১৯৭৩ সালে কৃষি-স্নাতকদের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হবার নির্দেশ জারি করেন। বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়নে তাঁদের অবদানকে উৎসাহ দেবার জন্যই এই আদেশ তিনি জারি করেছিলেন। অর্থনীতি ধীরে ধীরে চাঙ্গা হতে শুরু করেছিল। একটি বাম্পার ফলনের জন্য বাংলাদেশ তৈরি হচ্ছিল (দ্র. ওবায়দুল হক, প্রগুক্ত)। ঠিক সে-রকম একটি সময়েই শত্রুরা

তাঁর প্রাণের ওপর আঘাত হানলো। আর কেড়ে নিল বাঙালির প্রাণভোমরকে।

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'জাতির পিতা' বলে সংবিধানে স্থান লাভ করেন। তাঁর নাম যুক্ত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন, চীনের মাও সেতুং, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্নো, ভিয়েতনামের হো চি মিন, তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, উত্তর কোরিয়ার কিম ইল সুঙ, ঘানার নক্রুমা এবং ভারতের মহাত্মা গান্ধীর নামের তালিকায়, যাঁরা স্ব-স্ব জাতির প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।

অর্থনীতির সর্বত্র মজুরি কাঠামো ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিম্ন বেতনভুক কর্মচারী ও অল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্যে দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনতে হবে।

(–বঙ্গবন্ধু; পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান, ২৮ অক্টোবর, ১৯৭০)

গ. রাজনৈতিক দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু

পাকিস্তান-আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবলে সেই ১৯৪৭ সালেই স্পষ্ট অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে পূর্ববাংলার মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে না। বস্তুতপক্ষে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার আদলটি তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলিম লীগের পতাকা-তলে আর বেশি দিন থাকা সম্ভব হবে না। বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি জাতীয় পার্লামেন্টে দেয়া তাঁর ভাষণগুলোই প্রমাণ করে তিনি পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কতোটা ক্ষুব্ধ এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ-বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে কতোটা অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি চলমান পাকিস্তানি রাজনীতি ও শাসনপ্রক্রিয়ায় পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েন। ফলে সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পূর্ববাংলার মানুষের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরপরই। সেই

লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছিল মুসলিম লীগ ও পরে আওয়ামী লীগ। উপস্থাপন করেছিলেন বাঙালি জাতির 'মুক্তির সনদ' ৬ দফা। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনকে তিনি ৬ দফার পক্ষে রেফারেন্ডাম হিসেবে দেখলেন এবং সেভাবেই প্রচার করতে লাগলেন। উপরন্তু তিনি ৬ দফাকে এমনভাবে উপস্থাপন ও বিন্যস্ত করেছিলেন, যা শুধু বাঙালির নয়, পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশের জনগোষ্ঠীরও ব্যাপক সহানুভূতি লাভে সক্ষম হয়েছিল। ফলে '৭০ সালে আওয়ামী লীগ শুধু নির্বাচনেই বিজয়ী হয়নি, ৬ দফার রেফারেন্ডামেও জয় লাভ করে। দলীয় আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ একক মুখপাত্র ছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ আমরা আরও পাই নির্বাচনোত্তর ঘটনাবলির ভেতর দিয়ে। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি দলের মনোনয়নের বিজয় কেন্দ্রীয় পরিষদের ১৫১ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২৬৭ জন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ৬ দফা বাস্তবায়নের শপথ নিলেন। এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে সম্পন্ন করলেন। এই ঘটনার সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। আওয়ামী লীগের টিকেটে বিজয়ী উভয় পরিষদের ৪১৮ জন সদস্যের সকলেই যে পরীক্ষিত, অনুগত, পুরাতন ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন, এমন নয়। রাজনৈতিকভাবে অনেক অজানা-অচেনা প্রার্থীও নমিনেশন পেয়েছিলেন। উপরন্তু আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ পশ্চিমারা (পশ্চিম-পাকিস্তানিরা) শুধু রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারীই ছিলেন না, বিপুল ধনসম্পত্তি ও বিত্ত-বৈভবেরও মালিক ছিলেন। পার্লামেন্টারি রাজনীতির চর্চায় তাদের ঐতিহ্যও গৌরবজনক ছিল না। ফলে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত গণপরিষদের নবাগত সদস্যদের একটি অংশকে হাত করে নেয়া কল্পনাতীত ছিল না। অনুরূপ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ তথা পূর্ব-পাকিস্তানের মেজরিটিকে নিষ্ক্রিয় করা অনেকটাই সহজ ছিল। সেদিন বঙ্গবন্ধু তাই রেসকোর্স ময়দানে বিশ লাখ লোকের সমাবেশে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে সদস্যদের দিয়ে হলফ করিয়ে নিয়েছিলেন। এতে একদিকে যেমন দলীয় নির্বাচিত সদস্যদের, অন্যদিকে পশ্চিম-পাকিস্তানি ধনকুবেরদের প্রতিও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছিল (দ্র. আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত)। এছাড়া তীক্ষ্ণধী নেতা বঙ্গবন্ধু স্বীয় রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞাবলেই অসহযোগ-আন্দোলনের সময় উপযুক্ত কর্মসূচি দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে পশ্চিমাদের শাসনব্যবস্থাকে অচল করে দিয়ে কার্যত স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, যার চূড়ান্ত পরিণতি শত্রুমুক্ত 'বাংলাদেশ'। অসহযোগ-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তিনি প্রমাণ করেছেন কত বড় রাষ্ট্রনায়ক তিনি হতে যাচ্ছেন।

ঘ. আশাবাদী বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বহু জেল-জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন। বলতে গেলে জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তিনি জেলখানায় কাটিয়েছেন। পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন সময় তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানোরও আয়োজন করেছে। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সরকারের এমনি এক অপচেষ্টার নিদর্শন। যুদ্ধকালীন ৯ মাস পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকবার সময় তাঁর জন্য কবর পর্যন্ত খোঁড়া হয়েছিল। এত অত্যাচার, ভয়ভীতি ও নির্যাতনের মাঝেও একজন সাহসী নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের যে গুণটি বিশেষভাবে ঈর্ষণীয় তা হলো, রাজনীতিতে তাঁর তীব্র আশাবাদ এবং নিজের ও দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি অবিচল আস্থা। ফলে জেল-জুলুম-অত্যাচার কখনোই তাঁকে বিমর্ষ বা চিন্তিত করতে পারেনি। এমনকি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবেও তিনি আদালতকক্ষে ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল, অকুতোভয় ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী। জেলখানার স্যাঁতসেঁতে সেলের দীর্ঘ ও অনিশ্চিত জীবন কখনো তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু বন্দীজীবনকে কত সহজভাবে বরণ করতে পারতেন তাঁর পরিচয় পাই আমরা আবুল মনসুর আহমেদের লেখা থেকে : '...পরে জানিয়াছিলাম মওলানা সাহেব ও শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য আমার দুশ্চিন্তা ছিল নিতান্ত অনাবশ্যক। তাঁহারা সকাল-সন্ধ্যা সব্জীর বাগান করিয়া মরিচ-বেগুন ও নানা প্রকার মৌসুমী ফুলের গাছ লাগাইয়া আনন্দেই কাল কাটাইতেছেন। নিজ হাতে লাগানো গাছের ফুল তো তাঁহারা উপভোগ করিবেনই, এমনকি মরিচ-বেগুন দিয়া ভর্তা-চাটনি খাইয়া যাইবার সিদ্ধান্তও তাঁহারা করিয়া ফেলিয়াছেন। মুজিবুর রহমান আর একধাপ আগাইয়া গিয়াছেন। অন্য ওয়ার্ড হইতে একটা ফজলী আমের চারা (কলম নয়) জোগাড় করিয়া নিজের সেলের ছোট আঙ্গিনায় লাগাইয়াছেন। জেলার-সুপারকে বলিয়াছেন, ওই গাছের আম খাইয়া যাইবার জন্য মন বাঁধিয়াছেন। মুজিবুর রহমানের মনের বল দেখিয়া অফিসাররা অবাক হইয়াছেন।' (দ্র. প্রাগুক্ত)

এই একটি মাত্র উদ্ধৃতি থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু কতখানি হতাশামুক্ত ও দৃঢ়-সঙ্কল্পবদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

ঙ. সাধারণের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী বঙ্গবন্ধু

স্বল্প পরিসরের এই আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বঙ্গবন্ধুর সকল ভাবনার মূলে ছিলেন সাধারণ মানুষ। সেই শৈশব থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিনগুলোতেও তিনি কৃষকের কল্যাণ, শ্রমিকের কল্যাণ,

সাধারণের মঙ্গল-ভাবনায় ছিলেন সমর্পিতপ্রাণ। প্রশাসক হিসেবেও সর্বক্ষণ তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল সাধারণের দিকে। তাঁর দেওয়া সংবিধানই এর বড় প্রমাণ। সাধারণ মানুষকে তিনি প্রজাতন্ত্রের মালিক বানাতে চেয়েছেন ওই সংবিধানের মাধ্যমে।

নাগরিক জীবনের কোলাহল, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থের হানাহানি, ভণ্ডামি থেকে অনেক দূরে ছায়াঘেরা শান্তশীতল গ্রামীণ এক পরিবেশে তিনি এখন শায়িত। যাঁদের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন, তাঁরাই তাঁকে সাধারণের বেশে পরম আদরে শুইয়ে রেখেছেন। আজ তাই আমাদের একান্ত প্রচেষ্টা হওয়া উচিত কী করে আমাদের নীতিতে ও কর্মে তাঁর আজীবনের স্বপ্ন–সাধারণের কল্যাণ-ভাবনাকে যুক্ত করা যায়। কী করে আমাদের উন্নয়ন-ভাবনাকে সাধারণের মঙ্গলাশ্রয়ী করা যায়। সে-জন্যে আমাদের ফিরে যেতে হবে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে। আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার দিকে। অনুসন্ধান করতে হবে বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্তসমূহে কী ধরনের মন্তব্য তিনি করতেন। অনুসরণ করতে হবে তাঁরই দেওয়া উন্নয়ন নীতিমালা। বঙ্গবন্ধুর ভাবনাপ্রসূত সাংবিধানিক অঙ্গীকার-নির্ভর জনকল্যাণময়ী, কৃষক ও শ্রমিকদের মঙ্গলাশ্রয়ী করা যায়। সে লক্ষ্যে আমাদের ফিরে আসতেই হবে। মুষ্টিমেয় কল্যাণের ঘোর বিরোধী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। সর্বসাধারণের মঙ্গল-ভাবনায় সবসময় নিমগ্ন থাকা ছিল তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত। তাই আজ আমরা যদি সত্যি তাঁর আদর্শের রূপায়ণ চাই, তাহলে আমাদের স্বতন্ত্র স্বদেশচিন্তায় উদ্ভাসিত উন্নয়ন-কৌশল অবলম্বন করতেই হবে।



৩ বাঙালি মধ্যবিত্তের যোগ্য প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। শেখ মুজিবের চরিত্রের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর নিয়তিকে নির্ধারণ করেছিল সেগুলো বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে সেই সামাজিক প্রেক্ষাপটকে, যেখান থেকে তিনি উঠে এসেছিলেন। তিনি সাধারণ এক মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এমন এক সময়ে যখন ব্রিটিশ শাসনাধীনে প্রায় দেড়শত বৎসর নিশ্চুপ থাকার পর বাংলার মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ ঘটছিল। (এস. এ. করিম, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০)

বাঙালি বরাবরই রাজনীতি-সচেতন। এমন প্রবাদ চালু ছিল যে, বাংলা আজ যা ভাবে ভারত তা ভাবে আগামীকাল। ঐতিহাসিক বিচারেই বাংলা ছিল সমন্বয়ের কেন্দ্র। বাংলা ভাষা ও বাঙালির প্রধান ধর্মই হচ্ছে পরকে আপন করা, বাইরের প্রভাবকে আপন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যকে গ্রহণ করার এই গতিময়তাই বাঙালির বহুমাত্রিক চরিত্রকে বহুবর্ণিল উজ্জ্বলতা দিয়েছে। এই বাংলার আত্মীকরণের টানে পাঠানও এ দেশে এসে বাঙালি হয়ে গেছে। এভাবেই হাজার বছর ধরে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে বহুমাত্রিক বাংলাদেশ। বাঙালির বহমানতার সেই প্রক্রিয়া

আন্দোলন গাছের ফল নয়। আন্দোলন মুখ দিয়ে বললেই করা যায় না। আন্দোলনের জন্য জনমত সৃষ্টি করতে হয়। আন্দোলনের জন্য আদর্শ থাকতে হয়। ত্যাগী মানুষ থাকা দরকার। আর সর্বোপরি জনগণের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমর্থন থাকা দরকার।

(—বঙ্গবন্ধু; আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭৪)

এখনো থেমে যায়নি। নিরন্তর বহমানতার সেই প্রক্রিয়ায় ইদানীং নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। আজকাল অনেক বাঙালিই বিদেশে যাচ্ছেন। সারা বিশ্ব থেকেই বাঙালি নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীলতার শক্তি আহরণ করে চলেছে। তার নদ-নদীর গতির মতোই চির চঞ্চল গতির এক স্থায়ীরূপ বাংলাদেশ। দূর-দূরান্তের ভাবনার সঙ্গে স্বদেশের মাটি-ঘেঁষা ভাবনাকে যুক্ত করে বাঙালি হেঁটে চলেছে সামনের দিকে। বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। পলিমাটির দেশ বাংলাদেশ। নানা দেশের পলির মতোই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কত জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠীর মানুষ এক হয়েছে মিশ্রণের এই বেলাভূমিতে তার ইয়ত্তা নেই। বিস্ময়কর এক বৈচিত্র্যের প্রতীক এই বাঙালি। স্ববিরোধ সত্ত্বেও সুষমার সন্ধানী এই বাঙালির সমন্বয়-সাধনা সত্যি অনন্য। মোটেও একরৈখিক নয়, বহুত্ববাদী এই বাঙালির জাতি হিসেবে অভ্যুদয়ের প্রক্রিয়াটিও দীর্ঘ ও বহুমাত্রিক। ভেতর ও বাইরের উৎস থেকে নানান ভাবনাকে এক কেন্দ্রে জড়ো করে প্রচলিত ও আধুনিক সব আকাঙ্ক্ষাকে রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধে যুক্ত করা চাট্টিখানি কথা নয়।

জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মতো আধুনিক সব ধারণাকে আত্মস্থ করে বাঙালির মানসপটে স্থাপন করা মোটেও সহজ কাজ ছিল না। এসব ভাবনাকে বাঙালির আবেগ ও উচ্ছলতায় সিক্ত করে প্রাণবন্ত এক সত্তায় প্রকাশ করার চ্যালেঞ্জিং রাজনৈতিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন হাজার বছরের এক শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আবহমান বাঙালির আত্মপরিচয়কে সাহসের সঙ্গে তুলে ধরার এই অনন্য কৃতিত্ব তাঁকে দিতেই হবে। তিনি এই বিরল নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন এ কারণে যে, তিনি তাঁর কালের ও সমাজের ভাষা বুঝতে পারতেন। সেই ভাষাকে আপন সৃজনশীলতায় এমন করে প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর অনুসারীরা মনে করতেন তাঁর সঙ্গে যোগ রাখলেই সকলের সঙ্গে যোগ রাখা হবে। পাটভিত্তিক অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত থেকে বেড়ে ওঠে পূর্ববাংলার একঝাঁক তরুণ। গ্রাম থেকে মফস্বল শহর, সেখান থেকে কলকাতা ও ঢাকা হয়ে তারা এমন এক সামাজিক স্রোতধারা সৃষ্টি করে যা কিনা শেষ পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারা বনে যায়। বায়ান্নর ভাষাআন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাঙালি জাতির উত্থান তাঁর নেতৃত্বে ছিল বঙ্গবন্ধুর চারপাশের এক বিরাট মধ্যবিত্ত প্রতিনিধি দল। শোষণহীন কল্যাণময় এক সমাজ গড়ার সাধনায় এই নয়া মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব বলতে গেলে অসাধ্য সাধন করেছে। রাষ্ট্রসাধনায় শ্রেয়োবোধ, গরিবের জন্য কল্যাণচিন্তা, মানবিকতার বিস্তার–এমনি সব আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়ণের পবিত্র অঙ্গীকারে তাঁরা ছিলেন নিষ্ঠাবান। এমন এক মহৎ স্বপ্নকে ধীরে ধীরে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মনে জাগিয়ে দিতে পেরেছে যে নেতৃত্ব তার

শিরোমণি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন পরিবর্তনেরও পরিচালক। যদি পুরো সমাজ তাঁকে মদদ না দিত তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বিশ্বকে এমন সর্বব্যাপী পরিবর্তনের আরেক নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' উপহার দিতে পারতেন না। যদি তিনি তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল, কামারুজ্জামান, মনসুর আলী, মণি সিংহ, ভাসানী, মনোরঞ্জন ধরদের নিজের পাশে না পেতেন তাহলে নিশ্চয়ই এত দ্রুত একটি বাঙালি জাতির অভ্যুদয়কে নিশ্চিত করতে পারতেন না। এমনি এক প্রেক্ষাপট মনে রেখেই আমরা নিচে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের ধারাটির আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বুঝবার চেষ্টা করব।

মধ্যবিত্তের উৎপত্তি

নিঃসন্দেহে বাঙালির সার্থকতার শীর্ষতম শিখর ছিল একাত্তর। হাজার বছরের সংগ্রামের চূড়ান্ত প্রাপ্তি স্বাধীন বাংলাদেশকে অর্জন করার এই জন্মতারিখটি তাই বাঙালির কাছে অবিস্মরণীয়। একাত্তরে পৌঁছাতে বাঙালির অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়েছে। তবে বাঙালির জাতি হয়ে উঠবার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্বটি সবচেয়ে ঘটনাবহুল। আর এই পর্বটির নিয়ন্ত্রক ছিল দ্রুত বিকাশমান একটি নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিরা। পাকিস্তানের অনুগত ও অমানবিক পরিবেশে ক্রমবিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক অংশের দ্রুত বিকশিত হতে না পারার ক্ষোভ এবং আরেক অংশের জীবনযাত্রায় টানাপড়েনের জ্বালা–এই দুই প্রবণতার সম্মিলিত শক্তি তাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তাদের অংশগ্রহণের মাত্রা বুঝতে হলে এই শ্রেণির উৎপত্তি এবং উদ্ভবের ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করার প্রয়োজন রয়েছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এক পর্যায়ে এই শ্রেণির নিজস্ব উন্নতির পথ হতে তাঁকে বিচ্যুত হতে বাধ্য করা হয়। কার্যত, ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উন্নয়নের (ইউরোপীয়দের মতো) সকল উপসর্গ বিকশিত হচ্ছিল। একদিকে জমিদারদের একটি শক্তিশালী দল বিকশিত হচ্ছিল, অন্যদিকে স্বনিয়োজিত চাষিদের দল, প্রস্তুতকারক এবং ব্যবসায়ীদের দলও নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে তোলে। এই সময় ক্ষুদ্র আকারের কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা গিয়েছিল (আজাদ, ১৯৮৯ : ৬৭-৮২)। কিন্তু ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের কারণে এই প্রক্রিয়াটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অথচ প্রায় ইউরোপের মতোই সনাতনী কায়দায় এ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হতে শুরু করেছিল। অবশ্য

সিরাজের পতনের আগে থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক ধরনের দালালদের নিজেদের দলে ভিড়িয়েছিল। এরা স্থানীয় পণ্য কিনত এবং ব্রিটিশ পণ্য বিক্রি করত। এদের বলা হতো গোমস্তা (রহমান ও আজাদ, ১৯৯০: ৯)। পলাশীর যুদ্ধের পর এদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। এই স্থানীয় দালালরা ছিল কোম্পানির প্রতিনিধি। যে প্রক্রিয়ায় সনাতনী মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হচ্ছিল এরা তার বাইরেই ছিল। শুধু বাইরে কেন, ঐ প্রক্রিয়াকে বাধা দিচ্ছিল।

যথেষ্ট সম্পদ উপার্জনের পর এই প্রতিনিধিরা নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। তাদের কেউ কেউ সামাজিক এবং ধর্মীয় কাজের জন্য প্রচুর অর্থ দান করে (ঘোষ, ১৩৮৬ : ১৪৬০)। কোম্পানি তাদের এই উত্তরণে অসন্তুষ্ট ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। এ সময় এমন কিছু নতুন নিয়মকানুন চালু করা হয় যা ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের পক্ষে যায় এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় অথবা শিল্পে পুঁজি খাটাতে নিরুৎসাহিত করে। কার্যত ব্যবসায় অথবা শিল্পে না খেটে স্থানীয় পুঁজি জমিদারি কেনার কাজে ব্যবহৃত হতে শুরু করে (উমর, ১৯৮৭ : ১৬-১৭)।

মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে তাদের ঐতিহ্যগত ভিত্তি থেকে পৃথক করার জন্য ১৮৩৭ সালে ফার্সি ভাষার জায়গায় ইংরেজিকে প্রশাসনিক ভাষায় অধিষ্ঠিত করা হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে সামাজিক সুবিধা ভোগ করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণকে প্রশাসনিক যোগাযোগের উদ্দেশ্য ইংরেজি ভাষা শিখতে হয়, যা নতুন শিক্ষানীতির জন্ম দেয়। এই নীতির ফলে হাই স্কুল এবং কলেজগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পায় ইংরেজি এবং তা সরকারি যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। আমলা, আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক প্রভৃতি বিশাল শিক্ষিত জনগোষ্ঠী প্রশাসন ও সমাজের জন্য যথেষ্ট অবদান রাখলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের স্পষ্ট কোনো অবদান ছিল না। কিন্তু যখন থেকে কৃষকদের একাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করে তখন থেকেই এই চিত্র বদলে যেতে থাকে। এই সময় থেকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশ্যি ১৮৫৯ সালে জমিদারি প্রথার বিপক্ষে আদালত রায় দেওয়ার পর কৃষকরা আংশিকভাবে লাভবান হয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব আইন কৃষকদের জমির মালিকানা লাভে সাহায্য করেছিল (রহমান ও আজাদ, ১৯৯০ : ২৮-২৯)। তাছাড়া ১৯০২ সালের আরেকটি আইন কৃষকদের জমির অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল। এইভাবে কৃষকরা তাদের সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় বেশি নিরাপদবোধ করতে লাগলেন এবং এই

পদ্ধতিতে কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একটি স্বাধীন মধ্যবিত্ত শ্রেণি বের হয়ে আসতে শুরু করে। পরবর্তীতে তাদের উৎপাদিত বাণিজ্যিক পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং তারা কিছু বাড়তি আয় করতে শুরু করেন। বাড়তি এই আয় সন্তানদের শিক্ষাখাতে ব্যয় হতে থাকল। এই প্রক্রিয়ায় ধনিক কৃষকদের উদ্বৃত পুঁজি শিক্ষাখাতে ব্যবহৃত হওয়ায় তাদের মধ্য থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ হতে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, তিনটি আন্তঃসম্পর্কীয় পদ্ধতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশে অবদান রেখেছিল :

(১) কোম্পানির স্থানীয় দালালদের মধ্যস্থতার কারণে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত;

(২) ইংরেজি-শেখা জনসাধারণের মধ্য থেকে প্রশাসনিক এবং সামাজিক অভিজাত শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি; এবং

(৩) ১৮৫৯ এবং ১৮৮৫ সালের আইনের মাধ্যমে জমির ওপর কৃষকদের মালিকানার অধিকার।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ উপরের পদ্ধতিগুলোকে আরও বেগবান করে। কোলকাতা কেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণির সন্তুষ্টির বাস্তব ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও এ কথা ঠিক যে, আংশিকভাবে হলেও পূর্ববাংলার অভিজাতরা কিছু আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষমতার সুবাতাস পেয়েছিলেন। ব্যবসার ও শিক্ষার সুযোগ হঠাৎ করেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাণিজ্যিক পণ্যের দাম, বিশেষ করে পাটের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। ছেলেমেয়েরা প্রথমে স্থানীয় শহরগুলোতে এবং পরে কোলকাতা ও ঢাকায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাওয়া শুরু করল। এই নতুন শিক্ষিত যুবকদের কেউ কেউ জড়িয়ে পড়েন রাজনীতিতে এবং অন্যরা প্রশাসনিক কাজসহ বিভিন্ন পেশাদারি কাজে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকারও পান। তা সত্ত্বেও তাদের একটি বড় অংশ উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে সাধারণভাবে জড়িয়ে পড়েন। এক সময় ব্রিটিশদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করা হয়। পূর্ববাংলার এই শিক্ষিত অভিজনদের বেশিরভাগই পাকিস্তান চেয়েছিলেন। বাহ্যত ধর্মীয় পরিচয় মুখ্য মনে হলেও পূর্ববাংলার কৃষক সন্তানেরা আসলে তাদের পরিবারের বস্তুগত উন্নতির চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েই পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। তারা আশা করেছিলেন, পাকিস্তান সৃষ্টি হলে তারা কিছুটা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতি করতে পারবেন। কিন্তু তারা শিগগিরই বুঝতে পারলেন, তাদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার বিকাশমান মধ্যবিত্তের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্পেস বা বিকাশের

জায়গা ছাড়তে মোটেও রাজি ছিল না। বরং উল্টো-প্রতিবাদী হলেই তাদের ওপর নেমে আসে নির্মম রাষ্ট্রীয় আঘাত। এ পরিস্থিতিতে বাঙালি মধ্যবিত্তের মনে দ্রুত ক্ষোভ জমতে থাকে। বাংলা ভাষার মর্যাদার ওপর আঘাত আসার কারণে বাঙালির আত্ম-আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা আরও বিস্তৃত ও শাণিত হয়। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, এ অঞ্চলে একটি নতুন জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলন শুরু হতে থাকে ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের পর থেকে। পাকিস্তানের প্রশাসন কৃষকশ্রেণিতে জন্ম নেয়া পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে চায়নি। এই প্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রথমে গণতন্ত্রের জন্য এবং পরবর্তীতে আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির মানসিকতা নিয়ে বিস্তৃত হয়। আর এভাবেই পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন শক্তিশালী একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিত সুদৃঢ় হতে থাকে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিভিন্ন উপাদান

মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগের মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিভিন্ন বর্গকে বোঝার জন্য আমরা নিচের ছক-১ দেখতে পারি। এই ছকে ১৯৬০ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণের পেশাগত অবস্থানের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অর্থনৈতিক ও পরিবহন ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনিক এলিট ছাড়া ২ কোটি ৬০ লাখ শ্রমশক্তির বেশিরভাগকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কোনো একটি বর্গে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রশাসনিক এলিটরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত নন। এদের বেশিরভাগই রাষ্ট্র অথবা পুঁজির পক্ষে কাজ করতেন। শোষণের মাধ্যম হিসেবে তাদের চিহ্নিত করা যায়। সুতরাং, তারা ধনিক শ্রেণির অন্তর্গত। পরিবহন সম্পৃক্ত এবং অন্য শ্রমিকরা মজুর শ্রেণির অন্তর্গত। আবার বর্গাচাষিদের বড় অংশ প্রলেতারিয়েতের অন্তর্গত। তাছাড়া ছাত্ররা মধ্যবিত্ত শ্রেণির সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাও ধারণ করে। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে হিসাবে না ধরলে মাত্র ৩৭ লাখ শ্রমশক্তি মধ্যবিত্ত হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হবে। এরা মোট শ্রমশক্তির ১৪.৩ শতাংশের মতো।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত কৃষকদের পরিচয় জানার জন্য আমরা Pakistan Census of Agriculture, 1960 এবং Master Survey of Agriculture in Bangladesh 1967 (সপ্তম মুদ্রণের সপ্তম সংস্করণ, ১৯৭২-এ বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত)-এর ওপর নজর দিতে পারি। এই দুই নিরীক্ষা মতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত কৃষকের সংখ্যা ২৩ লাখ ১৩ হাজার ৯৭০ এবং ২৪ লাখ ২৪ হাজার ২২৪। অন্যভাবে বলা যায়, এই আট বছরে এই শ্রেণির কৃষকদের বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৪৬ শতাংশ।

ছক ১ **১৯৬৯ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের শ্রমশক্তির পেশাগত মর্যাদা**

নং	পেশাভিত্তিক শ্রেণি	হাজারে	%
১.	বিশেষজ্ঞ/পেশাজীবী	৩৭৪	১.৪৩
২.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৪১	০.১৬
৩.	কেরানি	২১৩	০.৮১
৪.	দোকান-কর্মচারী	৯৩৪	৩.৫৭
৫.	চাকরিক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমজীবী	৩৮৬	১.৪৮
৬.	কৃষিজীবী	২০১১১	৭৬.৬৫
৭.	পরিবহন ও অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত শ্রমজীবী	২২৪৭	৮.৮৬
৮.	ছাত্র	১৫৭৪	৬.০২
৯.	অন্যান্য	২৬৪	১.১
	মোট	**২৬১৪৪**	**১০০.০০**

এখন ১৯৬৯ সালের মধ্যবিত্ত শ্রেণির শ্রমশক্তির বণ্টন সম্পর্কে জানার জন্য আমরা ছক ২ পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

ছক-২ অনুযায়ী ১৯৬৯ সালে শ্রমজীবী হিসেবে নিযুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের সংখ্যা ছিল ৮৫,৬২,১৪৪। ঐ বছরের জন্য এই সংখ্যাটি ছিল মোট শ্রমশক্তির ৩২.৭৫ শতাংশ।

ছক-২ **মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত শ্রমশক্তির বিভাজন (১৯৬৯)**

নং	পেশা	হাজারে	%
১.	কর্মচারী/কেরানি		
	ক. দোকান-কর্মচারী (নিবন্ধিত দোকান)	৩,১৮,৭৮৭	৩.৭২
	খ. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান	৭০,৯৭৪	০.৮৩
	গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪৮,৫৫২	০.৫৭
	ঘ. অফিসের কেরানি (সরকারি, আধা-সরকারি) এবং অন্যান্য	৩০,২৬৬	০.৩৫
২.	আইনজীবী ও চিকিৎসক (নিবন্ধিত)	১৪,২৩০	০.১৭
৩.	প্রকৌশলী ও অন্যান্য পেশাদারী (শিক্ষক বাদে)	২,৭৭,৪১৩	৩,২৪
৪.	প্রতিরক্ষা, পুলিশ এবং অন্যান্য সেবাদানকারী সংস্থায় নিয়োজিত কর্মী	৩,৪৫,১৫১	৪.০৩
৫.	স্ব-নিয়োজিত মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণি	৫৬,২৬,১৮৫	৬৫.৭১
৬.	ছাত্র (হাইস্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত)	১৮,৩০,৫৮৬	২১.৩৮
	মোট	**৮৫,৬২,১৪৪**	**১০০.০০**

উৎস : ছক ১ ও ২

১) মহিউদ্দিন আলমগীর এবং লডউইক জে.জে.বি. বারলেজ (১৯৭৪), *বাংলাদেশ : ন্যাশনাল ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার ১৯৪৯-৫০-১৯৬৯-৭০*, বিআইডিএস, পৃ. ১৭৫-৭৬।

২) বিবিএস (১৯৭২), *স্ট্যাটিসটিক্যাল ডাইজেস্ট অব বাংলাদেশ*, ১৯৭২, নং ৮, পৃ. ৩৩-৬২ এবং ২৩৫-৫২

৩) ইকনমিক রিসার্চ ব্যুরো (১৯৭১), *স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট অব বাংলাদেশ*, সোসাইটি এন্ড কমার্স পাবলিকেশন্স, কলকাতা, পৃ. ২৫-৩৯।

৪) বিবিএস (১৯৭৭), *বাংলাদেশের আদমশুমারি*, ১৯৭৪, ছক ৪২, পৃ. ৪১।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে কিছু উপশ্রেণিও ছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই (প্রায় ৭০ শতাংশ) ছিলেন স্বাবলম্বী গ্রামীণ কৃষক। এরা অন্যের জমিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন না। নিজেরা অন্যদের দিনমজুর হিসেবে নিয়োগও করতেন না। ছাত্ররা ছিল দ্বিতীয় বৃহৎ মধ্যবিত্ত উপশ্রেণি। তারাও পুজিঁপতি অথবা পেশাজীবী হওয়ার স্বপ্ন দেখত। উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকা সত্ত্বেও তারা পিতামাতা ছাড়া অন্যের ওপর নির্ভরশীলও ছিল না। এর পরের গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিটিতে লেখক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, দোকান-মালিক ও কর্মচারীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা বিভিন্ন ধরনের কাজ করলেও তাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তারা সবাই কমবেশি শ্রেণির অন্তর্গত ছিলেন। দোকান কর্মচারীদেরকে এই শ্রেণিতে, বিশেষ করে দোকান মালিকদের (অনিবন্ধিত) শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের আয়ের স্তর প্রায় সমান বলেই তা করেছি। মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে যখন আঘাত করা হয় তখন সেই সঙ্কটের মুহূর্তে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে সাড়া দেন। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতার কারণে এই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সুযোগগুলো সংখ্যায় বেশি ছিল না। এরাই ছিলেন ১৯৬৯ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রায় এক দশমাংশ।

কেরানি এবং অন্য কর্মচারীরা ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রায় ৪ শতাংশ। সংখ্যায় কম হলেও তাঁরা শহরাঞ্চলের অফিস ও কারখানাগুলোতে কাজ করতেন বলে যেকোনো আন্দোলনে তাদের সহজেই সংগঠিত করা যেত।

পক্ষান্তরে, নিবন্ধিত দোকান এবং ব্যবসাকেন্দ্রগুলোর কর্মচারীরা বরাবরই ঝুঁকির মধ্যে থাকতেন। মালিকদের মানসিকতা সম্বন্ধে তাঁদের সবসময় সতর্ক থাকতে হতো। তাঁদের যে বিপুলভাবে শোষণ করা হচ্ছে তা এ সময়টাতেই তাঁরা অনুভব করলেন। তাঁদের চাকরিদাতাদের নেতিবাচক মানসিকতার বিরুদ্ধে

তাঁরা অনেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তারাই নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশ হিসেবে আবির্ভূত হতে শুরু করলেন। এই রাজনৈতিক আন্দোলন প্রকাশ্যে যোগদানে সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ছিল। তাঁদের চাকরির এই শর্তে তাঁরা খুশি ছিলেন না। বেতন কাঠামো এবং আবাসন ও অন্যান্য সুবিধার দিক থেকে অসমতা তাঁদের প্রায়ই আন্দোলনে উৎসাহিত করত। যদিও তা সীমিত ছিল, তবুও কিছু রাজনৈতিক দল এই অসন্তোষকে দক্ষতার সাথে ঐ সময় কাজে লাগিয়েছিল। অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবী আকারে ক্ষুদ্র হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি সচেতন ছিলেন। তাঁরা সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্যের ধারা বুঝতে পারার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন। বিকাশমান বাঙালি জাতির বিবেক হিসেবে তাঁরা বিবেচিত হতেন এবং বৈষম্যের ভিত্তির গভীরতার কারণ অন্বেষণে তারা অজস্র অবদান রেখেছিলেন। তাঁরা শহরে বাস করতেন এবং বুদ্ধিজীবী সমাজের বড় অংশ ছিলেন। আর্থসামাজিক বৈষম্য এবং অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। বিশেষ করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের একাংশ পাকিস্তানের দুই অংশের মূলত দুই অর্থনীতির যে ধারণা তা জনসম্মুখে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাজ ও রাজনীতিতে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল। রেহমান সোবহান, নূরুল ইসলাম, মুশাররফ হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক, মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী ছাড়াও আরও অনেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

আইনজীবী এবং চিকিৎসকগণ সংখ্যায় মাত্র ১৪ হাজার হলেও মধ্যবিত্ত বিভিন্ন অংশ এবং জনসাধারণের ওপর তাঁদের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। তাঁদের

জনসাধারণের নিত্যদিনের প্রয়োজন মিটানো অব্যাহত রাখার স্বার্থেই অর্থনৈতিক তৎপরতার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের জনগণকে কঠোর শৃঙ্খলা পালন করতে হবে।

(–বঙ্গবন্ধু; সংবাদপত্রে বিবৃতি, ২০ মার্চ ১৯৭১)

কারও কারও ওপর মানুষের অগাধ বিশ্বাস ছিল। ভালো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল আইনজীবী চিকিৎসক ও ছোটখাটো সমাজসচেতন গোষ্ঠী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এঁরা আলোকিত মধ্যবিত্তের ধ্যানধারণাকে মূলধারার রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

অবশ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছাত্রেরা ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র এবং সর্বোপরি জাতীয় মুক্তির স্বপ্নের ব্যাপারে আবেগপ্রবণ। তারা গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চল থেকেই এসেছিল। তারা সবসময় তাদের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে থাকত। সুতরাং, চলমান রাজনৈতিক ধারা সম্পর্কে তাদের পরিষ্কার ধারণা ছিল। চাষি ও শ্রমিক উভয়ের কাছে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে এই ধারণা তাদের সাহায্য করেছিল। একইভাবে রাজনৈতিক দলের কর্মীদের তারাই আরও সচেতন করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে। কার্যত তারাই আলোকিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা

পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশে পাট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কাঁচা পাটের ৯২ শতাংশ পূর্ববাংলায় উৎপাদিত হতো। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। এ সময় থেকে কলকাতায় পাটকলের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

এই কলগুলোতে কাঁচা পাট জোগান দিতে একটি নতুন সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এদের ফড়িয়া বলে ডাকা হতো। উৎপত্তিগত দিক থেকে তারা বাংলার উদ্বৃত্ত কৃষক সম্প্রদায়ের অংশ এবং মধ্যস্বত্বভোগী। পূর্ববাংলার বেশিরভাগ কৃষকই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। তাই ফড়িয়াদেরও বেশিরভাগ ছিল ঐ সম্প্রদায়ের (রহমান ও আজাদ, ১৯৯০ : ৪৩)। অন্যভাবে বলা যায়, পাটের এই ব্যাপক চাহিদা শুধু সনাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্বৃত্ত কৃষক বৃদ্ধিতেই সহায়তা করেনি, বরং পাট ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীক শ্রেণির বৃদ্ধিতেও সহায়তা করেছে। পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির এরাও ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কলকাতাভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি পাট এবং পাট-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। কিছু মধ্যস্বত্বভোগী পাট ব্যবসায়ের সাথে জড়িত হয়ে কলকাতার পৌর-অভিজনদের দলে যোগ দেন। এক সময় কলকাতাভিত্তিক শক্তিশালী এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি ঔপনিবেশিক শাসকদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ঔপনিবেশিক শাসকেরা এর জবাবে ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতির সূচনা করে। এ কারণেই ১৯০৫ সালে বাংলার বিভক্তি ঘটে। নতুন প্রদেশের মূল রাজধানী হয় ঢাকা এবং চট্টগ্রামকে বিকল্প রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। পূর্ববাংলার

আইন প্রণয়ন কেন্দ্র ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং এ অঞ্চলের এলিটরা এই সুবিধা ভোগ করতে থাকে। অতঃপর এ অঞ্চলে অনেক নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক আদালতকে ঘিরে একদল আইনজীবীর উদ্ভব ঘটে। এভাবেই তাঁরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের স্বাদ পেতে শুরু করেন। কিন্তু ঐ সময় কলকাতাভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্রিটিশ রাজকে অবিরাম চাপ দিয়ে আসছিলেন বাংলাকে পুনরায় একত্রিত করার জন্য। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রশাসন এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। ১৯১১ সালে বাংলা আবার এক হয়। এই অল্প সময়ের জন্য পাওয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, তা যত সীমিতই হোক না কেন, পূর্ববাংলার সাধারণ ও অভিজন উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই আশীর্বাদ বলে বিবেচিত হয়েছিল। তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান। এ কারণে বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে আখ্যা দেওয়ার নতুন সুযোগ তারা পেয়ে গেলেন। পূর্ববাংলার ঢাকা ও চট্টগ্রামকে ঘিরে অভিজনেরা, যাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান, মনে করলেন যে হিন্দু-প্রভাবিত কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাঁদের প্রতি আন্তরিক নন। পরিসংখ্যানও তাদের এই অসন্তুষ্টির পক্ষে যায়। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ১৯০৭ এবং ১৯১২ সালের মধ্যে শিক্ষিত জনসংখ্যার পরিমাণ ৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারা বাংলায় ঐ সময় শিক্ষিত জনসংখ্যা বেড়েছিল ৩৭ শতাংশ। এভাবে পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯০৫ সালের পর কর্মসংস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলা এক হবার পর সেখানে একটি ভাটার টান লাগে। সাধারণ চাকরির ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের প্রশ্ন শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ব্যবসা করার জন্য যে পুঁজির প্রয়োজন তা জোগান দেওয়ার মতো অতিরিক্ত অর্থ এই অঞ্চলে মধ্যবিত্তের কারও ছিল না। সরকারি চাকরির জন্য মুসলমান রাজনৈতিক নেতারা তৎপরতা চালান, যাতে এই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবকরা প্রয়োজনে যোগ্যতা শিথিল করে হলেও তা লাভ করতে পারে (রহমান ও আজাদ, ১৯৯০ : ৬৮)। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই দাবির পক্ষে বিখ্যাত 'বাংলার চুক্তি'র মাধ্যমে তাঁর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে মুসলমানদের অভূতপূর্ব সমর্থন নিয়ে তাঁর স্বরাজ পার্টি জয়যুক্ত হয়। তিনি বাংলা চুক্তিতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করেন এবং মুসলমানরা তাঁকে সেজন্যই বিশ্বাস করতেন। সুতরাং, তাঁরা তাঁকে নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯২৫ সালে তিনি মারা গেলেন এবং স্বরাজ পার্টির ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র দ্রুতই হারিয়ে গেল। আর এভাবেই মধ্যবিত্ত মুসলমানরা তাঁদের হিন্দু বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। তখন পর্যন্ত পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ বহিরাগত দল ছিল।

অবাঙালি জমিদারদের প্রভাবে এটি চলত। কিন্তু জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে রাজি হওয়ার সাথে সাথেই মুসলিম লীগ পূর্ববাংলার বিপুল সমর্থন পেলেন। কৃষক প্রজা পার্টির নেতা এ কে ফজলুল হক মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতায় পরিণত হলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর লাহোর প্রস্তাব এক নতুন মাত্রা যোগ করল। পূর্ববাংলার কৃষকরা জমিদারদের (বেশিরভাগ হিন্দু) শোষণে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাই এ অঞ্চলে মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা সর্বান্তকরণে চেয়েছিলেন যাতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে জমিদারি প্রথাটির উচ্ছেদ হবে। পাশাপাশি তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন একটি সৎ এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের যাতে তাঁরা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আগের চেয়ে ভালো থাকতে পারবেন, এসব ক্ষেত্রে আরও বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবেন।

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। জমিদারি প্রথা সত্যিকার অর্থে তখনো লোপ পায়নি। এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ-আইনে দুর্বলতা ছিল। বাস্তবায়ন ছিল আরও দুর্বল। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রশাসন ঔপনিবেশিক শাসনের চেয়ে কম নির্মম কিছু ছিল না। পূর্ব-পাকিস্তানের শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সদস্যরা তাঁদের উন্নয়নের ধারা নিয়ে তাই দারুণ অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাদের আর্থসামাজিক বিকাশের পথ সংকুচিত হতে শুরু করেছিল। খাজা নাজিমউদ্দিন বরাবরই জমিদারদের পক্ষে ছিলেন। আর তিনিই হলেন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। তিনি কখনোই পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইচ্ছার মর্যাদা দেননি। বরং সারা জীবনই অবাঙালি আমলা, প্রকৌশলী ও শিল্পপতিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে রইলেন। পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধনী হিন্দুরা দলে দলে ভারতে চলে গেলেন। ফলে ব্যবসায় ও প্রশাসনে শূন্যতা দেখা দিল (করিম, ১৯৮৪ : ২৪১)। যেসব মুসলমানের হাতে উদ্বৃত্ত পুঁজি ছিল তাঁরা দেশান্তরী হিন্দুদের সম্পত্তি কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁরা ব্যবসা কি শিল্পেও তাঁদের পুঁজি খাটালেন না।

শিগ্‌গিরই এই শূন্যস্থান অবাঙালিদের দ্বারা পূরণ হতে লাগল। তাঁরা পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন (রহমান ও আজাদ, ১৯৯০; আলী, ১৯৮৫ : ৪৫)। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় এই পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির সদস্যরা শিগ্‌গিরই বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা অবাঙালি আমলা, ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের দ্বারা অবরুদ্ধ। তাঁদের আশা পূরণের কারণে রাষ্ট্রের সমর্থনের ব্যাপারে তাঁরা বিশ্বাস হারালেন। পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির হতাশার কারণ না খুঁজে শাসক-সম্প্রদায় বরং বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করল। ফলে বাঙালি অভিজনদের হতাশা আরও তীব্র হতে

লাগল। এই হতাশা দ্রুতই পূর্ববাংলার গ্রামে-গঞ্জেও ছড়াতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্র বহুমাত্রিক বাঙালি সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে তাদের ইচ্ছেমতো তথাকথিত 'ধর্মীয়' সংস্কৃতিকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করল। সুতরাং, তারা শুরুতেই বাংলা ভাষার পবিত্রতায় আঘাত হানল। তৎকালীন পাকিস্তানের বেশিরভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলার জায়গায় জোর করে তারা উর্দুকে রাষ্টভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। এই অসৎ উদ্দেশ্য দ্রুতই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। ভাষা-আন্দোলন সেই অর্থে বাঙালি মধ্যবিত্তের ঐ চ্যালেঞ্জেরই ফসল।

আগেই বলেছি, পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির বেশিরভাগ মানুষ কৃষক সম্প্রদায় থেকে এসেছিলেন। পাকিস্তান-আন্দোলনের তাঁরা সক্রিয় ভূমিকাও রেখেছিলেন। যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন তাই তাঁরা মনে করেছিলেন, রাষ্ট্র তাঁদের আবেগ-অনুভূতির মূল্য দিয়ে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবে। কিন্তু বাস্তবে তারা বরং উর্দুকে সেই মর্যাদা দিল। বাংলাকে অপমান করল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশ ছাত্ররা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বেও ছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আগত তাঁর সহযোগী নেতৃবৃন্দ। বাংলা ভাষার মর্যাদার লড়াইয়ে ছাত্রদের রক্ত ঝরল। তাঁরা সরাসরি সরকারের রাষ্ট্রভাষা-নীতির বিপক্ষে চলে গেলেন। তাঁদের এই আন্দোলনে অংশ নেয়ার পেছনে যেসব কারণ কাজ করেছে সেগুলোর প্রধান দুটো কারণ হলো:

এক. বাংলা অপমানিত হওয়ার কারণে তারা মনে করল পাকিস্তান রাষ্ট্র বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও গর্বের বিরুদ্ধে। যারা মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ তাদের ভাষার প্রতি এই অবিচার বুদ্ধিজীবী মহলে গভীর

আপনারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের উপযোগী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুন। আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে, উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। দেশের সম্পদ বাড়িয়ে আমরা জীবনযাত্রার প্রকৃত মান উন্নয়ন করতে সফল হবো। আজকের এই মে দিবসে আসুন আমরা এই শপথ গ্রহণ করি যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য আমরা অবিরাম সংগ্রাম করে যাবো। এ দেশের চাষী, তাঁতী, কামার, কুমার, শ্রমিক ও মজলুম জনতার জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা কাজ করব।

(—বঙ্গবন্ধ, বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১ মে, ১৯৭২)

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সেই প্রতিক্রিয়া এক সময় সাধারণ মানুষের মনেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

দুই. তারা এটা উপলব্ধি করতে পারল যে, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে সরকারি ও আধাসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশের সুযোগ সংকুচিত হবে। তাদের অর্থনৈতিক সুবিধেগুলো হারিয়ে যাবে। তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হয়ে যাবে। তাদের সংস্কৃতি বিকশিত হবে না।

ভাষা-আন্দোলনের শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যাপক অংশগ্রহণ ঐ শ্রেণির শিক্ষিত অংশের নেতৃত্ব বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করে। মাতৃভাষার পবিত্রতা রক্ষার জন্য সর্বসাধারণের দাবির মাধ্যমে বাঙালি জাতির পৃথক আশা-আকাঙ্ক্ষার বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি দক্ষতার সঙ্গেই করতে পেরেছিলেন নেতৃত্বের অপেক্ষাকৃত বেশি আলোকিত অংশটি। পাকিস্তান রাষ্ট্র যে সংখ্যাগুরু বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে মোটেই আন্তরিক নয় ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। সেই চেতনারই প্রতিফলন ঘটে পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে। ঐ নির্বাচনে বাঙালি জাতিসত্তায় বিশ্বাসী যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়ী হয়।

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লিখিত ২১ দফা আসলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিচ্ছবি। এই ছবিটি আরও পরিষ্কার হয় যখন এই দাবিটি শ্রমশক্তির বিভিন্ন উপদলে বণ্টন করে দেখা হয়। আমাদের কাছে ১৯৫৪ সালের শ্রমশক্তির তথ্য না থাকার কারণে আমরা ১৯৬১ সালের উপাত্ত ব্যবহার করেছি।

১৯৬১ সালে মাত্র ৭ শতাংশ শ্রমশক্তি অকৃষিজীবী মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণির অন্তর্গত ছিল। শ্রমশক্তির প্রায় ২৯ শতাংশ ছিল মধ্যবিত্ত কৃষক। তাদের প্রায় সব আকাঙ্ক্ষাই এই ইশতেহারে উল্লিখিত বা প্রতিপলিত হয়েছিল। ২১ দফায় অন্তর্ভুক্ত আর্থসামাজিক দাবিসমূহের ২৪ শতাংশ ছিল এদের আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকে তৈরি। মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৩৬ শতাংশ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত। কিন্তু ২১ দফায় প্রায় ৬৮ শতাংশ আর্থসামাজিক দাবি-দাওয়াই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে। এটা অভাবিত ছিল না। কার্যত যুক্তফ্রন্ট ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক জোট। সুতরাং, নির্বাচনী ইশতেহারে তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। সত্যিকার অর্থে পঞ্চাশের দশকে গোড়ার দিকে শহুরে ও গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সংযোগ ছিল খুবই গভীর। রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন মূলত শহুরে মধ্যবিত্ত অভিজাত শ্রেণির প্রথম দিককার প্রজন্ম। সুতরাং, কৃষকদের আর্থসামাজিক দাবি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক নেতাদেরও প্রাণের দাবি ছিল।

ছক-৩ থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, বর্গাচাষি, কৃষিমজুর ও শিল্পশ্রমিক (যাদের মোট পরিমাণ প্রায় ৬০ শতাংশ) ছিলেন মোট শ্রমশক্তির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। কিন্তু তাদের দাবিদাওয়ার মাত্র ১৯ শতাংশ ২১ দফায় প্রতিফলিত হয়। তখন দেশে প্রায় ৬০,০০০ কৃষি শ্রমিক ছিলেন। তাদের নামেমাত্র একটি দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অন্যদিকে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি যারা সংখ্যায় কৃষিশ্রমিকদের অর্ধেকেরও কম, তাদের জন্য প্রায় ২৮টি দাবি উত্থাপিত হয়েছে।

ছক-৩ **১৯৬৪-৬৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির আহূত ধর্মঘট**

ধর্মঘট আহ্বানকারী শ্রেণি/দল	ধর্মঘটের সংখ্যা		%	
ছাত্র	১১৩	২৭৯	২৬.৫৩	৬৫.৪৯
কর্মজীবী (অফিস/দোকান)	১০৬		২৪.৮৮	
পেশাজীবী শ্রেণি	৬০		১৪.০৮	
শিল্পশ্রমিক	১০৫		২৪.৬৫	
অন্যান্য শ্রমিক	৪২		৯.৮৬	
মোট	**৪২৬**		**১০০.০০**	

উৎস : আজাদ, ১৯৮৯।

মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দরুণই যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়। যুক্তফ্রন্ট ২৯১টি আসন লাভ করে এবং শাসকদল মুসলিম লীগকে ১০টি আসন নিয়েই খুশি থাকতে হয় (সেন, ১৯৮৬ : ১২৪)। কিন্তু ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের বিজয় বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের চক্রান্ত এবং পূর্ববাংলার অভিজন নেতাদের একতার অভাবে পূর্ববাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি। মূলত, কেন্দ্রীয় আমলারা পূর্ববাংলায় সংসদীয় গণতন্ত্রকে দুরূহ করে তোলেন এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। প্রথমদিকে তারা পরোক্ষভাবে প্রতিরক্ষা এবং অর্থনীতিকে প্রভাবিত করলেও ১৯৫৮ সালের পর তারা আনুষ্ঠানিকভাবেই তা করতে শুরু করে।

সামরিক শাসনের প্রথম পাঁচ বছর সামরিক শাসক আইয়ুব খান প্রচণ্ড রূঢ় ছিলেন এবং কোনো সংগঠনের প্রতিবাদকে মাথা চাড়া দিতে দেননি। কিন্তু ১৯৬২ সালে ছাত্ররা খুবই সবল একটি শিক্ষা-আন্দোলনের সূচনা করল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্যান্য অংশও আন্দোলনের উদ্যোগকে সমর্থন দিতে শুরু করল। পাকিস্তান রাষ্ট্রও প্রচণ্ডভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। ১৯৬৪ সালে রাষ্ট্র

নিজেই উদ্যোগী হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দিল, যা প্রকারান্তরে বাঙালির জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল। এই ঘটনা তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল। এরপর জনসাধারণ গণতান্ত্রিক এবং আর্থসামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তাদের দুরবস্থা ও বিপদ আরও ভালোভাবে বুঝতে পারলেন।

ষাটের দশকের শুরুর দিককার আন্দোলনের প্রধান সারিতে ছিলেন শ্রমিক, ছাত্র এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। ১৯৬৯-এ আন্দোলন এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে, আইয়ুব খানকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হলো। কিন্তু সামরিক শাসন তখনো বহাল ছিল। তারপর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করলেন। আজাদ (১৯৯৩)-এর গবেষণা মতে, ১৯৬৪ থেকে ৬৯-এর মধ্যে প্রায় ৪২৬টি ধর্মঘট ছিল ছাত্রদের নেতৃত্বে। তার মানে আন্দোলনকারীদের মধ্যে তারাই ছিল প্রভাবশালী।

অফিস-কর্মচারী এবং অন্য কর্মজীবীরা ডেকেছিলেন ২৭ শতাংশ এবং সনাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি ডেকেছেন মাত্র ১৪ শতাংশ ধর্মঘট। অন্যভাবে বললে, সনাতন এবং নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি সেই সময় একত্রে প্রায় ৬৬ শতাংশ ধর্মঘট ডেকেছিলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রশাসনের বিরুদ্ধে আহূত ধর্মঘট বাস্তবায়নে মধ্যবিত্ত শ্রেণিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

ধর্মঘট ছাড়াও প্রতিরোধের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই প্রতিরোধে যোগ দেন। দৈনিক আজাদের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে এই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে (ছক-৪ দেখুন)।

ছক-৪ **দৈনিক আজাদে প্রকাশিত ধর্মঘটের সংবাদ, ১৯৬৪-৬৯ কালপর্ব**

ধর্মঘট আহ্বানকারী শ্রেণি/দল	প্রতিবেদন/সংবাদ এর সংখ্যা		%	
ছাত্র	১১৩	১৭৫	৩৭.০৬	৫৭.৩৮
কর্মজীবী (অফিস/দোকান)	১৭		৫.৫৭	
শিক্ষক ও সাংবাদিক	৪৫		১৪.৭৫	
কৃষক	৪৩		১৪.১০	
শ্রমিক	৭৪		২৪.২৬	
শিল্পপতি	১৩		৪.২৬	
মোট	৩০৫		১০০.০০	

উৎস : আজাদ, ১৯৮৯।

সরকার-বিরোধী বিক্ষোভের ৩০৫টি খবর এই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭ শতাংশ বিক্ষোভ ছাত্ররা সংগঠিত করেছিল। সাংবাদিক এবং শিক্ষকদের প্রতিরোধের হার ছিল ১৫ শতাংশ। কৃষকেরাও নিশ্চুপ ছিলেন না (১৪ শতাংশ) চাকরিজীবীরাও (৫.৫ শতাংশ) তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু করেছিলেন। এই দৈনিকে প্রতিরোধ সম্পর্কিত ৫৭ শতাংশ সংবাদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংযোগ ছিল। বাঙালি শিল্পপতিরাও নিশ্চুপ ছিলেন না (৪ শতাংশ)।

অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, পত্রিকাটি আইয়ুব খানের একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন উপদলের সকল প্রতিরোধের খবর প্রকাশ করতে পারেনি। একটি সাধারণ সমীক্ষায় (১৬২ জন উত্তরদাতা) দেখা গেছে, বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের ৪০ শতাংশ ছিলেন শহুরে এবং বাকি ৬০ শতাংশ ছিলেন গ্রামের অধিবাসী (আজাদ, ১৯৮৯)। এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে তারা ভৌগোলিকভাবে ১৭টি জেলার মধ্যে ১৫টি জেলা হতে এসেছিলেন। সমীক্ষাটি চারটি বিভাগীয় এবং কিছু জেলা সদরের প্রধান কার্যালয়ে চালান হয়েছিল। উত্তরদাতাদের ১৭ শতাংশ ছিলেন ভূমিহীন ৪০ শতাংশ ছিলেন উদ্বৃত্ত কৃষক যাদের জমির পরিমাণ ৮ একরের বেশি (গড়ে জমির পরিমাণ ছিল ৩১ একর)। ধনী ভূমিমালিক হওয়া সত্ত্বেও তারা সরাসরি কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পেশাগত দিক থেকে তাঁরা ছিলেন ছাত্র, অফিস-কর্মজীবী, দোকান-মালিক ইত্যাদি। বাকি ৪৩ শতাংশ ছিলেন মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের। ৮৩ শতাংশের পারিবারিক আয়ের উৎস ছিল আংশিক অথবা পুরোপুরি কৃষিনির্ভর। তাঁদের বাৎসরিক গড় আয় ছিল ১৬ হাজার ৩১৬ টাকা। মাত্র ১৩ শতাংশ বলেছিলেন তাঁদের বাৎসরিক আয় ২০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য ২৪ শতাংশের জন্য এই পরিমাণ ১০ হাজার টাকারও কম।

শ্রমিকরা সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু এটা করতে হলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিকরা যে ভূমিকা পালন করেছেন, সে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শিল্পোৎপাদনের সুফল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষী ভাইদের ভোগ করতে দিতে হবে। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল দাবি-দাওয়া পেশের মনোভাব ত্যাগ করা দরকার। সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা সম্ভব নয়।

(–বঙ্গবন্ধু, বেতার ও টেলিভিশনের জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ ১ মে, ১৯৭২।)

আয়ের এই চিত্র থেকে বোঝা যায়, আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণকারীই মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত ছিলেন। উত্তরদাতাদের ৯১ শতাংশ মনে করেন, বিভিন্ন পেশার লোকের মধ্যে ছাত্ররাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। ঊনসত্তরের বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ছাত্ররাই সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী অংশ ছিল, সে ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু আর কোন কোন গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সে প্রশ্নে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ৪৬ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, শ্রমিকরা এবং ৩৬ শতাংশের মতে বুদ্ধিজীবীরা বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী এবং ৩ শতাংশ বুদ্ধিজীবী ছিলেন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবী, দোকানদার এবং বস্তিবাসীদেরও আন্দোলনে উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল।

এ কথা ঠিক যে, ১৯৬০-এর আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিশাল অবদান ছিল এবং তাঁদের এই অংশগ্রহণ বাঙালিদের মনে জাতীয়তাবাদী ভাবনা স্পষ্টভাবে জাগিয়ে তোলে। ১৬২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭৫ শতাংশ বলেন, তাঁরা আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় সমান সংখ্যক (৬৪ শতাংশ) মনে করেন, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববাংলার অর্থনীতির ধ্বংস বা অবদমন করছিল এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও বিপন্ন হচ্ছিল বলে তারা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

উত্তরদাতাদের অনেকেই (৬০ শতাংশ) বলতে চেয়েছেন যে, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল মুক্তিযুদ্ধের পূর্বলক্ষণ। কার্যত ৯৬ শতাংশ উত্তরদাতাই বলেছেন, তাঁরা ১৯৬৯-এর আন্দোলনের সময় স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যাঁরা এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, অবশ্য তাঁদের অনেকেই রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুতরাং, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করে না। তা সত্ত্বেও তাদের এই মতামত কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্কও ছিল গভীর। তখনো তাঁদের অনেকেরই পিতামাতাও ছিলেন গ্রামে।

এটা নির্বিবাদে বলা চলে, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে সাধারণ মানুষও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কাজেই পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া পূর্ববাংলার রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান যে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল সে কথাটি অনুমান করা যায়। ইতিহাসের ধারাও ঠিক সেই পথেই ধাবিত হয়। ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং পরবর্তীতে ছাত্রদের নেতৃত্বে উত্থাপিত ১১ দফায় পরিষ্কারভাবেই জাতীয় দাবির পাশাপাশি গণমানুষের আর্থসামাজিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

বাম রাজনীতিকরা গণমানুষের এই আকাঙ্ক্ষাকে পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও আওয়ামী লীগ গঠিত কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসে। দলের নেতারা, বিশেষ করে প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধু সফলভাবেই নির্বাচনের প্রাক্কালে দেওয়া বক্তৃতা-বিবৃতিতে গণমানুষের এই আকাঙ্ক্ষাকে স্পষ্ট করে তোলেন। প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয়করণ, ২৫ বিঘার নিচে জমির খাজনা মওকুফ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পাটশিল্পের বিকাশ ও রপ্তানির হিস্যা, কৃষকের প্রতিশ্রুতি তাঁরা ঐ সময় দেশবাসীকে দিয়েছিলেন যার ফলে পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগের পক্ষে এক গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। মধ্যবিত্ত, শ্রমিকশ্রেণি, প্রান্তিক চাষি, ছাত্র অর্থাৎ পুরো বাঙালি জাতিই তাই ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগের জয়যুক্ত করে। কিন্তু নির্বাচনে জিতেও তাঁরা তাঁদের ন্যায্য ক্ষমতা লাভে বঞ্চিত হওয়ার কারণে অসহযোগ আন্দোলন (রহমান, ১৯৯৮) এবং অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। খুবই দক্ষতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব সকল জনগণের সমন্বিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে রাজনৈতিক রূপ দিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন পেশার মানুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সে কথাই প্রমাণ করে। আর সে কারণেই তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে মুক্তিযুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষের অবদান অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছিলেন। আশা প্রকাশ করেছিলেন : 'যারা আজ রক্ত দিয়ে উর্বর করছে বাংলাদেশের মাটি, যেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মানুষ, তাঁদের রক্ত আর ঘামে ভেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা' (*বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র* ৩য় খণ্ড, ১৯৮২. পৃ. ১৫)।

সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচারের সেই প্রত্যয়ই ছিল একাত্তরে সকল বাঙালির এক হওয়ার মূল অনুপ্রেরণা। আর বাঙালির এই মানসগঠনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ ভূমিকার বিবরণ আমরা আগের অধ্যায়েই লক্ষ করেছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

মাটি থেকে উঠে আসা মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিধিদের নেতৃত্বে যে অরাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটে তারই পরিচালনায় বায়ান্ন-একাত্তর পর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধে। পুরো ষাটের দশক ছিল এই জাতীয়তাবাদের বিকাশের শ্রেষ্ঠসময়। ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে বের হয়ে আসা তরুণ নেতৃত্বকে আরও সুসংহত করে। ছাত্র-জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করে সুদৃঢ় এক গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে বন্দি শেখ মুজিবকে মুক্ত করে বঙ্গবন্ধুতে রূপান্তরিত করে এই নেতৃত্ব। একই সঙ্গে পুরোনো বাঙালি জাতীয়তাবাদী

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই তরুণ নেতৃত্ব সারা পূর্ববাংলায় এমন এক গণজোয়ার তৈরি করে যার ফলে সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে অসুবিধা হয়নি। আর এই গণজোয়ারের পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করেছেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু তা পেয়েও বাঙালি নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তানের শাসনভার হাতে নিতে সক্ষম হননি। পাকিস্তানের সামরিক-অসামরিক আমলা, রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মহল বাঙালি নেতৃত্বের এই উত্থানকে মেনে নিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত, নির্বাচনে জয়ী হওয়া, গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, মধ্যবিত্ত নেতৃত্বকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিতে হলো। একাত্তরের সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে বাঙালির দীর্ঘদিনের আরাধ্য স্বাধীন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক আবির্ভাব ইতিহাসের এক বড়ো বিস্ময়। ২৬ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হাতে বন্দি হয়েও ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নিয়ন্ত্রক। তাঁর নামেই চলেছে মুক্তিযুদ্ধ। তিনিই ছিলেন বাঙালির শৌর্য ও ঐক্যের উৎস। পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যুদ্ধে বিজয়ী বাঙালি জাতির আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব ফের হাতে তুলে নিলেন বঙ্গবন্ধু। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পরীক্ষিত সহকর্মীবৃন্দ। স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ নেতৃত্বের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনার সুযোগ এই প্রবন্ধে নেই, তবে বঙ্গবন্ধুকে বোঝার জন্য বাঙালি মধ্যবিত্তের এবং বাংলাদেশের উদ্ভবের প্রক্রিয়ায় এই শ্রেণীর অবিস্মরণীয় অবদান চিহ্নিত করার এই প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। এ কথা ঠিক, সুশিক্ষা ও শুদ্ধ সংস্কৃতির সুবাতাস দিয়ে এ শ্রেণির কাঙ্ক্ষিত বিকাশ আমরা নিশ্চিত করতে পারি-নি। আর তা পারিনি বলেই বাঙালি আজও তার সবচেয়ে গর্বের ধন বাংলাদেশের আরেক নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতীয় জীবনের নিরন্তর সঙ্গী করে তুলতে পারেনি। তাঁকে আমরা আজো আমাদের বোধের অংশ করে তুলতে পারিনি। তা যদি পারতাম তাহলে ঐতিহাসিক ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়ককে জাতীয়ভাবেই করতাম ঐতিহাসিক স্মারক। কেননা এখান থেকেই তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব পরিচালনা করেছেন। এখানেই তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন। সশস্ত্র একদল নির্মম গোষ্ঠীর আক্রমণের মুখে নিরস্ত্র বঙ্গবন্ধু পিঠে নয়, বুকে গুলি খেয়েছেন। বাংলাদেশকে প্রাণের চেয়ে ভালোবেসেই তিনি এই বীরত্বের পথটি বেছে নিয়েছিলেন। এই অবিস্মরণীয় জাতীয় বীরকে আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা দেখাতে না পারলেও ইতিহাসের রথযাত্রা কিন্তু থেমে নেই। আর সেই রথযাত্রার অগ্রভাগেই রয়েছেন তিনি। ইতিহাস সব মনে রাখে।

মনে যে রাখে তারই অনন্য প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েক বছর পূর্বে। বিপন্ন এই বিশ্বের বিষণ্ন এক সময় হঠাৎ করেই বাঙালি জাতি পেয়েছিল নববর্ষের চমৎকার এক উপহার। দুঃখে, অপমানে, আঘাতে জর্জরিত লক্ষ কোটি বাঙালি তাই

১৪১১ সালের পয়লা বৈশাখটি উদ্‌যাপন করেছেন নির্মল আনন্দে। পথে-ঘাটে ছিল বিজয়োল্লাস। মানুষের মুখে ছিল তৃপ্তির হাসি। ইতিহাসবিকৃতির চরম দুঃসময়েও সেদিন বয়েছিল সত্যের ঝরনাধারা। ওই দিন ভোরবেলা বিবিসি বাংলা বিভাগ থেকে তাদের সারা বিশ্বের শ্রোতাদের ওপর পরিচালিত এক জরিপের ফলাফলের আলোকে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। সেদিন আমি ঢাকায় ছিলাম না। দেশবাসীর সঙ্গে এ আনন্দ তাই আমি ভাগ করে নিতে পারিনি। ছিলাম বিদেশে। কিন্তু বাংলাদেশ এখন আর ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের মধ্যেই সীমিত নয়। সারা বিশ্বেই আজ বাঙালির বসবাস। বিশ্বজুড়েই তাই রয়েছে টুকরো টুকরো বাংলাদেশ। সেই কারণেই পয়লা বৈশাখ সন্ধেবেলা এক অনাবাসী বাঙালির ঘরে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েই জানতে পারলাম এই সুসংবাদ। মনটা আনন্দে ভরে গেল। সত্যের এই জয়ের কথা শুনে চোখ ভরে গেল আনন্দের অশ্রুকণায়। এই বাড়িরই ছোট্ট এক শিশুর কাছ থেকে জানলাম বাঙালির নববর্ষে বিবিসি ওয়ার্ল্ডে দেখা গেছে সমুন্নত এক বাংলাদেশকে। আসলে দেখা গেছে বঙ্গবন্ধুর মুখচ্ছবি। শোনা গেছে তাঁর বজ্রকণ্ঠ। বাচ্চাটি বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধুকে তাই আলাদা করতে পারেনি। আমি অবাক হইনি। তেমনটিই তো হওয়ার কথা। আরেকবার, সুদূর আফ্রিকার এক দেশের গ্রামাঞ্চলে এক বিদেশির সঙ্গে পরিচিত হতেই বলে উঠলেন 'ও, তুমি শেখ মুজিবের দেশ থেকে এসেছ!' তাঁদের কাছে বাংলাদেশ মানেই শেখ মুজিব। এমনটি আরও বহু দেশে বহু স্থানে ঘটেছে। আমরা ভুলে গেলেও তারা ভুলে যাননি যে, বাংলাদেশ আর শেখ মুজিবের ভেতর কোনো পার্থক্য টানা যায় না। আর সে কারণেই বিবিসির শ্রোতারা তাঁকে তাঁর নিকটতম শ্রেষ্ঠ বাঙালির চেয়ে দ্বিগুণ ভোটে শ্রেষ্ঠতম বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। তিনিও এক মহত্তম

ভিক্ষুক জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক, এবং সেই জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শৃঙ্খলা দেশের মধ্যে আনতে হবে।

(—বঙ্গবন্ধু; জাতীয় সংসদ, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫।)

বাঙালি। তিনিও আমাদের অস্তিত্বের অংশ। তবু শ্রোতারা শেখ মুজিবকেই বেছে নিয়েছেন শ্রেষ্ঠতম আসনটি দেবার জন্য। আমি নিজেও দীর্ঘদিন বিবিসি লন্ডনস্থ বুশ হাউজে বাংলা বিভাগের হয়ে নানান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। আমি জানি কতটা নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে তাঁরা কাজ করেন। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচনের সময় তারা যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন এবং সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন সে বিষয়ে আমার দৃঢ় আস্থা রয়েছে। এ নিয়ে কূটতর্কের অবকাশ রয়েছে খুবই সামান্য। ক্ষুদ্র মনের কতিপয় মানুষ ছাড়া, সকল বাঙালিই এমন একটি শুভ উদ্যোগের জন্য বিবিসির কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। প্রতিদিনের অবহেলা, অপমান ও কুতর্কের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে খাটো করার কাজে যে কতিপয় নষ্ট মানুষ লিপ্ত ছিল, তাদের প্রতি যথার্থ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে বিবিসির এই অনুষ্ঠান। অবশ্য, বাঙালির সংগ্রাম, বিশেষ করে অমর একাত্তরের সঙ্গে রয়েছে বিবিসির নাড়ির টান। তাই তাদের পক্ষেই সম্ভব ছিল এমন একটি মহৎ উদ্যোগ হাতে নেয়া। বিবিসির শ্রোতারা কেন তাঁকেই নির্বাচন করলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে এ প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় বলা চলে যে, তিনিই আমাদের উপহার দিয়েছেন বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। তাঁর কারণেই আজ আমরা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক। তিনি এবং বাংলাদেশ তাই এক ও অভিন্ন সত্তা।

যুগে যুগে আমরা বাঙালি এমন একজন মানুষের সন্ধান করেছিলাম যিনি আমাদের সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হবেন। তিনিই হবেন আমাদের সমাজের প্রতিচ্ছবি। তাঁকে অবলম্বন করেই আমরা আমাদের 'স্বদেশকে উপলব্ধি' করব, ভক্তি করব, গর্ব করব ও স্বপ্ন দেখব। তাঁর সঙ্গে যোগ রাখলেই সমাজের প্রত্যেকের সঙ্গে যোগ রাখা যাবে। তিনিই হবেন আমাদের ঐক্যের এবং অহংকারের প্রতীক। তিনি সর্বক্ষণ আমাদের সমাজকে জাগ্রত করবেন এবং এক রাখবেন। তাঁকে ঘিরেই স্বদেশের উন্নয়ন তথা সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ঘুরপাক খেতে থাকবে। একটি বিশেষ স্থানে আত্মশক্তি অনুভব করার জন্য আমরা বারবার তাঁকেই খুঁজে নেব। তাঁকে আশ্রয় করেই আমরা আমাদের সমাজের হৃদয়কে চিহ্নিত করতে সক্ষম হব। তাঁকে সবাই মানবেন। সবাই সম্মান করবেন। তিনিও সবার স্বপ্ন নিজের মধ্যে ধারণ করবেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই স্বদেশি সমাজ ধীরে ধীরে একটা জাতি হিসেবে দানা বাঁধবে। অতীতের সকল অর্জন, বীরত্ব, মহত্ত্ব তিনি নিজের অন্তরে ধারণ করবেন এবং একটি গর্বিত জাতির উত্থানের প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করবেন। দিনশেষে তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির জন্ম দেবেন। এই জাতির ধ্যান, জ্ঞান ও মান এবং তিনি একসময় একাকার হয়ে যাবেন। সমাজের নানা স্থানে সঞ্চিত শক্তিকে একত্রিত করে তিনি যেমন স্বজাতিকে বড় করবেন, তেমনি আবার স্বদেশের সকলে মিলে তাঁকেও বড় করবে। সমাজের সর্বোচ্চ সম্মানে তাঁকে ভূষিত করবে। তিনিও নিজের

আরাম-আয়েশ বাদ দিয়ে পুরো স্বদেশকে মাথা তুলে দাঁড়াতে সকল স্বদেশবাসীকে সেবা ও সাহস প্রদান করতে নিজেকে তিলে তিলে প্রস্তুত করবেন। সর্বক্ষণ নিজে ত্যাগ স্বীকার করবেন এবং অন্যদের বৃহৎ স্বার্থের জন্য অনুরূপ ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করবেন।

আমাদের পরম সৌভাগ্য, বাঙালি জাতির বেড়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় ঠিক এমনি একজনকে আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম। ইতিহাসের নির্মাতা, গরিব-দুঃখী বাঙালির স্বপ্নের বীরপুরুষ হঠাৎ আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম। ইতিহাসের নির্মাতা, গরিব-দুঃখী বাঙালির স্বপ্নের বীরপুরুষ হঠাৎ করেই ষড়যন্ত্রকারীদের মরণকামড়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দৈহিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর আদর্শ, সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর যে মঙ্গলচিন্তা তা তো শেষ হওয়ার নয়। সে কারণেই বিবিসির জরিপে সারা বিশ্বের সাধারণ বাঙালি শ্রোতাদের বিচারে তিনিই নির্বাচিত হয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। যথার্থই তিনি ছিলেন গরিবের বন্ধু। তারাই যেহেতু এদেশে সংখ্যায় বেশি তাই বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাধারণের বন্ধু। গরিবের বন্ধু। যাঁরা তাঁর আশপাশে থেকে সুবিধে নিয়েছেন তারা তাঁর শাহাদাত বরণের পর প্রতিবাদ সংগঠিত করতে না পারলেও এদেশের লক্ষকোটি কৃষক-শ্রমিক তথা গরিব মানুষ ঠিকই নীরবে নিভৃতে চোখের পানি ফেলেছেন। আমি নিজে দেখেছি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে তাঁদের অনেককে নফল রোজা রাখতে। আজও তাঁরা তাঁকে অন্তর থেকে মনে রেখেছেন। ১৯৭৫ সালের ২৮ আগস্ট তারিখে লন্ডনে *দি লিস্‌নার* পত্রিকায় বিবিসি সংবাদদাতা ব্রায়ান ব্যারন এক সংবাদ-বিবরণীতে লিখেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে উচ্চতর আসনেই অবস্থান করবেন। তাঁর বুলেট বিক্ষত বাসগৃহটি উত্তরকালে গুরুত্বপূর্ণ এক 'স্মারকচিহ্ন' এবং কবরস্থানটি 'পুণ্যতীর্থে' পরিণত হওয়ার যে ভবিষ্যদ্বাণী ওই সাংবাদিক করেছিলেন তা আজ ক্রমশ এক অক্ষয় সত্যে পরিণত হতে দেখছি। দিনদিনই তিনি যেন তাঁর নিজের উচ্চতাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে পরিব্যাপ্ত এই মানুষটিকে তাই অযথা অতি উৎসাহে বড় করার কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ এ ভুলটা আমরা সুযোগ পেলেই করে থাকি। অন্যদিকে যারা বাংলাদেশটিকেই চায়নি তারা সবকিছু থেকেই তাঁর নামটি মুছে ফেলতে চায়। ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গ যাবার পথে বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর মাইল ফলকগুলো থেকে কীভাবে তার নাম উপড়ে ফেলার বৃথা চেষ্টা করা হয়েছে তা নিশ্চয় অনেকেরই চোখে পড়েছে। হীনম্মন্যতার এমন নজির আর কোন দেশে সম্ভব? এইসব ক্ষুদ্র প্রাণীদের জন্য করুণা প্রকাশ করা ছাড়া আমাদের আর কিইবা করার আছে। সময় ও মেধার অপচয় না করে বরং এই মহৎ প্রাণের বৃহৎ চিন্তা-চেতনার তল খুঁজে বের করার চেষ্টায় আমাদের আত্মআবিষ্কার সম্পন্ন হতে পারে। কী সেই সত্য যে কারণে তল খুঁজে বের

করার চেষ্টায় আমাদের আত্মআবিষ্কার সম্পন্ন হতে পারে। কী সেই সত্য যে কারণে ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট লন্ডনের *দি ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস* উচ্চারণ করেছিল, 'এই করুণ মৃত্যুই যদি মুজিবের ভাগ্যে অবধারিত ছিল তাহলে বাংলাদেশ জন্মের মোটেই প্রয়োজন ছিল না।' এই মৃত্যু একজন বিদেশি সাংবাদিকের মনে যেভাবে আঘাত করেছিল তা থেকেই অনুমান করা যায় স্বদেশের সাধারণ মানুষকে যে কতটা আহত ও বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল।

মানবিকতার মৌল আদর্শের পরিপন্থী এই হত্যাকাণ্ড মানব-ইতিহাসে সংঘটিত জঘন্যতম এক ঘটনা বলেই লিপিবদ্ধ থাকবে। কারণ এমন এক মানুষের জীবনে মর্মন্তুদ এই ঘটনাটি ঘটেছিল যিনি আজীবন শুধু জনগণের কথাই ভেবেছেন। 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, তাদের দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য তিনি সংগ্রাম করে গেছেন।' (লিবারেশন-এর চেয়ারম্যান, লর্ড ব্রকওয়ের ১৯৭৯ সালে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীতে দেওয়া বাণী থেকে)। আর সে কারণেই তিনি বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যা ব্যক্তিবিশেষের হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ। এ ছিল সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে সংঘটিত এক অপরাধ। তিনি বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন করার পর ঠিক যে সময়টাতে প্রত্যেক নাগরিককে পরিপূর্ণ জীবন উপভোগ করার সুযোগ দান (ব্রকওয়ে, ঐ) করার সংগ্রামে ব্যস্ত ছিলেন তখনই তাঁকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর অনেকগুলো বছর চলে গেছে। কিন্তু আজও আমরা বঙ্গবন্ধুর জনগণের সার্বিক মুক্তির চিন্তাকে সহজ করে জাতির সামনে তুলে ধরতে পারিনি। যাঁর জন্ম না হলে 'বাংলাদেশ' নামের দেশটি আমরা পেতাম না, সেই মহানায়কের চিন্তা-চেতনা নিয়ে এ দেশের গবেষকরা খুব সামান্যই কাজ করেছেন। আর সে কারণেই বিবিসির এই উদ্যোগ এতটা গুরুত্বপূর্ণ।

যেকোনো জাতিই একটি সজীব সত্তা। একটি মানস পদার্থ। অতীত এবং বর্তমান একযোগে কাজ করে এবং জাতির মানসগঠন তৈরি করে। বাঙালি জাতির মানসগঠনে নিঃসন্দেহে অতীতের অনেক ঘটনাপ্রবাহ, বহুজনের নেতৃত্বের ভূমিকা কাজ করেছে। সেই ইতিহাসের একজন তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণকারী হিসেবে বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতৃত্বের গভীর ছাপ সময়ের পাতে রেখে গেছেন। তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করলে তাঁর যে ব্যক্তিত্বকাঠামো স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলো, তিনি বাঙালি জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক রূপে নিজের ভূমিকা পালনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইতিহাসই তাঁকে তৈরি করেছিল। আবার তিনিই বাঙালির ইতিহাস গড়েছেন।

বাঙালি জাতির আনুষ্ঠানিক জন্মের পূর্বক্ষণে বঙ্গবন্ধু ছিলেন ধীরস্থির, শান্ত। বিদেশি এক কথাসাহিত্যিক ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন তাঁর সেই সৌম্য মূর্তি। তৃপ্ত বঙ্গবন্ধু তাই বলতে পেরেছিলেন, 'আমাকে গ্রেফতার করে কোনো লাভ হবে না। যেমন অতীতেও লাভ হয়নি। আমাকে হত্যা করা হলে হাজারো শেখ মুজিব প্রতিরোধের জন্যে এগিয়ে আসবে। ওরা জানে, ওরা শেষ হয়ে গেছে। এবং এই উপলব্ধি আমাকে আনন্দ দিচ্ছে। ওরা যদি আমাকে হত্যা করে এবং তোমাদেরকে আমার লাশ দেখতে দেয়, তখনো দেখবে, আমার মুখে হাসির রেখা ফুটে রয়েছে।' (দ্র. রবার্ট পেইনের *দি টর্চার্ড অ্যান্ড দি ড্যাম্‌ড* বইয়ের অনুবাদ *সেই দুঃসময়*, পৃ. ১৯)। সে কারণেই দীর্ঘ ৯ মাস হানাদারদের কারাগারে বন্দী থেকেও সামান্য বিচলিত হননি তিনি। কোনো ভয়ভীতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। ফাঁসির সকল আয়োজনও তাঁকে সামান্যতম দ্বিধান্বিত করতে পারেনি। অকুতোভয় বঙ্গবন্ধু বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছে নিজের স্ত্রী-সন্তানের কাছে না গিয়ে প্রথমেই বিমানবন্দর থেকে সোজা লাখ লাখ জনতার মাঝে চলে গিয়েছিলেন। কেননা তাদের কাছেই তাঁর দায়বদ্ধতা, তারাই তাঁর আপনজন। রেসকোর্সের বিশাল জনসমাবেশে জনগণের ত্যাগে মুগ্ধ বঙ্গবন্ধু হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা মিশিয়ে উচ্চারণ করেন, 'সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায় তাহলে আমাদের এ স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে, সেগুলো মেরামত করতে হবে। ... কর্মচারীদের বলছি, আপনারা ঘুষ খাবেন না। এদেশে আর কোনো দুর্নীতি চলতে দেওয়া হবে না।' তিনি তাঁর দেওয়া কথা রেখেছিলেন। দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পরপরই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে শুরু করেন। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামো নির্মাণ, স্কুল-কলেজ চালু করা, সংবিধান প্রণয়ন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি, বন্দর মাইনমুক্ত করা, প্রশাসন ব্যবস্থা সচল করা, ব্যাংক-বীমা পুনরায় চালু করার মতো অসংখ্য নীতিনির্ধারণী ও প্রাত্যহিক কাজ তাঁকে একই সঙ্গে করে যেতে হয়েছে। বাইরের সঙ্গে তাঁর বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাজ করে গেছেন। সাংবাদিক ফয়েজ আহমদকে তিনি ব্যস্ত রেখেছিলেন চীনের স্বীকৃতি আদায়ের কাজে। যেদিন তাঁর ওপর হামলে পড়ে বিশ্বাস-ঘাতকের দল সেদিনও ফয়েজ আহমদ ছিলেন রেঙ্গুনে এই গুরুত্বপূর্ণ দূতিয়ালির কাজে (সূত্র: ফয়েজ আহমদের সঙ্গে আলাপ, ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮)। বিশেষ করে, পাশের বন্ধুদেশ এবং দুই পরাশক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করায় যে দক্ষতা, দেশপ্রেম দেখিয়েছেন তা ছিল সত্যি অনন্য (দ্রষ্টব্য ইসলাম, প্রাগুক্ত)। আর সর্বক্ষণ

সজাগ থাকতে হয়েছে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তের ব্যাপারে। বুঝে বা না বুঝে এ দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের একাংশ অতিবিপ্লবী নেতাদের কথায় বিশ্বাস করে 'সমাজ পরিবর্তনের' নামে দারুণ এক অস্থিরতার শিকার হয়। ফলে যুদ্ধোত্তর সমাজে দেখা দেয় অস্থিতিশীলতা। এরই ফাঁক দিয়ে সামরিক ও অসামরিক প্রশাসনের অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে ষড়যন্ত্রকারীর দল। এত কিছু সামাল দিতে ব্যস্ত থাকলেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিন্তু একদণ্ডের জন্যও গরিবের দুঃখ ভোলেননি। ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিজয়দিবসের প্রাক্কালে টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, 'পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আরও এক শক্তিশালী শত্রু। এই শত্রু হলো অভাব, দরিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা, বেকারত্ব ও দুর্নীতি। এ যুদ্ধ সহজ নয়।' শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন, 'স্বাধীনতা শুধু পতাকা অথবা দেশের নতুন নাম বোঝায় না।' বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন যে, 'স্বাধীনতা অর্থহীন হবে যদি জনগণ প্রাণ ধারণের স্বাধীনতা, অভুক্ত না থাকার ও রুজি-রোজগারের স্বাধীনতা এবং অন্যদের সঙ্গে সম্পদের অংশীদার হওয়ার স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।' (সূত্র : শন ম্যাকব্রাইড, সর্ব-ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর ৬২তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ, ২০ মার্চ ১৯৮২, লন্ডন)। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তিনি কৃষক-শ্রমিকের পক্ষে কথা বলে গেছেন। তিনি যে অসাম্যকে অপছন্দ করতেন, দুর্নীতিকে ঘৃণা করতেন, কতিপয়তন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিলেন, সেই অসাম্য, দুর্নীতি ও কতিপয়তন্ত্রই আজ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের বুকের ওপর চেপে বসেছে। যে বিদেশি ঋণকে তিনি উপেক্ষা করে স্বদেশি উন্নয়নের গোড়াপত্তন করতে চেয়েছিলেন সেই পরনির্ভরতাই একসময় নীতিনির্ধারকদের মস্তিষ্ক পুরোপুরি দখল করে ফেলে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলে ছিল যে ক্ষুধাহীন ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন, সে স্বপ্ন যেন দুঃস্বপ্নে রূপান্তরিত হয়েছিল। দেরিতে হলেও দুঃখজনক এই বাস্তবতার পরিবর্তনের এক নয়া সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যেন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারি, সেই আশা বুকে বেঁধে বসে আছি। আমরা যদি সত্যি সত্যি তাঁকে শ্রদ্ধা করি তাহলে শুধু আনুষ্ঠানিকতা না করে জাতির অন্তরে তাঁর এসব প্রশ্ন গেঁথে দিতে হবে। বিশেষ করে, আগামী প্রজন্মের মনে যেন তাঁর গরিবহিতৈষী ভাবনাচিন্তা স্থায়ী আসন গেড়ে বসে। কেননা সবশেষে মনের পরিবর্তনই হলো উন্নয়ন। সেই পরিবর্তনকে কার্যকর করার মধ্য দিয়েই আমরা জানাতে পারি তাঁর প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাঁর নামে যত্রতত্র স্থাপনা গড়ে এবং পরবর্তী সময়ে সেই নাম মুছে ফেলার মতো কাজে লিপ্ত থেকে তাঁকে আমরা অন্যায়ভাবে ও অযথা বিতর্কিত করতে পারি

না। যদি সত্যি সত্যি তাঁকে সম্মানিত করতে চাই তাহলে আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পুষ্পমাল্যে কি আমরা লিখতে পারি না–এই রাজধানীর নাম 'বঙ্গবন্ধুনগর'? ভিয়েতনামীরা যেমনটি লিখেছেন 'হোচিমিন সিটি', মার্কিনিরা লিখেছেন 'ওয়াশিংটন'। তেমনি করে কি আমরা তাঁকে করে তুলতে পারি না আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্বের অংশ?

২০২০ সালে আমরা যেন সমৃদ্ধ বাংলাদেশেই সর্বশ্রেষ্ঠ এই বাঙালির জন্মশতবর্ষ মাথা উঁচু করে উদ্‌যাপন করতে পারি। তার পরের বছরই স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স হবে ৫৫। ততদিনে বাংলাদেশকে সত্যি সত্যি মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। সেজন্য শুধু স্তুতি-বাক্য নয়, তাঁর গরিবহিতৈষী উন্নয়ন-কৌশলকে বাস্তব রূপায়ণে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকে। একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনের যে স্বপ্ন তাঁর ছিল তাকে আমরাই আমাদের ধ্যানে, ত্যাগে, পরিশ্রমের মাধ্যমে রূপায়ণ করব–এই সংকল্প গ্রহণ করেই আমরা তাঁর এই সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হবার গৌরবকে অভিনন্দিত করতে পারি। জয়তু বঙ্গবন্ধু।



৪

১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর কারাবরণ এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা

এই বঙ্গের বাঙালি জীবনে ১১ মার্চ একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। যে দিনটি ভাষার লড়াইকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৪৮ সালের এদিন আমাদের সাহসী ছাত্রসমাজ একটি সর্বাত্মক ধর্মঘট পালনের মধ্য দিয়ে ভাষার দাবিকে জোরালো এবং আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসে। '৪৮ সালের এই দিনে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সে সময়কার উজ্জ্বল ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাস মতে, এটিই ছিল তাঁর প্রথম কারাবরণ। সেদিন আরও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী, অলি আহাদসহ আরও অনেকে। বলা বাহুল্য, ১১ মার্চ শক্ত প্রতিবাদের যে ভিত রচনা হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন সরকার ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। ১১ মার্চের প্রেক্ষাপট থেকেই ভাষা-আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলন বিকশিত হতে থাকে।

কেন ১১ মার্চ ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল এবং এর সামাজিক প্রভাবটাই-বা কী ছিল? এর উত্তর খুঁজতে আমাদেরকে একটু পেছনে ফিরে দেখতে হবে। আসলে রাষ্ট্রভাষা-প্রশ্নে দেশ বিভাগের

শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পান ১৫ মার্চ সন্ধ্যায়। মুক্তি পাওয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৫০নং মোগলটুলির শওকত আলীসহ ফজলুল হক হলে আসেন। সেখানে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের আট দফা চুক্তি পড়ে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। বলেন, 'মিয়ারা করছে কি? রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি কোথায়? এই চুক্তি আমি মানি না।' পরদিন সকালে ফজলুল হক হলে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাব মতো রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে এবং সম্পাদিত চুক্তির কয়েকটি স্থান সংশোধন করে সেই সংশোধিত প্রস্তাব সাধারণ ছাত্রসভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আগে থেকেই বিতর্ক চলছিল। এ বিষয়টি প্রথমে সাধারণ জনগণের মাঝে বিস্তৃত না হলেও শিক্ষিত সচেতন মহলে বেশ সাড়া ফেলে। এই ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষার স্বপক্ষে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'তমুদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলা হয় এবং একইসাথে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির স্বপক্ষে এই সংগঠন প্রচার চালাতে থাকে। '৪৭ সালের অক্টোবর মাসেই তমুদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এদিকে ঐ বছরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে করাচিতে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ভাষা হিসেবে উর্দু প্রচলনের সিদ্ধান্ত ছাত্রদের মাঝে দারুণ অসন্তোষ তৈরি করে। ৬ ডিসেম্বর তমদ্দুন মজলিসের নেতৃত্বে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে করাচিতে শিক্ষা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে নেতৃত্ব পর্যায়ের বেশ কিছু বাঙালি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা হিসেবে উর্দু প্রচলনের সিদ্ধান্ত বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হয়। কিন্তু এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিবাদ এত তীব্র হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ফজলুর রহমান দায়িত্ব এড়াবার জন্য বিবৃতি দিয়ে উর্দু প্রচলনের কথা অস্বীকার করেন এবং তাঁরা সম্মেলনে বাংলা ভাষার স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন বলে দাবি করেন। ফজলুর রহমানের বিবৃতির সবটুকুই ছিল মিথ্যা। কয়েক দিন পর কেন্দ্রীয় সরকার যখন প্রেস নোট দিয়ে সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ জানিয়ে দেন তখন সবকিছু পরিষ্কার হয়ে ওঠে। করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা-সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে ঢাকার ছাত্রদের ভেতরে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৬ ডিসেম্বর তমদ্দুন মজলিসের নেতা আবুল কাশেমের নেতৃত্বে প্রথম প্রকাশ্যে প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ঢাকার বিভিন্ন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে এবং তারপর বিভিন্ন উত্তপ্ত স্লোগান সহকারে বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ বিক্ষোভ-মিছিল শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে এবং কয়েকজন মন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বাংলার স্বপক্ষে সমর্থন আদায় করে। কোনো কোনো মন্ত্রী প্রকাশ্যেই বিক্ষোভকারীদের দাবির স্বপক্ষে বক্তৃতা দিয়ে সমর্থন জানান।

পূর্ববাংলা সরকারের মন্ত্রী এবং মুসলিম লীগ দলীয় অনেক বিধান-পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবিকে সমর্থন করলেও পাকিস্তান গণ-পরিষদে কিন্তু অবস্থাটা অন্যরকম ছিল। পাকিস্তান প্রথম গণ-পরিষদের মিটিংয়ে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি উত্থাপিত হলে মুসলিম লীগের সকল সদস্য বিরোধিতা করে এবং কংগ্রেসের সবাই তাকে সমর্থন করে। এ

ঘটনাকে স্বয়ং লিয়াকত আলী খানসহ মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন হিসেবে গণ্য করেন এবং প্রস্তাবক ও সমর্থনকারীদেরকে কটাক্ষ করে প্রস্তাব বাতিল করে দেন। অবশ্য '৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার প্রস্তাব পেশ করেন।

এদিকে গণ-পরিষদের নেতৃবৃন্দের উক্ত ভূমিকার কথা ঢাকায় প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। তাৎক্ষণিকভাবে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় স্কুল-কলেজসমূহে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় এবং তা অত্যন্ত সফলভাবে কার্যকরি হয়। এ কর্মসূচি সফল হয় অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদসমূহকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য তমুদ্দুন মজলিস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীদের ডাকে গণতান্ত্রিক কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় তমদ্দুন মজলিস, গণ-আজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও প্রতিটি হলের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। আহ্বায়ক নির্বাচিত হন তমদ্দুন মজলিসের সামসুল আলম। এ সভাতেই ১১ মার্চ ১৯৪৮ সমগ্র পূর্ববাংলায় সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানান হয়। এ কর্মসূচির স্বপক্ষে ব্যাপক প্রচার-আন্দোলন চলতে থাকে। অন্য দিকে, উর্দু ভাষার সমর্থক সরকারি মহল গুণ্ডামির আশ্রয় নেয়। ভাষা-আন্দোলনের কর্মীদের ওপর গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়ার ঘটনা অব্যাহতভাবে চলতে থাকায় এবং ধর্মঘট বানচালের জন্য বিভিন্ন ধরনের অপচেষ্টার কারণে সাধারণ ছাত্রসমাজ আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

১১ মার্চকে সফল করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি চলে। আগের দিন রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ সুপরিকল্পিতভাবে দিনটি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১১ মার্চ ব্যাপক ছাত্রসমাজ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু অত্যন্ত শক্ত পিকেটিং করা সত্ত্বেও কিছু কিছু কর্মচারী অফিসে যায়। শুধু তাই নয়, এ. কে. ফজলুল হকের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ প্রায় সকল আইনজীবী সেদিন কোর্টে যাওয়ার জন্য ছাত্রদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঢাকা শহরসহ পূর্ববাংলার বিভিন্ন শহরে ধর্মঘট পালিত হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১ মার্চ সকালে ছাত্র-জনতা সচিবালয়ের সামনে সমবেত হতে থাকে। সচিবালয়ে প্রবেশের দুটি গেট ছিল। আবদুল গণি রোডস্থ প্রথম গেটে পিকেটিং করেন শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদ প্রমুখ। এই গেট দিয়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা যাতায়াত করতেন। তোপখানা রোডস্থ দ্বিতীয় গেটে পিকেটিংয়ে নেতৃত্ব দেন কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, খালেক নেওয়াজ খান, মো. বায়তুল্লাহ প্রমুখ। ঢাকায় সচিবালয়ের সামনে পিকেটিং

করার সময় গ্রেপ্তার হন শেখ মুজিবুর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী, অলি আহাদ, শওকত আলী, খালেক নেওয়াজ খান, নঈমুদ্দিন আহমদ, বায়তুল্লাহ, রণেশ দাস গুপ্তসহ আরও অনেকে। ১১ মার্চের ধর্মঘট শুধু ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্ববাংলার প্রায় সর্বত্র ওইদিন ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। রাজশাহী ও সিলেটে ১১ মার্চে পিকেটিং করতে গিয়ে অনেকে রক্তাক্ত হন।

এখানে উল্লেখ্য যে, শহরের ব্যাপক জনসাধারণ এ আন্দোলন না করলেও ছাত্ররা ব্যাপকভাবে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ১১ মার্চের ধর্মঘট চলাকালীন পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে বন্দীমুক্তির দাবিতে পরবর্তী তিন দিন ধরে অব্যাহত বিক্ষোভ চলতে থাকে। এ বিক্ষোভ কখনো কখনো অত্যন্ত মারমুখী রূপ নেয়। এরকম একটি পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন আন্দোলন ব্যাপক শক্তি অর্জন করে আবার অন্যদিকে তেমনি নাজিমুদ্দীন-বিরোধী কিছু নেতা এ আন্দোলনের ফায়দা লুটতে তৎপর হয়ে ওঠে। এ অবস্থা টের পেয়ে ভাষা-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সকল সরকারি নেতা ও পরিষদ-সদস্য ইত্যাদির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে স্বাধীনভাবে কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নাজিমুদ্দিন-বিরোধী পরিষদ-নেতাদের কুমতলবের কথা প্রকাশিত হয়ে পড়লে সাধারণ ছাত্রদের ভিতর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পড়ে। এবং তাদের মধ্যে আপসহীন মনোভাব আরও বেড়ে যায়। তারা আরও জঙ্গী ভূমিকা নিয়ে ব্যাপকভাবে আন্দোলনে এগিয়ে আসে। এ পরিস্থিতিতে ১৫ মার্চ পরিষদের প্রথম অধিবেশন উপলক্ষে সাধারণ ধর্মঘট সফল হতে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন ক্রমেই আন্দোলনকারীদের পক্ষে চলে যাচ্ছে–এ সত্য বুঝতে পেরেই নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ-এর কাছে আলোচনার প্রস্তাব পাঠান এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে আটদফা চুক্তি হয়।

ভাষাসৈনিক গাজীউল হক প্রদত্ত একটি লিখিত বক্তব্য মতে, শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পান ১৫ মার্চ সন্ধ্যায়। মুক্তি পাওয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৫০নং মোগলটুলির শওকত আলীসহ ফজলুল হক হলে আসেন। সেখানে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের আট দফা চুক্তি পড়ে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। বলেন, 'মিয়ারা করেছ কি? রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি কোথায়? এই চুক্তি আমি মানি না।' পরদিন সকালে ফজলুল হক হলে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাব মতো রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে এবং সম্পাদিত চুক্তির কয়েকটি স্থান সংশোধন করে সেই সংশোধিত প্রস্তাব সাধারণ ছাত্রসভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভাষাআন্দোলনের পটভূমির পেছনে ছিল আর্থসামাজিক অনেকগুলো কারণ। অর্থনৈতিক বৈষম্য, দুর্ভিক্ষ, অসম প্রতিযোগিতা, ব্রিটিশ অনুসৃত বিভেদ নীতি এবং সামাজিক অপরাপর চাহিদার অপ্রতুলতাও এই আন্দোলনের নেপথ্যে ছিল।

আসলে বাংলা ভাষাকে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা সবসময়ই লক্ষণীয় ছিল। শাসকগণ সবসময়ই সু-কৌশলে এটি করতে চেয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর এই প্রচেষ্টা যেন আরও দৃঢ় হয়। পাকিস্তান হওয়ার পর তাই পূর্ব-পাকিস্তানে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধতে শুরু করে। বাংলা ভাষাকে দমিয়ে রাখতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একের পর এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে থাকে। চলে মনস্তাত্ত্বিক নীপিড়ন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার বাংলা ভাষাভাষীদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন, পূর্ববঙ্গে জমিদার মহাজনের শোষণের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজাদের অসন্তোষ। এমতাবস্থায় অন্নবস্ত্রের এবং আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন সামনে এগিয়ে আসে। স্বভাবতই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় দিতে সরকার যখন অস্বীকার করল তখনই শুরু হলো ভাষা-আন্দোলন। যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের বাক্য বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ

৭ই মার্চ : বাঙালির সার্বিক মুক্তির ডাক

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ, রমনার রেসকোর্স ময়দানে সমবেত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ১০ লাখের অধিক মানুষ, তারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বুক বেঁধে দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন তাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শুনতে। এ সমাবেশের মূল চেতনাই ছিল *'স্বাধীন বাংলাদেশ।'* বঙ্গবন্ধুও তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ব্যক্ত করেছিলেন স্বাধীনতার অভিপ্রায়। ১১০৮টি শব্দের ১৯ মিনিটের এই ভাষণটিতে ঘনীভূত হয়ে আছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার-বঞ্চিত বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ সময়। ৪৪ বছর ধরে ভাষণটি জনসাধারণ্যে শ্রুত হচ্ছে লাখ-কোটিবার। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে এই ভাষণ। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধটি এই ঐতিহাসিক ভাষণের শিরোনামোক্ত বাক্যের পূর্বাপর বিশ্লেষণ সূচিত করার একটি প্রয়াস মাত্র।

'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম–এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

(৭ মার্চ, ১৯৭১, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ)

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ–প্রকৃত অর্থেই অভিন্ন ও একাত্ম। যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন পথিকৃৎ। মৃত্যুকে তুচ্ছ ভেবে এগিয়ে গেছেন অবিচল চিত্তে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বৈষম্য-শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা–এই ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যই

বঙ্গবন্ধুর মূলকথা। এই মূলমন্ত্রকে তিনি সঞ্চারিত করে ছিলেন প্রতিটি বাঙালির চেতনায়। এজন্যই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার। জাতির পিতা। সকল অর্থেই *'তিনিই বাংলাদেশ'*। বঙ্গবন্ধু সারা জীবন কাজ করে গেছেন বাঙালি জনগণের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য। স্বপ্ন দেখেছিলেন শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের। গড়তে চেয়েছিলেন ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা, যা বাস্তবায়নে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত এই নেতা তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

সাতচল্লিশে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ ২৩ বছরে শত শহিদের রক্তস্নাত বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন থেকে ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত রাজনৈতিক অধিকার অর্জন এবং সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামেই ছিল বঙ্গবন্ধুর দৃপ্ত পদচারণা। পাকিস্তান সৃষ্টির পরেই শুরু হয় পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানের শোষণমূলক আচরণ। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক–সকল ক্ষেত্রেই বাঙালিরা উপেক্ষিত হতে থাকে। দিনে দিনে রচিত হয় বৈষম্যের পাহাড়। জনসংখ্যার দিক দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান বৃহত্তর অংশ হওয়া সত্ত্বেও সরকারি বাজেটের প্রায় পুরোটাই খরচ হতো পশ্চিম-পাকিস্তানিদের জন্য। বৈদেশিক সাহায্যের ৮০ ভাগই ব্যয় হতো পশ্চিম-পাকিস্তানে। চাল, আটা ও তেলের দাম পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব-পাকিস্তানে ছিল দ্বিগুণ। কেন্দ্রীয় সরকার ও সামরিক বিভাগের চাকরির প্রায় ৯০ শতাংশই ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানিদের দখলে। সকল প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন তারাই। এমনকি তারা নগ্ন আঘাত হানে বাঙালির মাতৃভাষা বাংলার ওপর।

এসব বৈষম্য ও পাকিস্তানিদের নানা অন্যায়-অত্যাচারকে উপজীব্য করে ছেষট্টিতে বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিব ৬ দফা কর্মসূচি দেন। জনগণের অধিকার আদায়ের এই ঐতিহাসিক কর্মসূচি মোকাবিলায় পাকিস্তানি সামরিক শাসক শেখ মুজিব ও তাঁর দলের ওপর অগণতান্ত্রিক ও ষাড়যন্ত্রিক আচরণ শুরু করে। ফলে তাঁর ওপর বারবার নেমে আসে দুঃসহ কারাজীবন। তবে তিনি ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও অন্যায়ের সাথে আপস করেননি। বরং বলেছেন, *'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব–আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।'* আর বাঙালি জনগণ পরিস্থিতির করুণার পাত্র হয়ে না থেকে পাকিস্তানি শাসকদের অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে আত্মদান করতেও পিছপা হয়নি। ঊনসত্তরে ছাত্র-জনতা সংগ্রাম করেই শেখ মুজিবকে কারামুক্ত করেন এবং *'বঙ্গবন্ধু'* উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর আসে সত্তরের সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনের ফলাফল ছিল বাঙালির শোষণ-বৈষম্যের প্রতিফলন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তা

সত্ত্বেও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যেকোনোভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পশ্চিম-পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখা। এই ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু একাত্তরে মার্চের শুরুতেই পূর্ব-পাকিস্তানে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিকামী মানুষ ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত করে তোলে। ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। সারা পূর্ব-পাকিস্তান কার্যত অচল হয়ে পড়ে। বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে বিশালকায় এক নেতার রাষ্ট্রনায়কে রূপান্তরের প্রক্রিয়া।

অসহযোগ আন্দোলনের টানটান উত্তেজনায় যখন বাঙালি জনমানুষ আন্দোলিত, সেই পটভূমিতেই ৭ মার্চ বেলা ২টা ৩০ মিনিটে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের সর্বব্যাপী গণজাগরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুরু করেন তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণটি। রেসকোর্সের পুরো ময়দান তখন পরিণত এক বিশাল জনসমুদ্রে। হাতে তাদের বাঁশের লাঠি আর কণ্ঠে *'জয়বাংলা'* ধ্বনি। লক্ষ্য তাদের অভিন্ন–স্বাধিকার ও মুক্তি। চোখে তাদের মুক্তির চেতনার আগুন। লড়াই করে অধিকার ছিনিয়ে আনার আগুন।

কী অসীম চাপ! একটি জাতির প্রত্যাশা। অদূরেই পাকিস্তানি সেনা। সামনে সাত কোটি বাঙালির রক্তমাখা চোখ। তারা চেয়ে আছে তাদের প্রাণের ও ভালোবাসার নেতার দিকে। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি আর কালো কোট পরনে নেতার চোখে সংগ্রাম। রক্তে উদ্বেলতা। মাথায় সাবধানতার অসীম ওজন। একটু এদিক-সেদিক হলেই রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনতে পারে হায়েনার দল। তাই সাবধানে উচ্চারণ করতে হবে প্রতিটা শব্দ। অথচ কোনো রকম পূর্বপ্রস্তুতি নেই। নেই লিখিত কোনো স্ক্রিপ্ট। শুধু মাথায় আছে একটি মাত্র শব্দ *'স্বাধীনতা'*। সাত কোটি মানুষের ভালোবাসায় আস্থা রেখে বাঙালি জাতির মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুরুতেই শান্ত ও গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, *'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।'* এ কথার মাধ্যমে তিনি বাঙালি জাতির রাজনৈতিক অধিকার বারংবার ভুলুণ্ঠিত হওয়া আর চরম নিষ্ঠুরতায় তা দমিয়ে দেওয়ার পুঞ্জিভূত মনোবেদনা তুলে ধরেন। আর জীবন-দানের পেছনে মানুষের কী অদম্য আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল ছিল তা তিনি স্পষ্ট করলেন, *'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়'* এ কথাগুলোর মাধ্যমে। বাংলার মানুষ কার কাছ থেকে কী ধরনের মুক্তি ও অধিকার চায় তাও তাঁর বক্তৃতায় ফুটে ওঠে। সেদিন সবার চিন্তা-চেতনায় ছিল শত বছরের

পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করবে। বঙ্গবন্ধুও তাঁর ভাষণে স্বাধীনতার অবয়ব আঁকেন এভাবে *'এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।'*

এরপর ২৩ বছরের বাঙালির করুণ ইতিহাসের সারাংশ উপস্থাপন করে তিনি বলেন, *'কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।'* এ কথার মাধ্যমে মানসপটে ভেসে ওঠে বাঙালিরা কেমন করে অন্যায়-বঞ্চনাকে প্রতিহত, ন্যায়কে সমুন্নত, জাতিগত অসাম্য এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে চেয়েছিল; জীবন দিয়ে চেষ্টা করেও সেগুলো একে একে ব্যর্থ হওয়ায় কেমন করে মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম মুখ্য হয়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর পুরো দেশ বদলে যায়। যেন আগুনের তাপে ফুটন্ত পানির মতো টগবগ করতে থাকে সাত কোটি মানুষ। জোরদার হয়ে ওঠে অসহযোগ আন্দোলন। শেখ মুজিবের নির্দেশই হয়ে ওঠে সরকারি নির্দেশ। মানুষও তা মানতে থাকে। এমনকি সরকারি প্রশাসনও। তিনি বলেন, *'আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে–খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ দেবে না।'* বাংলার বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতি কর্তৃত্বমূলক এই নির্দেশাবলি প্রদানের অমিত তেজ, আস্থা আর প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন দীর্ঘ সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায়। শুধু জনতার প্রতি নির্দেশই নয় বরং পাকিস্তানি সেনাশাসকদের উদ্দেশ্যেও কয়েকটি শর্ত দিয়ে তিনি আসন্ন স্বাধীনতার ঘোষণাও দেন।

ভাষণের শেষ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেন, *'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম–এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'* সুচিন্তিতভাবেই তিনি ঐ বক্তব্য দিয়েছিলেন। কেননা, স্বাধীনতা যতটা রাজনৈতিক-ভৌগোলিক, মুক্তি ততটাই অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক। একটি জাতি স্বাধীন হলেই মুক্ত হয় না। বাঙালি স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও মুক্তি পায়নি। তারা পাকিস্তানের কাছে আত্মা বিক্রি করে দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু সেই মুক্তি চেয়েছিলেন, যা স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে। এজন্যই তিনি প্রথমে মুক্তি ও পরে স্বাধীনতার কথা বলেন। মুক্তি মানে

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল ধরনের শোষণ-বৈষম্য থেকে মুক্তি। একটা স্বাধীন জাতিই কেবল পারে ঐ ধরনের মুক্তির প্রত্যাশা করতে। তাই তাঁর এই ভাষণ গোটা জাতিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উন্মাতাল করে তোলে। সেইসঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের টনকও নড়িয়ে দেয়।

মুক্তির দিশারি বঙ্গবন্ধু একটি দর্শন, একটি চেতনা। এই প্রবাদ পুরুষের রাজনৈতিক দর্শনের মাঝে বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায়। বাঙালির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কাজ করে যাচ্ছিলেন। আর তখনই ঘাতকের নির্মম বুলেট তাঁকে জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। জাতির পিতা আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে তিনি অমর, অবিনশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়ী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাঝে তিনি চিরজাগ্রত। আর সে কারণেই বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের এই অনন্য ভাষণকে এ বছর ইউনেস্কো 'মেমরি অব দি ওয়ার্ল্ড' এর অন্তর্ভূক্ত করেছে।



৬ বঙ্গবন্ধু ও অসহযোগ আন্দোলন

সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। শোষিত, নির্যাতিত ও লুণ্ঠিত বাংলাদেশের সমাজদেহে সমস্যার অন্ত নেই। এই সমস্যার জটগুলোকে খুলে সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে।

(—বঙ্গবন্ধু; জাতীয় দিবস উপলক্ষে ভাষণ ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৪)

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, ইতিহাসের বিশেষ কোনো পর্বে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে সারা সমাজের সঙ্গেই যোগ রাখা হয়। তাঁকে অবলম্বন করে 'বৃহৎ স্বদেশি' সমাজের রূপান্তর ঘটানো যায়। তাঁর চোখ দিয়েই সকলে পুরো সমাজকে দেখতে পায়। তাঁর মুখ দিয়েই সমাজের সকলের চাওয়া-পাওয়ার কথা বলা হয়ে যায়। তাঁর সাহসের সংস্পর্শে সকলেই সাহসী হয়ে ওঠেন। তাঁর উপস্থিতিতে সকলের প্রাণে সাড়া জাগে। দেশের বুক জুড়ে বসে থাকা জড়তার জগদ্দল পাথর তাঁর গতিময় প্রাণস্পন্দনে টলে ওঠে। তাঁর আবির্ভাবের আগে যাঁরা ছিলেন ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে ম্রিয়মাণ, সর্বক্ষণ অনুগ্রহপ্রার্থী, আবেদন-অনুনয়ে অভ্যস্ত, আপাদমস্তক আস্থাহীন, দৈন্যে কাতর, সেই তারাই তাঁর অবিচল নিষ্ঠা, সংকল্প ও সাহসের স্পর্শে হয়ে ওঠেন আস্থাবান, মাতৃভূমির মর্যাদারক্ষাকারী সাহসী মেরুদণ্ড খাড়া করা একদল সংগঠিত মানুষ। সকল মলিনতা কাটিয়ে সমগ্র দেশের মানুষ তাঁর তেজ অনুভব করেন। সেই তেজ আত্মস্থ করেন। নতুন তেজ তৈরি করে। সেই তেজ বিলিয়ে দেন অন্যদের মাঝে।

বাঙালির ইতিহাসে সেই তেজি মানুষটিই ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নিজে বেড়ে উঠেছেন আর একটি জাতিকেও বেড়ে উঠতে

সাহায্য করেছেন। বাঙালি জাতির বেড়ে ওঠার সেই পথরেখায় আমরা লক্ষ করেছি, কী নিবিষ্টভাবে এককালের শেখ মুজিব এদেশের কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত তথা সাধারণ মানুষের স্বার্থ-চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। তাদের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পাকিস্তান গণপরিষদের কৃষকদের পক্ষ নিয়ে বহুবার জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ষাটের দশকে বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা ঘোষণা করেছেন, সত্তরের ঘূর্ণিঝড়কবলিত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি তুলে ধরেছেন। সত্তরের নির্বাচনী কর্মসূচিতে কৃষকসহ সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি-সংস্কার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন। নির্বাচনে বিজয়ের পর বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্য গণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি পরিকল্পনার কথা বলেছেন। বাঙালির স্বার্থরক্ষার শপথ নিয়েছেন। এসবের মধ্য দিয়েই তিনি বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বের অবস্থান চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। বিকাশমান বাঙালি জাতির অভিপ্রায় ও অহংকারের কথা মনে রেখে সবদিক ভেবেচিন্তে এমনভাবে তিনি জাতির মানস গঠন করেন যে, যখন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন তখন পুরো জাতি তাঁর সেই ডাকের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এই অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা ও দূরদর্শিতার কারণেই মূলত তিনি জাতির পিতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। এই আন্দোলন শেষে যখন দখলদার পাকবাহিনীর হাতে বন্দী হন তখন তিনি এক তৃপ্ত মানুষ। কেননা ততক্ষণে বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়ে গেছে। নতুন এই রাষ্ট্রের মুক্তির জন্য বিদেশি আক্রমণে আক্রান্ত মানুষেরা তাঁরই নির্দেশমতো তাদের যা আছে তাই দিয়ে প্রতিরোধের লড়াই শুরু করে দিয়েছেন।

আমরা জানি, একাত্তরের ১ মার্চ পাকিস্তানের সেনাশাসক ইয়াহিয়া খান ঢাকায় অনুষ্ঠেয় সাংবিধানিক পরিষদের সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণার প্রতিবাদে পুরো বাঙালি জাতি ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা বুঝিয়ে না দিয়ে এমন করে অধিবেশন স্থগিত করায় পুরো বাঙালি জাতি অপমান বোধ করেছিল বলেই এমনভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। সেই ক্ষোভকে খুবই সৃজনশীলভাবে একটি স্বাধীন জাতির অভ্যুদয়ের দিকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু সেই ঘোষণাটি যেদিন এসেছিল তার ঠিক একদিন আগে বঙ্গবন্ধু কী ভাবছিলেন? ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদভবন-প্রাঙ্গণে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দেওয়া এক সংবর্ধনাসভায় রাষ্ট্র পরিচালনা, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি প্রসঙ্গে তিনি

বেশকিছু নীতি-আশ্রয়ী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সকল নির্বাচিত সদস্যের অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়ে সেদিন তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর দল সর্বক্ষণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এতৎসংক্রান্ত সকল সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালাবে। এমনকি একজন সদস্যও যদি সুষ্ঠু ও ন্যায্য সুপারিশ করেন তবে তা মেনে নেয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ৬ দফা জনগণের ম্যান্ডেট পেয়ে তাদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। তাই এ নিয়ে ভুট্টোর সঙ্গে কোনো দর কষাকষিতে যেতে তিনি ইচ্ছুক নন। তিন আরও বলেন, ৬ দফা শুধু বাংলার মানুষের জন্য নয়, পাকিস্তানের অন্যান্য শোষিত মানুষের জন্যও মঙ্গল বয়ে আনবে। পাকিস্তানের পুঁজিপতিরা তাদের গ্রাস করে ফেলেছে। তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যাংক-বীমা এই শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সে কারণেই তিনি সে সময় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করার প্রস্তাব করেন। তবে তিনি সেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে চালু করার পক্ষে ছিলেন।

তিনি আরও বলেছিলেন, বাংলাকে ওই পুঁজিপতিদের সংরক্ষিত বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়ে পাকিস্তান সরকার বাঙালির পাট ও চায়ের রফতানি-বাজার নষ্ট করে ফেলেছে। লবণ ও তাঁতশিল্প ধ্বংস করেছে। আর সে কারণেই তিনি বাংলার হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণভার দিতে চান। বাংলা এই নিয়ন্ত্রণভার পেলে আর এখানে ২২ পরিবারের সৃষ্টি হবে না। সাধারণ মানুষের দুঃখের কথা সেদিনও তিনি মনে রেখেছিলেন। তাই বেকারত্বের ভারে ন্যুব্জ বাংলার অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র ঐ চরম রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে তিনি মেলে ধরতে ভুলে যাননি। জয়নুল যেমন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের চিত্র এঁকেছিলেন তুলির আঁচড়ে, ঠিক একইভাকে তিনি কথার আঁচড়ে আঁচড়ে আনন্দঘন সেই সংবর্ধনা সভাতেও বাংলার অনটনের চিত্র অঙ্কন করেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'ঢাকার অলিগলি বাস্তুহারা মানুষে ভরে গেছে। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সব জিনিসের দাম আছে, দাম নেই শুধু মানুষের। ছেঁড়া কাপড় বা রুটির টুকরা ফেলে দিলে লোকে তা কুড়িয়ে দিয়ে যায়, কিন্তু নেয় না মানুষকে।'

সেদিনের সেই সংবর্ধনা-সভায় দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন, 'এই শোষণের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে হলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আদায় করতেই হবে।' আর গণতান্ত্রিক উপায়েই তিনি তা করতে চেয়েছেন। অধীর আগ্রহে তিনি অপেক্ষা করেছেন প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সংসদের অধিবেশনের জন্য। কিন্তু ১ মার্চ দুপুরে সেই প্রত্যাশাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রস্তাবিত অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলেন। এর কয়েক

ঘণ্টা পর বিকেল চারটের সময় তিনি পূর্বাণী হোটেলে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে পূর্বাপর ষড়যন্ত্রের অংশ বলেই ব্যাখ্যা করলেন। আর বললেন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে নির্বাচন হয়েছে, তারই মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়েছে। তিনি জানান, 'এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। কিন্তু পুরোনো ষড়যন্ত্র আবার শুরু হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে শোষণের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বাংলাদেশকে উপনিবেশ ও বাজার হিসেবে শোষণ করার জন্য এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।' একই সঙ্গে তিনি বললেন, 'সংখ্যালঘু দলের কথামতো অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে কার্যত গণতান্ত্রিক পথে এগুনোর উপায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আওয়ামী লীগ আমাকে দান করেছে।' এর পরের দিন (২ মার্চ) বঙ্গবন্ধু জানান, 'চরম অপমানের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে অন্তত দুজন বাঙালি নিহত ও বহু আহত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে তাঁরা আহত ও নিহত হয়েছেন।' এই ঘটনার তিনি তীব্র নিন্দা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী গ্রুপ ও সামরিক-বেসামরিক আমলাদের স্বার্থেই অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে হয়েছে। যেসব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পশ্চিম পাকিস্তানি ও সংসদ-সদস্য এরই মধ্যে ঢাকা পৌঁছে গেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।' তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'বাংলার মানুষ এধরনের অবাঞ্ছিত চাপকে কিছুতেই মেনে নেবে না।'

২ মার্চেই তিনি 'স্বাধীনতা' শব্দটি উচ্চারণ করেন। সেদিনই তিনি আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, 'বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত গণজাগরণ সারা বিশ্বের সামনে প্রমাণ করবে যে, বাঙালিরা আর উৎপীড়িত হতে চায় না, তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচতে চায়, বাংলা আর কারো উপনিবেশ বা বাজার হয়ে থাকবে না।' তিনি জানান, আইনগত নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশ পরিচালনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সুতরাং, অবিলম্বে সামরিক শাসন তুলে নেয়া উচিত। তাই সরকারি কর্মচারীসহ সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি মানুষকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতি অনুগত থাকার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু। গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা না করার আহ্বান জানান তিনি। পরের দিন ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত ভোর ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল পালনের ডাক দেন। এছাড়াও জয়দেবপুরে নিহত ও আহত প্রতিবাদী বাঙালিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে তিনি ৩ মার্চ জাতীয় শোকদিবস পালনের আহ্বান জানান। তাছাড়া সংবাদপত্র, বেতার ও টিভি কর্মচারীদের বাঙালির পক্ষে খবর প্রকাশে প্রচারে বাধা দেওয়া হলে তাদের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান এবং ৭ মার্চ

রেসকোর্স ময়দানে গণসমাবেশের ডাক দেন। কোনোভাবেই লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ বা অন্য কোনো ধ্বংসাত্মক কাজে যোগ দেওয়া যাবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চরণ করেন। সকল ধরনের সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি নির্দেশ দেন।

৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বিরাট এক জনসমাবেশে তিনি আবার লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি খুবই স্পষ্ট করে বলেন যে, এসব ধ্বংসাত্মক কাজে যারা জড়িত তারা বাংলার অধিকার আদায়ের আন্দোলন নস্যাৎ করতে চায়। তাই তিনি এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলেন। সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'অস্ত্র ছাড়া কীভাবে শান্তি রক্ষা করা যায় তা দেখিয়ে দেব।' সেনাশাসনের অবসান না হওয়া অবধি সরকারকে খাজনা ও ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য তিনি জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করেন। বাড়াবাড়ি না করার জন্য তিনি সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন এবং বলেন, সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মারা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষ মরতে প্রস্তুত আছে। আমি না থাকলেও বাংলার মানুষ তাদের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাবেই।' বঙ্গবন্ধু ওই জনসভায় আরও বলেন, 'নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা কাপুরুষতা মাত্র। এতে কোনো বীরত্ব নেই। দেশে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা আওয়ামী লীগ তৈরি করেনি। ভুট্টো অধিবেশনে যোগ দেবেন না বলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ অস্ত্রধারণ করা হয়েছে বাঙালিদের বিরুদ্ধে।'

৩ মার্চেই বঙ্গবন্ধু একটি বিবৃতিও দেন। ১০ মার্চ রাজনীতিকদের সঙ্গে ইয়াহিয়ার প্রস্তাবিত বৈঠক প্রতাখ্যান করে তিনি এই বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতিতে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'যাদের চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধির কারণে বাংলাদেশের নিরাপরাধ ও নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে, তাদের সঙ্গেই বৈঠকে বসতে বলা হয়েছে। এটা এক নির্মম পরিহাস। উদ্যত বন্দুক ও সঙ্গিনের মুখে তিনি এই বৈঠকে যেতে পারেন না।'

মার্চের ৪ তারিখে এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য দুঘণ্টার জন্য ব্যাংক খোলা রাখার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে বলা হয়, দেশের বাইরে কোনোরকম টাকা পাঠানো যাবে না। তবে দেশের ভেতরে সর্বোচ্চ ১৫ শ টাকা পর্যন্ত বেতনের চেক ভাঙানো যাবে। তাঁর ডাকে বাংলার মানুষ যে তেজোদ্দীপ্তভাবে সাড়া দিয়েছেন সেজন্য তাঁদের তিনি অভিনন্দন জানান। যে সাহস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন

তা বিশ্ববাসীর কাছে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এর পরের দুই দিন (৫ ও ৬ মার্চ) দলের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ বিবৃতি দেন। বঙ্গবন্ধু অনেকের সঙ্গে দেখা করলেও সে সময় আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেননি। এই সময়টায় তিনি ৭ মার্চে কী বলবেন তার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। দলে ও দলের বাইরের অনেকের মতামত নিচ্ছিলেন। এসব মতামত নেওয়ার পর তিনি মনে মনে রচনা করেন ৭ মার্চের সেই অমর কবিতাখানি। সেদিনের এই সংক্ষিপ্ত ভাষণটি (দেখুন পরিশিষ্ট-২) ছিল বঙ্গবন্ধুর গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এক ভারসাম্যপূর্ণ আহ্বান। কার্যত ওই আহ্বানে সাড়া দিয়েই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেয়। সেদিন দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেছিলেন, শহিদের রক্ত মাড়িয়ে তিনি সংসদ অধিবেশনে যাবেন না। সেই জনসভায় তিনি দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন এবং একটি সংখ্যালঘু দলের কথামতো সংখ্যালঘু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার প্রচেষ্টার নিন্দা করেন। সেই ভাষণেই তিনি অবিলম্বে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, জনসাধারণের ওপর গুলি বন্ধ করা, সমরসজ্জা বন্ধ করা, সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ইত্যাদি দাবির কথা জনান। এসব দাবি মানা হলে তবেই তিনি বিবেচনা করে দেখবেন পরিষদে যোগ দেবেন কিনা।

সকল মানুষকে তিনি সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবিলার জন্য ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেন। যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলেন। আসন্ন সংগ্রাম যে স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম সে কথাগুলো বলেই তিনি ৭ মার্চের ভাষণ শেষ

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে গত ২২ বছরে সরকারের রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র ১৫ শত কোটি টাকার মত (মোট ব্যয়ের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র) বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে। অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দেশের সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে বাংলাদেশে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

(—বঙ্গবন্ধু; পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান ২৮ অক্টোবর, ১৯৭০।)

করেন। মুহুর্মুহু করতালি ও চিৎকারের মাধ্যমে লাঠি উচিয়ে লাখ লাখ জনতা সেদিন বঙ্গবন্ধুর সেই হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। পরের দিন সকালে বেতারকর্মীদের চাপে যখন ওই কালজয়ী ভাষণ প্রচার করা হলো তখন তাঁর আহ্বানে সারা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কার্যতই দুর্গ গড়ে উঠল। তরুণরা একদিকে জনসমাবেশ করতে থাকল, অন্যদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। সর্বত্রই তখন সাজসাজ রব। মনে হচ্ছিল মুক্তিযুদ্ধ যেন দ্বারপ্রান্তে। প্রকৃতপক্ষে কার্যকরভাবে অসহযোগ শুরু হয়েছিল ঐ ভাষণের পর থেকেই।

৮ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের আরও ব্যাখ্যা দিলেন। ঐ দিন এবং তার পরের দিন আরও অনেক নেতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। ১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু আরেকটি দীর্ঘ বিবৃতি দান করলেন। সেই বিবৃতিতে বাঙালির চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস মূর্ত হয়ে উঠল। তিনি বলেছিলেন :

* স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার লক্ষ্যে এবং মুক্তি অর্জনের জন্য বাংলাদেশের মানুষ শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

* বাংলাদেশের মানুষের দৃঢ় মনোবল সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস হিসেবে গণ্য হবে।

* বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছা চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

* দেশে ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞদের চলে যাওয়ার জন্য উসকানি দেওয়া হচ্ছে।

* শুধু জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের অপসারণ করে নেওয়া হচ্ছে এবং চার্টার অনুযায়ী মানবাধিকার থেকে বাংলাদেশের মানুষকে বঞ্চিত করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

* সকল সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থাকে জনগণের পক্ষ থেকে দেওয়া নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

* বাংলাদেশে গণহত্যা পরিচালনার জন্য অশুভ শক্তিসমূহ সমরসজ্জাসহ নানা ধরনের তৎপরতায় লিপ্ত। একই সঙ্গে তারা প্রতিহিংসামূলকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে।

১৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু আরেকটি সামরিক আদেশ জারির বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ১১৫ নম্বর সামরিক বিধি জারি করে দেশরক্ষা বিভাগের সকল বেতনভুক্ত কর্মচারীকে অবিলম্বে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশের কথা শুনে বঙ্গবন্ধু বিস্মিত হন এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া এভাবে ব্যক্ত

করেন : 'আমরা যেখানে গোটা সামরিক আইনটাই প্রত্যাহারের জন্য গণদাবি উচ্চারণ করেছি সেখানে এধরনের সামরিক আইন আদেশ জারি জনগণকে কেবল উসকানিই দেবে। যারা এধরনের সামরিক আইন আদেশ জারি করছেন, তাদের এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করা উচিত যে, এধরনের ভীতি প্রদর্শনের কাছে নতি স্বীকার না করার দৃঢ়সংকল্পে জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ। যে কোনো ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও জনতার সংগ্রাম চলবেই। কারণ জনতা জানে যে, ঐক্যবদ্ধ মানুষের সামনে কোনো শক্তিই টিকতে পারে না।'

১৪ মার্চ তিনি যে বিবৃতি দেন তাতে জনগণের বীরত্বের কথাই ছিল বেশি। তিনি বলেন, শক্তির জোরে যারা শাসন করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ও সংঘবদ্ধ জনশক্তি কেমন করে মুক্তির দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলে, বাংলাদেশের জনগণ এরই মধ্যে তা প্রমাণ করেছে। বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে বাঙালির এই মুক্তিসংগ্রামও যুক্ত হওয়ার দাবি রাখে। বাংলাদেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ এমনকি শিশু পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসে বলীয়ান। যারা নগ্নভাবে শক্তি প্রয়োগ করে এদের দলিত করার চিন্তা করেছিল তারা পরাভূত হয়েছে। 'বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ, সরকারি কর্মচারী, অফিস আর কারখানার শ্রমিক, কৃষক আর ছাত্র সবাই দৃপ্তদম্ভে ঘোষণা করেছে তারা আত্মসমর্পণের চেয়ে মরণ বরণ করতেই বদ্ধপরিকর।' একই বিবৃতিতে তিনি ১১৫ নম্বর সামরিক আইনবিধি জারি করে যে ভীতিপ্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে তার নিন্দা করেন। আর যাদের লক্ষ করে এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে তাদের তিনি হুমকির কাছে মাথা নত না করার আবেদন জানান। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাদের পরিবারের পেছনে রয়েছেন বলে তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন। সবশেষে তিনি দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেন যে, 'বাংলাদেশের মুক্তির স্পৃহাকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদের কেউ পরাভূত করতে পারবে না। কারণ, প্রয়োজনে আমরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের মুক্তমানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে আর মর্যাদার সঙ্গে বাস করার নিশ্চয়তা দিয়ে যেতে চাই। মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে। আর সেজন্য জনগণকে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।' একই দিনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু জানান, ইয়াহিয়া ঢাকায় এলে তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। তবে অন্য এক সাংবাদিককে এ কথাও বলতে ভোলেননি যে, তিনি তখনো সংগ্রাম করছেন। তিনি খুবই স্পষ্ট ভাষায় ওই সাংবাদিককে জানিয়ে দেন যে, 'যতদিন জনগণের মুক্তি না আসে এবং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচার অধিকার অর্জিত না হয়, ততদিন সংগ্রাম চলবে।'

মাঝখানে ১৫ ও ১৬ মার্চ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিকভাবে বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। জনগণকে নিজেদের সাধ্যমতো আসন্ন মুক্তিসংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন অনেক নেতা। বঙ্গবন্ধুর কোনো বিবৃতি এই দুদিন পত্রিকায় লক্ষ করা যায়নি। তবে ১৭ মার্চ ছিল তাঁর জন্মদিন। সেদিন এক বিদেশি সাংবাদিককে তিনি জানান যে, 'দেশের মানুষ জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই, যখন কেউ ভাবতেও পারে না মরার কথা তখনো তারা মরে, সেই দেশে জন্ম বা মৃত্যু দিবসে কিবা আসে যায়। আমার জনগণই আমার জীবন।' তাঁর কথাতে কোনো বিপদের পূর্বাভাস রয়েছে কিনা সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, সাড়ে সাত কোটি মানুষ যখন পাহাড়ের মতো তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছেন তখন তাঁর চেয়ে সুখী মানুষ আর কে হতে পারে। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের অবনতি যেভাবে হচ্ছিল তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে বিদেশি সাংবাদিকরা যখন বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন যে, বিদেশি দূতাবাসগুলোকে এসবের কিছু জানানো হচ্ছে কিনা, তিনি তখন সহজ সরলভাবে বলেন যে, তারা এখানেই আছেন এবং সমস্ত ঘটনা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছেন। বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজন নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেন, 'পাট, চা ইত্যাদিসহ আমাদের যা প্রয়োজন বাংলাদেশের তা আছে।' কী নেই, সেই বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার শুধু বাঙালিদের নেই।'

এর আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসেছিলেন। তবে আলোচনা যে সফলতার দিকে এগুচ্ছিল না তার আভাস তিনি সাংবাদিকদের দেন। আলোচনা অব্যাহত রয়েছে এবং আন্দোলনও প্রত্যাহার করেননি–এই কথাগুলোর মধ্য দিয়েই তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া ঐদিনই তাঁর বাড়ির সামনে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে যেসব কথা তিনি বলেছিলেন তা থেকেও বোঝা যাচ্ছিল যে, আপসের পথ বন্ধ হয়ে গেছে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই দেশকে স্বাধীন করতে হবে। তিনি সেদিন খুবই প্রত্যয়ী কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে আমি আমার শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত উৎসর্গ করব। জনগণের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। বাংলাদেশের মানুষ ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করছে। সুতরাং, তাদের স্বাধিকারের প্রশ্নে কোনো আপস চলে না। জনগণ তাদের এ সংগ্রামে বিজয়ী হবেই।'

১৮ মার্চ বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে যেসব কথা বলেন তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধের পথই বেছে নিয়েছেন। ওই দিন তাঁর

বাসভবনের সামনে সমবেত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতালের সেবক-সেবিকাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব না হলে দেশবাসীকে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। 'আঘাত এলে প্রত্যাঘাত করতে হবে। প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তুলুন।' এরপর আরও অসংখ্য মিছিল আসে। তাদের প্রত্যেককেই মোটামুটি ওই একই কথা জানিয়ে দেন। শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তবে প্রয়োজনে মুক্তিপাগল বাঙালি তপ্তরক্তের বিনিময়ে তাদের দাবি আদায় করতেও প্রস্তুত। 'আমাদের শহীদদের সঙ্গে আমরা বেঈমানি করতে পারি না।'

১৮ মার্চ দুপুরে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, বুলেট আর মেশিনগান দিয়ে মুক্তিকামী বাঙালিদের কণ্ঠ স্তব্ধ করা যাবে না। ঐক্যবদ্ধ জনগণকে প্রতিহত করা যাবে না। আমাদের দাবি ন্যায়, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।'

২ মার্চ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্য গৃহীত সামরিক তৎপরতার বিষয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করার যে সিদ্ধান্ত সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু তা নাকচ করে দেন। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গঠিত এই কমিশনের বৈধতা নিয়েই তিনি প্রশ্ন তোলেন। ৭ মার্চ তিনি যেসব শর্ত দিয়েছিলেন যেসব পূরণ না করে খণ্ডিত কিছু বিষয়ের তদন্ত করার এই সিদ্ধান্ত মূল রাজনৈতিক প্রশ্নকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা বলে তিনি দাবি করেন। এই কমিশনের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা না করার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করেন।

এর পরের দিন (১৯ মার্চ) জয়দেবপুরে সেনাবাহিনী প্রতিরোধকারী জনগণকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুলিবর্ষণের খবর পেয়ে বিক্ষুব্ধ বিমান-কর্মচারীদের উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সঙ্গিন উঁচিয়ে বাঙালির দাবি স্তব্ধ করা যাবে না। বাঙালির ফিনকি দেওয়া রক্তের দাগ শহরে বন্দরে ছড়িয়ে আছে। জয়দেবপুরের মাটিও ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে বাঙালির মুক্তি-আন্দোলন স্তব্ধ করা কোনো শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।' সেদিন রাতে তাঁর বাসভবনে সমবেত সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'সৈনিকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে বলে যখন কর্তৃপক্ষ দাবি করছে, তখন জয়দেবপুরের ঘটনা কীভাবে ঘটল? প্রেসিডেন্ট ঢাকা থাকতেই জয়দেবপুরে গুলি হলো। লক্ষ্য অর্জনের জন্য রক্তদানে প্রস্তুত বীর জনতাকে পর্যুদস্ত করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।' এরপর তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাতে তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সেই

বিবৃতিতে তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন যে, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচার দাবিতে যেকোনো ত্যাগের জন্য জনগণ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। শহরে-বন্দরে-গ্রামে সর্বত্র নারী-পুরুষ-শিশু সকলেই আন্দোলনে শরিক হয়েছে। তারা সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের মন ও প্রাণ জয় করেছে। কৃষক-শ্রমিক ও ছাত্ররা যে ত্যাগের পরিচয় দিয়েছে তাতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, জনগণ নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিতে পারবেন। অর্থনীতির সকল স্তরে শৃঙ্খলার পরিচয় দিতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাতে চাহিদা মতো পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। 'আমরা শান্তিপূর্ণ ফয়সালা চাই। তবে তার মানে এই নয় যে, কেউ আমাদের গোলাম করে রাখবে। আমরা আর গোলাম হতে চাই না। আমরা আর কারো বাজার হতে চাই না।' তিনি ঘোষণা করেন, 'যে দাবি আমরা করেছি তা পূরণের জন্য যদি আরও রক্তের প্রয়োজন হয় তবে বাঙালি তাও দেবে। এবার বাঁচতে হয় মানুষের মতো বাঁচব, মরতে হয় মানুষের মতো মরব।' বাঙালির সুশৃঙ্খল সংগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সারা বিশ্ব আমাদের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করছে। এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারলে জয় সুনিশ্চিত। মুক্তি না আসা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে, শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।' ২১ মার্চ বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ৭০ মিনিটের এক বৈঠক করেন। কতিপয় বিষয়ে ব্যাখ্যা নেয়ার জন্য তিনি এই বৈঠকে অংশ নেন।

কিন্তু এই বৈঠকের পরের দিন (২২ মার্চ) তাঁর বাসভবনে যে বিপুলসংখ্যক মিছিল আসে তাদের উদ্দেশ্যে যেসব বক্তৃতা বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন তাতে কিন্তু মনে হয় না আলোচনায় কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল। তাঁর ভাষণের মূল কথাই ছিল বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে ঐক্যবদ্ধ বাঙালিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। তাঁর কথা থেকে মনে হয় বাংলাদেশের স্বাধিকার মেনে নিলেই কেবল পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে–এরকম একটি ইঙ্গিত তিনি ইয়াহিয়াকে দিয়ে এসেছেন। কেননা, তিনি বারবার যে কথাটি সেদিন বলেছেন তা হলো, সাড়ে সাত কোটি বাঙালি নৈতিক ও বৈধভাবে বাংলার নিয়ন্ত্রণ ভার তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। বাঙালি এই অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে তাতে বিশ্বের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। আর তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'শত শহীদের রক্তের শোধ আমাদের নিতেই হবে। যে পর্যন্ত পূর্ব-বাংলার সাত কোটি মানুষ মুক্তি না পাবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলতেই থাকবে।' সেদিন প্রাক্তন সৈনিকদের মিছিলের উদ্দেশ্যে তিনি যে ভাষণটি দেন তা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তাদের যেকোনো ত্যাগস্বীকারে

প্রস্তুত থাকতে বলেন। যা কিছু তাদের আছে তাই নিয়ে চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। 'এবার আমাদের শেষ সংগ্রাম। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।' ঐদিনই বঙ্গবন্ধু, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যে যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আপাতদৃষ্টে মনে হয় ওই বৈঠকে কিছুটা অগ্রগতি অর্জিত হয়েছিল। সে কারণেই আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও প্রেসিডেন্টের উপেদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে বলে তিনি জানান। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি বলেন যে, বাংলাদেশে এখন গুরুতর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জনগণের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

এরপর আসে ২৩ মার্চ। আওয়ামী লীগ এই দিনটি 'লাহোর প্রস্তাব দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করে। সেদিন আওয়ামী লীগ গণবাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা বাংলাদেশের জনগণকে মুক্ত করবই এবং এ ব্যাপারে কারো কাছে আমরা নতি স্বীকার করব না।' তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিই চলমান আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংকট সমাধানের চেষ্টা তিনি করে যাচ্ছেন। কিন্তু একই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, প্রয়োজনে শেষ রক্তবিন্দুটি তিনি বিসর্জন দিতে মোটেও দ্বিধা করবেন না। সকল স্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে তাঁর নির্দেশমতো আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে অংশগ্রহণের জন্য দেশবাসীর নিকট তিনি আবেদন জানান। একই সঙ্গে তিনি তাদের এই আশ্বাস দেন যে, তাঁর রক্তের বিনিময়ে হলেও বাঙালির দাবি আদায় করবেন। ২২ দিনের শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, এরপর শাসকচক্র কোনো দিন আর কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, বাঙালির এই ঐক্য অটুট থাকলে কোনো শক্তিই তাদের শৃঙ্খলিত করে রাখতে পারবে না।

২৪ মার্চ পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হয়। সেদিন তাঁর কথার ভিতরে যে ওজস্বিতা প্রকাশ পেয়েছিল তাতে মনে হয় আলোচনার নামে শাসকগোষ্ঠীর হীন মতলব সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় হয়েছেন। ফলে তিনি ঘোষণা করেন যে, জোর করে কোনো সিদ্ধান্ত চাপানোর চেষ্টা হলে তিনি এবং বাঙালিরা তা কিছুতেই মানবেন না। তিনি কোনো শর্তেই আপস করতে রাজি নন। তিনি আরও ঘোষণা করেন, 'আমার মাথা কেনার শক্তি কারো নেই। বাংলার মানুষের সঙ্গে, শহীদের রক্তের সঙ্গে আমি বেঈমানি করতে পারব না।'

সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর যে চেষ্টা বিশেষ মহল চালাচ্ছিল সে সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে দেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বলেন যে, তাঁর নিজের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। কঠোরতর সংগ্রামের নির্দেশ

দেওয়ার জন্য বেঁচে থাকবেন কিনা তাও তিনি জানেন না। তবে দাবি আদায়ের জন্য দেশবাসী যেন সংগ্রাম চালিয়ে যায় সে আহ্বান তিনি ঠিকই জানিয়েছিলেন : 'কোনো ষড়যন্ত্রই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা রক্ত দিয়েছি, প্রয়োজন হলে আরো রক্ত দেব। আমাদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।'

এর পরের দিন ছিল ২৫ মার্চ। ২৫ মার্চের ঘটনাবলির বিবরণ আমরা পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে অন্যান্য সূত্র থেকে জানা গেছে, সেদিন খুবই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে আলোচনা ভেঙে গেছে। চরম আঘাতের জন্য সেনাবাহিনী উদ্যত হয়েছে। ইয়াহিয়া আকস্মিকভাবে ঢাকা ছেড়ে গেছেন রাতে। আক্রমণের জন্য সামরিক বাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল। বঙ্গবন্ধু তাঁর সহকর্মীদের নিরাপদ স্থানে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। আর নিজে বসে রইলেন যেকোনো সময় বন্দীত্ব বরণ করার জন্য। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁকে ধরতে না পারলে হানাদার পাকবাহিনী ঢাকাসহ সর্বত্র তাণ্ডবলীলা চালাবে। আর তিনি এই ভেবেও স্বস্তিতে ছিলেন যে, দীর্ঘ অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক জন্মের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। তাই পাকবাহিনীর আক্রমণ শুরু হলে ২৫ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরেই রাত ১টা ১ মিনিটে, তিনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁর সেই ঘোষণার কথা শত্রুপক্ষ তাদের বিভিন্ন লেখাতেও স্বীকার করেছে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা সাড়ে সাত কোটি বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বাংলাদেশ স্বাধীন করেন। বৈরী পরাশক্তির দাপট উপেক্ষা করে দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের বিপুল আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত এই বাংলাদেশ মূলত বঙ্গবন্ধুর অনুকরণীয় নেতৃত্বের এক অবিস্মরণীয় অর্জন। আর সে অর্জনের ভাগীদার মুক্তিপাগল সকল জনগণ।



৭ স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে অযথা বিতর্ক

মানুষকে যারা পয়সা দেয়, তোমার মাহিনা দেয়, তোমার সংসার চালানোর জন্য ট্যাক্স দেয়, তার কাছে তুমি আবার পয়সা চাও! মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে হবে। সরকারি কর্মচারী, মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট— আমরা জনগণের সেবক, আমরা জনগণের মাস্টার নই।

(—বঙ্গবন্ধু; জাতীয় সংসদ, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫)

জাতি হিসেবে আমাদের দুর্ভাগ্যের যেন শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে, সেইসব জাতি ভাগ্যবান যারা সব সময় স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মাঝেই খুঁজে পায় (রবীন্দ্র-রচনাবলি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৪)। সাধারণত ইতিহাসই নবীন প্রজন্মের সদস্যদের স্বদেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। অতীতের অর্জনের সঙ্গে বর্তমানকে যুক্ত করে দেয়। ভবিষ্যতে কোন পথে তাদের হাঁটতে হবে তার দিকনির্দেশনা দেয়। গর্বিত এ জাতির উত্তরাধিকার তৈরির কাজে ইতিহাসের ভূমিকা তাই খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের ইতিহাস তার কাঙ্ক্ষিত সেই ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারেনি। বরং একপর্যায়ে, আমাদের স্বদেশের মুখচ্ছবিকে আরও আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অস্পষ্ট এই স্বদেশের ছবি আমাদের সন্তানদের মোটেই মহৎ কিছু অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত তো করেইনি, বরং উল্টো তাদের বিভ্রান্ত করতে শুরু করেছিল। তারা তাই স্বদেশের মলিন মুখ দেখতে দেখতে নিজেরাও হতাশার সাগরে ডুবে যেতে বসেছিল। এজন্য তাদেরকে দোষও দেয়া যায় না। এতদিন তারা জেনে এসেছে, একাত্তরের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং পরের দিন মেজর জিয়া মহান

নেতা শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা বেতারে পাঠ করেন। এত বছর পর তাদের সেই জানাকে উল্টে দিয়ে ইতিহাসের এক দুঃসহ পর্বে বলার চেষ্টা করা হয় যে, ২৫ মার্চ রাতে (অর্থাৎ ২৬ মার্চ) শেখ মুজিব নয়, জিয়াই স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন। এমনও বলা হয়েছে যে, যার যা আছে, তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনিই নাকি বলেছিলেন। ইতিহাসকে এমন করে বদলে দেবার এই প্রচেষ্টার কারণে সবচেয়ে বিপদে পড়েছিল আমাদের নিষ্পাপ সন্তানেরা। সেই সময় একটি টিভি চ্যানেলের সংবাদে দেখেছিলাম ইতিহাস নিয়ে এই ধাক্কাধাক্কির বিষয়ে কয়েকটি শিশুর প্রতিক্রিয়া। তখন মনে হয়েছিল, তারা সত্যি অসহায়। বিভ্রান্ত শিশুরা তখন বলেছিল যে, এমন করে সময়ে সময়ে স্বাধীনতার ঘোষণার মতো মৌল বিষয়ে পরিবর্তন হলে তারা কোনটা বিশ্বাস করবে? তাদের পাঠ্যসূচি কেন রাজনৈতিক বিবেচনায় বদলে ফেলা হয়? জাতির আত্মা নিয়ে কেন এভাবে টানাটানি হয়? পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে কি এভাবে মীমাংসিত জাতীয় গৌরবের বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়?

এ প্রশ্ন শুধু শিশুদের নয়। দেশের কল্যাণ নিয়ে যাঁরা ভাবেন, তাঁরা সবাই ইতিহাস নিয়ে এই চক্রান্তের কারণে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। অনেকে বিরক্তও হয়েছিলেন। কেননা ইতিহাসের সত্যকে ইচ্ছে করলেই নিজের প্রয়োজনে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেয়া যায় না। বিশেষ করে আমরা যারা চোখের সামনে মুক্তিযুদ্ধ হতে দেখেছি, নিজেরা তাতে অংশগ্রহণ করেছি, তাদের পক্ষে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা মেনে নেয়া মুশকিল। নিজের চোখকে, কানকে অবিশ্বাস করি কী করে?

অথচ যাঁরা এ কাজটি করেছেন কিংবা এখনো করছেন তাঁরাও নিশ্চয় জানেন ইতিহাসের সত্যকে জোর করে মনগড়া খাতে প্রবাহিত করা যায় না। ইতিহাস ছাইচাপা আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলতেই থাকবে। ইতিহাস কারও ক্রীতদাস নয়। ইতিহাসের অন্তরাত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন। এমনকি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, সেই পাকিস্তানিরাও এখন পর্যন্ত বাঙালির ইতিহাস নিয়ে এমন করে ছক্কা-পাঞ্জা খেলার সাহস দেখায়নি। বরং, তাদের কেউ কেউ সঠিকভাবেই জানিয়েছেন সে সময়ের নিয়ন্ত্রণভার কার হাতে ছিল। অথচ আমরা নিজেরাই আমাদের ইতিহাস নিয়ে কেবলি ধস্তাধস্তি করে চলেছি। নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করছি। একাত্তরে সারা বিশ্বের অগ্রগামী গণমাধ্যমগুলোর সেরা সব প্রতিনিধি এসেছিলেন ঢাকায়। তাঁদের প্রতিবেদনগুলো এখনো কালের সাক্ষী। সেগুলোই-বা অস্বীকার করি কীভাবে? এমনকি অনেক যাচাই-বাছাই করার পর সরকারি উদ্যোগে যে *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র* তৈরি করা হয়েছিল তাকেই-বা উপেক্ষা করি কীভাবে? মনে রাখা দরকার, প্রয়াত কবি হাসান হাফিজুর রহমানের

সম্পাদনায় রচিত ঐ দলিলপত্রের তথ্যাবলি প্রামাণ্যীকরণ কমিটির সদস্য হিসেবে দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত ইতিহাসবিদরাও যাচাই-বাছাই করেছিলেন। তখন মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলটিও ক্ষমতায় ছিল না। সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সেই দলিলপত্রে তাঁদের দলীয় কোনো প্রভাব ছিল না বলে ধরে নেয়া যায়। ঐ কমিটির সদস্যরা বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, স্বাধীনভাবে তাঁরা ঐ কাজটি করতে পেরেছিলেন। ক্ষমতাসীন সরকারের নজরের ভেতরে থেকেই তাঁরা কাজ করেছেন। তাঁদের কাজে কেউ বাধা দেননি। বাংলাদেশ স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের প্রামাণ্যীকরণ কমিটির চেয়ারম্যান প্রয়াত মফিজুল্লাহ কবির ঐ দলিলপত্রের মুখবন্ধে লিখেছেন :

> 'বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনী কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পাণ্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। ... দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। ... বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি।'

জিয়াউর রহমান ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য সেক্টর কমান্ডার বা উপ-কমান্ডারদের কথা থেকেও বহু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তদানীন্তন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে নতুন করে ছাপা দলিলের পেছনের দিকের খণ্ডগুলোতে তাঁদের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দেওয়া তথ্যের বড় ধরনের গরমিল লক্ষ করা গেছে। যেমন কর্নেল মীর শওকত আলী বা কর্নেল অলি আহমদের দেওয়া তথ্যের সঙ্গেও নতুন সংস্করণের মুখবন্ধের তথ্য মেলে না। এমনকি নতুন করে ছাপা দলিলপত্রের প্রত্যয়নকারীদের কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁরা মূল তথ্য বদলানোর পক্ষে মত দেননি। তা সত্ত্বেও তথ্য বদলে গেছে। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি বেড়েছে। তবে গত কয়েক বছরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা সঠিক পথেই এগিয়েছে। বিশেষ করে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ঘাতক দালালদের বিচার সম্পন্ন হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সঠিক গতিপথ সন্ধানের কাজটি সহজ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস উৎসাহীদের, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে জানাতে বড় ভূমিকা পালন করেছে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করেই কোনো এক সামরিক কর্মকর্তার ডাকে শুরু হয়নি। এর পটভূমি তৈরি হয়েছিল

দীর্ঘদিন ধরে। হাজার বছর ধরে বাঙালি জনগোষ্ঠী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে টিকে থাকলেও একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের পর থেকেই। অবশ্য ভাষা-আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল ১১ মার্চ ১৯৪৮ থেকে। একমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে জিন্নাহ্‌র চেষ্টার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই আন্দোলন দানা বাঁধে। এ কথা ঠিক যে, বাঙালিরাও বিপুলভাবে পাকিস্তান চেয়েছিলেন। মূলত, আর্থসামাজিক মুক্তির আশা নিয়েই তাঁরা তা চেয়েছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্রটি হবে গণতান্ত্রিক, মানবিক ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণধর্মী। জমিদারি প্রথা দ্রুত উচ্ছেদ করে পূর্ববাংলার কৃষকদের ওপর শোষণের প্রক্রিয়া বন্ধ করতে এই রাষ্ট্র তৎপর হবে। প্রশাসনিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য বিকাশের পূর্ণ সুযোগ অনগ্রসর বাঙালিদের দেওয়া হবে। কিন্তু নয়া রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই সকল ক্ষেত্রে বাঙালিরা উপেক্ষিত হতে থাকে। নতুন রাষ্ট্রের বাজেটের প্রায় পুরোটাই খরচ হতে থাকে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের জন্য। সেদিনের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন তাঁরাই। তাই সরকারি জমা-খরচের ন্যায্য হিস্যা বাঙালিরা যে পাননি তাতে অবাক হবার কিছু নেই। উল্টো তাঁদের অস্তিত্বের পরিচয় যে-মাতৃভাষা সেই বাংলা ভাষার ওপর নেমে আসে নগ্ন আঘাত। ফলে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। আমলাতান্ত্রিক, অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক পাকিস্তানি রাষ্ট্রের চাপে বাঙালির বেড়ে ওঠার সকল স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায় বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে। সেদিন পুলিশের গুলিতে নিহত হয় বেশ ক'টি ভাষাপ্রেমী তাজাপ্রাণ। সেদিনই পূর্ববাংলার মূলত কৃষক-সন্তান, মধ্যবিত্ত তরুণেরা পাকিস্তান ধারণাটির কবর রচনা করে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও বহুমাত্রিক আধুনিক এক নয়া রাষ্ট্রচিন্তার বীজ বপন করে বাঙালির মনে। '৫৪-র প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়, '৬১-র রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-র ৬-দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং অসংখ্য ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান। এসব আন্দোলনে অনেক নেতারই অবদান ছিল। কিন্তু তাঁদের সকলের অবদানকে আত্মস্থ করে ধীরে ধীরে একজনই কেবল বেড়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে। আর সেকারণেই ঊনসত্তরের সফল গণ-অভ্যুত্থান শেষে ছাত্র-জনতা তাঁকে বাংলার বন্ধু বা 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ভাষা-আন্দোলনে তাঁর পাশে ছিলেন একঝাঁক দক্ষ, মেধাবী, সহযোগী নেতা ও সংগঠক—এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার। তাঁরা তাঁকে সর্বক্ষণ সহযোগিতা করেছেন বলেই

বঙ্গবন্ধুর বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি আরও বেগবান হতে পেরেছিল। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল নামটি অবশ্যই তাজউদ্দিন আহমদ। তাছাড়া সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম. মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান ছাড়াও বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী বামপন্থী নেতৃবৃন্দের অনেকের সহায়তা ও আশীর্বাদ তিনি সক্রিয়ভাবে পেয়েছেন। মওলানা ভাসানীকে তিনি সব সময় শ্রদ্ধেয় নেতার সম্মান দিয়েছেন। মওলানা ভাসানীও তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতায় অভিভূত হয়েছিলেন। তবে তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। একইসঙ্গে মণি সিংহ-মোজাফ্‌ফর আহমদের মতো অনেক নেতাই তাঁর চিন্তা ও চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবীদের সঙ্গেও ছিল তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। আর তরুণ ছাত্রনেতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল গুরু-শিষ্যের। ছিলেন সকলেরই প্রিয় 'মুজিব ভাই'।

সামরিক আইনের বেঁধে দেওয়া গণ্ডির মধ্যেও ১৯৭০ সালের নির্বাচনটি ছিল বাঙালি জাতির জন্য এক 'টার্নিং পয়েন্ট'। এই নির্বাচনকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে গণভোটে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সত্তর সালে শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে তিনি যেসব প্রাক-নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করেছিলেন, তাতেই দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত একটি স্বতন্ত্র দেশের কথা আকারে-ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছিল। এ সময়টায় ৬ দফার পক্ষে বলতে গিয়ে কার্যত তিনি স্বাধীনতার কথা আকারে ইঙ্গিতে জনগণকে বলে গেছেন। সেকারণেই সমাজের ভেতর বাঙালির আত্ম-আবিষ্কারের একটি মানসিক ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও বাঙালিকে দেশ শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার কোনো মতামত না নিয়েই তা হঠাৎ করে স্থগিত করে দেওয়া হলো। এর প্রতিবাদে একাত্তরের ১ মার্চ থেকেই বাঙালির মুক্তির দূত বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে দেশজুড়ে শুরু হলো প্রতিরোধ। তারপর ৩ মার্চ থেকে শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলনটি ছিল মূলত মুক্তিযুদ্ধেরই প্রস্তুতিপর্ব। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রমাণ করলেন যে, একটি স্বাধীন দেশ পরিচালনার সকল নৈতিক ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বাঙালির রয়েছে। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিনটি ছিল ৭ মার্চ। ঐ দিনই 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে বাঙালি জাতিকে স্বপ্ন দেখিয়ে তাঁর ইচ্ছাপূরণের পথনির্দেশ করেছিলেন রাজনীতির এক অমর কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এর পরের ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা। তাজউদ্দিন

আহমদ ও অন্যান্য বিচক্ষণ নেতার সহায়তায় এ ভূখণ্ডের পুরো বেসামরিক শাসনভার বঙ্গবন্ধু নিজের হাতে তুলে নিলেন। তাঁর নির্দেশেই একাত্তরের মার্চ মাসের বেশিরভাগ সময় বাংলার জীবন ও প্রশাসন স্বাধীনভাবে চলতে থাকে (দ্র. আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৮)। পাশাপাশি সশস্ত্র সংগ্রাম করে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের স্বপ্নও বাঙালির মনে সুদৃঢ় হতে থাকে। ঔপনিবেশিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা আলাপ-আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে ২৫ মার্চ কালরাতে হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। এর পরপরই ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই টেলিফোন, টেলেক্স, টেলিগ্রাম ও ইপিআরের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইংরেজি সেই ঘোষণায় তিনি বলেন:

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent, I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved" (*বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র* তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮২, পৃ. ১)।

ঐ সময় যেসব বাঙালি জেলা প্রশাসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন তাঁরা এই ঘোষণাপত্র পেয়েছিলেন। এদের কেউ কেউ এখনো ঐ ঘোষণাপত্রের কপি সংরক্ষণ করে চলেছেন। তাদের এখন মুখ খোলা উচিত। সে সময় ডেপুটি কমিশনার ছিলেন এমন একজন বলেছেন এই ঘোষণার কপি তিনি ২৬ তারিখেই পেয়েছিলেন। আরও অনেকেই তা পেয়েছিলেন।

স্বাধীনতা-ঘোষণার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার এই ঘোষণা নানাভাবে জনগণের কাছে প্রচার হতে থাকে। চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রথমেই প্রচার করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এম. এ. হান্নান। ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে যখন মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণাটি একটু ভিন্নভাবে পুনরায় পাঠ করলেন, তখন উত্তেজিত, অস্থির ও মুক্তিপাগল জনগণের মনে স্বস্তি ও সাহস দুই-ই যোগ হয়েছিল। সেদিনের ঐ ঘোষণার যে ক্যাসেটটি এখন পাওয়া যাচ্ছে, তাতে তিনি আমাদের মহান জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষেই স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেছিলেন :

'I, Major Ziaur Rahman, do hereby declare independence of Bangladesh on behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.'

Anthony Mascarenhas তাঁর *Bangladesh: A Legacy of Blood* (1986) বইয়ের 'Zia: The Man and the Myth' শিরোনামের একাদশ পরিচ্ছেদে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। বেতারকর্মী বেলাল মোহাম্মদকে উদ্ধৃত করে তিনি জানিয়েছেন যে, একাত্তরের ২৬ মার্চ ২-৩০ মিনিটে এম. এ. হান্নানই প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন। কিন্তু ১০ কিলোহার্টজের ট্রান্সমিটারে প্রচারিত সেই ঘোষণাটি মাত্র ৬০ মাইলের মধ্যকার সামান্য সংখ্যক মানুষই শুনতে পেয়েছিলেন। কিন্তু পরের দিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ সন্ধে ৭-৩০ মিনিটে কালুরঘাট থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মেজর জিয়ার ঘোষণাটি বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতীয় ভূখণ্ডের বেতার-তরঙ্গে ধরা পড়ে এবং এভাবেই তিনি ইতিহাসে তাঁর নাম লিখতে সক্ষম হন। বেলাল মোহাম্মদ এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন এবং বলেছেন। আমি নিজে তাঁর মুখ থেকে এ ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনেছি। মেজর রফিকের (A Tale of Millions (1974) বইতেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐ ক্রান্তিকালে তৎকালীন মেজর জিয়ার ভূমিকা নিয়ে যে-আলোচনা রয়েছে তিনি জীবদ্দশায় তার বিরোধিতা করেননি (দ্র. Mascarenhas, প্রগুক্ত, পৃ. ১২০)। তবে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে একই ঘটনা একটু অন্যভাবে রেকর্ড করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে :

(I) Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaims, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.

I also declare, we have already framed a sovereign, legal Government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution. The new democratic Government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all Government to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.

The Government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world. (দ্র. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮২, পৃ. ২)।

উল্লেখ্য, 'মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের স্বাধীনতা-ঘোষণা পাঠের ঐতিহাসিক মূল কপিটি নিরাপত্তার কারণে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল'। (পাদটীকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২)। তবে স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার টেপরেকর্ড,

২৭ মার্চ, ১৯৭১ এবং *দি স্টেটসম্যান*, দিল্লী, ২৭ মার্চ, ১৯৭১ সূত্র ধরে উপরের ঘোষণাটি *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্রে* লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁর ঐ বেতার ঘোষণাটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। তাছাড়া ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চের *দৈনিক বাংলায়* 'একটি জাতির জন্ম' শিরোনামে যে লেখাটি জিয়াউর রহমান লিখেছিলেন তাতে বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা বলে অন্তত দুবার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'তারপর এল ১লা মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন।' এরপর তিনি ৭ মার্চের কথা লিখেছেন। তাঁর ভাষায়, '৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগনাল বলে মনে হলো।' ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে যে বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন তার স্বীকৃতি সেদিনের দখলদার পাকিস্তানিদের লেখাতেও ধরা পড়েছে। জেনারেল নিয়াজীর জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক তাঁর *Witness to Surrender* গ্রন্থেও বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার কথা লিখেছেন। মাসুদুল হক অনূদিত সিদ্দিক সালিকের *নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল* (নভেল পাবলিকেশন, ১৯৮৮) গ্রন্থে লেখা হয়েছে : 'যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিওর সরকারি তরঙ্গের (ওয়েভলেংথ) কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ওই কণ্ঠের বাণী মনে হলো আগেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল। তাতে শেখ মুজিব পূর্ব-পাকিস্তানকে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন।' (পৃ. ৮৫)। পরবর্তীকালে পাকিস্তান সফরকারী এক বাঙালি সাংবাদিকের কাছে জেনারেল টিক্কা খানও বলেছেন যে, শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর তিনি চিনতেন এবং ২৬ মার্চের ঐ ঘোষণা যে বঙ্গবন্ধুরই ছিল তিনি সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন (মুসা সাদিক, 'ইতিহাসের আলোকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা', জনকণ্ঠ, ৪ এপ্রিল, ২০০২)।

বিবিসিও স্বাধীনতার এই ঘোষণার কথা প্রচার করেছিল। ২৭ মার্চ বিবিসির সকালের অধিবেশনে বলা হয় '... শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।' ('বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বিবিসি', বিসিডিজেসি, ২০০১)। ঐ একই গ্রন্থে মার্ক টালীর এক প্রতিবেদনের উল্লেখ রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে : 'খবর পাওয়া গেছে যে, শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ... প্রেসিডেন্টের (ইয়াহিয়া খান) বক্তৃতায় কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখেননি যে, সঙ্কটের জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবেই শেখ মুজিব এবং তাঁর অনুসারীদের দোষী করেছেন।'

উল্লেখ্য, ইয়াহিয়া খান ঐ ভাষণেই দম্ভ করে বলেছিলেন, 'এইবার শেখ মুজিব তাঁর শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারবেন না।' এ কথা তর্কাতীত যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার তিনিই ছিলেন মধ্যমণি। আর সেই কারণেই ১০ এপ্রিল '৭১ মুজিবনগর থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র দেওয়া হয় তাতেও বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি পুনরায় নিশ্চিত করা হয় (দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮২, পৃ. ৪-৬)।

"Whereas in the facts and circumstances of such treacherous conduct Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of the 75 million people of Bangladesh, in due fulfilment of the legitimate right of self-determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971, and urged the people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh." (দ্র. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮২, পৃ. ৪)।

সেই ঘোষণাটিই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূল স্তম্ভ। এটিই ছিল জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের তথা স্বাধীনতার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। সেই অর্থে আমাদের পবিত্র সংবিধানের অংশও। আমাদের স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। ব্রিটিশ পত্রপত্রিকাও বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন তা নিশ্চিত করেছে। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চের *দি টাইমস* প্রথম পাতায় শিরোনাম করেছিল : 'Heavy fighting as Sheikh Mujib declares E. Pakistan independent.' অনুরূপভাবে একই দিনে *দি গার্ডিয়ান* লিখেছিল : 'Shortly before his arrest, Mujib had issued a proclamation to his people which informed them: you are citizens of a free country.'

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ইতিহাসবিদদের একটি নির্ভরযোগ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। দেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের সম্পাদনায় এই প্রতিষ্ঠান ১১ খণ্ডে *বাংলাপিডিয়া* প্রকাশ করেছে। *বাংলাপিডিয়াতে* স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন (দ্র. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, *বাংলাপিডিয়া*, ২০০১)। এই *বাংলাপিডিয়ার* প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম দলিলপত্রের নয়া সংস্করণের প্রামাণ্যীকরণ কমিটিতেও ছিলেন। তিনি নতুন সংস্করণে মূল দলিলে তথ্য পরিবর্তনে সম্মত হতে পারেননি বলে কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন এবং ইতিহাসের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। একাত্তরের নয় মাস ধরে যে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয় তার সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুরই

নামে তাঁরই আস্থাভাজন নেতৃবৃন্দ (সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিনসহ আরও অনেকে)। যুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রতিদিন দুবার তাঁর *বজ্রকণ্ঠ* প্রচারিত হতো এবং মুক্তিযোদ্ধারা তাতে উজ্জীবিত হতেন, সাধারণ মানুষ অনুপ্রাণিত হতেন, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, '২৫ মার্চ মাঝরাতে ইয়াহিয়া খান তার রক্তলোলুপ সাজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যে নরহত্যাযজ্ঞের শুরু করেন তা প্রতিরোধ করবার আহ্বান জানিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।' (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮)। ঐ ভাষণে তৎকালীন মেজর জিয়ার কথাও এসেছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবার জন্য তাঁর প্রশংসাও তিনি করেছেন। কিন্তু এ কথা সত্যি নয় যে, তাজউদ্দিন আহমদ মেজর জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে কোথাও স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমন দাবি করে উভয়কেই বিতর্কিত করার এই প্রচেষ্টাও নিন্দনীয়।

তাছাড়া সম্প্রতি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিবরণ সংবলিত অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি বের হয়েছে রোয়েদাদ খানের সম্পাদনায় (১৯৯৯) *The American Papers*। এই বইয়ে সন্নিবেশিত ঢাকাস্থ মার্কিন কন্সুলার অফিস থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে পাঠানো গোপনীয় চিঠি ও দলিলপত্র পড়লেও বোঝা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-ঘোষণা দেবার মতো নৈতিক ও রাজনৈতিক সক্ষমতা শুধু একজনেরই ছিল। খুব সম্ভব সেকারণেই ২০০২ সালের ডিসেম্বরেও বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের ওয়েবসাইটে (দেখুন : http: /www. bangladoot.org/ aboutbangladesh.asp) একই কথা আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে,

'Bangabandhu declared the independence of Bangladesh on March 26, 1971 and urged upon the people to liberate the country through armed struggle. The entire nation stood like a rock and followed the command of their supreme leader and finally succeeded in vanquishing the marauding Pakistan occupation forces.'

সেদিনের সকল বার্তা, আলোচনা, সমালোচনা ছিল শুধু একজনকেই ঘিরে। তিনি বাঙালির প্রশ্নাতীত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। রোয়েদাদ খানের ঐ বইয়ের ৪৫৭ পৃষ্ঠায় শেখ মুজিবকে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। একই বইয়ের ৪৬৫ পৃষ্ঠায় তাঁর 'Charismatic Personality'র বর্ণনা দেয়া রয়েছে। তবে অন্য গুরুত্বপূর্ণ এক গোপন দলিলে (৫ মার্চ, ১৯৭১) State

Department বিশ্লেষণ করেছে এভাবে– 'All indications are that Mujib intends to cast the die in his speech on March 7 and will probably call for action tantamount to independence.' (ঐ, পৃ. ৪৯৮)। অর্থাৎ পরবর্তীকালে ঠিকই লক্ষ করা গেল, তিনি ৭ মার্চের ভাষণে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও তাঁকে প্রায় স্বাধীনতার ঘোষণাই বলা চলে। এরপর অন্যান্য দলিলপত্রেও শেখ মুজিব কর্তৃক 'স্বাধীন বাংলাদেশ' ঘোষিত হওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে (দেখুন ঐ, 'Alternate US postures toward possible East Pakistan secession', পৃ. ৫০৮-৫১২ এবং 'Contingencies and actions to be taken in the event of separation' পৃ. ৫১২-৫১৭)। বিদেশি এসব দলিলপত্রের কোথাও শেখ মুজিবকে আপসকামী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। বরং স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবেই তাঁকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মার্কিন গোপন দলিলে আশঙ্কা করা হয়েছে যে পূর্ব-পাকিস্তান ধীরে ধীরে স্বাধীনতা ঘোষণার দিকেই এগুচ্ছিল : 'With the steady drift toward independence in East Pakistan over the past several days this posture has now been overtaken as a practical recourse. ... If agreement is not reached Mujib is expected to announce on March 7 complete or virtual independence ... .' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩)। কোনো সন্দেহ নেই, সেদিন তিনি কার্যত স্বাধীনতাই ঘোষণা করেছিলেন।

ইউপিএল প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বই হচ্ছে সাবেক মার্কিন কূটনীতিবিদ আর্চার ব্লাডের *The Cruel Birth of Bangladesh* (২০০২)। একাত্তরের দুর্বিষহ দিনগুলোতে তিনি ঢাকায় কূটনীতিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সুতরাং, বাংলাদেশের জনগণের এবং তাঁদের প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃবৃন্দের মনোভাব যেভাবে তিনি তাঁর এই বইয়ে বর্ণনা করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বইয়েরও মধ্যমণি শেখ মুজিবুর রহমান। ব্লাড নিয়মিত ওয়াশিংটনে বার্তা পাঠাতেন। সেইসব বার্তাতেও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইঙ্গিত ছিল। ৬ দফার প্রশ্নে শেখ মুজিব বরাবরই অনমনীয় ছিলেন। এ পর্যায়ে তিনি 'পূর্ব-পাকিস্তান'-এর বদলে 'বাংলাদেশ' শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। শব্দের এই রূপান্তরও যে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, সে দিকটিও ব্লাডের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি লিখেছেন :

'Upon rereading this report after a gap of many years I was struck by Mujib's frequent reference to Bangaldesh instead of East Pakistan. I do not recall any earlier public use of the term Bangladesh which means Bangali homeland. Mujib may have done

so in order to convey a subtle hint to a West Pakistani audience that there was an alternative to the continual union of East Pakistan and West Pakistan. In those early days of 1971 Bangladesh was expressed in two words, later when joined together Bangladesh carried the clear connotation of an independent country, i.e. for the Bangalis of East Pakistan.' (Archer K Blood, *The Cruel Birth of Bangladesh*, UPL, ২০০২ ; পৃ. ১৪৬)।

১ মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর বাংলাদেশের স্বাধীন অভ্যুদয় যে অবধারিত হয়ে যায় সে কথাটি ব্লাডের কথায় ফুটে ওঠে। অসহযোগের অবয়বে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা যে স্বাধীনতা-আন্দোলনে রূপ নেবে সে কথা তিনি স্পষ্টই বলেছেন : 'It would be difficult, perhaps impossible, for the movement toward independence to be checked now.' (ঐ, পৃ. ১৬৩)। তাই ইতিহাসের এই বাস্তবতা সেই আন্দোলনের অদ্বিতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মওদুদ আহমদও জাতির প্রতিষ্ঠাতা জনক ('the founding father') বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন (দ্র. আহমদ, ২০০২, পৃ. ৫১)। পাশাপাশি তিনি জিয়াউর রহমানকে সমরনায়ক (war hero) বলে পরিচিতি দান করেছেন (ঐ, পৃ. ৫২)। *The New Encyclopaedia Britanica* Vol ৯ (১৯৯৮, পৃ. ৪২৭), ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেছে। সেই তথ্যমতেও শেখ মুজিবই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে :

'The success by the Awami League in East Pakistan surprised even its friends. Sheikh Mujib emerged with a majority at his command among the membership of the new assembly (167 of the 300 total). ...Yahya's plan provided that when the new assembly met it must produce a constitution within 100 days. Mujib, however, stood out for complete independence for East Pakistan except for foreign policy, though the East wanted to make its own aid, trade and defense agreements. Bhutto rejected these terms and refused to bring his party to Dacca to participate in the assembly. On March 1, 1971, President Yahya announced that the National Assembly would be suspended indefinitely. Sheikh Mujib replied by ordering a boycott and general strike throughout East Pakistan. Bowing to the inevitable Yahya proceeded to Dacca in mid-March to negotiate a compromise that would concede the substance of Mujib's demands while retaining tenuous ties that might still preserve the name of

Pakistan. But compromise proved impossible. President Yahya denounced Mujib and his men as traitors and launched a drive to 'reoccupy' the East with West Pakistan troops.'

'Warfare between government troops and supporters of the Awami League broke out in the East in March. Sheikh Mujib and many of his colleagues were arrested while others escaped to India, proclaiming East Pakistan an independent state under the name Bangladesh (Bengal Land).'

উপরের এই উদ্ধৃতিতে reoccupy বা পুনরুদ্ধারের কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকল অর্থেই অসহযোগের দিনগুলোতে বাঙালিরা স্বাধীন দেশে বাস করছিলেন। তাই পাকিস্তানের শাসকরা তা পুনরায় উদ্ধারের লক্ষ্যে যুদ্ধে নামে। আর এই যুদ্ধের প্রধানতম টার্গেট ছিলেন শেখ মুজিব।

এতটা বিস্তৃতভাবে দলিলপত্র উদ্ধৃত করে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গটি টানলাম এজন্য যে, এই বিষয়টি নিয়ে এক সময় অযথা একটি বিভ্রান্তিকর বিতর্ক জিইয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের নয়া সংস্করণ প্রকাশের নামে সেই বিতর্ককে আরেক দফা উসকে দেওয়া হয়েছিল। এখন নিশ্চুপ থাকলেও মূলত রাজনৈতিক ফায়দা অর্জনের জন্য যারা এই বিতর্ক জিইয়ে রাখতে চেয়েছিলেন বা চান তারা সুযোগ পেলেই তা ফের উসকে দিতে দ্বিধা করবেন বলে মনে হয় না। তবে বেশ জোর দিয়েই বলতে পারি, এই বিতর্ক ইতিহাসের স্রোতে একদিন ভেসে যাবেই। এরই মধ্যে তা অনেকটাই উবে গিয়েছে। এই বিতর্কের মাধ্যমে শুধু শুধু মুক্তিযুদ্ধের আরেকজন সমরনায়ককে (যিনি নিজেও বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির পিতা' মানতেন) খাটো করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, জীবদ্দশায় এ ধরনের বিতর্ককে জিয়াউর রহমান কখনো প্রশ্রয় দেননি। আশা করছি, ইতিহাসে যাঁর যেস্থান নির্ধারিত হয়ে আছে তার হেরফের করার কুযুক্তি ও কুবুদ্ধি দেওয়ার মতো সুবিধাবাদী মানুষের সংখ্যা নেহাত কম না হওয়া সত্ত্বেও জাতি তাতে বিভ্রান্ত হবে না। বরং, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল পর্যায়ের সংগঠক ও নেতাদের প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধারা অব্যাহত থাকবে। সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে অযথা এই ধস্তাধস্তির অবসান হওয়া একান্ত জরুরি। জাতীয় ঐক্যমতের জন্যই এ প্রশ্নে চূড়ান্ত বোঝাপড়া কাম্য। আমাদের জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থেই তা হওয়া উচিত। কোমলমতি শিশুদেরও নিজেদের গৌরবগাথা থেকে বঞ্চিত করার কোনো অধিকার আমাদের নেই (দেখুন আতিউর রহমান, বঙ্গবন্ধু সহজপাঠ (২০১৬) এবং *Bangabandhu Primer* (২০১৭) জার্নিম্যান বুকস। বড়ই স্বস্তির কথা এই যে, ২০০৭ সালের শেষ দিকে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তৎকালীন শিক্ষা-উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরির সদিচ্ছার কারণে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমে বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির পিতা' এবং ২৬ মার্চ তিনিই যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তা পরিষ্কার করে লেখা হয়েছে এবং এও লেখা হয়েছে, ২৭ মার্চ একাত্তরে তাঁর সেই ঘোষণাই ফের পাঠ করেছিলেন সেদিনের মেজর জিয়াউর রহমান। পাশাপাশি প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানের টুঙ্গিপাড়া সফর এবং জাতির পিতাকে যোগ্য সম্মান প্রদর্শনের ফলে তাঁকে ঘিরে অযথা বিতর্ক অনেকটাই স্তিমিত হয়েছিল। তবে ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইতিহাস এখন সঠিক পথেই এগুচ্ছে।

তা সত্ত্বেও ইতোমধ্যে যা স্বীকৃত সত্য সে বিষয়ে অযথা সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টির এই আত্মঘাতী পথ থেকে সংশ্লিষ্টজনদের সরিয়ে আনার জন্য প্রবল জনমত তৈরির পক্ষে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। যিনি না জন্মালে বাংলাদেশই সৃষ্টি হতো না, যাঁর মুখচ্ছবিই আসলে বাংলাদেশের মানচিত্রে সর্বক্ষণ ভাসে, তাঁকে বাদ দিয়ে মনগড়া ইতিহাস লেখার অপচেষ্টা যেন স্বার্থান্বেষী মহল আগামী দিনগুলোতেও চালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য সামাজিক চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। তবে, এভাবে ইতিহাস বদলে ফেলার চেষ্টা করলেই বঙ্গবন্ধুকে বাঙালির চিন্তাজগৎ থেকে উপড়ে ফেলা যাবে না। শত অপচেষ্টা সত্ত্বেও ইতিহাসে তাঁর যে অটল অবস্থান তা দিন দিনই আরও মজবুত হবে। তাঁর ঐ অবস্থান নিয়ে তাঁর অনুরাগীদেরও দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তাঁকে আরও বড়ো করারও প্রয়োজন নেই। যে বামনেরা তাঁকে মাথায় আঘাত করতে চেয়েছে, তারা তাঁর নখও স্পর্শ করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে না। ইতিহাস তাঁর যা প্রাপ্য তা তাঁকে দিতে সামান্যতম কার্পণ্য করবে না। ঠিক একইভাবে ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের অন্য নেতৃবৃন্দ এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক ও মহিমান্বিত স্থান নির্ধারণ করে দেবে। তাই যারা নিজেদের ইচ্ছেমতো ইতিহাস র্নিমাণের জন্য শুধু শুধু পরিশ্রম করে থাকেন তাদের জন্য বরং করুণাই হয়। দুঃখ হয় এজন্য যে, এদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত (?) জনও রয়েছে। ইতিহাস যে কারও ধার ধারে না, এ কথা তো অন্তত তাদের জানার কথা। নিঃসন্দেহে সময়ই ইতিহাসের সত্যকে খুঁজে নেবে। বলতে দ্বিধা নেই যে, সে প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আমার ধারণা, দিন দিন এই প্রক্রিয়া আরও বেগবান হতে থাকবে। আমাদের নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সত্যিকারের ইতিহাস জানবে, বুঝবে এবং নিজেদের গর্বিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে সেই প্রত্যাশা করছি।



৮ বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তি-চিন্তা (এক)

যারা আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে এবং ভোট দিয়েছে আমি মরে গেলেও আমার আত্মা তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি যখন দেখতে পাবে, তখন শান্তি পাবে। ৭ কোটি মানুষকে হত্যা করতে পারবেন না। আমি না থাকলেও বাংলার মানুষ তাদের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাবে।

(—বঙ্গবন্ধু; পল্টনের জনসভা, ৩ মার্চ, ১৯৭১)

স্বাধীনতা। মুক্তি। সমৃদ্ধি। সাম্য। শব্দগুলো পরপর বেজে ওঠে মনের গহীনে। ৩৭ বছর বয়সী এই বাংলাদেশে শব্দগুলোর ধার অনেকটাই কমে এসেছে। বহুল ব্যবহার ও প্রয়োগে আন্তরিকতার অভাবের কারণেই এমনটি হয়েছে। শব্দগুলোর মর্মকথা না বুঝেই আমরা যত্রতত্র তাদের ব্যবহার করেছি। সত্যি সত্যি এই শব্দগুলোর অন্তর্জাত অর্থ যদি আমরা জন-জীবনে প্রয়োগ করতে চাই তাহলে আমাদের আরও বেশি আন্তরিক, দেশপ্রেমিক এবং মানবিক হতে হবে। শুধু জনতুষ্টির জন্য নয়, এসব শব্দের ভেতরে প্রবেশ করা চাই। সেজন্য প্রয়োজন উন্নয়ন নীতি ও আইনি সংস্কারে ব্রতী হওয়া। রূপায়ণে একনিষ্ঠ হওয়া চাই। সমাজকে পুনর্গঠন করা চাই।

'স্বাধীনতা' শব্দটি সম্প্রতি অমর্ত্য সেনের কল্যাণে নতুন এক ব্যঞ্জনা পাচ্ছে। নতুন মর্মার্থ বহন করছে। এ যাবৎকাল আমরা স্বাধীনতাকে সীমিত অর্থেই ব্যবহার করে এসেছি। মুখ্যত, এতদিন ধরে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই আমরা বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। সার্বভৌমত্বের সমার্থক এই শব্দটিকে এখন নানা মাত্রায় প্রয়োগের চেষ্টা করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে আজকাল স্বাধীনতার কেন্দ্রে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। পৃথিবীব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ফলে বস্তুগত জীবনমানেরও উন্নতি

হয়েছে। সমৃদ্ধি নিশ্চয় বেড়েছে। সুযোগও বেড়েছে। কিন্তু এত সমৃদ্ধি সত্ত্বেও বহু মানুষ এখনো বাঁচার ন্যূনতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই আমাদের বাংলাদেশেই ছয় কোটির মতো মানুষের আয়-উপার্জন দিনে এক ডলারেরও কম। এই সামান্য আয়ের মানুষেরা সর্বক্ষণ শুধু বেঁচে থাকার চিন্তাতেই প্রাণান্ত। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগের সময় ও সুযোগ তাদের কোথায়? অথচ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ এত বেশি সম্পদ ও সুযোগের অধিকারী যে তাঁরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অন্য সব রকম স্বাধীনতাই ভোগ করছেন। এঁরাই অভিজন। এঁরাই ক্ষমতাবান। আর এর আগে যাঁদের কথা বললাম তাঁরা অভাজন। তাঁরা নিঃস্ব। ক্ষমতাহীন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে-আন্দোলন বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল, তার মর্মকথাই ছিল এই অভাজনদের উন্নতি। তাঁদের জীবনযাপনের সুযোগ বৃদ্ধি। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে এঁদের দুঃখ-বঞ্চনার কথাই সে সময়ের নেতারা বেশি করে বলেছেন। এঁদের সন্তানরাই দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলো যাঁদের আত্মত্যাগে তাঁরাই অবহেলিত থেকে গেলেন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সকল ক্ষেত্রেই আজ অভিজনদের কর্তৃত্ব। আয়ের বৈষম্য বেড়ে গেছে। ভালো শিক্ষার সুযোগ থেকে সাধারণের সন্তানরা বঞ্চিত। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারছে না বেশিরভাগ মানুষ। নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগ করা যায়নি বলে অন্যায় করেও সুবিধাভোগীরা পার পেয়ে যাচ্ছে। অভাজনরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। অশান্তির মধ্যে পড়ছেন। সব ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় তাঁরা ভুগছেন। সকল ক্ষেত্রেই অভিজন ও অভাজনের মধ্যে বৈষম্য বেড়েই চলেছে। বৈষম্য স্বাধীনতাকে খণ্ডিত করে। খর্ব করে। অনেকের পরাধীনতার বিনিময়ে কতিপয়ের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। অমর্ত্য সেন তাঁর বই *Development as Freedom* (১৯৯৯) বইতে লিখেছেন, সর্বক্ষেত্রে সীমাহীন সমৃদ্ধি সত্ত্বেও আজকের বিশ্ব সংখ্যাগুরু মানুষকে প্রাথমিক সব স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। তিনি তাঁর বইয়ে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন কী করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অন্যান্য স্বাধীনতা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকার ওয়ারিতে বাস করতেন অমর্ত্য সেনের পরিবার। এক বিকেলে ১০ বছরের অমর্ত্য বাড়ির ভিতরে খেলছিল। হঠাৎ একজন মানুষ কাঁদতে-কাঁদতে তাদের বাড়ির গেট পেরিয়ে ঢুকে পড়েছেন। তার পিঠে ছুরির আঘাত। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার শিকার কাদের মিয়া। দিনমজুর। অমর্ত্যর বাবা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও বাঁচাতে পারেননি। হাসপাতালে যাবার পথে কাদের মিয়া অমর্ত্যর বাবাকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী তাকে বৈরী এলাকায় যেতে মানা করেছিলেন। ঘরে অভুক্ত সন্তান। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে তাঁকে

এভাবে জীবন দিতে হলো। এই অভিজ্ঞতা অমর্ত্য সেনকে পরবর্তীকালে ভাবতে শিখিয়েছে যে, দারিদ্র্যের কারণে অর্থনৈতিক যে পরাধীনতা সৃষ্টি হয় তার ফলে মানুষ এতটাই অসহায় হয়ে পড়ে যে, অন্য সকল স্বাধীনতা থেকেও সে বঞ্চিত হয়। যদি তাঁর ঘরে খাবার থাকত বা খাবার জোগাড় করার মতো পয়সা থাকত নিশ্চয় কাদের মিয়াকে ওই দুঃসময়ে শত্রু-এলাকায় কাজের খোঁজে বের হতে হতো না। আর সে কারণেই অমর্ত্য সেন লিখেছেন, অর্থনৈতিক পরাধীনতা মানুষের সামাজিক পরাধীনতার কারণ হতে পারে। উল্টো কথাটাও সত্যি। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও অভাব দেখা দিতে পারে। স্বাধীনতার এই বৃহৎ চালচিত্রেই অমর্ত্য সেন উন্নয়নচিন্তা করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে আলাপ করতে গেলেই এর নানা মাত্রার, নানা অর্থের দিকে নজর না দিয়ে উপায় নেই। বিশেষ করে, আমরা যদি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর কথা স্মরণে আনি, পরবর্তী পর্যায়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূল সুর ধরার চেষ্টা করি, তাহলে অভাজনের অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টিই সামনে চলে আসে। আমাদের সমকালীন উন্নয়ন-কৌশলে যদিও সামাজিক ন্যায়বিচার বা অভাজনদের আর্থসামাজিক ন্যায্য পাওনার কথা– 'পাবলিক অ্যাকশন'-এর কথা তেমন জোর দিয়ে বলি না, তাহলেও এ কথা মিথ্যা হয়ে যায় না যে, আমরা মূলত আর্থসামাজিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যেই বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম। আর এই যুদ্ধের যিনি প্রধান নায়ক সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও আজীবন অভাজনের চাওয়া-পাওয়ার কথাই বলে গেছেন। তাঁর আহ্বানেই অভাজনের সন্তানেরা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন। আর সে কারণেই তাঁকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতার মর্মকথা বোঝার চেষ্টারও কোনো মানে হয় না। সত্য যে, আরও অনেকেই আমাদের জন্য তাঁদের অবদান রেখেছেন। প্রয়োজনীয় নেতৃত্বও দিয়েছেন। কিন্তু তিনিই প্রথম এইসব অর্জনকে, অন্যান্য নেতৃত্বের ফসলকে সমবায় করে বাঙালির ঘরে তোলার মহৎ আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন। আর সে কারণেই মনে হয়, তিনি না জন্মালে কি এত তাড়াতাড়ি 'বাংলাদেশ' নামের দেশটি আমাদের হতো? এমন নিবেদিতপ্রাণ এই নেতা সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে বের হয়ে এসে কী করে একটি দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করলেন সে এক চমকপ্রদ কাহিনি। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন ইতিহাসের এক রাখাল বালক, যিনি একটি সাধারণ মানুষের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ধীরে ধীরে নিজে বেড়ে উঠেছিলেন এবং বাড়িয়ে তুলেছেন এক আপসহীন জাতির স্বকীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে। সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়াকে সম্পূর্ণভাবে

এবং সজ্ঞানভাবে নিজের বুকে ধারণ করে তিনি তা আবার পুরো জাতির স্বপ্নের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। সেই কারণেই তাঁর শুধু প্রশংসা করে নয়, তাঁর সীমাবদ্ধতাকে বড় করে দেখিয়েও নয়, প্রয়োজন জনগণের সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রতীক কী করে তিনি হতে পেরেছিলেন সেই বিষয়টি অনুধাবন করা। বিচার করা। এমন একটি মুহূর্ত কাটেনি যখন তিনি বাংলাদেশ ও বাঙালির সার্বিক মুক্তির কথা ভাবেননি। বাংলাদেশ ছিল তাঁর ধ্যান, তাঁর আত্মার অংশীদার। আর তা ছিল দুঃখী মানুষের বাংলাদেশ। সাধারণের বাংলাদেশ।

সাধারণ মানুষের সেই চাওয়া-পাওয়াকে বাস্তব রূপায়ণের উদ্যোগও তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু সময় ছিল বৈরী। প্রশাসন-ব্যবস্থা নড়বড়ে। রাষ্ট্র নতুন। চারদিকে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র। দল খানিকটা বিভক্ত। 'চাটার দল' সক্রিয়। মানুষের প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী। সাধ্য ও সুযোগ সীমিত। ভুল বোঝাবুঝি তাই প্রবল। মুক্তিযোদ্ধারা বিভ্রান্ত। কেউ কেউ হতাশ। স্বার্থান্বেষী মহল এই হতাশার আগুনে ঘি ঢেলে দিতে মোটেও দ্বিধা করেনি। তবুও তিনি লড়েছিলেন বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য। অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করার জন্য তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারেরও সূচনা করেছিলেন। তিনি সর্বক্ষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রশ্নে। এমনি এক বাস্তবতায় এল তাঁর ওপর চূড়ান্ত আঘাত। '৭৫-এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হলো খানখান। এরপরের ইতিহাস সবারই জানা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিরোধী পথে দেশের উল্টোযাত্রার কথা আজ আর বিস্তৃতভাবে বলার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো মনে হয় না, দেশে অভাজনের স্বাধীনতা লাভের সুযোগ আশাতীতভাবে বেড়েছে। বরং মনে হয়, অভিজাতরাই (এলিট) আরও পোক্ত হচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চিন্তার সঙ্গে এ প্রবণতা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তিনি ছিলেন সমস্ত সমাজের এবং পরবর্তী সময়ে জাতির ভরসার প্রতীক এক বিশ্বস্ত বিস্তারীর প্রতিমাস্বরূপ। এমন এক সময় আমাদের জাতীয় জীবনে এসেছিল যখন তাঁর সঙ্গে যোগ রাখলেই মনে হতো সকলের সঙ্গে যোগ রাখা হচ্ছে। মনের মতো একজন মানুষকে আমাদের পিতামহরা, প্রপিতামহরা দীর্ঘদিন ধরেই খুঁজছিলেন। তাঁরা এমন একজন নেতাকে খুঁজছিলেন যাঁর চোখ দিয়েই পুরো সমাজকে দেখা যায়। যাঁর মুখ দিয়েই সমাজের নিচ থেকে উপর পর্যন্ত সকলের চাওয়া পাওয়ার কথা বলানো যায়। যাঁর সংস্পর্শে এলে সকলেই সাহসী হয়ে ওঠেন। বাঙালি হয়ে ওঠেন। মানবিক হয়ে ওঠেন।

সাধারণ ঘরে জন্মেছিলেন তিনি। কথাও বলতেন সাধারণের ভাষায় সাধারণের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে সর্বদাই মর্মাহত করত। আজীবন তাই ছুটে

বেড়িয়েছেন স্বদেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত। আরও অনেকেই স্বদেশের মুক্তির জন্য সংগঠন করেছেন, দৌড়ে বেড়িয়েছেন। তবে খণ্ডখণ্ড সেসব উদ্যোগের সূত্র ধরে একটি মহাজাগরণের সূচনা করতে পেরেছেন একমাত্র তিনিই। তিনি ছিলেন কারও কারও ঈর্ষার পাত্র, অনেকের ঘোর শত্রু, কারও কাছে আবার স্বপ্নের সম্রাট, সাধারণের হৃদয় জুড়ে ছিল যাঁর অধিবাস। তাঁর শৈশব, যৌবন ও কর্মময় জীবন এমন সব ঘটনায় ভরপুর, তাঁর রাজনৈতিক উচ্চারণ এমনই তাৎপর্যপূর্ণ যে, সেসব গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আমরা এখনো শুরুই করে উঠতে পারিনি। তাঁকে ঘিরে আনুষ্ঠানিকতা কম হয়নি। আলাপ-আলোচনাও হচ্ছে। কিন্তু গভীরতর অনুসন্ধানের বিষয়টি কেন জানি উপেক্ষিতই থেকে গেল। তাঁর ওপর গবেষণা না করেও মোটা দাগে এ কথাটি বলা চলে যে, তাঁর চিন্তা, কর্ম, স্বপ্ন সবই ঘুরপাক খেয়েছে অভাজনদের ঘিরেই। অভিজাতরা তাঁর কাছ থেকে অনেক সুবিধা নিয়েছিলেন। কিন্তু সেভাবে তাঁর পাশে দাঁড়াননি তাঁর স্বপ্নপূরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সময়। বরং অসহযোগিতাই করেছেন তাঁরা। সঙ্কটকালে কেউ-বা দূরে চলে গিয়েছেন তাঁকে ছেড়ে। তিনি ছিলেন অভাজনের স্বার্থের প্রতি পুরোপুরি দায়বদ্ধ। আমরা লক্ষ করেছি, বরাবর কী নিবিড়ভাবে শেখ মুজিব এদেশের কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত তথা সাধারণ মানুষের স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। নিরন্তর তাদের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। তাদের কল্যাণ-চেতনায় ছিলেন পুরোপুরি নিবেদিত। ঘাতকের বুলেট তাঁর নশ্বর দেহকে বিদ্ধ করলেও, বৈরী প্রশাসন ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম তাঁকে এড়িয়ে চললেও, প্রতিদিনই বঙ্গবন্ধু উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছেন সাধারণ মানুষের হৃদয়ে। এখনো তিনি প্রতিদিনই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছেন। মহৎ থেকে মহত্তর হচ্ছেন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের আত্মবিরোধ, কুটিল রাজনীতির বিচ্ছিন্নকরণ প্রক্রিয়া, স্বার্থপরতা ও সুযোগ-সন্ধানের প্রবণতা বাঙালির অন্তরে তাঁর গোপনে বেড়ে ওঠার এই গতিকে থামাতে পারেনি। তাঁর অপ্রতিরোধ্য উত্থানকে ঠেকাতে পারেনি। দিন দিনই তিনি সংহত হয়েছেন। এখনো হচ্ছেন। সকল দীনতা, জীর্ণতা ভেদ করে তিনি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছেন। শত্রুরা হাজার চেষ্টা করেও সাধারণ মানুষের মনের মণিকোঠা তাঁর সংহত হওয়ার, সমগ্র হওয়ার অনিবার্য প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে পারেনি। পারবেও না। কবিতায়, গানে, শিল্পীর তুলির আঁচড়ে, শিশুর কলকাকলিতে এবং সাধারণের শুভ নিশ্বাসে তিনি অবিরাম প্রসারিত হচ্ছেন। আমরা যদি আমাদের স্বার্থচিন্তার কারণে কিংবা আগ্রহের আতিশয্যে অযথা তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করি তবে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। তিনি রয়ে যাবেন আমাদের হৃদয় জুড়ে। বিপুলভাবে। বিশালভাবে।

কিন্তু মনে হয়, ক্ষমতায় গিয়ে তাঁরই দলের কেউ কেউ তাঁর ক্রমবর্ধমান সেই অগ্রযাত্রায় কিছুটা হলেও বাধা দিয়েছিলেন। উচ্চারণে, অপ্রয়োজনীয় কৃতিত্ব আরোপণে, যত্রতত্র তাঁর স্বপ্নের কথা বলে মনে হয় তাঁর নামের ধার ও ভার তাঁরা নিজেদের অগোচরেই কমিয়ে ফেলেছিলেন। এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। এর কোনো প্রয়োজন নেই। ছোটবেলা থেকেই তিনি খুবই অধিকার-সচেতন ছিলেন। স্কুলে পড়তে থাকা অবস্থাতেই তিনি অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই যে অধিকার আদায়ের যাত্রা শুরু করলেন আর পেছন ফিরে তাকাননি। কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনকে মদদ দেওয়ার জন্য জেলে যাওয়া, জেলে থেকেও ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা, চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করা, পাকিস্তান গণপরিষদের কৃষক-শ্রমিক-সংখ্যালঘুদের তথা বাঙালিদের পক্ষ নিয়ে বারবার সোচ্চার হওয়া এবং অবশেষে বাঙালির একচ্ছত্র নেতা হওয়ার প্রক্রিয়াটি যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মানবিক। যেমন প্রতিকূল, তেমনি আনন্দঘন। তেমনি সাফল্যের ও গৌরবেরও। একই সঙ্গে বীরত্বেরও। পাকিস্তানের পার্লামেন্টে তাঁর সোচ্চার হওয়ার ধরন থেকেই বোঝা যায় তিনি কতটা গণমুখী ছিলেন।

১৯৫৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদের করাচিকে ফেডারেল রাজধানী করা এবং গভর্নরের বেতন ৬ হাজার রুপীতে নির্ধারণ করায় তিনি গর্জে ওঠেন। প্রশ্ন তোলেন যেখানে একজন পিয়নের বেতন মাত্র ৫০ রুপী, সে দেশে কী করে গভর্নরকে এত বেতন দেওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের জনগণকে ধোঁকা না দেওয়ার জন্য সেদিন তিনি পশ্চিম-পাকিস্তানি নেতাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। অনির্বাচিত গভর্নর-জেনারেলের হাতে অসীম ক্ষমতা প্রদানের তিনি বিরোধিতা করেন ১৯৫৫ সালের ১ অক্টোবরের অধিবেশনে। সংসদের দৈনন্দিন কর্মসূচি বাংলায় ছাপানোর দাবি তোলেন ১৯৫৬ সালের ১৭ জানুয়ারির অধিবেশনে। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবি করেন ওই বছরেরই ১৪ ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে। এসব বক্তৃতায় তিনি বারবার সাম্যের কথা বলেন, গরিবদের ওপর জুলুম বন্ধ করতে বলেন এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে শোষণ না করতে বলেন।

এরপরের ইতিহাস মোটামুটি সকলেরই জানা। আটান্ন সালে সামরিক শাসন জারির পরপরই শেখ মুজিবের ওপর নেমে আসে জেল-জুলুম। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁর গণমুখী কর্মপ্রক্রিয়া থামাতে পারেনি। বরং, বাঙালির আর্থ-সামাজিক মুক্তির প্রশ্নে তিনি আরও আপসহীন হতে থাকেন। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে লাহোরে তিনি বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা ঘোষণা করেন।

এরপর তিনি মুখোমুখি হন আরও হয়রানির। কিন্তু 'কোনো হুমকিই বাংলার মানুষকে ৬ দফা দাবি থেকে নিবৃত করতে পারবে না' বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপনী অনুষ্ঠানে।

আগরতলা মামলার সূত্র ধরে গণজাগরণের কথা আমরা সবাই জানি। এ গণজাগরণেই ভেসে যায় আইয়ুব খান, মোনেম খানরা। আর জনগণের মনে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেন শেখ মুজিব। দ্রুতই হয়ে যান তিনি 'বঙ্গবন্ধু'। ৭০-এর নির্বাচনের প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। একদিকে যেমন তিনি বুঝতে পারলেন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বাঙালি কতটা অসহায় ও পাকিস্তান সরকার কতটা নির্বিকার, অন্যদিকে অনুভব করলেন গরিব-দুঃখী মানুষগুলোর কী কষ্ট। তাই তাঁদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য চাই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনার কিছু কিছু তিনি প্রকাশ করলেন ১৯৭০ সালের শেষ দিকে পাকিস্তান টেলিভিশনে দেওয়া তাঁর প্রাক-নির্বাচনী ভাষণে। সেদিনের ভাষণে তিনি এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন যেসবের সঙ্গে গণমানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সরাসরি যোগ ছিল। তিনি শুরুতেই একচেটিয়াবাদ ও কার্টেলের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন। বললেন, ভূমি-সংস্কার না করার ফলে অসহায় দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। ৯০ লাখ শ্রমজীবী মানুষ বেকার। পাশাপাশি তিনি তুলে ধরেন অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ এক চিত্র। গ্রামাঞ্চলে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থার খবর জানালেন। আর বললেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে তিনি কী কী করবেন। বৈষম্য দূর করবেন। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তুলবেন। সমবায়কে সমর্থন দেবেন। কৃষি-ব্যবস্থা সংস্কার করবেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেবেন। গ্রামে গ্রামে বিজলি বাতি দেবেন। শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগ করবেন। নিম্ন-আয়ের মানুষদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করবেন। প্রতি ইউনিয়নে পল্লী-চিকিৎসাকেন্দ্র খুলবেন। অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সবকিছুর পুনর্বিন্যাস করবেন। নয়া মজুরি-কাঠামো তৈরি করবেন। জনগণের সরকার কায়েম করবেন।

মূলত, সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা এমন স্পষ্ট করে বলার কারণেই নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে জিতেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের নিপীড়নবাদী রাষ্ট্র তাঁকে ক্ষমতায় যেতে দেয়নি। নানা ষড়যন্ত্র শুরু হলো। জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডেকেও বন্ধ করা হলো। শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। বঙ্গবন্ধুর একাত্তরের ৭ মার্চে তাঁর ভাষণের মাধ্যমে দিলেন মুক্তির ডাক। স্বাধীনতার ডাক। প্রস্তুতি নিল পুরো জাতি মুক্তিযুদ্ধের জন্য। সুযোগ্য সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে ৩৫

দফা নির্দেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের বেসামরিক নির্বাচিত সরকার পরিচালনার মহড়া দিলেন। প্রশাসন, পুলিশ, অর্থপ্রতিষ্ঠান সকলেই তাঁর ডাকে সাড়া দিল। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার সাধ পেলেন। কিন্তু তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাদের 'পূর্ব-পাকিস্তান' পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ২৫ মার্চ রাতে শুরু করে নির্মম হামলা। এই পরিস্থিতিতে তিনি ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করলেন। পরপরই তিনি বন্দী হলেন। শুরু হলো তাঁরই নির্দেশমতো মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালির শ্রেষ্ঠ সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত।

দেশ স্বাধীন হলো। '৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বিজয়ীর বেশে দেশে ফিরে এলেন। শুরু করলেন 'অন্ধকার থেকে আলোর পথে' যাত্রা। এক ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন সোনার বাংলা গড়ার। অঙ্গীকার অনুযায়ী চমৎকার একটি সংবিধান দিলেন মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক মুক্তির অঙ্গীকার লেখা আছে ওই সংবিধানের পাতায় পাতায়। জাতিকে উপহার দিলেন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, যার মূল লক্ষ্য ছিল সম্পদের সামাজিকীকরণ। দেশ-বিদেশে অবস্থানরত শ্রেষ্ঠ বাঙালি মেধার সম্মিলন ঘটালেন তিনি পরিকল্পনা কমিশনে। যাত্রাতেই বললেন, 'আমাদের চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণী এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।' (২৬ মার্চ, ১৯৭২-এর টিভি ভাষণ)। বললেন, 'সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থায় সমতা আনতে হবে।' শুধু কথা নয়, কাজেও তিনি তাঁর এই চিন্তার প্রতিফলন ঘটালেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, কৃষকদের কৃষি-উপকরণ সরবরাহের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ, শিল্পের জাতীয়করণ প্রভৃতি অর্থনৈতিক নীতি সংস্কারের সূচনা করে তিনি সাধারণের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এসব নীতির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে সে কথা আমি বলব না। তবে এই ধাঁচের নীতি গ্রহণের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির পক্ষে যে অবস্থান নিয়েছিলেন তা কিন্তু পরিষ্কার। এভাবেই তিনি নিজে স্বপ্ন দেখলেন এবং জাতিকে স্বপ্ন দেখালেন। বললেন, 'শ্মশান বাংলাকে সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। সে বাংলার আগামী দিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলব।' এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি রাত-দিন পরিশ্রম করেছেন। বিধ্বস্ত এক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছেন। কপর্দকহীন রাজকোষ নিয়ে যাত্রা করেও তিনি হাল ছাড়েননি। নিরন্তর চেষ্টা করেছেন দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচনের। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির এই স্বপ্ন আজীবন তাঁকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। ১৯৭২

সালের ৯ মে রাজশাহীতে এক বক্তৃতায় তাঁর এই স্বপ্নের কথাই তুলে ধরেছিলেন, 'আপনারা জানেন, জীবনে আমি কোনো দিন মিথ্যা ওয়াদা করি না। ... আমি কী চাই? আমি চাই আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক।' ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি তারিখে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলে তিনি সভাপতি হিসেবে তাঁর শেষ ভাষণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। সেদিন তিনি আরও বলেছিলেন, 'আজ বাংলার নিভৃত কোণে আমার এক কর্মী পড়ে আছে যার জামা নেই, কাপড় নেই। তারা আমার কাছে আসে আমার ওই ধরনের কর্মীকে আমি দেখি। এদের সাথে আমার রক্তের সম্বন্ধ। আজও আমি দেখি তার পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি। আজও দেখি সেই ছেঁড়া পায়জামা, ছেঁড়া শার্ট, পায়ে জুতা নেই। বাংলাদেশে আমার এ ধরনের লাখ লাখ কর্মী পড়ে আছে।' এরপর তিনি মোক্ষম কথাটি বললেন : 'আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না–পারব না–পারব না।' কৃষক-শ্রমিকদের তিনি খুবই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের ভাষণে বলেছিলেন : 'করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুররা করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ।' বঙ্গবন্ধুর এমন অসংখ্য কথা আছে যা থেকে প্রমাণ মেলে তিনি এদেশের কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানুষকে, দেশকে কতটাই-না ভালোবাসতেন। কাছ থেকে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা বলেন যে, '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময় তিনি জায়নামাজে বসে-বসে কাঁদতেন। নিজে রুটি খেতেন। আর সেই মহৎপ্রাণ মানুষটিকেই ঘাতকেরা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল পনেরোই আগস্ট শেষ রাতে। একজন মানুষকে নয়, একটি ধারাকে তারা শেষ করতে চেয়েছিল। একটি আদর্শের ধারাকে। খানিকটা হলেও দুর্বৃত্তদের সেই আশা পূরণও হয়েছিল।

দীর্ঘদিন পর তাঁর অনুসারীদেরকে জনগণ ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। সুযোগ এসেছিল শুধু আনুষ্ঠানিকতার ভেতরে সীমাবদ্ধতা না রেখে তাঁর আদর্শকে সমুন্নত রাখার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করার ও নীতি সংস্কার করে এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু সেই সুযোগের পুরোপুরি ব্যবহার তাঁরা করতে পেরেছেন এমন কথা বলা যাবে না। তবে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা এবং 'অগ্নিকন্যা' মতিয়া চৌধুরী বাংলাদেশের কৃষক ও হতদরিদ্রদের উন্নয়নে কম চেষ্টা করেননি। '৯৮-এর বন্যার পর কৃষক বাঁচাতে তাঁরা যে নিজেদের মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন সে কথা আমরা সবাই জানি। তাঁদের এই প্রচেষ্টার কারণেই বন্যা সত্ত্বেও কোনো মানুষ না খেয়ে তখন মারা যায়নি। তাঁদের শাসনামলে কৃষির প্রবৃদ্ধি ঘটেছিল গড়ে পাঁচ

শতাংশেরও বেশি হারে। এর সুপ্রভাব খাদ্যমূল্যের ওপর পড়েছিল। তাই মূল্যস্ফীতি নিম্নপর্যায়ে স্থিতিশীল ছিল। এত কিছুর পরেও দেশে দারিদ্র্যের মাত্রা ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়েই রয়ে গেছে।

পরবর্তী সময়ে যে-সরকার আসে তারা কৃষকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ কমিয়ে ফেলে। তারই ধারাবাহিকতায় আজ কৃষক-সমাজ কী সঙ্কটেই-না পড়েছে। এই দুঃখজনক বাস্তবতা সত্ত্বেও আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ তৈরির প্রক্রিয়া স্বদেশি চিন্তা ও চেতনায় বলীয়ান হয়ে, সম্মিলিত সামাজিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দলমত নির্বিশেষে বাঙালি জাতিকে এগিয়ে যেতে হবে সম্ভাবনাময় এক বাংলাদেশ তৈরির লক্ষ্যে। একটি বা দুটি প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার মধ্যে আমরা তাই বঙ্গবন্ধুকে সীমিত করার পক্ষে নই।

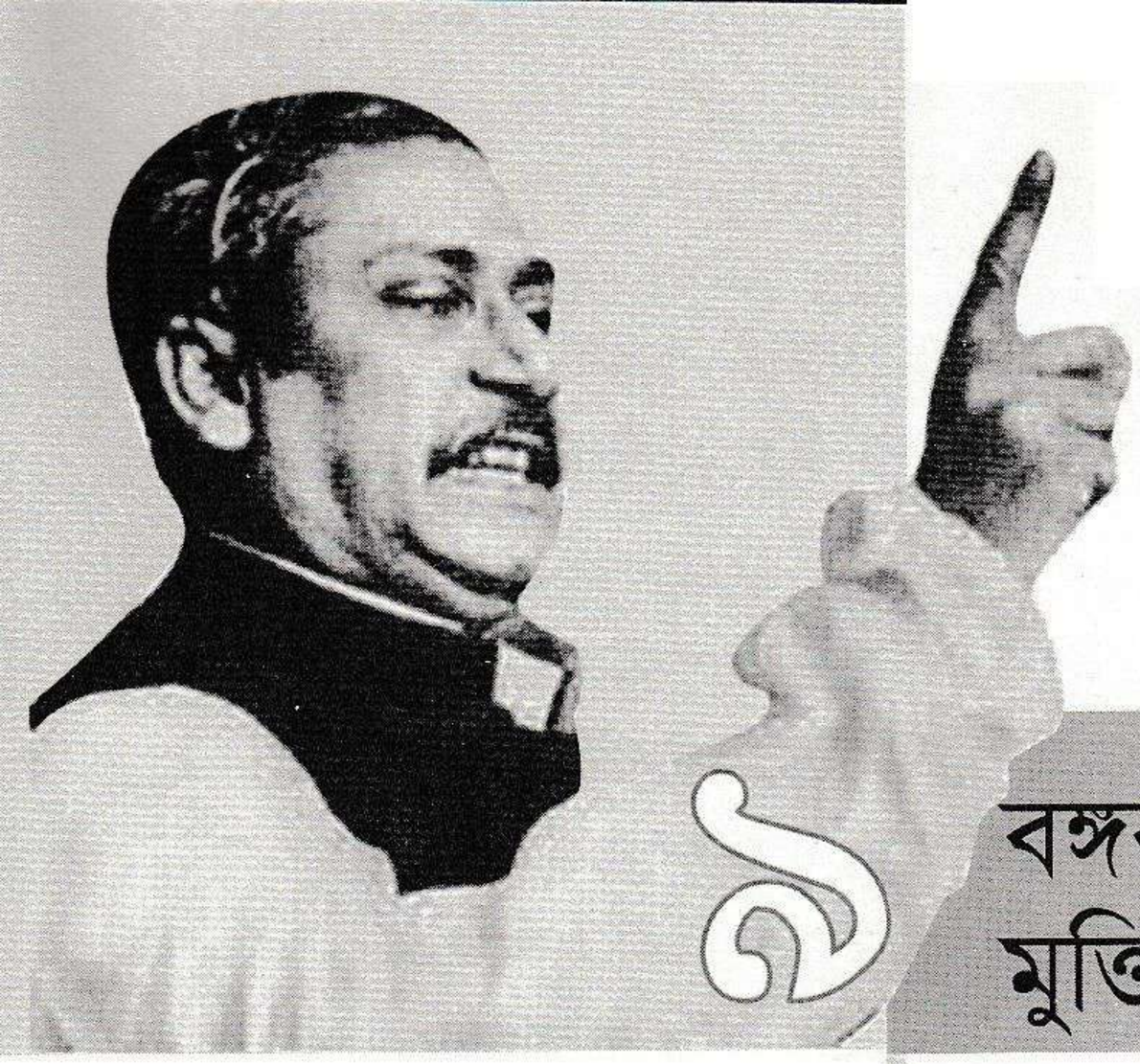
২০২০ সালে তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী আমরা পালন করতে চাই উন্নত ও সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশে। একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে থাকবে না দারিদ্র্য, বঞ্চনা, নারী-নির্যাতন, সহিংসতা, রাজনৈতিক হানাহানি। নব সহস্রাব্দের শুরুতেই আমরা উজ্জ্বল এক বাংলাদেশের অধিবাসী হতে চাই। পুরো জাতিকেই একসঙ্গে নিয়ে এগুতে হবে আমাদের। বিচ্ছিন্নভাবে এগুনোর চেষ্টা না করাই ভালো। বঙ্গবন্ধুর মনোবল, বাংলাদেশের জন্য তাঁর ভালোবাসা, সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর কল্যাণচিন্তাই হবে আগামী দিনের এই অগ্রযাত্রার অন্যতম পাথেয়। সেজন্য তাঁর চিন্তার আলোকে আমাদের ধ্যান করতে হবে, বিচার করতে হবে। পরীক্ষা করতে হবে। চিদ্‌বৃত্তিকে সচেষ্ট করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই আরও বড় করতে হবে একুশ শতকের বাংলাদেশকে। শিক্ষাতে, গবেষণায়, প্রযুক্তির প্রসারে আরও বেশি তৎপর হতে হবে আমাদের। বঙ্গবন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন (২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে সংসদে) তাঁর কর্মীদের :

'দুঃখের বিষয় আজ শুধু আমরা বলি, আমরা কী পেলাম। তোমরা কী পেয়েছ? তোমরা পেয়েছ শিক্ষার আলো, যে শিক্ষা পেয়েছ বাংলার জনগণের টাকায়। তুমি কী ফেরত দিয়েছ বাংলার দুঃখী মানুষকে, যে-দুঃখী না খেয়ে মরে যায়? যে মানুষের কাপড় নেই, যে-মানুষ বন্ধু খুঁজে পায় না, যার বস্ত্র নাই, শার্ট নাই, বুকের হাড়গুলো পর্যন্ত দেখা যায়, তাকে আজকে তোমরা কী দিয়েছ? এ প্রশ্ন আজ এখন জেগে গেছে।'

বঙ্গবন্ধুর এই প্রশ্ন আজও বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একুশ শতকের বাংলাদেশকে এসব মৌল প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হবে। আমাদের পরিকল্পনায়, জননীতিতে ও গণমাধ্যমে এসব প্রশ্নের প্রতিফলন পড়তে হবে। হালে অভিজন ও অভাজনদের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি যেভাবে দুই

দিকে এগিয়ে চলেছে তাতে আমাদের শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। স্বাধীনতার মর্মকথার সঙ্গে এই বৈষম্যপ্রবণতার কোনো মিল নেই। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও উচ্চারণের সঙ্গেও তা মেলে না।

গণতন্ত্রবিহীন বিষণ্ন এক সময় বাংলাদেশকে আবার জাপটে ধরেছিল। সাধারণ মানুষের খাদ্যাভাব ও নিরাপত্তাহীনতাসহ সার্বিক অর্থনৈতিক দুর্গতি বেড়েই চলেছিল। এমন দুঃসময়ে তাঁর অর্থনৈতিক মুক্তির কথা আরও গভীরভাবে মনে পড়ছিল। আমাদের আগামী দিনের চলার পথে তাঁর কল্যাণধর্মী আর্থ-সামাজিক চিন্তা-চেতনাকে পাথেয় করার কথাই বেশি করে ভাবছিলাম। এরপর দিন বদলের এক নয়া পালা শুরু হয়েছে। পরিবর্তিত এই সময়েও তাঁর হৃদয়-নিংড়ানো দেশপ্রেমের কথা বারবার স্মরণে আনতে হবে। অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে তাঁর চিন্তাকে সর্বজনের সাথী করতে হবে। বিশেষ করে, তরুণ প্রজন্মকে তাঁর এসব কালজয়ী জনকল্যাণমুখী ভাবনার সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে। সর্বশেষ নির্বাচনের সময় মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের যে-অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রমাণ মিলেছে তাতেই আশাবাদী হতে ইচ্ছা করে। মুক্তিযুদ্ধের মৌল আকাঙ্ক্ষা পূরণের সংগ্রামে যে তাদেরকে সঙ্গে পাওয়া যাবে, সে ইঙ্গিত তারা খুবই স্পষ্টভাবে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের আলোকে নতুন করে বাংলাদেশ গড়তে পারলে নিশ্চয় তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাশাও অনেকাংশেই পূরণ করা সম্ভব হবে।



১৯

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তি-চিন্তা (দুই)

আমি জন্মদিন পালন করি না, আমার জন্মদিনে মোমের বাতি জ্বালি না, কেকও কাটি না। এ দেশে মানুষের নিরাপত্তা নেই। অন্যের খেয়ালে যে কোনো মুহূর্তে তাদের মৃত্যু হতে পারে। আমি জনগণেরই একজন। আমার জন্মদিনই কী, আর মৃত্যুদিনই কী? আমার জনগণের জন্যই আমার জীবন ও মৃত্যু।

('স্মৃতির পাতায় জাতির জনক', তোফায়েল আহমেদ, ১৭.০৩.১৩)

বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু মুক্তিকামী মানুষের দৃষ্টিতে সমার্থ। তিনিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার। এই বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি নিজে দেখেছেন এবং মুক্তিকামী জনগণকে দেখিয়েছেন। আজ বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলজুড়েই পড়ে আছে তাঁর বিশাল শরীর। দলমত নির্বিশেষে সকলের মনেই রয়েছেন তিনি নানা মাত্রিকতায়। জনগণকে ভালোবাসলে, তাদের আস্থা অর্জন করা গেলে কী অসাধ্য সাধন করা যায় বঙ্গবন্ধু তা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকালেই আমাদের এবং বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন। আর তাই শ্রাবণের এই বৃষ্টির ধারা এবং জনগণের অশ্রুধারা একাকার হয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে তাঁর অস্তিত্বের এক নয়া ধারা প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় ও স্বাধীনতা অর্জন বাঙালি জাতির গৌরবের ইতিহাস–যা বিশ্বেও ছিল সাড়া জাগানো একটি ঘটনা। নয় মাসের রক্তঝরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের আনন্দ অসীম। একইসঙ্গে ৩০ লাখ শহিদের প্রাণ, দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম ও অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগে এ বিজয় অনেক কষ্টের–এক হৃদয়বিদারক বেদনাগাথা। তাই রক্তেভেজা মুক্তিযুদ্ধের কথা কখনো ভুলবার নয়।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, প্রকৃত অর্থেই অভিন্ন ও একাত্ম। দুটি নাম, একটি ইতিহাস। যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। একাত্তরে সারা বিশ্বেই

বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু একইসঙ্গে উচ্চারিত হতো। বাঙালির সম্মিলিত চেতনা সঞ্চারে তিনি রাখেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রাম শেষে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়, যার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে বাংলাদেশ নামের স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ এ পথ পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন পথিকৃৎ। মৃত্যুকে তুচ্ছ ভেবে তিনি এগিয়ে গেছেন অবিচল চিত্তে। গণতান্ত্রিক মূল্যচেতনা, বৈষম্য-শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা–এই ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের মূলকথা। এই মূলমন্ত্রকে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন প্রতিটি বাঙালির চেতনায়। এজন্যই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ। মহত্তম বীর। বাঙালির জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের প্রতিটি ধাপেই বাঙালির সার্বিক মুক্তির জয়গান গেয়েছেন। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, '৫২তম জন্মদিনে আপনার সবচাইতে বড় ও পবিত্র কামনা কী?' উত্তরে বঞ্চিত বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'জনগণের সার্বিক মুক্তি।' এরপর তিনি বেদনার্ত স্বরে বলেছিলেন, 'আমি জন্মদিন পালন করি না, আমার জন্মদিনে মোমের বাতি জ্বালি না, কেকও কাটি না। এ দেশে মানুষের নিরাপত্তা নেই। অন্যের খেয়ালে যে কোনো মুহূর্তে তাদের মৃত্যু হতে পারে। আমি জনগণেরই একজন। আমার জন্মদিনই কী, আর মৃত্যুদিনই কী? আমার জনগণের জন্যই আমার জীবন ও মৃত্যু।' ('স্মৃতির পাতায় জাতির জনক', তোফায়েল আহমেদ, ১৭.০৩.১৩) এ কথার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় জনগণের মধ্যে বঙ্গবন্ধু কতটা অন্তঃপ্রাণ ছিলেন।

বাঙালি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন, দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত জাতি গঠন, বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো ও সোনার বাংলা গড়াই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য–এই মৌলিক অধিকারগুলো পূরণের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ উন্নত জীবন পাবে, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে, বেকারত্ব দূর হবে–সেই ভাবনাই ছিল প্রতিনিয়ত তাঁর মনে। তিনি তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন–অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার ধ্যান-ধারণা তুলে ধরেছিলেন নানা বক্তৃতা-বিবৃতি আর প্রচারে। তিনি বলতেন, 'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।' (*শেখ মুজিব বাংলাদেশের আরেক নাম*, আতিউর রহমান, ২০০৯, দীপ্তি প্রকাশনী)

বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকার অর্জনে আজীবন কাজ করে গেছেন। কিংবদন্তি এ নেতা বাঙালি জাতির মুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। নিজের জীবনের সুখ-স্বস্তি, আরাম-আয়েশ, মোহ, ধনদৌলত সবকিছু ত্যাগ করে জনগণের দাবি আদায়ের জন্য এক আদর্শবাদী ও আত্মত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আটান্নর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ এ দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামেই ছিল তাঁর দৃপ্ত পদচারণা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাই বঙ্গবন্ধুর নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ কথাই যেন ব্যক্ত হয়েছে অন্নদাশংকর রায়ের লেখায়, 'যতদিন রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান/ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'।

সাতচল্লিশে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের পরপরই তা চলে যায় আমলা, মহাজন, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং তাদের মদদদাতা সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের নিয়ন্ত্রণে। শুরু হয় পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানের শোষণমূলক আচরণ। সকল ক্ষেত্রেই বাঙালিরা উপেক্ষিত হতে থাকে। দিনে দিনে রচিত হয় বৈষম্যের পাহাড়। সত্তরের নির্বাচনের সময় 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' শীর্ষক এক পোস্টারে অর্থনৈতিক বৈষম্যের যে চিত্র আঁকা হয়েছিল তা এ দেশের মানুষকে পীড়া দেয়। জনসংখ্যার দিক দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান বৃহত্তর অংশ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকারের বাজেটের প্রায় পুরোটাই খরচ হতো পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য। পশ্চিম-পাকিস্তানে বছরে রাজস্ব ব্যয় ছিল পাঁচ হাজার কোটি টাকা। অন্যদিকে, পূর্ব-পাকিস্তানে ছিল মাত্র দেড়হাজার কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্যের ৮০ ভাগই ব্যয় হতো পশ্চিম-পাকিস্তানে। চাল, আটা ও তেলের দাম পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব-পাকিস্তানে ছিল দ্বিগুণ। কেন্দ্রীয় সরকার ও সামরিক বিভাগের চাকরির প্রায় ৯০ শতাংশই ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানিদের দখলে। সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন তারাই। এমনকি বাঙালির অগ্রসর সাংস্কৃতিক চিন্তা ও ঐতিহ্যের ওপর নেমে আসে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের নগ্ন আঘাত। আঘাত আসে বাঙালির প্রাণের চেয়েও প্রিয় বাংলা ভাষার ওপর। রবীন্দ্র চিন্তা-চেতনার ওপর।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক কর্মসূচিতেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। এসব বৈষম্যের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তুলে ধরা ও পাকিস্তানিদের নানা অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন। জনগণের অধিকার আদায়ের এই আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁর এবং তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের ওপর বারবার নেমে আসে দুঃসহ কারাজীবন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন

আপসহীন নেতা। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও অন্যায়ের সাথে আপস করেননি। আর এ কথা তো সকলেরই জানা ছিল যে তিনিই সত্যিকারের বীর যিনি মৃত্যুকে ভয় পান না। দু-দুবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব–আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।' যে বাংলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, যে বাংলার জন্য তিনি যৌবনের অধিকাংশ সময় কারাগারে কাটিয়েছেন, ফাঁসির মঞ্চেও যে বাঙালির জয়গান গেয়েছেন, সেই বাংলা ও বাঙালির জন্য তাঁর ভালোবাসা ও হৃদয়ের দরদ ছিল অপরিমেয়।

ঊনসত্তরে ছাত্র-জনতা সংগ্রাম করে তাঁকে কারামুক্ত করেন এবং 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর আসে সত্তরের নির্বাচন। বিক্ষুব্ধ বাঙালি পশ্চিম-পাকিস্তানের শোষণের সমুচিত জবাব দেয় এ নির্বাচনে। নির্বাচনের ফলাফলে ফুটে ওঠে বাঙালির অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিফলন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। অথচ আপাদমস্তক গণতান্ত্রিক এই নেতা বলেছিলেন যে একজন হলেও ভিন্ন মতালম্বির প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন। এরপরেই শুরু উত্তাল মার্চ। বঙ্গবন্ধুর ডাকে একাত্তরের ৪ মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন–যা ছিল বিশ্বের ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। সেদিনই তিনি ঘোষণা করেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' হবে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। উত্তাল মার্চে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির মুক্তির মহানায়ক। তাঁর নেতৃত্বে ১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনসহ নানা কর্মসূচি শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এটি শুধু একটি সফল মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও পটভূমিই তৈরি করেনি, এ আন্দোলনকালেই কার্যত বাঙালি কয়েকদিনের জন্য হলেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা চালায়। (*অসহযোগের দিনগুলি*, আতিউর রহমান, ১৯৯৮, সাহিত্য প্রকাশ)

অসহযোগ আন্দোলনের টানটান উত্তেজনায় যখন বাঙালি জনমানুষ আন্দোলিত, তখন ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের শেষ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেন: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তিনি প্রথমে মুক্তি ও পরে স্বাধীনতার কথা বলেন। মুক্তি মানে সকল ধরনের শোষণ থেকে মুক্তি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে মুক্তি। সুচিন্তিতভাবেই তিনি ঐ বক্তব্য দিয়েছিলেন। মুক্তির জন্য যে স্বাধীনতার প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু তা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন। একটা স্বাধীন জাতিই কেবল পারে ঐ ধরনের মুক্তির প্রত্যাশা করতে। তাই তাঁর ভাষণ গোটা জাতিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উন্মাতাল করে তোলে। বাংলার প্রতিটি মানুষের রক্তে জাগিয়ে তোলে দুর্বার শক্তি–যে শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারেনি পাকিস্তানের প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী এবং এ দেশের স্বাধীনতা বিরোধীচক্র। এটি ছিল তাঁর

অসামান্য নেতৃত্বের উত্থান-পর্বের শীর্ষবিন্দু। 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো' এবং 'যার যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুকে মোকাবেলা করো' এসব কথার মাধ্যমে তিনি বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

সকল আলাপ-আলোচনার অবসান ঘটিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। আর্চার ব্লাডের টেলিগ্রাম থেকে জানা যায়, কী বিভৎস ছিল সেই রাতের এবং পরবর্তী সময়ের হত্যাকাণ্ড! স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরপরেই পাকবাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। সেদিন থেকেই বঙ্গবন্ধুর শারীরিক অনুপস্থিতিতে তাঁর নামেই শুরু হয়ে যায় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশের আপামর মানুষ। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে, সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে বঙ্গবন্ধুর নামটিই ছিল ভরসার স্থল। তাঁর নামটিই ছিল শক্তি ও সাহসের অবিরল উৎস। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে এ দেশের বীর জনতা দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। একটি মানচিত্র। একটি জাতীয় পতাকা। তারা বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দেয় ঐক্য ও ত্যাগ থাকলে বুলেট আর কামান দিয়ে কোনো জাতিকে দমিয়ে রাখা যায় না। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এ অর্জন সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী, সাহসী এবং ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বের কারণে।

মুক্তির দিশারি এই প্রবাদ পুরুষের রাজনৈতিক দর্শনের মাঝে বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার মানুষের প্রতি ভালোবাসার মর্যাদা তিনি রক্ত দিয়ে পরিশোধ করে গেছেন। তিনি শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি সবসময় বাঙালি জাতি এবং বিশ্বের নির্যাতিত-শোষিত-মেহনতি মানুষের মুক্তির কথা ভাবতেন–যা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রতিটি কর্মে, চিন্তায়। ১৯৭৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত–শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' নানা বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের কথা, মানমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার মৌল আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কথা বারবার বলেছেন। ১৯৭২ সালের ৯ মে রাজশাহীর এক জনসভায় বলেন, 'আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কি চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণভরে হাসুক।' (*শেখ মুজিব : বাংলাদেশের আরেক নাম*, আতিউর রহমান, ২০০৯, দীপ্তি প্রকাশনী) বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা

পূরণ এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ জাতি গড়ার পথে তাঁরই সুকন্যা শেখ হাসিনা জনহিতৈষী পদক্ষেপ, উন্নত রাষ্ট্রচিন্তা, স্থিতিশীল অর্থনীতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবিত করার মাধ্যমে দেশকে জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার কাজে তিনি তাঁর ধ্যান, মন, প্রাণ পুরোপুরি সঁপে দিয়েছেন। তিনিই দেশি-বিদেশি নানা প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেই ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার এক কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন ব্যাপক অগ্রগতির জন্য দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তক। তাঁর অর্থনৈতিক আদর্শ ও কৌশল ছিল–নিজস্ব সম্পদের ওপর দেশকে দাঁড় করানো। সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতা-আন্দোলনকে পরিচালনা করেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। এজন্য স্বাধীনতা লাভের পরপরই সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত হন। হাতে নেন নানা উদ্যোগ। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রথম কয়েকটি বছর ছিল চড়াই-উৎরাইপূর্ণ। তখন ছিল না অর্থ, অবকাঠামো, দক্ষ জনশক্তি, শিল্প-কারখানা, রপ্তানি আয়, রেমিট্যান্স ও বিদেশি মুদ্রার মজুদ। তখন বাংলাদেশের পরিচিতি ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ, বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অভাব অনটনের দেশ হিসেবে। দারিদ্র্যপীড়িত সাব-সাহারার কয়েকটি দেশের সাথে উচ্চারিত হতো বাংলাদেশের নাম। তখন পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদরা বাংলাদেশকে উন্নয়নের পরীক্ষার মুখে পড়া এক অসহায় দেশ হিসেবে দেখতেন। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে টিকে থাকার এক তীব্র লড়াই করতে হয়েছে। দেশের অর্থনীতিকে সচল করতে যেসব সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করেন তা শেষ করার মতো যথেষ্ট সময় বঙ্গবন্ধু পাননি। তবে ঐ উদ্যোগগুলো তিনি নিয়েছিলেন বলেই এতদিনে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি মজবুত পাটাতন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার লড়াই করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু নিরন্তন তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছেন স্বদেশকে। ঐতিহ্যে স্থির থেকে বাঙালির আধুনিক পরিচয়কে বহুমাত্রিক পূর্ণতা দিয়েছেন। ভাষা-আন্দোলন যেভাবে বাঙালির নবলব্ধ আত্মপরিচয়কে গণতান্ত্রিক, বহুরৈখিক, সহিষ্ণু করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পথ বেঁধে দেয় তা থেকে একটুও বিচ্যুত হননি তিনি। বরং হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো ঐ পথেই কোটি বাঙালিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হেঁটেছেন মুক্তির মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রতিজ্ঞা বুকে বেঁধে। শিক্ষার প্রসারে প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ, শিক্ষকদের সরকারি চাকরি, ছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রেও বিজ্ঞান ও গবেষণার প্রসারে তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক গৌরবান্বিত কৃষকসন্তান। বাঙালি কৃষককুলের কথা সবসময় ভাবতেন তিনি। পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে কৃষকের

পক্ষে, ষাটের দশকে ছয় দফা আন্দোলনে কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের কথা বলেছেন। সত্তরের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দলীয় সদস্যগণের শপথবাক্য পাঠ উপলক্ষে এক বিশাল সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেবে। আর দশ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না। (*শেখ মুজিব : বাংলাদেশের আরেক নাম*, আতিউর রহমান, ২০০৯, দীপ্তি প্রকাশনী)

মূলত, কৃষক-সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের কর্ণধার হিসেবেও সর্বক্ষণ কৃষক-অন্তঃপ্রাণ ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর শোষণহীন সমাজ গঠনের অভিপ্রায়ের বড় অংশই জুড়ে ছিল কৃষক। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, কৃষিই এ দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস। কৃষক ও কৃষির উন্নতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে দেশের উন্নতি। কৃষকেরাই এ দেশের প্রাণ। সোনার বাংলা গড়ার কারিগর। কৃষকদের অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ বারবার গর্জে উঠত। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বেতার-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বঙ্গবন্ধু কৃষকদের কথা বলেন এভাবে, 'আমাদের চাষিরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে।' (*শেখ মুজিব : বাংলাদেশের আরেক নাম*, আতিউর রহমান, ২০০৯, দীপ্তি প্রকাশনী)

বঙ্গবন্ধু কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য কৃষকের নিজস্ব জমির ব্যবস্থা, কৃষকের মাঝে খাসজমি বিতরণ, কৃষির উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের সার ও কীটনাশক, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্যান্য কৃষি-উপকরণ সরবরাহ, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য দেওয়া, পচনশীল ফসল সংরক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান–এসব কিছুরই সূচনা করে গেছেন তিনি। সদ্য স্বাধীন দেশের ৩০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণে তাৎক্ষণিক আমদানি এবং কৃষিতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। উচ্চতর কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৭৩ সালের মধ্যেই ধ্বংস-প্রাপ্ত কৃষি-অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করেন। পাকিস্তানি শাসনকালের ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি ও তাদের সকল ঋণ সুদসহ মাফ করে দেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরদিনের জন্য রহিত করেন। পরিবার পিছু জমির সিলিং একশ' বিঘায় নির্ধারণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, কৃষির আরও উন্নতি ঘটাতে পারলেই অর্থনীতির পালে জোর হাওয়া লাগবে। বাংলাদেশ হয়ে উঠবে সত্যিকারের সোনার বাংলা।

বঙ্গবন্ধুর সচেতন ও কৃষকদরদি নীতির ফলে কৃষিতে অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয়েছিল তারই ফলে আজ কৃষিখাত শক্তিশালী হয়েছে। তাঁর কৃষিভাবনার আলোকেই বর্তমান সরকার কল্যাণধর্মী ও কৃষকবান্ধব উন্নয়ন নীতি-কৌশল গ্রহণ করে চলেছে। কম দামে সার, বীজ, সেচযন্ত্র ও অন্যান্য কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা বাড়ানো এবং কৃষি গবেষণা, জৈবপ্রযুক্তি, জেনেটিক প্রকৌশল ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের ভূমির অধিকার, ঋণপ্রাপ্তির অধিকার, উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য পাবার অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা ও সন্তানদের শিক্ষা পাবার অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এসব নীতি-কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকৃত কৃষক, বর্গাচাষি ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ সেবাসহ আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কৃষকের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে যুগোপযোগী কৃষিঋণ নীতিমালা। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক বিপ্লব ঘটে গেছে। ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে কৃষির ওপর। বর্তমানে চার কোটি টন খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে। পাঁচ-ছ' বছর আগেও বাংলাদেশ চাল আমদানিতে প্রতিবছর এক বিলিয়ন ডলার খরচ করত। এখন চাল আমদানি করতে হয় না বললেই চলে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে এখন পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ করছে বাংলাদেশ। কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে। কৃষক পরিবারের উদ্বৃত্ত দিয়েই তাদের ছেলেমেয়েরা এখন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা করতে পারছে। কৃষকরা আজ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কৃষিপণ্য বিক্রির জন্য মূল্য সঠিকভাবে যাচাই করতে পারছে। নয়া মাত্রার এই 'কানেকটিভিটি' বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির সর্বত্রই বিস্তার লাভ করছে।

বঙ্গবন্ধু মানেই একটি দর্শন, একটি চেতনা। যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজও আমরা এগিয়ে চলেছি একটি শোষিত-বঞ্চিত জাতির সার্বিক মুক্তির দিকে। বঙ্গবন্ধু হলেন বিশ্বাস, ধ্যান ও জ্ঞানে মুক্তিকামী জনতার মূলমন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নপূরণ এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে বর্তমান সরকার 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়ন করে চলেছে। আমরা জানি, মূল্যস্ফীতি হচ্ছে গরিবের সবচেয়ে বড় শত্রু। যখন খাবারের দাম বাড়ে, কাপড়ের দাম বাড়ে, বাড়িভাড়া বাড়ে গরিবেরা তা বহন করতে পারে না। তাই গরিব মানুষের জন্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই বাংলাদেশ ব্যাংক বিচক্ষণ মুদ্রানীতি ও আর্থিক নীতি দিয়ে এটিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিগত ছয়-সাত বছরে মূল্যস্ফীতি প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক রাখার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করা হয়েছে নতুন মাত্রায় দেশের উন্নয়নে অপরিহার্য খাতগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে

ঋণ দিতে। বিশেষ করে কৃষি, খুদে, মাঝারি, নারী উদ্যোক্তা ও পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়ন বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। এমনকি বর্গাচাষিদের জন্যও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষিঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের ধারা অক্ষুণ্ন রেখে ব্যাংকিং খাতকে কাজে লাগিয়ে দেশের গরিব, অসহায়, বঞ্চিতদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে নানা কর্মসূচি।

নিম্নআয়ের কৃষক, অসহায় মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক, সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী, কর্মজীবী পথশিশুসহ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুফল ভোগকারী মানুষদের আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তির কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। আজ তাদের ১০ টাকার ব্যাংক হিসাব সংখ্যা দেড় কোটি ছাড়িয়ে গেছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও ব্যাংক হিসাব খুলে সঞ্চয় করতে পারছে। কম খরচে ও দ্রুত টাকা পাঠানোর জন্য চালু করা হয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা। দেশব্যাপী এ নতুন সেবার দ্রুত প্রসার ঘটেছে। প্রায় তিন কোটি মানুষ হিসাব খুলে এ সেবা নিচ্ছে। জনস্বার্থে গ্রিন ব্যাংকিং, সিএসআর, এজেন্ট ব্যাংকিং, আর্থিক শিক্ষার মতো সামাজিক দায়বোধ প্রণোদিত নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গরিব-দুঃখী মানুষের উন্নয়নে সিএসআর খাতে ব্যাংকগুলো এখন বছরে পাঁচশ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করছে। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকেও একটি সিএসআর তহবিল গঠন করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং, দরিদ্রের ক্ষমতায়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এই নয়াধারার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একটি মানবিক ও উন্নয়নমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। খুবই আনন্দের বিষয়, পুরো ব্যাংকিং খাতও এখন অনেকটাই মানবিক। বিগত কয়েকবছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাবনাতেও যুক্ত হয়েছে সাম্য-সমতাভিত্তিক সমুন্নত এক বাংলাদেশের কথা। যেখানে দেশের গরিব-অসহায় মানুষ উন্নত জীবন পাবে। তাদের মুখে হাসি হবে চিরস্থায়ী। যেখানে থাকবে না কোনো ক্ষুধা-দারিদ্র্য, শোষণ-বঞ্চনা। ঠিক যেমনটি ভেবেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উন্নয়নমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে দেশে আর্থিক খাতের সুস্থিতি ও রেজিলিয়েন্স অনেকটাই বেড়েছে। অর্থনৈতিক খাতের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যের হার, গড় আয়ুসহ অনেক সূচকেই ইতিবাচক পরিবর্তন এখন লক্ষণীয়। দারিদ্র্য প্রায় ২৪ ভাগে নেমে এসেছে। এই হার আগামী দিনে আরও দ্রুত কমবে বলে আশা করা যায়। অর্থনীতির সব সূচকই এখন ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল ও জোরালো অবস্থায় রয়েছে। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। বৈদেশিক অর্থনৈতিক খাতের শক্তির জোরেই বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর মতো বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছি।

বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি মন্দার পরিবেশেও গত এক দশক ধরে গড়ে ৬.২ শতাংশেরও বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ শ' ডলারের বেশি। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের পরিচয় পেয়ে গেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল হবে। দ্রুতই পুরোপুরি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবো। তাই আজ দৃঢ়চিত্তে বলা যায়, বাংলাদেশ আর পরনির্ভর জাতি নয়। স্বনির্ভর জাতি। আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরও এগিয়ে যাবে। তারাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন 'দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা' গড়বে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও গর্বের প্রতীক। উজ্জীবিত বক্তা, স্বপ্নদ্রষ্টা ও এমন এক প্রাণের নেতা যাঁর ছিল অনন্য ক্যারিশমা। তাঁর মৃত্যুর চার দশক পর বাংলাদেশ আজ অদম্য। তাঁর স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে বাংলাদেশে। এই দেশটার সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিশ্বকেই চমকে দিয়েছে। আর্থসামাজিক সূচকগুলোই প্রমাণ দেয় বাংলাদেশ আজ এই উপমহাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লাখো শহিদের স্বপ্নের প্রতিও দেশ আজ সুবিচার করে চলেছে। একসময় যারা হতাশ হয়ে দেশটির স্থায়িত্ব নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশের পৃথক রাষ্ট্র হওয়াকে হঠকারী সিদ্ধান্ত মনে করেছেন, যারা আশঙ্কা করেছিলেন কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়া, হেরে যাওয়া অকার্যকর রাষ্ট্রের তালিকায় সামিল হবে–সেইসব নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে আমাদের প্রিয় দেশটি এ সমস্ত মিথ ও ভ্রান্ত পূর্বাভাসকে মিথ্যা প্রমাণ করে অভাবনীয়ভাবে ধ্বংসাবশেষ থেকে স্ফিনিকস পাখির মতো উঠে এসেছে। যারা সে সময়ে হতাশা ছড়িয়ে ছিলেন তারাই এখন বাংলাদেশকে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। বাংলাদেশ এখন টেকসই প্রবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আদর্শ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে উঠেছে। বহির্বিশ্বে ও বাংলাদেশের উন্নয়নমুখী নীতিকে এখন দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হয়। বিশ্বের নানা কোণ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কৃত হয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকও পুরস্কৃত হয়েছে। ভাবতে ভালো লাগছে যে, সনাতনী পথে না হেঁটে নয়া পথে হেঁটেও সাধারণ মানুষের কল্যাণে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। আমার বড়ই সৌভাগ্য হয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের এই নবযাত্রার নেতৃত্ব দেবার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সকল কর্মচারী ও কমকর্তার অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গবন্ধুর চিহ্নিত সাম্যভিত্তি উন্নয়নের নবযাত্রার উদ্বোধন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। হালের একটি প্রযুক্তিগত দুর্ঘটনা বাংলাদেশ ব্যাংকের এই নবজাগরণ স্তব্ধ করে দিতে পারে না। এ দিকে নতুন নেতৃত্বকে কড়া নজর রাখতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সৃজনশীল পরিশ্রমী

দেশ প্রেমিক কর্মীদের মনোবল যেন কোনোভাবেই ভেঙে না পড়ে সেদিকে নীতি নির্ধারকদের অবশ্যই খেয়াল রাখা খুবই জরুরি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই অনাহুত 'ধাক্কা' বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা নিশ্চয় সম্ভব হবে।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিলেন। আর তখনই ঘাতকের নির্মম বুলেট তাঁকে জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। জাতির পিতা আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে তিনি অমর, অবিনশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়ী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে চিরজাগ্রত। 'স্বাধীনতা সংগ্রাম', 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ', 'বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি', স্বাধীন বাংলাদেশ'–যাই বলি না কেন এগুলোর অপর নাম 'বঙ্গবন্ধু'। লাল সবুজের পতাকায় তিনি হয়ে আছেন চিরস্মরণীয়। বরণীয়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক। আমাদের চেতনার অগ্নিমশাল। তাঁর আদর্শ বাঙালি জাতির পথের দিশারি হয়ে থাকবে। তাঁর নির্ভেজাল স্বদেশি চিন্তা-চেতনা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তিনি বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে দৃঢ় শপথ গ্রহণই হবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা জানানো। তাই স্লোগান সর্বস্বতা এবং লোক দেখানো স্তুতিবাক্য নয়, তাঁকে কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নয়, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে কাজ করে যেতে হবে। তাঁর সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গোটা জাতি একযোগে কাজ করতে পারলেই আমাদের অর্থনীতির পালে যে হাওয়া ইতোমধ্যে লেগেছে তা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। নিশ্চয়ই বাংলাদেশ হয়ে উঠবে সত্যিকারের 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা', যেমনটি বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন। আসুন, আমরা সকলে মিলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত থাকার শপথ গ্রহণ করি।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির ও একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নকে আমরা আমাদের ধ্যানে, ত্যাগে, শ্রমের মাধ্যমে রূপায়ণ করব–এটাই হোক আমাদের আজকের শপথ। এ কথা ঠিক তিনি স্বশরীরে আমাদের মাঝে এখন নেই। কিন্তু রয়েছেন আমাদের অন্তরে, ধ্যানে ও মনে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে, তা মোকাবিলার জন্যও আজ তাঁর ঐক্যের আহ্বান, ধর্মবর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে সকলের জন্য তাঁর সামাজিক ঐক্যচিন্তা খুবই প্রাসঙ্গিক। আসুন, আমরা তাঁর এই ঐক্য চেতনার প্রতি দায়বদ্ধ থেকে তাঁর আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।



১০ বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি

সবার সঙ্গে মৈত্রী এবং কারো সঙ্গে বৈরিতা না করে নিরুপদ্রবে 'দেশের সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব এ দেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যাণ্ড' বানাতে চেয়েছিলেন।

(—মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সমকাল, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)

পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা যোগ না করলে তাঁকে পূর্ণাঙ্গভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরা প্রায় অসম্ভবই থেকে যাবে। আজকের পৃথিবী যেভাবে বদলে যাচ্ছে এবং প্রতিটি দেশ বিশ্বায়নের বিষ পান করে বসে আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মতো ছোট উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা বেশ মুশকিল। বঙ্গবন্ধু ভেবেছিলেন, তিনি বাংলাদেশকে তখনকার দুই পরাশক্তির টানাপড়েন থেকে দূরে রেখে সুইজারল্যান্ডের মতো এক শান্তির উপত্যকা হিসেবে গড়ে তুলবেন। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন সমসাময়িক দ্বিমেরু পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতায় বাস্তবে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। যে সময়ের পৃথিবীতে বাংলাদেশ জন্মেছিল এরই মধ্যে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। দ্বিমেরুর এক মেরু ভেঙে গছে। বিশ্বজুড়ে এখন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র প্রভাব। সেই প্রভাবের পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে ছোট বড় নানান ক্ষমতাবলয়। আমাদের পাশের দেশ ভারত অতিদ্রুত শক্তিধর এক ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গড়ে উঠেছে তার লেনদেনের নতুন সম্পর্ক। পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় তার একক কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। অথচ এক সময় খুবই বৈরী সম্পর্ক ছিল এই দুই রাষ্ট্রের। অন্যদিকে আমাদের দেশের অনতিদূরেই চীন

নয়া অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে দ্রুত বিকাশমান। তাঁকে সমীহ করে না এমন দেশ খুব কমই আছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও চীনকে হিসাবে রেখে কথা বলে। বিশেষ করে হালের বিশ্ব-আর্থিক বিপর্যয়ের মাঝেও চীনের অর্থনৈতিক শক্তিমত্তা দুনিয়াকে খানিকটা অবাকই করেছে। এমনি এক নয়া বাস্তবতায় বাংলাদেশকে তার পররাষ্ট্রনীতিকে বিন্যস্ত করতে হচ্ছে। তবে বঙ্গবন্ধু পররাষ্ট্র নীতির যে মূল ভিত্তি গড়ে দিয়ে গেছেন তাকে সম্বল করেই আমাদের এখনো এগোতে হচ্ছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই স্বদেশের বাস্তব প্রয়োজনে পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখা খানিকটা বদলে ছিলেন। শুরুতে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের বিদেশনীতি দাঁড় করালেনও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের কথা মাথায় রেখে এবং পাশাপাশি দেশটির অর্থনেতিক পুনর্গঠনের অপরিহার্যতা মনে রেখে তিনি তাঁর পররাষ্ট্রনীতিকে যেমন মধ্যপ্রাচ্যমুখী করেছেন, তেমনি আবার পশ্চিমের বৈদেশিক সাহায্য-ঋণ গ্রহণের উপযোগীও করে তুলেছিলেন। এমনকি বেঁচে থাকতেই তিনি চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক গভীরতর করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তবে তিনি সবচেয়ে কৌশলী ছিলেন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে। তিনি মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা স্মরণে রাখলেও একই সঙ্গে সর্বাধিক সংখ্যক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করে সহযোগিতার সম্ভাবনাকে বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন। বরাবরই তিনি বাস্তববাদী ছিলেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনেও তিনি বাস্তবতাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। খেয়াল রেখেছেন তাঁর পররাষ্ট্রনীতি যেন একদিকে ঝুঁকে না পড়ে। তিনি আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করেছেন যাতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে যেন কেউ ঢালাওভাবে ভারত-সোভিয়েত অক্ষের প্রভাবে বেড়ে উঠেছে বলে ধরে না নিতে পারে। তবে মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম এই দুই বন্ধুরাষ্ট্রকে কোনো অবস্থাতেই খাটো না করার নীতিও ছিল তাঁর খুবই সুদৃঢ়। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি ভালো করেই জানতেন যে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ ছিল। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর হঠাৎ করে সীমানা বদল হওয়ার কারণে পাকিস্তান ও ভারতের সম্পূরক অর্থনীতির বিকাশে বাধা পড়ে। এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে দু-দুটো যুদ্ধের কারণে সম্পূরক এই অর্থনীতির বিকাশ আরও সংকুচিত হয়ে পড়ে। পাকিস্তান খুব বেশি করে পশ্চিমের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তার অর্থনীতিও সেভাবেই পশ্চিমের অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত হতে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও রাতারাতি ব্রিটিশ যুগের পুরোনো সম্পূরক অর্থনীতির পুনর্জাগরণ ঘটানো সম্ভব হয়নি। আর অর্থনীতি ও রাজনীতির বন্ধন যে পারস্পরিক তা কে না জানেন। দুদেশের সমকালীন বা পরবর্তী রাজনৈতিক বন্ধন সুদৃঢ় হলে বাণিজ্যিক সম্পর্কে গতি আসবেই। ইতিহাস অন্তত তাই বলে। রাজনৈতিক শূন্যতায় অর্থনেতিক

সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় না। রাজনৈতিক আস্থার ভেতর দিয়েই দুদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গভীরতর হয়। রাজনৈতিক সম্পর্ক ভালো থাকলে শুরুতে অর্থনৈতিক সম্পর্কের মাত্রা সামান্য হলেও দ্রুতই তা বিকশিত হতে থাকে। আর অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হলে রাজনৈতিক সম্পর্কও ধীরে ধীরে আরও মজবুত হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু দুদেশের সম্পর্কের এই বৃহত্তর ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামোর দিকটি খুবই ভালো করে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর তা সম্ভব হয়েছিল তার বিরাট রাষ্ট্রনায়কোচিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। দুটো দেশ সহযোগিতা চুক্তি করলে শুরুতে কেউ-না-কেউ একটু বেশি সুবিধে পেতেই পারে। কিন্তু সম্পর্কটা সুদৃঢ় থাকলে পরবর্তী সময়ে কম সুবিধে পাওয়া দেশের পক্ষেও আরও বেশি সুবিধা লাভের সুযোগ মিলবে। ভারতের মতো বড় দেশের পক্ষে খানিকটা বাড়তি সুবিধা লাভের বাস্তবতার বিষয়টি বঙ্গবন্ধু বুঝতেন। তাই তিনি ধৈর্য ধরে সম্পর্কটা বজায় রেখে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সুবিধা লাভের পাল্লাটি ভারী করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষায় বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর উঁচুমানের ব্যক্তিগত সম্পর্কও ভারত-বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে শক্তিশালী ভিত্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বড় দেশ হিসেবে ভারত হয়তো ভেবেছে যে, বাংলাদেশের মতো ছোট দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়লেও কতই-বা লাভ হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের অর্থনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পূরক সম্পর্কের আলোকে দেখলে দুদেশেরই পারস্পরিক লাভের পরিমাণ মোটেও সামান্য নয়। এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি দিল্লীর কাছে স্পষ্ট হলে দুদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের পক্ষে যুক্তিগুলো যে আরও শাণিত করা যায়–সে কথাটি বঙ্গবন্ধু জানতেন। আর তা জানতেন বলেই তাঁর শাসনামলে যৌথ অর্থনৈতিক বিনিয়োগের পরিসর বাড়ানোর জন্য বেশ কিছু প্রকল্পের সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছিল। দিল্লীর সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ছিল বলেই অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের এই শুভ সূচনা করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। স্বদেশের স্বার্থকে সুরক্ষা করেও বড় পড়শির সঙ্গে কী করে সম্মানজনক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব–বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বঙ্গবন্ধুর অকালপ্রস্থান সম্ভাবনাময় এই বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিকাশে শুধু ছেদ টেনেছে তাই নয়, আজও এ অঞ্চলের আন্তর্দেশীয় সম্পর্কে বড় ধরনের কোনো গুণগত উত্তরণ ঘটেনি। বরং নানামাত্রিক সংশয় দানা বেঁধেছে। সে কারণে উভয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের বিষয়টি এই সন্দেহ ও সংশয়ের পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে নিঃসন্দেহে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এমন বিপর্যয় বিরাজ করার সুযোগ দিতেন না।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের (১৯৭২) পর বঙ্গবন্ধু প্রথম সংবাদ-সম্মেলনে মুক্তিসংগ্রামকে সর্বাত্মক সমর্থন করায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, তাঁর সরকার ও মহান জনগণকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানান। বাংলাদেশের সংগ্রামকে সমর্থন ও জাতিসংঘে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার জনগণকে বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ জানান। পোলান্ড, বুলগেরিয়া ও অন্যান্য পূর্ব-ইউরোপীয় দেশ এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাংলাদেশের সংগ্রাম সমর্থন করায় তিনি যুক্তরাজ্যসহ সারা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ, সংবাদপত্র ও নেতৃবৃন্দকেও ধন্যবাদ জানান। চীনের প্রতিও আবেদন রেখে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি আশা করি, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বীরোচিত সাফল্যকে স্বীকৃতি দেবে। কারণ চীনও যুদ্ধবাজ-স্বৈরতন্ত্রী ও ঔপনিবেশিক শোষকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।' (মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি*, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ. ৬৬৮)।

১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ভারত সরকারের আমন্ত্রণে কলকাতা সফর করেন। বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর এটাই ছিল প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিদেশ সফর। সে সফরের সময় উভয় দেশের মধ্যে আন্তরিক ও উষ্ণতার উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেদিন বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন :

'ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রী চিরদিন অটুট থাকবে, বিশ্বের কোনো শক্তি পারবে না এই মৈত্রীতে ফাটল ধরাতে। ভারত-বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আর সাম্রাজ্যবাদের খেলা চলতে দেওয়া হবে না। বিশ্বের আর কোনো শক্তিই এ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বিশ্বের ইতিহাসে স্বাধীনতার জন্য এত বড় মূল্য আর কেউ দেয়নি। এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের শেষ মানুষটিও প্রাণপণ সংগ্রাম করবে।...

'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী এশিয়ায় এক নতুন যুগের উন্মেষ ঘটাবে। আমি আমাদের প্রতি ভারত সরকার ও জনগণের ভালোবাসা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। আসুন মানবতার সেবায় আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করি।' (দ্র. *দৈনিক বাংলা*, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৯ তারিখে এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

'আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গড়ে তোলা। রাষ্ট্রীয় মূল চার নীতির ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধুর সরকার তা-ই অনুসরণ করেছে স্বাধীনতা-পরবর্তীতে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের

সুইজারল্যান্ড বলে ঘোষণা করেন। অর্থাৎ সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়। চীন ও পাকিস্তান সে সময়ে অপপ্রচার চালিয়েছিল যে, বাংলাদেশ কোনো স্বাধীন দেশ নয়, ভারতের অংশ বিশেষ। বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেন। ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার সম্পন্ন হয় মার্চের মধ্যে। ১৯৭১-এর আগে যারা দেশত্যাগ করেছিলে তাদের ফেরত না আনা ও ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যেন প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে, এই বিষয়ে তিনি ছিলেন বেশ সতর্ক।'

তাৎক্ষণিক এসব বিষয় ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির একটি বড় উদ্যোগ ছিল দুদেশের সুসম্পর্ক যেন স্থায়ী হয়। ছোটখাটো বাধা যেন দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক বিকাশে কোনো বিড়ম্বনার সৃষ্টি না করতে পারে–সে দিকে তার প্রখর নজর ছিল। ফেব্রুয়ারি '৭২ সালের প্রথম দিকে কলকাতায় দুদেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলাপ-আলোচনার সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক সহযোগিতা সুদৃঢ় করার জন্য যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেগুলোর মধ্যে ছিল : উভয় দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীসমূহের ব্যাপক জরিপ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে উভয় দেশের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য দুদেশের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে স্থায়ী একটি যুগ্ম নদীপরিষদ গঠন করা হবে। বাংলাদেশকে ইতিমধ্যে যে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশের সরকার ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। উভয় প্রধানমন্ত্রী নিজ নিজ দেশের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য চালাবার ব্যবস্থা এবং সীমান্ত বাণিজ্য-চুক্তির পুনরুজ্জীবনের নীতি অনুমোদন করেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিবেচনা করে উভয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন যে, উভয় দেশের সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, শিল্পোন্নয়নের জন্য

দেশ গড়ার কাজে কেহ আমাদের সাহায্য করতে চাইলে তা আমরা গ্রহণ করবো। কিন্তু সে সাহায্য অবশ্যই হতে হবে নিষ্কণ্টক ও শর্তহীন। আমরা জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সব জাতির সমমর্যাদার নীতিতে আস্থাশীল। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার কেহ হস্তক্ষেপ করবেন না এটাই আমাদের কামনা।

(—বঙ্গবন্ধু; বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৬ মার্চ, ১৯৭২।)

কারিগরি গবেষণার ফলাফল ব্যবহার, সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ভবিষ্যতের মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল ব্যবহার সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও তথ্য-বিনিময় করবেন। দীর্ঘমেয়াদী এই রূপরেখার অধীনেই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বেড়ে ওঠার উর্বর ক্ষেত্র তিনি প্রস্তুত করেছিলেন।

১৯৭২ সালের ১৭-১৯ মার্চের কথা। বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফর করেন। এই সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় ও সহযোগিতার নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহান অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে জনসমুদ্রে বক্তৃতাকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র এখনো চলছে। ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের দুদেশের ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছে।' ভারতের নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন, 'ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব ও ঐক্য সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন দুদেশই স্বাধীনতা ও মানবতার মহামন্ত্রে উজ্জীবিত। কেউ যদি এই বন্ধুত্বের মাঝে বিভেদের প্রাচীর তুলতে চেষ্টা করে তবে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।' শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ভাষণদানকালে আরও বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণ পরস্পর মহান বন্ধু। আপনাদের দুঃখ-দুর্দশায় প্রতিটি ভারতবাসী কেঁদেছে। বাংলাদেশের জনগণ তাদের বিগত আঁধার দিনগুলোতে ভোগ করেছে অকথ্য নির্যাতন ও দুঃখ-দুর্দশা। বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভারতের জনগণের রয়েছে অশেষ ভালোবাসা আর দরদ। ভারতীয় সৈনিকরা বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে। পাকিস্তানবাহিনীর অকথ্য নির্যাতনে বাংলাদেশের লাখ লাখ লোক গৃহহারা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা তাদের ঘরবাড়িতে ফিরে এসেছেন, এতে তারা সুখী হয়েছেন। দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ফেলে যাওয়া ধ্বংসস্তূপের উপর বাংলাদেশের মানুষ তাদের সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৬)। রক্তের বন্ধনে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ-ভারত সুসম্পর্কের যে ভিত্তি এই দুই রাষ্ট্রনায়ক স্থাপন করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত তাদের বিদায়ের পর পুরোপুরি অক্ষত রাখা যায়নি। তবে মূল কাঠামো এখনো মোটামুটি টিকে আছে বলে চলে।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির ধারণা তাঁর বাস্তব জ্ঞান এবং প্রখর দেশপ্রেমের সম্মিলনেই গড়ে উঠেছিল। ক্ষমতাগ্রহণের আগে খুব বেশি দেশ তিনি দেখেছিলেন সে কথা বলা যাবে না। প্রাক-স্বাধীনতাকালে বঙ্গবন্ধুর বেশিরভাগ সময়ই

কেটেছে কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায়, এ কারণে তাঁর মাত্র চারবার বিদেশ সফরের সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রথমবার ১৯৫২ সালে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য গণচীনের রাজধানী পিকিং সফর করেন। দ্বিতীয়বারও তিনি গণচীন সফর করেন ১৯৫৬ সালে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে। ১৯৫৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমান পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশ সফর করেছিলেন। সফরকালে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও জাপান গিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য :

S.A. Karim তাঁর Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy, বইতে ৮৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

...Suhrawardy proposed that Mujib should go on a world tour of important countries like the United States, Great Britain, France, Germany and Japan. The tour would last two months. The Working Committee approved the tour plan and Mujib left Dhaka soon thereafter. It was in London, where there was the biggest concentration of Bengalis in the western world, that he spent the longest time, twelve days in all...'

আরেকবার তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লন্ডনে গিয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের বিষয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আলোচনার জন্য লন্ডন গিয়েছিলেন। আবার পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের শুরুতেই স্বল্প সময়ের জন্য লন্ডন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরেছিলেন। সে ছিল এক ঐতিহাসিক সফর।

১৯৭২ সালের ২ থেকে ৬ মার্চ তিনি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল নিয়ে তৎকালীন অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সোভিয়েত ইউনিয়নে সফর উপলক্ষে *প্রাভদা* ও *ইজভেস্তিয়া* নামে দুইটি প্রধান রুশ দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁর ছবিসহ জীবনী প্রকাশিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর মস্কো সফরের সময় অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তিতে বাংলাদেশে নির্মীয়মাণ সোভিয়েত প্রকল্প ছাড়াও কিছু নয়া প্রকল্প ও সহযোগিতার নবতর ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হয়। দুই দেশের নেতারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু বিষয়ে কথা বলেন। আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়ে উভয় দেশ অভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উল্লেখ করেন :

'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে আমার দেশের

মানুষ যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল তখন আমাদের সাহায্য করার জন্য একমাত্র ভারতের মহান জনগণ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীই এগিয়ে এসেছিলেন। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। আমাদের সঙ্কটকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সমর্থনের কথা আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না। আমাদের চরমতম জাতীয় সঙ্কটের দিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের যে সাহায্য দিয়েছে, আমরা তা কোনো দিন ভুলব না। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী মানুষের শুভেচ্ছার বাণী নিয়ে আমি সোভিয়েত দেশে এসেছি।' (দ্র. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮৪)

বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্রনীতির বড় সাফল্য হচ্ছে দ্রুত শতাধিক দেশের স্বীকৃতি আদায় করা, পাকিস্তানে আটক বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনা, জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভ, আন্তর্জাতিক অনেকগুলো সংস্থায় সদস্যপদ লাভ প্রভৃতি। স্বাধীন জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর সরকারের। এর পাশাপাশি ইসলামি বিশ্ব আর পশ্চিমা শক্তির সাথেও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ আর পাকিস্তানের শর্তহীন স্বীকৃতি আসে ১৯৭৪ সালে। শুধু চীন এবং সৌদি আরব ছাড়া সকলের সাথেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সময়ে। আর সেই সম্পর্ক ছিল স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, চীন ও সৌদি আরব বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের আগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন করেনি (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৬)। তবে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্থাপনে বড় ধরনের অগ্রগতি বঙ্গবন্ধুর অনানুষ্ঠানিক উদ্যোগের ফলেই ঘটেই ছিল। ঝানু এক কূটনীতিক ও প্রগতিশীল সাংবাদিকের সহযোগিতায় তিনি এ কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নির্ভর করে খুব বেশি সাহায্য পাওয়া যাবে না। কাজেই ১৯৭২-এর শেষ থেকেই বাংলাদেশ ঋণ/সাহায্য সংগ্রহের বিকল্প উৎসের সন্ধান শুরু করে। একই সময়ে বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতিতে ভারসাম্য রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। যেমন, চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দরকে মাইনমুক্ত করার জন্য সোভিয়েত নৌবাহিনী প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের দায়িত্ব সোভিয়েত নৌবাহিনীকে দেওয়া হলেও চালনা বন্দরের দায়িত্ব দেওয়া হয় জাতিসংঘকে। বাংলাদেশের জলসীমায় সোভিয়েত নৌবাহিনীর উপস্থিতিতে বাইরের বিশ্বে যে প্রতিক্রিয়া হতো তাকে কিছুটা লাঘব করার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশ এই পদক্ষেপ গ্রহণ

করেছিল। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বন্দরের মাইন অপসারণের জন্য ভারতীয় নৌবাহিনী তৎপর ছিল। কিন্তু ভারতের ওপর নির্ভরশীলতা যেন না বাড়ে সেদিকে বাংলাদেশ সচেতন ছিল (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৬)

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখা আমরা খুঁজে পাই জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর ১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তাঁর বাংলায় ভাষণ দেবার সিদ্ধান্ত থেকে। সেদিনই প্রথম বিশ্বদরবারে বাংলা ভাষার উচ্চারণের মাধ্যমে ভাষা-আন্দোলনের গৌরবময় ঐতিহ্যের বন্ধনে বিশ্ববাসীকে যুক্ত করেন। পরবর্তীতে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘ বাঙালি জাতি ও তাঁর পিতার প্রতি পূর্ণাঙ্গ সম্মান দেখিয়েছিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন :

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহতকরণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ও ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে যাহারা মূল্যবান সাহায্য দিতেছেন, তাহাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম হইতেছে সার্বিক শান্তি ও ন্যায়ের সংগ্রাম। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পরে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, এইসব নীতিমালার বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে কী তীব্র সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইয়াছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার লাখ লাখ বীরযোদ্ধার চরম আত্মদানের মাধ্যমে শুধুমাত্র জাতিসংঘ সনদ স্বীকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পুনরুদ্ধার সম্ভব। ...যুদ্ধের ধ্বংসলীলার উপর সৃষ্ট বাংলাদেশ পরপর কতিপয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছে। সর্বশেষে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছি তাহা হইতেছে, এই বছরের নজিরবিহীন বন্যা। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সাহায্য করার ব্যাপারে সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করায় আমরা জাতিসংঘ, তার বিভিন্ন সংস্থা ও মহাসচিবের কাছে কৃতজ্ঞ।' বঙ্গবন্ধু আরও বলেন :

'বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার প্রমাণের জন্য উপমহাদেশে আপস-মীমাংসার পদ্ধতিকে আমরা জোরদার করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের অভ্যুদয় বস্তুতপক্ষে এই উপমহাদেশে শান্তি-কাঠামো এবং দায়িত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবদান সৃষ্টি করিবে। ...আমরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ও নেপালের সাথে শুধুমাত্র সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করি নাই, অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলিয়া গিয়া পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক করিয়া নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছি।' (দ্র. মোনায়েম সরকার সম্পাদিত *বাঙালির কণ্ঠ*, ১৯৯৮, পৃ. ৩৭৭-৩৮২)

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক গৃহীত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সম্মেলনের রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ১৮-২০ জানুয়ারি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান প্রদত্ত প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল, '...আমাদের মুক্তিসংগ্রাম চলাকালে মহান ভারতবর্ষ ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ আমাদের কোটি কোটি মুক্তিকামী সংগ্রামী জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা শুধু মৌখিক সমর্থন দিয়েই বিরত থাকেননি, তাঁরা অর্থনৈতিক এবং উপকরণগত সাহায্য দিয়ে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীন জাতিকে বিশ্ব-মানবগোষ্ঠীতে প্রতিষ্ঠিত করার ক্রমাগত চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এ সকল বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশ সরকারের সমন্বয় সাধন করে আমরা প্রতিনিয়ত দলীয় ভিত্তিতে ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্পর্ক মজবুত ও দৃঢ় করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি। ...বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও স্বাধীনতালাভের মাত্র দুবছর সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও তার সরকার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন সাফল্য অর্জন করেছে, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এই কৃতিত্ব ও সাফল্যের মূলে রয়েছে আওয়ামী লীগের জনগণের কাছে প্রদত্ত সকল প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর হওয়ার নীতি। তাই, বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে আমরা সব সময়ই সরকারকে প্রয়োজনীয় উপদেশ, নির্দেশ বা পরামর্শ দিয়েছি। এই উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক কমিটিতে ২৯-৭-৭২ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ...১১৬টি রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে।...' (দ্র. আওয়ামী লীগ সম্মেলনের রিপোর্ট, ১৯৭৪, পৃ. ৩৩৭-৩৫৬)

১৯৭৫-এর মে মাসে চীন-বাংলাদেশ বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চীন-বাংলাদেশের সম্পর্কের অগ্রগতি সম্পর্কে সেই সময়ে বাংলাদেশে পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দীন আহমদের জবানিতে জানা যায়, 'I mention that Chinese Ambassadors in various capitals were unusually warm and friendly to heads of our missions and we in the Ministry of Foreign Affairs were enocuraged by the signal. We concluded that before the end of 1975 normal relations with China would be restored.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৬)

বাংলাদেশের সঙ্গে দেরিতে হলেও চীনের সমঝোতা হয়েছিল। এ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের সফল পররাষ্ট্রনীতির একটি বিরল দৃষ্টান্ত। ১৯৭৩-এর মধ্যে বাংলাদেশ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে, বাস্তব কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ থেকে আশানুরূপ সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। কাজেই এ সময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া

প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ তৎপর হতে শুরু করে। ১৯৭৩-এর অক্টোবর মাসে বঙ্গবন্ধু জাপান সফর করেন। এই সফরের সময়ে যমুনা সেতু প্রকল্পে জাপানি সাহায্য সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা হয়। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ-তহবিলের মাধ্যমে সাহায্য দিতে শুরু করে। আর জাতিসংঘ তো প্রথম থেকেই বাংলাদেশের প্রতি সদয় ছিল। এভাবেই 'কারও সঙ্গে শত্রুতা নয় সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব'–এই কাঠামোর ভেতর বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি গড়ে উঠেছিল। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী সময়ে আরও স্পষ্ট করেন তিনি।

১৯৭৪-এর ৪ মার্চ কুমিল্লার দাউদকান্দিতে একটি জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন :

'এ উপমহাদেশে বাংলাদেশ ভারত, পাকিস্তান, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা–আমরা শান্তিতে বসবাস করতে চাই। আমরা কারও সঙ্গে কোনো বিবাদে লিপ্ত হতে চাই না। আমরা আত্মমর্যাদা নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে একে অপরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে চাই। আমাদের ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করুক তা আমি চাই না, আমরা অপরের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাই না।' (দ্র. পাণ্ডরু, পৃ. ৬৯৯)

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক যে খুবই স্পর্শকাতর সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ধারণা ছিল খুবই গভীর। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি এবং বাংলাদেশের বাঙালির পরিচয় অভিন্নতা ও ভিন্নতা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারতের সহযোগিতা এবং ঘনিষ্ঠ আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্যক অবহিত এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক রাষ্ট্রনায়ক। এই মূল্যায়ন আমার নয়। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু যান লন্ডনে। লন্ডন থেকে দিল্লী হয়ে ঢাকা আসার দীর্ঘ যাত্রাপথে বিশেষ বিমানের পাশের সিটে বসে এসেছিলেন সেই সময়ের তরুণ ভারতীয় কর্মকর্তা বেদ মারওয়া। *প্রথম আলোর ছুটির দিনে*-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'শেখ মুজিবের মতো মানুষ দেখিনি।' (দ্র. ছুটির দিনে, ১০ জানুয়ারি, ২০০৯)। তিনি বলেছেন, 'ওই সময় শেখ মুজিব বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরাজমান কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত করেছিলেন। ...তিনি বললেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারতকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে হবে।

'একপর্যায়ে তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পরিচয় কী হবে তা নিয়ে কথা বলা শুরু করেন। আমাকে উদ্দেশ করে শেখ মুজিব বলছিলেন, দেখ, আমরা প্রথমে বাঙালি। এটা বাংলাদেশিদের বহু স্তরবিশিষ্ট পরিচয়ের একটি। আমরা এ

পরিচয় নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত। এ পরিচয়কে ভিত্তি করেই স্বাধীনতার সব সংগ্রাম হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমরা মুসলিম। স্বীকার করতে হবে, তাঁর এ কথায় আমি কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলাম। তৃতীয়ত, আঞ্চলিক পরিচয়। তিনি বলছিলেন, এ অঞ্চলের সমস্যাগুলো খুব বেশি অভিন্ন। পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এসব সমস্যা সমাধানের অন্য কোনো উপায় নেই। আপনি কল্পনা করতে পারেন, একজন মানুষ কতটা আত্মবিশ্বাসী হলে দায়িত্বভার গ্রহণের আগেই এমন সব কথা বলতে পারেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই প্রখরতা ওই সময় আমার মধ্যে গভীর দাগ কেটেছিল। শেখ মুজিবের কথায় মনে হচ্ছিল পুরো বাংলাদেশটাই তাঁর হাতের মুঠোয়। যেন তিনিই 'বাংলাদেশ'।

স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে ভারতপন্থী হিসেবে অভিযুক্ত করা খুবই অযৌক্তিক। তবে ভারতের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনেও তিনি ছিলেন সচেতন। মনে রাখা চাই, পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি দেশে ফেরার সময়ে ভারতীয় বিমানে ভ্রমণের আমন্ত্রণ পর্যন্ত গ্রহণ করেননি। বরং যুক্তরাজ্যের রাজকীয় বিমানেই তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরেছিলেন। দেশে ফিরেই বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহারের জন্য তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ১৯৭৪-এর সীমানা-সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে কিছু অতিরিক্ত ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার জন্য তিনি ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর জোরালো ভূমিকার কারণেই ১৯৭৫-এর ১৮ এপ্রিল ফারাক্কা সংক্রান্ত অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের দৃষ্টিতে পাকিস্তান ছিল শত্রুরাষ্ট্র। কিন্তু নিজের স্বার্থে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়েছে। বাঙালি প্রত্যাবাসন, সম্পদ বিভাজন ও বাংলাদেশ থেকে অবাঙালি ফেরত পাঠানো ইত্যাদি বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় ইস্যুতে বাংলাদেশের স্বার্থই জড়িত ছিল। তাঁর এই বাস্তবমুখী পররাষ্ট্রনীতিকে কেউ কেউ বাঁকা চোখে দেখলেও শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তিকে তা খুবই জোরদার করেছে। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো আমরা তাঁর এই যুগোপযোগী স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির ফসল বেশি করে ঘরে তুলতে পারতাম। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কের উপস্থিত পররাষ্ট্রনীতির ওপর কী প্রভাব ফেলতে পারে তা বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্কের নিরিখেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। বঙ্গবন্ধুর এই ভাবনার আলোকে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে উচ্চতর এক পর্যায়ে নেবার নতুন সুযোগ ফের বাংলাদেশ পেয়েছে। পরিবর্তিত এই সময়ে বাংলাদেশের নতুন সরকার কতটা দূরদৃষ্টি ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এ সুযোগকে ব্যবহার করে দুদেশের মাঝে বিরাজমান সমস্যাগুলো সন্তোষজনক সমাধান করতে পারে তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।



১১ দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালির কৃষকপ্রীতি

আজ শুধু একলা চাষীর
চাষ করিবার দিন নাই,
আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে,
বৈজ্ঞানিককে যোগ
দিতে হইবে।

(—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
'ভূমিলক্ষ্মী', র র, চতুর্দশ
খণ্ড, পৃ. ৩৬০)

আমাদের চাষীরা হলো
সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত
শ্রেণী এবং তাদের অবস্থার
উন্নতির জন্যে আমাদের
উদ্যোগের বিরাট অংশ
অবশ্যই তাদের পিছনে
নিয়োজিত করতে হবে।

—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শ্রাবণ মাস এলেই দুচোখ বেয়ে ঝরে কান্না। সেই কান্নায় ভেসে যায় গ্রামবাংলা। লাখ লাখ গ্রামবাসী বন্যার কারণে হন দিশেহারা। প্রায়ই ফসলি জমি পানির নিচে, ঘরে পানি, পেটে থাকে না ভাত। এদের কষ্টের নেই কোনো সীমা-পরিসীমা। তাদের দুঃখ-বঞ্চনার কথা নগরের ক্ষমতাকেন্দ্রে সাধারণত পৌঁছায় না। ব্যক্তির লোভ ও শক্তি এতটাই বেড়েছে যে মানুষ আজ বিচ্ছিন্ন। সমাজ তাই বিপন্ন। এই সমাজে কৃষককুল পুরোপুরিই উপেক্ষিত। কিন্তু এদের কথা ঠিকই মনে রেখেছিলেন দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালি। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধুর কৃষকপ্রীতির কথা আমরা আমাদের আলোচনায় সেভাবে আনি না। শ্রাবণেই এই দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালি ছেড়ে গেছেন আমাদের। দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে তাঁরা এমনই বর্ষণমুখর শ্রাবণে বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের কথা নানাভাবে নানান অনুষ্ঠানে স্মরণ করা হয় এবং হচ্ছে। আমরা আজ তুলে ধরতে চাই এদেশের সবচেয়ে অবহেলিত জনগোষ্ঠী কৃষকদের নিয়ে তাঁদের ভাবনা ও পরিকল্পনাকে।

রবীন্দ্রনাথ নগরে জন্মেছিলেন। কাজের সুবাদে তাঁকে আসতে হয়েছিল পূর্ববাংলায়। কৃষকদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। আর বঙ্গবন্ধু তো ছিলেনই কৃষকসন্তান। তবে তাঁর পড়াশোনা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের

বড় অংশই ছিল নগরে। গ্রাম ও নগরের ভাবনার এই মিশেল দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালির মনোজগৎকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ যতদিন পল্লীতে ছিলেন ততদিন তাকে তন্নতন্ন করে জানবার চেষ্টা করতেন। পল্লীবাসীর দিনকৃত্য, তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনযাত্রার ধরন দেখে তাঁর প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠত। তিনি লিখেছেন, 'আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে, মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তাঁর জন্য কিছু করব, এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছটফট করে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসা করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক-বৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তার পর থেকে চেষ্টা করতুম–কী করলে এদের মনের উদ্বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে। কী করলে এদের মধ্যে জীবনসঞ্চার হবে, এই প্রশ্নই তখন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।' (রবীন্দ্রনাথ, 'শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ, র র, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৩৭৮)। তিনি বরাবরই মনে করতেন যার অভাব আছে তার অভাবমোচনের শক্তিকে জাগিয়ে তোলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আত্মশক্তি উদ্বোধনের এই প্রচেষ্টা ছিল তাঁর সারা জীবনের সাধনা। পূর্ববাংলার কৃষকদের দুঃখ দেখে তিনি তাদের সমবায় গঠন করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। নিজের ছেলেকে পর্যন্ত কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষিবিদ্যাতে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। নোবেল পুরস্কারের টাকাটাও গ্রামীণ উন্নয়নে ব্যয় করেছিলেন। শান্তিনিকেতনেও তিনি আশপাশের গ্রামের কৃষকদের নিয়ে নানান কাজ করেছেন। তিনি বরাবরই আত্মশাসনের পক্ষে ছিলেন। পল্লীর উন্নতির জন্য তাঁর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল। 'আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘরবাড়ি পরিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগীপরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি।' (রবীন্দ্রনাথ, 'পল্লীর উন্নতি', র র, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৩৫৮)

তিনি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন যে, পল্লীবাসীরা উপেক্ষিত। তিনি মনে করতেন, 'অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। ...গ্রামে অন্ন উৎপাদন করে বহু লোকে, শহরে অর্থ উৎপাদন ও ভোগ করে অল্প সংখ্যক মানুষ; অবস্থার এই কৃত্রিমতায় অন্ন এবং ধনের পথে মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে। ওই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বাঁধে তার বাসা বেশিদিন টিকতেই পারে না। গ্রীসের সভ্যতা নগরে সংহত হয়ে আকস্মিক ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে পৃথিবীকে বিস্মিত করেছিল, কিন্তু নগরে একান্ত

কেন্দ্রীভূত তার শক্তি স্বল্পায়ু হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে।' (রবীন্দ্রনাথ, *উপেক্ষিত পল্লী*, র র, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৩৭১)

এই অবস্থার অবসানের জন্যই তিনি সারা পৃথিবীর আলো পল্লীতে ফেলতে বলেছেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরশ পল্লীবাসীরও পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সে কারণে নগরবাসীরও রয়েছে দায়। দেশে জন্মালেই যে দেশ আপন হয় না সে কথা তিনি তাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। 'যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়।' (রবীন্দ্রনাথ, 'দেশের কাজ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮)

দেশকে এমন গভীরভাবে ভালোবাসার যে আহ্বান রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তা মনে হয় বৃথা যায়নি। আরেক শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছেন স্বদেশকে। ছিলেন তিনি গ্রামীণ সাধারণ পরিবারের সন্তান। কিন্তু সুযোগ পেয়েছিলেন উদার, অধিকার-বঞ্চিত গ্রামীণ কৃষকের নিরন্তর খণ্ড খণ্ড স্পর্ধিত প্রতিরোধ অবলোকনের, অন্যদিকে তাঁকে ক্রমাগত প্রভাবান্বিত করছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। তাই শহরের গণ্ডি থেকে টেনে তিনি তাদের (রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে) সমগ্রের প্রতিনিধি করলেন। ঐতিহ্যে স্থির থেকে তিনি বাঙালির আধুনিক পরিচয়কে বহুমাত্রিক পূর্ণতা দিলেন। ভাষা-আন্দোলন যেভাবে বাঙালির নবলব্ধ আত্মপরিচয়কে গণতান্ত্রিক, বহুরৈখিক, সহিষ্ণু করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পথ বেঁধে দেয় তা থেকে একটুও বিচ্যুত হননি তিনি। বরং হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো ঐ পথেই কোটি বাঙালিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে থাকেন স্বাধীনতা তথা মুক্তির মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রতিজ্ঞা বুকে বেঁধে। সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতা-আন্দোলনকে পরিচালনা করেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মূলত কৃষক-সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হলো যে বাংলাদেশ তার প্রাথমিক পরিচালনা-দায়িত্ব নিয়েও তিনি ভুলতে পারেননি কৃষকদের কথা। শোষণহীন সমাজ গঠনের তাঁর যে অভিপ্রায় ছিল তা তিনি গোপন করেননি। আর সেই অভিপ্রায়ের জমিনের বড় অংশই জুড়ে ছিল বাংলাদেশের কৃষক। সারা বাংলাদেশের হৃদয়কে এক করার নিরলস প্রচেষ্টায় তিনি কৃষকদের অবস্থান বরাবরই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। শেষ পর্যন্ত কৃষকদের মুক্তির পরিকল্পনা তিনি রূপায়ণ করে যেতে পারেনি। অর্থনীতির আমূল সংস্কারবাদী বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যে বিশাল কর্মযজ্ঞে তিনি হাত দিয়েছিলেন তাতেই রুষ্ট হয়েছিল নগরের সুবিধাভোগী স্বার্থান্বেষী মহল। তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত কৃষকদের কাছেই ফিরে যেতে হলো। তিনি তাদের সান্নিধ্যেই পরম শান্তিতে টুঙ্গিপাড়ায় ঘুমিয়ে রয়েছেন। জীবন দিয়ে হলেও তিনি কৃষকদের তথা গরিব-দুঃখীদের জন্য তাঁর

আজীবন অঙ্গীকারের প্রমাণ রেখে গেছেন। প্রকৃতির বর্ষণমুখর বাস্তবতায় তাঁকে তাই খুবই মনে পড়ে। আমি নিজেও এক কৃষক-সন্তান। তাই কৃষকের জন্য তাঁর হৃদয়মথিত আকুতির কথা বলতে ইচ্ছে করছে পাঠকদের।

বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, কৃষির উন্নতি ছাড়া এদেশের মানুষের মুক্তি আসতে পারে না। কৃষকেরাই এদেশের প্রাণ। তাঁরাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। কেননা তারা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারা বেলা কঠোর পরিশ্রম করে বাংলার প্রত্যেকটি ঘরের প্রত্যেকটি মানুষের মুখে অন্নের জোগান দেন। ক্ষুধা নিবারণের প্রধান উপাদানের জোগানদাতাদের বঙ্গবন্ধু সবসময় স্থান দিয়েছেন নিজের মনের মণিকোঠার সর্বোচ্চ স্তরে। তিনি যেমন তাঁদের ভালোবেসেছেন তেমনি তাঁদের ভালোবাসাও পেয়েছেন সর্বক্ষণ। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশমাতৃকার মান অক্ষুণ্ন রাখতে কৃষকরাও লাঙল ছেড়ে অস্ত্র ধরেছিল দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে। কৃষক-বধূরাও সাহস যুগিয়েছেন তাঁদের। সস্নেহে সাহায্য করেছেন অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের। বঙ্গবন্ধু কিন্তু সে কথা কখনো ভুলে যাননি। কৃষকদের প্রতি ভালোবাসার টান ছিল বলেই তিনি তাঁদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে গেছেন নিবিড়ভাবে। রাজনৈতিক কারণে তিনি দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন নিরন্তর। তাঁর যাত্রাপথে এগিয়ে এসেছেন বাংলার কৃষককুলসহ সর্বস্তরের জনগণ। তিনি তাদের দিয়েছেন আশ্বাস, পেয়েছেন ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসার টানেই তিনি কাজ করেছেন তাঁদের জন্য। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কৃষকশ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিই সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে। পঞ্চাশের দশকে তাঁকে দেখেছি পাকিস্তানের পার্লামেন্টে কৃষকের পক্ষে কথা বলতে, ষাটের দশকে দেখেছি ৬ দফার আন্দোলনে তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণে সকলের সচেতনতা আনতে এবং স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও দেখেছি সর্বক্ষণ কৃষক-অন্তঃপ্রাণ বঙ্গবন্ধুকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক আয়োজিত রাজনৈতিক সমাচার শীর্ষক বক্তৃতামালায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বক্তা ছিলেন। ২৮ অক্টোবর ১৯৭০ তারিখে বঙ্গবন্ধু বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দেন। সেই ভাষণেও এদেশের কৃষক-সমাজের অধিকার সংরক্ষণের কথা তিনি বলেছিলেন দ্ব্যর্থহীনভাবে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, 'এ যাবৎ বাংলার সোনালী আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ-হার এবং পরগাছা ফড়িয়া-ব্যাপারীরা পাটচাষীদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করছে। পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ,

পাটের গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট-সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তুলার প্রতিও একই ধরনের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সেই জন্য আমরা মনে করি, তুলা ব্যবসাও জাতীয়করণ করা অত্যাবশ্যক। তুলার মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। বিগত সরকারগুলো আমাদের অন্যতম অর্থকরী ফসল চা, ইক্ষু ও তামাকের উৎপাদনের ব্যাপারেও যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে এসব অর্থকরী ফসল আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

একটা স্বল্প সম্পদের দেশে কৃষি পর্যায়ে অনবরত উৎপাদন-হ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষিদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষি-ব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম-পাকিস্তানের জমিদারি, জায়গীরদারি, সরদারি প্রথার অবশ্যই বিলুপ্তি সাধন করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমি-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভূমিদখলের সর্বোচ্চসীমা অবশ্যই নির্ধারণ করে দিতে হবে। নির্ধারিত সীমার বাইরের জমি এবং সরকারি খাসজমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। কৃষিব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। অবিলম্বে চাষিদের বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি-সংহতিসাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকার এজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

'ভূমি-রাজস্বের চাপে নিষ্পিষ্ট কৃষককুলের ঋণভার লাঘবের জন্য অবিলম্বে আমরা ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা বিলোপ এবং বকেয়া খাজনা মওকুফ করার প্রস্তাব করেছি। আমরা বর্তমান ভূমিরাজস্ব-প্রথা তুলে দেবার কথা ভাবছি। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের বনজ সম্পদ, ফলের চাষ, গো-সম্পদ, হাঁস-মুরগির চাষ–সর্বোপরি মৎস্যচাষের ব্যবস্থা করতে হবে।' [দ্র. *দৈনিক আজাদ*, ২৯ অক্টোবর ১৯৭০]

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আনুমানিক ২০ লাখ লোকের এক সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের দলীয় সদস্যগণ জনগণের সামনে শপথ গ্রহণ করেন। শপথবাক্য পাঠ করানোর পর বঙ্গবন্ধু বিবিধ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ৫০ মিনিটের একটি নীতিনির্ধারণী ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের মধ্যেও কৃষকদের জন্য বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। বক্তৃতা দানের সময় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেবে। আর ১০ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের

বেলায়ও এই একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। আইয়ুবী আমলে বাস্তুহারা হয়েছে বাংলার মানুষ। সরকারের খাসজমিগুলো বণ্টন করা হয়েছে ভুঁড়িওয়ালাদের কাছে। তদন্ত করে এদের কাছ থেকে খাসজমি কেড়ে নিয়ে তা বণ্টন করা হবে বাস্তুহারাদের মধ্যে। ভবিষ্যতেও সকল খাসজমি বাস্তুহারাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং চর এলাকায়ও বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। আমি কৃষক এবং শ্রমিকদের কথা দিচ্ছি, আওয়ামী লীগ তাদের আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কারণ আমি বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগের মাথা কেনার মতো ক্ষমতা পুঁজিপতিদের নেই। এরা কেউ, এমনকি আমি নিজেও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি তবে আমাদের জীবন্ত কবর দেবেন।' [দ্র. *দৈনিক পূর্বদেশ*, *দৈনিক সংগ্রাম* ও *দৈনিক পাকিস্তান*, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১]

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি-অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, কৃষি-যন্ত্রপাতি সরবরাহ (১৮৭৩ সালের মধ্যেই হ্রাসকৃত মূল্যে ৪০ হাজার শক্তি-চালিত লো-লিফট পাম্প, ২৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩০০০টি অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়), ১৯৭২ সালের মধ্যেই জরুরি ভিত্তিতে বিনামূল্যে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে অধিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ১৬,১২৫ টন ধানবীজ, ৪৫৪ টন পাটবীজ ও ১,০৩৭ টন গমবীজ সরবরাহ করা হয়, দখলদার পাকিস্তানি শাসনকালে রুজু করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষক ভাইদের মুক্তি দেওয়া হয় ও তাদের সকল বকেয়া ঋণ সুদসহ মাফ করে দেওয়া হয়, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে রহিত করা হয়; ধান, পাট, তামাক ও আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপাণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য বেঁধে দেওয়া হয়, গরিব কৃষকদের বাঁচানোর স্বার্থে সুবিধাজনক নিম্নমূল্যের রেশন-সুবিধা তাদের আয়ত্বে নিয়ে আসা হয় এবং গরিব কৃষক-পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিনা খরচে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সামাজিক নায়বিচার ও দারিদ্র্য নিবারণের তাগিদে কৃষি-উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। ঐ সময় দেশে ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ। বিরাজমান খাসজমির সাথে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিবরণযোগ্য জমির সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধু পরিবারপিছু জমির সিলিং ১০০ বিঘায় নির্ধারণ করে দেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্যস্বাধীন দেশের খাদ্যঘাটতি ছিল প্রাথমিক হিসাবে ৩০ লাখ টন। তাৎক্ষণিক আমদানির মাধ্যমে এবং স্বল্পমেয়াদে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্যান্য কৃষি-উপকরণ সরবরাহ করে এবং কৃষিঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার ও খাসজমি বিতরণ করে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করা হয়। বঙ্গবন্ধু

ভারতের সাথে গঙ্গার পানিবণ্টনের ফর্মুলা নির্ধারণে অত্যন্ত জোরদার ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেন। এর ফলে ভাটির দেশ হিসেবে গঙ্গার পানির ৪৪,০০০ কিউসেক হিস্যা পাবার সম্মতি তিনি আদায় করেন–পরবর্তী কোনো সরকারই যে-লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছেও যেতে পারেনি। ১৯৬৮-৬৯ সালের ১১ হাজার শক্তি-চালিত পাম্পের স্থলে ১৯৭৪-৭৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ হাজার। এর ফলে সেচের আওতায় জমির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লাখ একরে উন্নীত হয়। বিশ্ববাজারে রাসায়নিক সারের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির অভিশাপ থেকে বাংলার কৃষককে ভর্তুকি দিয়ে রক্ষা করেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ সালে ইউরিয়া, পটাস, টিএসপি সারের মণপ্রতি মূল্য ছিল যথাক্রমে ২০ টাকা, ১৫ টাকা ও ১০ টাকা। গঙ্গা নদীর প্রবাহ থেকে অধিক পানি প্রাপ্তি, সেচব্যবস্থার প্রসার, উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, অতিরিক্ত খাসজমি প্রাপ্তি এবং মূল্যসমর্থনমূলক সচেতন ও কৃষকদরদি নীতির ফলে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয়েছিল তারই ফলে আজ কৃষিক্ষেত্রে শক্তিশালী ধারা সৃষ্টি হয়েছে (দ্র. ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, 'ধন্য সেই পুরুষ', *বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ : কৃষি ও কৃষকেরা দেশ*, বেতার বাংলার সংকলন, জুন ২০০০)।

করাপ্‌শন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপ্‌শন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপ্‌শন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ। যারা আজকে ওদের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করেছি।

(—বঙ্গবন্ধু; জাতীয় সংসদ, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫)

বাংলার চাষিদের অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ বারবার গর্জে উঠত। সোনার বাংলা গড়ার কারিগর তো বাংলার কৃষক-সমাজ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু বেতার টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সেখানেও তিনি কৃষকদের কথাই বলেন এভাবে :

'আমাদের চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণী এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে। সম্পদের স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও আমরা চাষীদের স্বল্পমেয়াদী সাহায্য দানের জন্যে ইতিমধ্যে

ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ২৫ বিঘার কম জমি যাদের আছে তাদের খাজনা চিরদিনের জন্য মওকুফ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সমস্ত বকেয়া খাজনা মাফ করা হয়েছে। তাকাবি ঋণ বাবদ ১০ কোটি টাকা বিতরণ করা হচ্ছে এবং ১৬ কোটি টাকা টেস্ট রিলিফ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। লবণের উপর থেকে কর তুলে দেওয়া হয়েছে।

'সারা বছর ধরে সেচের কাজ চালানো, উন্নত মানের বীজ বপন, সার, কীটনাশক এবং প্রতিটি চাষীকে পর্যাপ্ত ঋণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভূ-মালিকানার ক্ষেত্রে পশ্চাতের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মালিকানার পরিধি কমিয়ে এনে পরিবার পিছু ১০০ বিঘায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই উচ্চ সীমা আরও কমিয়ে আনা যায় কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখা যাবে। ছোট ছোট চাষীদের অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে তুলতে হবে। একথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায়-ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। এর ফলে চাষীরা কেবল আধুনিক ব্যবস্থার সুফলই পাবে না, বরং সমবায়ের মাধ্যমে সহজ শর্তে দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে। এই সাথে আমাদের উদ্দেশ্য হলো ভূমিহীন স্বল্প জমির অধিকারী চাষীদের জন্যে ব্যাপক পল্লী-পুনর্গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করা। 'কাজ করলে খাদ্য' এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১ লাখ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া টেস্ট রিলিফের অধীনে পল্লীর কর্মসংস্থানের জন্য নগদ ১৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়ে গেছে।'

কৃষিকাজে কৃষকদের ব্যাপকভাবে মনোনিবেশ করানোর ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান কম নয়। তিনি জানতেন, কৃষকরা যদি সঠিকভাবে উৎপাদন করে তাহলে দেশের খাদ্যসমস্যা দ্রুত নিরসনসহ এটি জাতীয় আয়কে আরও প্রশস্ত করবে। তাই কৃষি-উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অবদান এবং কৃষি-উৎপাদনের উৎসাহ দানের জন্য বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। রাষ্ট্রপতির ২৯নং আদেশ অনুযায়ী কৃষিক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' ঘোষণা করা হয়। তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল এটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য। প্রাথমিকভাবে ২৫ লাখ টাকার একটি ট্রাস্ট তহবিল গঠন এবং পরবর্তীতে সরকারি এবং বৈধ সংস্থাসমূহের চাঁদার সাহায্যে এই তহবিল সম্প্রসারিত হয়েছিল (দ্র. *দৈনিক বাংলা*, ১০ এপ্রিল ১৯৭৩)। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছিল একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, একজন সংসদ-সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও একজন সরকারি অফিসারকে। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতায় এই ট্রাস্টি বোর্ডের সুদক্ষ পরিচালনায় 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' কৃষকদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং কৃষকরা তাদের সর্বশক্তি

দিয়ে মাঠে নামে এবং উৎপাদনে মনোযোগী হয়। বঙ্গবন্ধুর এ পদক্ষেপ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে সমাদৃত হয় সব মহলেই। কিন্তু এই পুরস্কারের ধারাবাহিকতা পরবর্তীতে ধরে রাখা যায়নি।

কৃষি-গবেষণার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। কৃষি-গবেষণা ছাড়া যে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয় বঙ্গবন্ধু তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এদেশে কৃষি-গবেষণাধর্মী কাজ পরিচালনার জন্য তেমন কোনো সমন্বয়ধর্মী প্রতিষ্ঠান ছিল না। প্রবীণ কৃষিবিদ কাজী এম. বদরুদ্দোজা বলেছেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গঠনে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কৃষি-গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সূচনা হয়। (দ্র. *এশিয়াটিক সোসাইটি*, *বাংলাপিডিয়া*, ২০০৩, পৃ. ৩৯২-৩৯৩)। একই সঙ্গে তিনি কৃষি-স্নাতকদেরও প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তায় উন্নীত করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, 'আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষকভাইয়ের কাছে যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্ট-পরা কাপড়-পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই—জমিতে যেতে হবে, ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ঐ শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি, আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ হবে না।'

কৃষি ও কৃষকের উন্নতি–বিশেষ করে অধিক ফসল উৎপাদন, সেই সঙ্গে উৎপাদিত কৃষিপণ্য কৃষকরা যাতে সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করতে পারে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। সদ্য স্বাধীন দেশে কৃষি-উৎপাদনের প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতির সরবরাহ খুব বেশি না থাকলেও এগুলোর প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করতেন। কৃষিকাজের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেচ, সার, বীজ ইত্যাদি ব্যবহারে কৃষকদেরকে তাদের নিজেদের বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগাতে বলতেন। জেলা-গভর্নরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন কৃষি ও কৃষকদের প্রতি নজর দেওয়ার জন্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, কৃষিই যেহেতু এ দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস সেহেতু কৃষির উন্নতিই হবে দেশের উন্নতি। ১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত জেলা-গভর্নরদের প্রশিক্ষণ-কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষকদের জন্য গভর্নরদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন, 'ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের জন্য পাম্প পেলাম না, এটা পেলাম না, –এসব বলে বসে না থেকে জনগণকে মবিলাইজ করুন। যেখানে খাল কাটলে পানি হবে সেখানে সেচের পানি দিন। সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান। মবিলাইজ দি পিপল।

পাম্প যদি পাওয়া যায়, ভালো। যদি না পাওয়া যায় তবে স্বনির্ভর হোন। বাঁধ বেঁধে পানি আটকান, সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান। আমাদের দেশে আগে কি পাম্প ছিল? দরকার হয় কুয়া কেটে পানি আনুন। আমাদের দেশে পাঁচ হাত, সাত হাত, আট হাত কুয়া কাটলেই পানি ওঠে। সেখানে অসুবিধা কী আছে? আর এখন থেকে যে সমস্ত সার থানায় যাবে, তা যেন রেগুলারলি গরিব-দুঃখীরা পায়। ...আমি খবর পেলাম, ঠাকুরগাঁয়ে একটা কোল্ডস্টোরেজ করা হয়েছে। এক বছর আগে সেটা হয়ে গেছে। কিন্তু পাওয়ার নাই। খবর নিয়ে জানলাম, পাওয়ার সেখানে যেতে এক বছর লাগবে। কারণ, খাম্বা নাই। খাম্বা নাকি বিদেশ থেকে আনতে হবে। মিনিস্টার সাহেবকে বললাম, খাম্বা-টাম্বা আমি বুঝি না। বাঁশ তো আছে। এখানে দাঁড়াও, খাম্বা কাটো, দা লাগাও। দেড় মাস, দুই মাসের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। এটা লাগাও। কী করে লাগবে, সেটা আমি বুঝিটুঝি না। দিল, লেগে গেল। কিন্তু আমার কাছে যদি না আসত, এক বছরের আগে খাম্বা পেত না। খাম্বা আসে কোত্থেকে? পাওয়ার গেল, আলু রাখল। আলু রাখার জায়গা নেই। এই মেন্টালিটি কেন হয়? খাম্বা বাংলাদেশের গাছে গাছে হয়। আমি বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় পাওয়ার দিতে চাই।'

এই যে কৃষকের হাতে আধুনিক উপকরণ দেওয়ার অঙ্গীকার, এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আকুতির পুরোপুরি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এতদিনে গ্রাম-বাংলা অনেকটাই বদলে গেছে। গ্রামে কলের লাঙল পৌঁছে গেছে। এক-তৃতীয়াংশ গ্রামে বিদ্যুৎও পৌঁছেছে। কিন্তু আজও গ্রাম-বাংলায় দারিদ্র্য প্রকট। বিশেষ করে আজও দুর্যোগে দুঃসময়ে গ্রামের মানুষ খুবই অসহায়। ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত কৃষকদের দুরবস্থা দেখলেই অনুমান করা যায় তারা এখনো কতটা অসহায়। তাদের বাঁচাতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেবার মতো নীতিনির্ধারণী উদ্যোগের বড়ই অভাব। সময়মতো বীজ, সার, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তারা পায় না বলেই তাদের কৃষিকাজ ব্যাহত হয়। আর তার প্রভাব পড়ে খাদ্য উৎপাদনে। তাছাড়া চরের কৃষক বরাবরই নদীভাঙনের শিকার। চর কুকরিমুকরির কৃষকদের জন্য আজ গর্জে ওঠার মতো কেউ নেই। বানভাসী কৃষকদের বাঁচানোর জন্য যে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের দরকার তা অস্থির এই সময়ে খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল। দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালির কৃষকপ্রীতির কথাগুলো স্মরণ করে আমাদের নীতিনির্ধারকরা যদি কৃষকদের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে তাদের জীবনচলাকে সুস্থির করতে অনুপ্রাণিত হন তবেই মঙ্গল। মনে রাখা চাই, কৃষক বাঁচলেই দেশ বাঁচবে।



১২

বঙ্গবন্ধুর শিল্প ও সংস্কৃতি ভাবনা

১৫ আগস্ট বাঙালির সবচেয়ে দুঃখের দিন। পঁচাত্তরের এই দিনেই ঘাতকদের আঘাতে প্রাণ দেন বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় বীর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রফিক আজাদ ঠিকই বলেছেন, নিজের জীবন ছাড়া এই বাংলাদেশের সবকিছুই তাঁর কাছে ছিল মূল্যবান। 'স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে' আজ পড়ে আছে তাঁর 'বিশাল শরীর'। এ দিঘল পুরুষ 'হাত বাড়ালেই /ধরে ফেলত পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল/সাড়ে সাত কোটি হৃদয়/ধরে ফেলত বৈশাখী মেঘ কেমন অনায়াসে' (বাবলু জোয়ারদার, 'সে ছিল দিঘল পুরুষ')। মনে হয় আজও তিনি বাংলার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুলের মতো। আমাদের মতো করে আমাদের একটি স্বাধীন দেশ সৃষ্টির যে স্বপ্ন ঘুরে বেরিয়েছে হাজার বছর ধরে এ ভূখণ্ডের মানুষের মনে, পথে-প্রান্তরে, তা এসে যেন থিতু হয়েছিল তাঁর অন্তরের গহীনে। ইতিহাসের এই বরপুত্রের 'চোখে ধরা পড়েছিল রূপসী বাংলার স্নিগ্ধ মুখশ্রী/তাই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল–'আমার সোনার বাংলা'/তাই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল মুক্তি-স্বপ্ন প্রিয়/স্বাধীনতা' (নির্মলেন্দু গুণ, 'পুনশ্চ মুজিবকথা')। আর সে কারণেই বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অবিচ্ছেদ্য এক সত্তা।

এদেশের যা-কিছু তা
হোক না নগণ্য, ক্ষুদ্র তাঁর
চোখে মূল্যবান ছিল—
নিজের জীবনই শুধু তাঁর
কাছে খুব তুচ্ছ ছিল;
স্বদেশের
মানচিত্র জুড়ে প'ড়ে আছে
বিশাল শরীর...

—রফিক আজাদ ('এই সিঁড়ি')

১৭ মার্চ তাঁর জন্মদিন। একাত্তরের উত্তাল মার্চের ঐ দিনেও তিনি বলতে ভুলে যাননি যে, এদেশের জনগণ এবং তাঁর জীবন অবিচ্ছেদ্য। তাদের দুঃখ তাঁরও দুঃখ। এদেশের প্রতিটি বাড়িই তাঁর বাড়ি। ১৯৭১-এ তাঁর ৫২তম জন্মদিনে বিদেশি সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, 'আমি জীবনে কখনো আমার জন্মদিন পালন করিনি। আপনারা আমার দেশের মানুষের অবস্থা জানেন, তাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। যখন কেউ ভাবতেও পারে না মরার কথা কখনো তারা মরে। ... আমার আবার জন্মদিন কী, মৃত্যুদিবসই-বা কী? আমার জীবনই-বা কী? মৃত্যুদিন আর জন্মদিন অতি গৌণভাবে এখানে অতিবাহিত হয়। আমার জনগণই আমার জীবন।'

জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির চিন্তাই ছিল তাঁর একমাত্র আরাধ্য। ধীরে ধীরে তাই বাঙালির সকল চাওয়া-পাওয়ার এক মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। একই সঙ্গে আবার বিশ্বের সকল মানবিক উদ্বেগ তাঁর ভেতর ঠাঁই করে নিয়েছিল। সেই অর্থে তিনি ছিলেন স্বভূমিতে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন এক আধুনিক মানুষ। ৩০ মে ১৯৭৩-এর ডায়েরিতে তিনি লিখেছিলেন :

'As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bangalee, I am deeply involved in all that concerns Bangalees. This abiding involvement is born of and nourished by love, enduring love, which gives meaning to my politics and to my very being.' ('৩০ মে, ১৯৮৩ নিজ হাতে ইংরেজিতে লেখা বঙ্গবন্ধুর ডায়েরির একটি পাতা,' শাহরিয়ার ইকবাল সম্পাদিত বঙ্গবন্ধুর জীবনের শেষ বছরের দৈনন্দিন কর্মতালিকা ও কতিপয় দলিল, উত্তরবঙ্গ প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১০৫)।

তাঁর মহাপ্রয়াণ তিথিতে তাই এমনি এক সম্পূর্ণ বাঙালির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে চাই তাঁর নান্দনিক তথা শিল্প ও সংস্কৃতি ভাবনার খানিকটা উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। প্রচলিত অর্থে তিনি শিল্পী ছিলেন না। কিন্তু 'রাজনীতির এক অমর কবি' বলে তাঁকে চিহ্নিত করতে ভুল করেননি সমকালীন বিশ্বমানের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। রবীন্দ্রনাথ কলাবিদ্যা বিষয়ে বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'হৃদয়বৃত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকবেই, আর থাকাই শ্রেয়। ... এই হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ কলাবিদ্যার সাহায্যেই ঘটে।' (দ্র. সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ: শিল্পচিন্তা, [রবীন্দ্র-রচনা সংকলন], গ্রন্থালয় প্রাইভেট লি., ১৯৯৬ পৃ. ১৩৯)। দেশের আবেগ, স্বপ্ন, উদ্বেগ শুধু কবিতায়, গানে বা নাটকের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় না। উপযুক্ত প্রতিনিধির প্রাত্যহিক কথায়, বক্তৃতায়, জীবনচলার মাধ্যমেও তা

প্রকাশিত হতে পারে। মানুষের ভেতরে আবেগের যে উদ্বৃত্ত দেখা দেয় তা নানাভাবে প্রকাশিত হয়। সেই প্রকাশ যদি নান্দনিক হয়, তা যদি অন্যের অন্তরে সমান তালে দোলা দিতে পারে, তাকে নিশ্চিতভাবেই শৈল্পিক বলা চলে। ব্যক্তিত্বের এই সুন্দরতম প্রকাশকেও তাই আর্ট বা শিল্পের আওতায় ফেলতে পারি।

'... Man has a fund of emotional energy which is not all occupied with his self preservation. This surplus seeks its outlet in the creation of art, for man's civilisation is built upon his surplus ... . When a feeling is aroused in our hearts which is far in excess of the amount that can be completely absorbed by the object which has reduced it, it comes back to us and makes us conscious of ourselves by its return waves ... . This is the reason why, of all creatures, only man knows himself, because his impulse of knowledge comes back to him in its excess. He feels his personality more intensely than other creature, because his power of feeling is more that can be exhausted by his objects. This efflux of the conscious less of his personality requires an outlet of expression. Therefore in Art, man reveals himself and not his objects ... .' (Rabindranath Togore, What is Art?' Personality, 1917. সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : শিল্পচিন্তা*, ১৯৯৬, পৃ. ১৩৬)

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা পাকিস্তানি যে কোনো নাগরিকের মতোই সমান নাগরিক এবং সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী।
(—বঙ্গবন্ধু; নির্বাচনী জনসভা, জয়দেবপুর, ৩০ অক্টোবর, ১৯৭০)

ব্যক্তিত্বের প্রকাশই আর্টের প্রধান লক্ষ্য। যে মাধ্যম ব্যবহার করে তা প্রকাশ করা হয় (ছবি, গান, বক্তৃতা ইত্যাদি) তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সত্য। সত্য ব্যক্তিত্বেরই অন্যতম দ্যুতি। 'আমার বোধ হয় আর্ট মাত্রেরই কাজ হচ্ছে বিশ্বের যেটুকু আমাদের

মনোহরণ করে সেইটুকুকে সযত্নে তার অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের কাছে অবিমিশ্র উজ্জ্বল করে ধরা। সত্যের উপরিভাগ থেকে সেইটুকু ছেঁকে নেওয়া, সাজিয়ে তোলা আর্টিস্টের কাজ।' (রবীন্দ্রনাথ, *ছিন্নপত্রাবলি*, ১৩১নং পত্র। দ্র. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫)। এই যদি হয় আর্ট বা নন্দনতত্ত্বের মূল কথা, তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা চলে বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক বড় মাপের শিল্পী : 'রাজনীতির এক অমর কবি'। তাঁর সময়ের প্রধান কথক। প্রভাবশালী নিয়ামক। জীবন্ত এক কিংবদন্তি। তাঁর নান্দনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর দৃঢ় তর্জনী হেলনে, অঙ্গভঙ্গিতে, কথায়, ব্যবহারে, আচার-অনুষ্ঠানে এবং সর্বোপরি কালজয়ী সব বক্তৃতায়, বিশেষ করে জাতির দিকনির্দেশক '৭১-এর ৭ মার্চের হৃদয়স্পর্শী ভাষণে। বাঙালির ক্ষোভ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, অপমান, জেদ, অহং, সংযম, স্বপ্ন, প্রতিরোধ, সংকল্প–সবকিছুই সমন্বিতভাবে অর্কেস্ট্রার মতো সেদিন বেজে উঠেছিল তাঁর বজ্রকণ্ঠে। সাহিত্যের তথা নন্দনতত্ত্বের কাজ যদি হয় 'সাধারণ জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা' (রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের সামগ্রী', রর চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬২৪) তাহলে বঙ্গবন্ধু খুবই দক্ষতার সঙ্গে সেই কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। এর আগে এবং পরেও তিনি নিরন্তর জনগণ ও নিজের জীবনকে একই সুতোয় গেঁথেছেন। '৭১-এর ৭ মার্চের সেই অতুলনীয় ভাষণে এই সৃজনশীলতাকে তিনি কতটা দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন তা নতুন করে আজ আর বলার প্রয়োজন নেই। বাঙালির হৃদয়কে অনুক্ষণ স্পন্দিত করা, প্রভাবিত করা, অন্তর ও বাইরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার কাজটি তিনি আজন্মই করে গেছেন। তাঁর ছিল প্রতিভাশালী এক হৃদয়। আর সেই হৃদয়ের কাছে সঞ্চারিত হওয়ার জন্য লাখ-কোটি বাঙালি হৃদয়ের 'সুর, রঙ, ইঙ্গিত, প্রার্থনা' করার বিষয়টি ছিল লক্ষ করবার মতো। তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে আকারে, প্রকারে, ভাবে, ভাষায় মিলিত হওয়ার এই আকাঙ্ক্ষাই শেষ পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে পেরেছিল। মনে রাখা চাই, জাতীয়তাবাদ একটি অনুভবের বিষয়। উপলব্ধির বিষয়। হৃদয়ে স্পন্দিত হবার বিষয়। তাঁকে ঘিরেই আমরা সাতচল্লিশ-উত্তর উত্তাল সময়ে এক হতে পেরেছিলাম। তাকে বাহন করেই আমরা বাঙালিরা 'স্বাজাত্যবোধে'র পর্যায় থেকে 'স্বাধিকার' হয়ে 'স্বাধীনতার' পর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছিলাম। দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চলের মুক্তিপাগল মানুষ এমন একজন নেতাকে খুঁজছিলেন যাঁর মাধ্যমে তাদের নিজেদের জাতীয় স্বাজাত্যবোধের বিকাশ তারা ঘটাতে পারেন। অতীতের সকল অর্জনকে গ্রহণ করে স্বদেশের সকল জাতীয় বীরের সাহস ও শৌর্যকে আত্মস্থ করে তিনি হয়ে ওঠেন সমাজের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। প্রায় শতবর্ষ আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বদেশী সমাজ', র র, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩, পৃ. ৬৩৪)

আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে, আমাদের চাওয়া-পাওয়ার এক অনন্য প্রতীক হিসেবে তেমন একজনকে আমরা পেয়েছিলাম। কয়েক দশক ধরে তাঁকে ঘিরেই আমাদের দুঃখ ও আনন্দ আবর্তিত হয়েছে। আমাদের সকল কথা সকল ব্যথা যেন তাঁর হয়ে যায়। তাঁরও অন্তরের সাহসী উচ্চারণ আমাদের সকলের উচ্চারণ হয়ে যায়। তিনি তাই সহজেই হয়ে যান আমাদের 'পথের দাবি'র মূল নায়ক। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন মহানায়ক। এক পর্যায়ে তিনি ও আমরা এক হয়ে যাই। তিনি আমাদের শুধু একটি জাতিই উপহার দেননি, তৈরি করে দিয়ে গেছেন একটি স্বপ্নের ঠিকানাও। কিন্তু আমরা এমনই এক হতভাগ্য জাতি যে, সেই স্বপ্নের নির্মাতাকে 'আমাদের'ই একাংশ অপমান করেছে। কেড়ে নিয়েছে তাঁর প্রাণ। সে কারণেই জাতি হিসেবে আমাদের আজ এমন নিম্নগামী যাত্রা, এমন অধঃপতন। জানি না, এই অভিশাপ থেকে আমরা কবে মুক্তি পাব। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন যে, 'সেইসব জাতি ভাগ্যবান, যারা সব সময় স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মাঝেই খুঁজে পায়।' (র র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭০৪)। আজ আমরা আমাদের তৈরি ইতিহাসকেই অস্বীকার করছি। আর জাতীয় বীরদের অপমান করছি।

তিনি সমুজ্জ্বল সাধারণের অন্তরে

যেকোনো সফল রাষ্ট্রের লক্ষণই হচ্ছে যে, তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সে কিছুতেই বিতর্কিত হতে দেয় না। বিশেষ করে, আগামী দিনের নাগরিকদের কাছে ইতিহাসকে কখনো ছক্কা-পাঞ্জার বিষয় করা হয় না। একটি দেশ আগামী দিনে কতটা উন্নত হবে তা কিন্তু নির্ধারিত হয়ে যায় তার বিদ্যায়তনগুলোর শ্রেণিকক্ষে। গুণগতমানের শিক্ষার পাশাপাশি যদি দেশের সত্যিকার ইতিহাসকে ঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয় তাহলে সমাজের ভেতরে যে আত্মশক্তির জন্ম নেয় তা খুবই অদম্য হয়ে ওঠে। সেই আত্মশক্তিই গড়ে তোলে ঘরে-বাইরের সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ। সেই আত্মশক্তিই হতে পারে আমাদের স্বদেশি উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। আমাদের অপরিসীম দুর্ভাগ্য যে, আমাদের সন্তানদের আমরা একদিকে যেমন গুণমানের শিক্ষা দিচ্ছি না, অন্যদিকে তেমনি সত্যিকার ইতিহাসও তাদের জানাচ্ছি না।

নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোমলমতি শিশুদের আমরা সর্বক্ষণ বিভ্রান্ত করে চলেছি। তাদের আমরা জানতেও দিচ্ছি না যে, দীর্ঘ এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ফসল এই বাংলাদেশ। এই মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি তৈরি করেছেন অসংখ্য জাতীয় বীর। তাঁদের আত্মত্যাগ, দূরদর্শিতা এবং পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছিল মুক্তিকামী বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সমাজবিদগণ। পূর্বসূরিদের সেইসব অবদানকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে স্বদেশের জন্য সকলকে প্রাণ উৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন শেখ মুজিব। জনগণ তাঁকে ভালোবেসে উপাধি দিয়েছিলেন 'বঙ্গবন্ধু'। আজকের শিশুদের কাছে তাঁকে আড়াল করে এক অর্থে আমরা নিজেদেরই আড়াল করেছি। দেরিতে হলেও আমরা তাঁকে আবার পাঠ্যপুস্তকে সঠিকভাবে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করছি, আগামীতে তাঁকে ফের শিশুদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার হীন ষড়যন্ত্রে কেউ মেতে উঠবে না।

অন্য সকল জাতীয় বীরদের চেয়ে বঙ্গবন্ধু এ কারণে স্বতন্ত্র যে, তিনি আপামর জনসাধারণের মনে একটি স্বাধীন স্বদেশের স্বপ্নের বীজ পুঁতে দিতে পেরেছিলেন। স্বদেশকে তাঁর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন এদেশের মানুষ। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশার রূপায়ণ যেন : তাঁর সঙ্গে যোগ রাখলেই সকলের সঙ্গে যোগ রাখা হতো। কেননা সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাসের জন্য হাসিমুখে প্রাণ দিতে প্রস্তুত এই বার্তাটিও পৌঁছে গিয়েছিল এদেশের ঘরে ঘরে। তিনি আমাদের প্রধানতম জাতীয় বীর এ কারণেই। বারবার তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন নির্ভয়ে। এক অর্থে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আমাদের স্বপ্নের বাতিঘর। সর্বক্ষণ তিনি বাঙালির সাহসের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। নিজের সাহস সকলের মনে সংক্রমিত করতে পেরেছিলেন। এই স্বপ্ন বোনার কাজটি এমন নিপুণভাবে করার কারণেই মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই একটি স্বাধীন বাংলাদেশের বহিঃপ্রকাশ প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

'সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, শেখ মুজিবের নামে ইতিহাসের দরজা খুলে যায়' (বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর)। সেই দরজা দিয়ে বের হয়েই আমরা আবার নিয়তির সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছি। মুক্তিযুদ্ধের মতোই এ লড়াইও এক নিরন্তর প্রক্রিয়া।

পুনর্বার অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়েছিল বাঙালি জাতিসত্তা। এই সঙ্কট থেকে বের হতেও প্রয়োজন হবে বঙ্গবন্ধুর মতো প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নেতৃবর্গের আকাঙ্ক্ষার নিবিড় সংযোগ, এবং পর্বতপ্রমাণ সাহস। সেই কারণেই খোঁজা প্রয়োজন তাঁর সাহসের উৎস, জনগণের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সংযোগের ভিত্তি এবং সত্যের প্রতি অবিচল থাকার প্রেরণার মূল। অনুভব করতে চাই রাজনীতির এই অমর কবির নান্দনিক ভাবনার তলদেশ। স্পর্শ করতে চাই তাঁর মানবিক ও শৈল্পিক চেতনার শিকড়।

অভাজনের শেখ মুজিব, অভিজনের শেখ মুজিব

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন প্রজন্মের কাছে পরিচিত ছিলেন মুজিবর, মুজিব ভাই, শেখ সাহেব ও বঙ্গবন্ধু নামে। এই সম্বোধনগুলোর মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমুজিবের বেড়ে ওঠা, পরিণতি লাভ করা ও জনসম্পৃক্ততার রেখাচিত্র ফুটে ওঠে। শেখ মুজিব তাঁর রাজনীতি শুরু করেছিলেন মুসলিম বাংলায়। সেই সময় তাঁর রাজনৈতিক দল ছিল 'মুসলিম লীগ'। আটচল্লিশ ও বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন ব্যক্তি-মুজিবকে ও জাতিকে কতখানি নাড়া দিয়েছিল তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় 'মুসলিম লীগ'-এর নাম পরিবর্তন হয়ে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামকরণের মধ্য দিয়ে। আরও এক ধাপ এগিয়ে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'র নাম হয় 'আওয়ামী লীগ'। বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের শুরুটা ছিল আটচল্লিশে। চুয়ান্নর পথ পেরিয়ে তা বাষট্টিতে পরিণত হয় শিক্ষার লড়াইয়ে। ছেষট্টিতে এ দাবি আরও স্পষ্ট হয় ৬ দফার মাধ্যমে। ৬ দফার পথ বেয়েই ঊনসত্তরে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার দাবি মিলেমিশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত হয়। এসব আন্দোলনের প্রতিটি পর্বে তিনি ছিলেন সক্রিয়। ছিলেন অন্যতম প্রধান নিয়ামক।

একষট্টিতে রবীন্দ্রসংগীত-বিরোধী তৎকালীন সরকারের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে লড়াইও ছিল সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার লড়াই। শেষ অবধি তা শুধু বাঙালি এলিটদের সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের অংশ না থেকে সাধারণ মানুষের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের লড়াইয়ের অংশ হয়ে ওঠে। ঊনসত্তরের সামরিক শাসন-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান সত্তরে নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্থিতিশীল পটভূমি তৈরি করেছিল। আর এই নির্বাচনের মাধ্যমে ৬ দফাভিত্তিক পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অধিকার জনরায়ে সমর্থিত হয় এবং তার পথ ধরেই আসে একাত্তর।

সকল অর্থেই একাত্তর ছিল এক হিরন্ময় সময়। জাতি হিসেবে দানা বাঁধবার এক শ্রেষ্ঠ সময়। একাত্তরের মার্চেই জন্ম নেয় বাংলাদেশ। অসহযোগের পুরোটা সময় ধরেই চলেছিল তার জন্মের উন্মাদনা। মুক্তিযুদ্ধের সেই প্রস্তুতিপর্বে বাঙালির শিল্প ও সংস্কৃতি-অঙ্গনের সকল প্রতিনিধিই তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অনিবার্য করে তোলেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিকসহ সকল শক্তিই আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি। সে সময় ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে এসে জড়ো হয়েছিলেন সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রতিনিধিবৃন্দ। স্বদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আত্মত্যাগের দৃপ্ত শপথ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর সামনে। এরপর এল মুক্তিযুদ্ধ। দুঃখের দিনে এক হওয়ার সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। সেই দিনগুলোতেও মুক্তির গান গেয়ে গেয়ে লড়াই করেছেন সংস্কৃতিসেবীরা। স্বাধীন

বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বিপুলভাবে উৎসাহিত করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। তাঁর বজ্রকণ্ঠও প্রতিদিন উজ্জীবিত করত তাদের। তাঁর দেওয়া 'জয় বাংলা' রণহুঙ্কার তখন ছিল মুক্তি-উন্মত্ত সকল বাঙালির মুখে মুখে। হুমায়ুন আজাদ মনে করেন :

> '১৯৭১-এর মার্চে শেখ মুজিব সৃষ্টি করেছিলেন শুভ দাবানল, শুভ প্লাবন, শুভ অগ্নিগিরি, নতুনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন বাঙালি মুসলমানকে। যার ফলে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। তিনটি রূপকপ্রতীক আমরা পেয়েছিলাম একাত্তরের মার্চে। একটা জাতীয় সংগীত–'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', যাতে কোনো উগ্রতা নেই, আছে শুধু প্রকৃতিপ্রেম; দ্বিতীয়টি এক অপূর্ণ জাতীয় পতাকা, যাতে ছিল সবুজের মাঝে সূর্যের মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্র, তৃতীয়টি হৃদয়কাঁপানো, স্বদেশ জাগানো স্লোগান : 'জয় বাংলা'। এ তিনটি রূপকপ্রতীক নিয়ে মার্চ ও তার পরের মাসগুলো আলোড়িত ও মুখরিত ছিল; এগুলো ছিল পুরোপুরি পাকিস্তান চেতনার বিপরীত, এবং আবেগ ও শৈল্পিকভাবে অনেক উৎকৃষ্ট।' (হুমায়ুন আজাদ, 'স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিব', *ভোরের কাগজ*, ১৭ মার্চ ২০০৬)।

বলাই বাহুল্য, এই চেতনা, এই শৈল্পিক আবেগের বীজ বুনেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই তিন রূপকপ্রতীক এবং বঙ্গবন্ধু অভিন্ন। অবিচ্ছেদ্য। আর সে কারণেই বন্দীশালায় থেকেও 'তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধকে, তিনিই সৃষ্টি করে চলেছিলেন একটা স্বাধীন রাষ্ট্র।' (প্রাগুক্ত)। একথা ঠিক, তিনিও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। তাই বলে কতিপয় বামনদের আকাশছোঁয়া এই ব্যক্তিত্বের ওপর আঘাতের এই কসরৎ একেবারেই বিসদৃশ। যে যাই বলুক না কেন, 'তিনি মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, বাংলাদেশের মহা-স্থপতি।' (প্রাগুক্ত)। মনে রাখা চাই, 'মুক্তিযুদ্ধের যত প্রচার হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধারা যত সেতু উড়িয়েছে, যত পাকিস্তানি জন্তু বধ করেছে, যত বাঙালি নিহত হয়েছে, যত নারী লাঞ্ছিত হয়েছে, আর আমার স্বাধীনতার যত স্বপ্ন দেখেছি, তার সবটাই মুজিবের নামে। অন্য কোনো নামে এটা ঘটতে পারত না; অন্য কোনো নাম থেকে এ প্রেরণা উৎসারিত হতো না।' (প্রাগুক্ত)

রাজনীতির এক অমর কবি

পঞ্চাশ-উত্তর পুরোটা সময় জুড়েই রাজনৈতিক-সামাজিক-নান্দনিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ ছিল বঙ্গবন্ধুর হাতে। তাঁর বজ্রকণ্ঠ, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশনা, অঙ্গুলি হেলন, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ভঙ্গিই প্রভাবান্বিত করেছে সদ্যজাত বাঙালি জাতিকে। সেই অর্থে '৭১-এর ৭ মার্চের কালজয়ী সেই

ভাষণটিই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ এক রাজনৈতিক কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়ের মতো দিঘলদেহী এই শ্রেষ্ঠ বাঙালির সেদিনের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতে নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে। এই ভাষণেই আমরা লক্ষ করেছিলাম রাজনীতির এই অতুলনীয় কবির আবেগ, গরিবের প্রতি মমত্ববোধ, চরম উত্তেজনাময় পরিবেশেও সংযত থাকার পরিমিতিজ্ঞান, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের শেষ পরিণতি সার্বিক মুক্তির আহ্বান।' ... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এ-দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রতি তাঁর লোভ নেই। তিনি চান মানুষের অধিকার। এই ভাষণেই তিনি প্রমাণ করেছেন, তিনি ছিলেন এদেশের মাটি ও মানুষেরই অংশ। ঐতিহ্যের সন্তান।

'দাবায়ে রাখতে পারবা না'র মতো আঞ্চলিক ভাষা ও অনুভূতির মিশেলে এমনি সাহসী উচ্চারণের কারণেই তাঁর ঐ ভাষণটিকে রাজনীতির এক মহাকাব্য হিসেবে অভিহিত করেছেন অনেকে। এমন মহাকাব্য একদিনেই তৈরি হয় না। মাটি-ঘেঁষা রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি নিরন্তর অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার জন্যই তিনি এমন অনুপম এক হৃদয়কাড়া রাজনৈতিক কবিতা লাখ-কোটি মানুষের সামনে সেদিন ওভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন। এমন একটি ভাষণ যিনি দিতে পারেন তাঁর নান্দনিক চিন্তার তল কতটা গভীরে থাকতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাঙালির স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বিকাশের পেছনে যে মানুষটির অবদান অতুলনীয় তাঁর সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক চিন্তা-চেতনার খানিকটা স্পর্শ তাই আমরা পেতে চাই।

তাঁকে খেটে খাওয়া মানুষের সার্থক প্রতিনিধি বিবেচনা করার অজস্র কারণ আছে। গ্রাম থেকে আগত যেকোনো কৃষক তাঁর সঙ্গে সহজেই ভাবের আদান-প্রদান করতে পারতেন। বিনা দ্বিধায় পৌঁছাতে পারতেন তাঁর কাছে। একই ভাষায় আলাপ করতে পারতেন। একই সঙ্গে অভিজনদের, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেও ছিল তাঁর গভীর যোগাযোগ। স্বদেশের গরিব-দুঃখী মানুষের দুঃখের কথা বলে গেছেন যেসব কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, তাদের তিনি মন থেকে ভালোবাসতেন। তারাও তাঁকে একইভাবে ভালোবাসতেন। কবি জসীমউদ্‌দীন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক, প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, প্রফেসর মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রফেসর নুরুল ইসলাম, প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ, জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সুফিয়া কামাল, আবুল ফজলের মতো শিক্ষাবিদ-শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মিক সম্পর্ক। তাঁরাও সকলে মনে করতেন তিনিই বাঙালির সকল

আশা-ভরসার প্রতীক। এঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কতটা গভীর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৯ সালে কন্যা শেখ হাসিনাকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে–'বোধ হয় শুনেছ, মানিক ভাই পিন্ডিতে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। বুঝতেই পারো আমার অবস্থা। প্রফেসর হাই সাহেবও মারা গিয়াছেন। বাংলাদেশের দুইজন কৃতি সন্তান আমরা হারালাম।' (দ্র. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত *অ্যালবাম জাতির জনক*, ২০০৩ পৃ. ২১১)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামে বাঙালি জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির লড়াইয়ের প্রশ্নটি সবসময় বঙ্গবন্ধুর কাছে সমভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। অন্যথায় তিনি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারিতে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেই ছুটে যেতেন না রেসকোর্সে অপেক্ষমাণ জনসমুদ্রের কাছে এবং উচ্চারণ করতেন না : 'ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। তাদের আরও বলেছি, তোমরা মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও।' সাধারণ এ শব্দমালার উচ্চারণের পেছনে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের মাত্রাটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ–এই দুই ভিত্তির ওপরই বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক দর্শন ও শৈল্পিক ভাবনার বিষয়গুলো গড়ে উঠেছিল।

বঙ্গবন্ধু ও ভাষা-আন্দোলন

একটি জাতিকে পঙ্গু ও পদানত করে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা। তাই পশ্চিমা [পশ্চিম-পাকিস্তান] শাসকগোষ্ঠীও চেয়েছিল আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে ছিনিয়ে নিতে। কিন্তু এদেশের মানুষ কখনো তা মেনে নেননি। তাঁরা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য আন্দোলন করেছেন। অনেক রক্ত ঝরিয়েছেন। যোগ্য নেতার মতো বঙ্গবন্ধুও সে সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার মানসে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ সময় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুসলিম ছাত্রলীগকে দ্বিধাবিভক্ত করে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর ডাকে ১১ মার্চ হরতাল ডাকা হয়। হরতালের মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় ঢাকার আব্দুল গণি রোডে শেখ মুজিব তৎকালীন পুলিশের আইজি শামছুদ্দোহার মুখোমুখি হলে গ্রেফতার হন। কিন্তু প্রচণ্ড ছাত্র-বিক্ষোভের

মুখে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন শেখ মুজিবসহ অন্য ছাত্রনেতাদের ৪ দিনের মাথায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৬ মার্চ যে সভায় মুখ্যমন্ত্রীর জন্য তৈরি স্মারকের শর্ত ঠিক করা হয়, তার সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিব (দ্র. *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী*, প্রথম খণ্ড, ১৯৪৭-১৯৪৮, ২য় মুদ্রণ ২০০৫, পৃ. ১৮০)। সেই সভাতেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের ৮ দফা চুক্তির সংশোধনী আনতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঐ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি 'রাষ্ট্রভাষার দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণকে পূর্ববাংলার সদস্য ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের ওপর বাধ্যতামূলক করেন।' (দ্র. আতিউর রহমান ও সৈয়দ হাশেমী, *ভাষা-আন্দোলন : অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান*, ১৯৯০, পৃ. ৫৩, গাজীউল হকের সাক্ষাৎকার)। বাহান্নতে ভাষা-আন্দোলন আরও জোরদার হয়। জেলে থেকেও শেখ মুজিব এই পর্বে ভাষা-আন্দোলনকে নিয়মিতভাবে প্রভাবান্বিত করেছেন।

মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

(—বঙ্গবন্ধু; রেসকোর্স ময়দান, ৭ মার্চ, ১৯৭১)

ভাষা-আন্দোলনের দুই পর্যায়েই তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি ছিলেন সংগ্রামী ছাত্রনেতা। দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং দুর্ভিক্ষাবস্থা মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে ঢাকায় ভুখা মিছিল থেকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ ২ বছর ৮ মাস কারাভোগের পর ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অসুস্থতাবস্থায় শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করেন। (সূত্র : জেল রিপোর্ট, যেখানে লেখা আছে 'Security Prisoner Sk. Mujibur Rahman broke his fast on receipt of the Govt. Order for his release on the afternoon of 25.2.52. He was let off from the jail on the morning of 27.2.52.'

বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের উত্তাল সময়ে বন্দী থাকার কারণে শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও আন্দোলনকে বেগবান করতে নেতৃত্বদানকারীদের সাথে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। তাই ভাষা-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ভাষা-আন্দোলন বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> 'অনেকেই ইতিহাস ভুল করে থাকেন। ১৯৫২ সালের আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস আপনাদের জানা দরকার। আমি তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বন্দী অবস্থায় চিকিৎসাধীন। সেখানেই আমরা স্থির করি যে, রাষ্ট্রভাষার ওপর ও আমার দেশের ওপর যে আঘাত হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি, তার মোকাবিলা করতে হবে। সেখানেই গোপন বৈঠকে সব স্থির হয়। একথা আজ বলতে পারি : কারণ, আজ পুলিশ কর্মচারীর চাকরি যাবে না। সরকারি কর্মচারীর চাকরি যাবে না। কথা হয়, ১৬ ফেব্রুয়ারি আমি জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট করব, আর ২১ তারিখে আন্দোলন শুরু হবে। জেলে দেখা হয় বরিশালের মহিউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে। তাঁকে বললাম, আমরা এই প্রোগ্রাম নিয়েছি। তিনি বললেন, আমিও অনশন ধর্মঘট করব। ১৬ ফেব্রুয়ারি আমরা অনশন ধর্মঘট করলাম। এর দরুন আমাদের ট্রান্সফার করা হলো ফরিদপুর জেলে। সূচনা হয় ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের।'

ভাষা-আন্দোলন থেকেই গড়ে ওঠে স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন। স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন থেকেই দানা বাঁধে মুক্তিযুদ্ধ। প্রতিটি পর্যায়েই তাঁর নেতৃত্ব বাঙালি জাতির বিকাশের ধারাকে বেগবান ও মহিমান্বিত করেছে।

একসূত্রে গাঁথা

'বাংলাদেশ' এবং 'বঙ্গবন্ধু' এই দুটো নাম একই সূত্রে গাঁথা। একটি ছাড়া অন্যটিকে কল্পনা করা যায় না। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন বঙ্গবন্ধু গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ১৭ জুন তিনি পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে ২১ দফা দাবি করেন। এরপর ২৩ জুন তিনি ঘোষণাও দেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। তাই ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণ-পরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেন :

> 'Sir, you will see that they want to replace the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should make Bengal (Pakistan). The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You

can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we will have to back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite'.

[অনুবাদ : 'স্যার, আপনি দেখবেন ওরা 'পূর্ববাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব-পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে 'বাংলা' নামে ডাকেন। 'বাংলা' শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কিনা। এক-ইউনিটের প্রশ্নটা গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এই প্রশ্নটাকে এখনই কেন তুলতে চান? বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কী হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রশ্নটারই-বা কী সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধেই-বা কী ভাবছেন? পূর্ববাংলার জনগণ অন্যান্য প্রশ্নগুলোর সমাধানের সাথে এক-ইউনিটের প্রশ্নটাকে বিবেচনা

আমি আপনাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেব না। আপনারা জানেন, আমি একবার কোন অঙ্গীকার করলে নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও পালন করতে চেষ্টা করি। আমি বিগত দিনে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেগুলো পালনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে নিয়ে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিনি যে রাতারাতি সবকিছু ঠিকঠাক করে দেব।

(—বঙ্গবন্ধু; বেতার ও টেলিভিশনের জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১ মে, ১৯৭২)

করতে প্রস্তুত। তাই আমি আমার ঐদিকের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাব তারা যেন আমাদের জনগণের 'রেফারেন্ডাম' অথবা 'গণভোট' যেভাবেই হোক তার মাধ্যমে দেওয়া রায়কে মেনে নেন।' (দ্র. Shahryar Ikbal, ed., *Sheikh Mujib in Parliament 1955-58)*।'

বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ নামটি প্রথম ঘোষণা করেছিলেন। ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে সোহরাওয়ার্দীর ও শেরে বাংলার সমাধি প্রাঙ্গণে ঊনসত্তরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী-স্মরণে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এক সময় এদেশের বুক হইতে মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর; ছাড়া আর কিছুতে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ... বাংলা ও বাঙালির অবিসংবাদিত গণনায়ক শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলার প্রতিও অমার্জনীয় অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে। ... বাংলার এই কৃতী দুই সন্তান আজ অসহায়ের মতো আমাদের মুখের ওপর তাকাইয়া আছেন। এই দুই নেতার মাজারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি–আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে 'পূর্ব-পাকিস্তানে'র পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।' (দ্র. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯)।

বঙ্গবন্ধু সব সময় সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ছিলেন। তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এক করে ভাবতেন। তাঁর কাজের মাধ্যমেই তিনি প্রমাণ করে গেছেন সবকিছু। অহিংস আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধী যা পেরে ওঠেননি বঙ্গবন্ধু তা করেছেন। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এদের ধর্মের ঊর্ধ্বে গান্ধী নিতে পারেনি। আর যদি তিনি নিতেই পারতেন তাহলে ধর্মভিত্তিক দুটো রাষ্ট্রেরও সৃষ্টি হতো না। অথচ বঙ্গবন্ধুর ডাকে সকল ধর্মের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল। সেখানে ছিল না কোনো ধর্মীয় ভেদাভেদ। সত্যিকার অর্থেই আধুনিক মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল এক অনন্য ঘটনা।

পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন শ্রদ্ধাভরে লিখেছেন :

'শুনেছি আমরা গান্ধীর বাণী জীবন করিয়া দান,
মিলাতে পারেনি প্রেম-বন্ধনে হিন্দু-মুসলমান।
তারা যা পারেনি তুমি তা করেছ, ধর্মে-ধর্মে আর,
জাতিতে-জাতিতে ভুলিয়াছে ভেদ সন্তান বাংলার।'

(জসীম উদ্‌দীন, 'বঙ্গবন্ধু')

বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বঙ্গবন্ধু

৩১ ডিসেম্বর ১৯৭০ হোটেল পূর্বাণীতে 'পূর্বাণী'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ঐ অনুষ্ঠানে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ফুটে উঠেছিল। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'শিল্পী, সাহিত্যিক এবং কবিদের তাদের লেখায় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই প্রতিফলিত করতে হবে। তারা তাদের মানুষ, তাদের মাতৃভূমি ও সংস্কৃতির জন্য শিল্পচর্চা করবেন। জনগণের স্বার্থে এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য সাহিত্যিকদের প্রাণ খুলে আত্মনিয়োগ করার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। আমি তাদের আশ্বাস দিচ্ছি–শিল্পী, কবি এবং সাহিত্যিকবৃন্দের সৃষ্টিশীল বিকাশের যে কোনো অন্তরায় আমি এবং আমার দল প্রতিহত করবে। আজ আমাদের সংস্কৃতির সামনে কোনো চক্রান্ত নেই, শাসন বা নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল নেই। শিল্পী-সাহিত্যিকরা আর মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের জন্য সংস্কৃতিচর্চা করবেন না। দেশের সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্য শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।' সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর এই মমত্ববোধ এবং পক্ষপাতিত্বের মাত্রা দিন দিন বরং বেড়েছে। ক্ষমতাসীন বঙ্গবন্ধু তাদের জন্য কী তীব্রভাবে ভাবতেন তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায় তা লক্ষণীয়।

তিনি নিজেও তাঁর সকল সাংগঠনিক তৎপরতায় শিল্পী-সাহিত্যিকদের যুক্ত করার চেষ্টা করতেন। স্বদেশি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশি দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ মেলে বাংলাদেশের সংবিধানের নান্দনিক উপস্থাপনার মধ্যে। দেশের প্রখ্যাত শিল্পীদের দায়িত্ব দেন মূল সংবিধানটি হাতে লিখে মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের আত্মত্যাগের শৈল্পিক প্রতিফলন ঘটাতে। মনে পড়ে, ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত যে-সম্মেলন মঞ্চে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা জনগণের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করেন তাতে শিল্পী হাশেম খানসহ অনেকেরই হাত পড়েছিল। ৬ দফাকে শৈল্পিকভাবে বাঙ্ময় করার এই আগ্রহ থেকেও অনুমান করা যায় কী গভীর ছিল তাঁর নন্দনপ্রীতি।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার ও আধুনিক। ক্ষুদ্রচিন্তা তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু যেমন নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করেছেন তেমনি অন্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির কথাও বলেছেন। ১৯৭১ সালের ২৪ জানুয়ারি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে পূর্ব-পাকিস্তান সংগীত-শিল্পীসমাজ বঙ্গবন্ধুর সম্মানে এক সংবর্ধনার আয়োজন করে। সেই অনুষ্ঠানেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি কতটা উদার ও মানবিক। নিজের সংস্কৃতির প্রতি

ভালোবাসার পাশাপাশি অন্যের ভাষা ও সংস্কৃতিকে তিনি কখনো খাটো করতেন না। সেদিন তিনি উল্লেখ করেছিলেন, 'আমি যখন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কথা বলি তখন সিন্ধি, পাঞ্জাবি, বেলুচি, পশতু তথা অন্যান্য অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্যের সমান সমৃদ্ধি কামনা করি। কারণ, আঞ্চলিক পরিবেশ ও জনগণের ধ্যানধারণার ভিত্তিতেই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে। ধর্মের নামে ভাড়াটিয়া সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া মানুষের আত্মার স্পন্দনকে পিষে মারার সামিল।' (দ্র. *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭১)। এ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু একটি জাতীয় 'ললিতকলা একাডেমী' প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য বঙ্গবন্ধু সর্বক্ষণ সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তেমনই তাদেরকে নির্ভয়ে কাজ করার সাহসও যুগিয়েছেন। ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত ভাষা-আন্দোলনের স্মরণ-সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দানকালে নিজের বিশ্বাসজাত উপলব্ধি থেকেই তাঁকে বলতে শুনি :

'মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যই সাহিত্য। এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না'। (দ্র. *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ ফেব্রুয়ার ১৯৭১)। 'স্বাজাত্যবোধ' কথাটি উচ্চারণের মধ্যেই তাঁর অন্তরের একান্ত অনুভূতি ফুটে উঠেছে। একই সঙ্গে তাঁর নান্দনিক চিন্তার গভীরতার দিকটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর এই ভাষণের মাধ্যমে এদেশের সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতি-কর্মীদের নির্ভয়ে এবং জোরালোভাবে স্বদেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদা টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে যুক্ত থাকার আহ্বান করেছিলেন এবং নিজে বাঙালি সংস্কৃতির মূলে শক্তির জোগান দিয়েছেন সব সময়। তাঁর ভাষায়, 'মানবাত্মার সুদক্ষ প্রকৌশলী হচ্ছেন দেশের সুধী সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী। ... জনগণ হলো সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো দিন কোনো সৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না।' (দ্র. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪)।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে বঙ্গবন্ধুর হাতের ছোঁয়া লাগে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে 'বাংলা একাডেমী' ও 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' দু'টি আলাদা প্রতিষ্ঠান ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার বিকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়ার পর এ-দুটোকে একই প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। এতে বাংলা ভাষায় গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। দেশের নিবেদিতপ্রাণ গবেষক-বুদ্ধিজীবীদের এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রেখে তিনি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অব্যাহত মনোযোগ ও উৎসাহের সাক্ষ্য রেখে গেছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে কোনো সংস্কৃতি-মন্ত্রণালয় ছিল না। তাঁর হাত ধরেই এই মন্ত্রণালয়টির উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ-ভারত সংস্কৃতিচুক্তি সই হয়। এতে দুই দেশের মধ্যে শিল্পী-বিনিময় সহজতর হয়। বাংলাদেশের শিল্পী ও শ্রোতাবৃন্দ ভারতীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠান বিপুলভাবে উপভোগ করেন। বাংলাদেশের শিল্পীরাও ভারতে গিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা ভারতে গিয়ে সংগীত, নৃত্যসহ বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন ও চর্চার সুযোগ পায়। ভারত থেকে লেখাপড়া শেষ করে এসে তারা এদেশের শিল্প-সংস্কৃতিক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ দুটো দেশের সংস্কৃতি যে একই উৎস থেকে উত্থিত সে কথাটি তিনি কখনো ভোলেননি। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় দুদেশের শিল্পীরা হাতে হাত রেখে যে মুক্তির গান গাইতেন সে খবরও তিনি রাখতেন। আর সে কারণেই দুদেশের সাংস্কৃতিক সংযোগ বৃদ্ধির জন্য তিনি খুবই উদগ্রীব ছিলেন।

আমাদের সংগ্রাম চলবেই। কারণ আমাদের মূল লক্ষ্যে এখনো আমরা পৌঁছাইনি। জনগণকে ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। মানুষের উপর শোষণ, অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটাতেই হবে।

(—বঙ্গবন্ধু; পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান, ২৮ অক্টোবর, ১৯৭০)

বঙ্গবন্ধু দেশের সৃজনশীল শিল্পী ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' গঠন করেছিলেন। সংস্কৃতিসেবী কিংবা তাঁদের পোষ্যদের আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য ও পুনর্বাসন করা এবং মেধাবিকাশের জন্য বৃত্তি প্রদান করাই ছিল এই ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (দ্র. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৪)। সংস্কৃতির আরেকটি অংশ খেলাধুলা।

দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু 'ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' গঠন করেছিলেন। (দ্র. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ আগস্ট ১৯৭৫)। বাংলাদেশে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে তিনি ১৯৫৭ সালের ৪ এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল উত্থাপন করেন। তাঁর আগ্রহ ও সহযোগিতায় বাংলাদেশে ছায়াছবি নির্মাণের প্রাতিষ্ঠানিক গোড়াপত্তন হয়। সংস্থাটি গঠনের দেড় মাসের মধ্যে ফতেহ লোহানি 'আসিয়া' ছবি নির্মাণ শুরু করেন। (দ্র. সিরাজউদ্দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান*, ভাস্কর প্রকাশনী)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে চূড়ান্ত বিজয়ে উত্তীর্ণ করার জন্য যেসব শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী এবং বেতারকর্মী তাঁদের সৃষ্টি বা তৎপরতা দিয়ে অসামান্য অবদান রেখেছেন বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালে ২৫ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে তাদের মধ্য থেকে বাংলাদেশের ১৮ জন এবং ভারতীয় ৪ জন বিশিষ্ট শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী ও বেতারকর্মীর জন্য 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক' ঘোষণা করেন। পদকপ্রাপ্তরা হলেন–শহীদ আলতাফ মাহমুদ, রাজু আহমেদ, সর্দার আলাউদ্দিন, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, বেলাল মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ আল ফারুখ, রেজাউল করিম চৌধুরী, রাশিদুল হাসান, আমিনুর রহমান, কাজী হাবিব উদ্দিন, শফিকুজ্জামান, সৈয়দ আব্দুস শাকের, গাজী মাজহারুল ইসলাম, এম. আর. আখতার মুকুল, রথীন্দ্রনাথ রায়, সমর দাস, মুস্তফা আলম; এবং ভারতের দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, অংশুমান রায় এবং প্রণব ঘোষ। (দ্র. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ মার্চ ১৯৭৫)

রেডিও ও টেলিভিশনকে বিলাস-উপকরণ হিসেবে গণ্য না করে সাধারণের ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেওয়ার এক মহৎ উদ্যোগ বঙ্গবন্ধু নিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা জনগণ সঠিকভাবে পাক। কার্যকর জনসংযোগের মাধ্যমে রেডিও ও টেলিভিশনের ব্যবহার জনপ্রিয় করার জন্য এক ব্যান্ডের রেডিওর ওপর থেকে লাইসেন্স ফি, আমদানি-কর ও বিক্রয়-কর প্রত্যাহারের আদেশ দেন। এক ব্যান্ডের রেডিও সেটের দাম ২১০ টাকা থেকে ২৪৫ টাকার মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যে নামমাত্র শুল্ক ধার্য করার জন্য বঙ্গবন্ধু আদেশ দেন। এর সাথে ২০ ইঞ্চি টেলিভিশন সেটের লাইসেন্স ও অন্যান্য ফি বাতিলের নির্দেশ দেন এবং এই সেটের দাম সাড়ে তিন হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য শুল্ক হিসেবে মাত্র আড়াই শ টাকা ধার্য করার নির্দেশ দেন। (দ্র. *দৈনিক বাংলা*, ৪ জুলাই ১৯৭৫)

কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বঙ্গবন্ধু

কবি, শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা। স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে তাদের যুক্ত করতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

পরিকল্পনা কমিশনে ড. নূরুল ইসলাম, প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর আনিসুর রহমান, ড. মুশাররফ হোসেনসহ অসংখ্য শিক্ষক, প্রকৌশলী ও পেশাজীবীদের জড়ো করেছিলেন। প্রফেসর কবীর চৌধুরীকে শিক্ষাসচিব নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি চলে আসার পর অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে শিক্ষাসচিব হওয়ার জন্য খুব করে বলেছিলেন। বাংলায় সংবিধান প্রণয়নে তাঁকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছিলেন। প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও ডক্টর এ. আর. মল্লিককে মন্ত্রিসভায় নিয়েছিলেন। সাহিত্যিক আবুল ফজলকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করেছিলেন। জয়নুল আবেদীনসহ সকল শিল্পী ও শিক্ষাবিদকে তিনি শিক্ষকতুল্য সম্মান করতেন এবং তাঁদের উপদেশ শুনতেন। নিজেও প্রচুর পড়াশোনা করতেন।

তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির উজ্জ্বল সংগ্রহের কথা অনেকেই জানতেন। *The Tortured and The Damaned* উপন্যাসের লেখক রবার্ট পেইন লিখেছেন, 'তিনি তাঁর গ্রন্থাগারের দিকে তাকান। সেখানে জর্জ বার্নার্ড শ এবং বার্ট্রান্ড রাসেলের রচনাবলি রয়েছে। একটি বুকশেলফে রয়েছে রৌপ্যবাঁধাই মাও সেতুং-এর স্বাক্ষরিত ছবি। তিনি লিখেছেন, 'আমার বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে, মাও সেতুং।' স্বাক্ষরটি একটি বিস্ফোরিত আতশবাজির মতো মনে হয়। তিনি ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। বহুবছর আগে যখন তিনি পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে পিকিং গিয়েছিলেন তখন মাও সেতুং একমাত্র তাঁকেই একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার প্রদান করেছিলেন।' (দ্র. রবার্ট পেইন, *সেই দুঃসময়*, সিদ্দিকুর রহমান অনূদিত, পৃ. ১৮, অনুপম প্রকাশনী ২০০০)

বঙ্গবন্ধুর শুধু ব্যক্তিগত লাইব্রেরিই ছিল না, তিনি সেই সময় তাঁর সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাগার স্থাপন করেন। লাইব্রেরিটি শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকত। সেই পাঠাগারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ৭ হাজার ছাড়াও ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পূর্ব-জার্মান, পশ্চিম-জার্মান, বুলগেরিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশ কয়েক হাজার পুস্তক প্রদান করেছিল। (দ্র. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ মে ১৯৭৪)

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব বঙ্গবন্ধুর জীবনে ছিল খুবই গভীর। বেগম মুজিব তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'কবিগুরুর আসন বঙ্গবন্ধুর অন্তরে অন্তঃস্থলে। রাজনৈতিক জীবনের উত্থানপতন দুঃখ-দৈন্য সর্বমুহূর্তে তাঁকে দেখতাম বিশ্বকবির বাণী আবৃত্তি করতে। 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়' অথবা 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে' প্রভৃতি অসংখ্য গানের টুকরো তিনি আবৃত্তি করে যেতেন দুঃখ-দৈন্য-হতাশায় ভরা অতীতের সেই দিনগুলোতে।'

'সব সময় মনে হতো তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠের আবেগময় আবৃত্তি যেন তাঁর জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাচ্ছে। ... কবিগুরুর সোনার বাংলাকে পবিত্রতায়, স্নিগ্ধতায় অপরূপ করাই বঙ্গবন্ধুর জীবনের পরম প্রার্থনা, আর এ জন্যই তিনি নেমেছিলেন সংগ্রামে। আর তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে কবিগুরুর অমর বাণী। প্রতিবারই জেলে যাবার সময় *সঞ্চয়িতা*টা হাতে তুলে নিতেন। কারাগারে নিঃসঙ্গতায় বঙ্গবন্ধুর জীবনের একমাত্র সঙ্গী ছিল *সঞ্চয়িতা*। বইটার গায়ে পড়েছিল জেলের সেন্সরের অনেকগুলো সিল।' (দ্র. সংবাদ, ৮ মে ১৯৭২)। বঙ্গবন্ধুর রবীন্দ্রপ্রীতির পরিচয় পাই সেই সময় বাংলা একাডেমি আয়োজিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন অনুষ্ঠানে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে। সেখানে তিনি বলেছিলেন :

'নতুন পরিবেশ ও নতুন চেতনায় এবার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে লাখ লাখ প্রাণ ও অপরিমেয় ত্যাগের বিনিময়ে। কিন্তু সত্য, শ্রেয়, ন্যায় ও স্বাজাত্যের যে চেতনা বাঙালি কবিগুরুর কাছ থেকে লাভ করেছেন আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে তারও অবদান অনেকখানি। বাঙালির সংগ্রাম আজ সার্থক হয়েছে। বাঙালির রবীন্দ্র-সম্মাননার চেয়ে বড় কোনো দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই।' (দ্র. *দৈনিক বাংলা*, ৮ মে ১৯৭২)।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর নূরুল ইসলাম। ২০০৫ সালের মে মাসে একান্ত এক আলাপচারিতায় তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'এমন বড় হৃদয়ের মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ আমি আর দেখিনি। যতদিন সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়েছি ততদিনই লক্ষ করেছি যে তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে নাশতা সারছেন।'

সুখে-দুঃখে সবসময় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে ছিলেন সে কথা লেখক মাহবুব তালুকদারও জানিয়েছেন। তিনিও তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯৭৫-এর ৭ মে জাহাজ গাজীতে চড়ে বঙ্গবন্ধু যাচ্ছিলেন তাঁর বাবার চেহলামের উদ্দেশ্যে টুঙ্গিপাড়ায়। মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন কে কোথায় কীভাবে ঘুমুচ্ছেন। জাহাজের দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন মাহবুব তালুকদার। বঙ্গবন্ধু তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'মাহবুব এইভাবে শুইয়া আছে। একটা বালিশ ওরে জোগাড় কইরা দিতে পারলা না?' এরপর নিজের কেবিনে গিয়ে নিজেরই একটা বালিশ এনে মাহবুব তালুকদারের মাথার নিচে দিয়ে গেলেন। 'পুরো ব্যাপারটা আমার জন্য বিপন্ন বিস্ময়' বলে জানিয়েছেন মাহবুব তালুকদার (মাহবুব তালুকদার, বঙ্গভবনে পাঁচ বছর, ইউপিএল, ১৯৯২, পৃ. ১৩৬)। এর পরপরই তিনি যোগ করেছেন, 'ভোরবেলা দিনের আলো ফোটার পূর্বেই উঠে পড়লাম। লক্ষ করলাম, বঙ্গবন্ধু জাহাজের ডেকে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে

একা বসে আছেন। এত সকালে আর কেউ তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। আমি নীরবে গিয়ে তাঁর একপাশে দাঁড়ালাম। দেখলাম তিনি পা দোলাতে দোলাতে আবৃত্তি করছেন :

'নম নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি... ।'

আমাকে দেখে আবৃত্তি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি? রাত্রে ভালো ঘুম হইছে তো?

রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি নজরুলের আদর্শেও তিনি ছিলেন অনুপ্রাণিত ও বিমোহিত। দুজনেই বিদ্রোহী। দুজনেরই গণমানুষের প্রতি প্রীতি অতুলনীয়। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কবি নজরুলকে তাঁর ৭৩তম জন্মবার্ষিকীতে ঢাকায় নিয়ে আসার সমস্ত ব্যবস্থা করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি কবি নজরুলকে পত্র লিখেছিলেন এভাবে : 'মুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণ ও আমার পক্ষে আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনার জন্মবার্ষিকীতে আপনার আদর্শে বাংলাদেশকে সিক্ত হতে দিন। আমরা সাগ্রহে আপনার আগমনের প্রতীক্ষা করছি।' (দ্র. সংবাদ, ২১ মে ১৯৭২)। বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে কবি ঢাকায় আসলেন। অবিরাম পুষ্পবর্ষণের মাঝে কবি বাংলাদেশে পদার্পণ করলেন। কবি ও বঙ্গবন্ধুর মাঝে এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হলো। বাঙালির এই দুই বিদ্রোহীর মিলনক্ষণটি ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল এক অধ্যায় হিসেবে এরই মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। 'গণভবন থেকে কাজ সেরে গতকাল বিকেল আড়াইটায় বঙ্গবন্ধু গেলেন তাঁর ধানমণ্ডির বাড়িতে। বাড়ি গিয়ে তিনি বুকশেলফ থেকে বের করলেন কবি নজরুলের কাব্যগ্রন্থ *সঞ্চিতা*। আবেগ আর উচ্ছ্বাস জড়িয়ে আবৃত্তি করলেন 'বিদ্রোহী' কবিতা। তারপর 'মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেইদিন হব শান্ত'–চরণ দুটি আবৃত্তি করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসলেন। তাঁর বাড়ি থেকে আটাশ নম্বর কবির বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত সারাটা পথ আবৃত্তি করলেন কবিতার সেই চরণ দুটি। হাতে তার পুষ্পনৈবেদ্য। ... বঙ্গবন্ধু গভীর শ্রদ্ধাভরে পুষ্পমালা পরিয়ে দিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। পরম স্নেহে বারবার হাত বোলাতে থাকলেন কবির মাথায়, পিঠে, সর্বাঙ্গে। নির্বাক কবি অপলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন বঙ্গবন্ধুর দিকে। হাত বাড়িয়ে কী যেন বললেন বঙ্গবন্ধুকে। বাকশক্তিহীন সেই মুখের ভাষা বোঝা গেল না।' (দ্র. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মে ১৯৭২)

আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ও বঙ্গবন্ধু

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটির প্রতি ছিল তাঁর আলাদা আবেগ। এই গানটিকেই যে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত করবেন সেটি বহু আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন। গানটিকে সারা বাংলা ছড়িয়ে

দেওয়ার জন্য তিনি আগ্রহী ছিলেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফা প্রণয়নের পর থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। বাঙালি ৬ দফাকে মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। এই সময়েই 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'আমার সোনার বাংলা' গানটি সর্বত্র প্রচারের বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সনজিদা খাতুন ২০০৫ সালে ২১ মে তারিখের *দৈনিক জনকণ্ঠে* লিখেছিলেন :

'১৯৫৬ সালের প্রথমার্ধে ঢাকাতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতাসুদ্ধ প্রাদেশিক নেতাদের এক বৈঠক হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য কার্জন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সে সভায় আমাকে গান গাইতে বলা হয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গাইতে খবর পাঠান। এর তাৎপর্য তখন বুঝিনি, আজ বুঝতে পারি। সেদিন পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের কাছে 'সোনার বাংলা' বিষয়ে বাঙালির আবেগ-অনুভূতি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন এ-দেশের নেতা। এর কিছু আগে ২৩ মার্চে পূর্ববঙ্গের নাম পূর্বপাকিস্তান করে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়েছিল। আঞ্চলিক স্বাধীনতার জন্য উত্তাল আন্দোলনের সময়ে বঙ্গবন্ধু সবসময় জাহিদুর রহিমকে এই গান গাইবার জন্য খবর পাঠাতেন। রেসকোর্সের মযদানে তাঁর সভাতে জাহিদ যে কতবার 'আমার সোনার বাংলা' গেয়েছে! এ গানের আবেগ বাঙালিকে আমূল নাড়া দিয়েছে। পাকিস্তানি বিরূপ প্রচারণা রবীন্দ্রসংগীত আর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে দ্বিধাগ্রস্ত করে রেখেছিল। জনপ্রিয় নেতার বাঙালির স্বার্থ-সংরক্ষণমূলক বক্তৃতার সঙ্গে এই বাংলাপ্রীতির গান সকল মানুষকে অমোঘভাবে আকর্ষণ করল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাই মাঠের রাখালও স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গেয়ে উঠেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি কিংবা বাঙালির যাবতীয় আন্দোলনে শিল্পীরা ঐ গান গেয়েছেন বারংবার। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে 'আমার সোনার বাংলা'-র সুর আর স্বরলিপি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। তখন কেবিনেট ডিভিশনের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু রায় দেন, যে সুর গেয়ে দেশকে স্বাধীন করা হয়েছে, তা-ই আমাদের জাতীয় সংগীতের সুর। ঘটনা এই যে, সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া রেকর্ড থেকে যে সুর শুনে শিল্পীরা গানটি তুলেছিলেন, সে সুর থেকে নিজেরাই খানিকটা সরে যান। আর সেই সুরই গাওয়া হয়ে আসছে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল থেকে এ-পর্যন্ত। বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত আমাদের ভুলের অপরাধকে মুছে দিয়েছিল। আজও সেই সুরেই 'আমার সোনার বাংলা' গেয়ে চলেছি আমরা।'

এক অতৃপ্ত মানুষ

তাঁর সংস্কৃতি-ভাবনার পুরো জমিন জুড়েই ছিল এদেশের দুঃখী মানুষ। তিনি শিল্পী কামরুল হাসানের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন শাশ্বত বাংলার আর্ট ফর্ম কী করে উঠে আসে তাঁর ক্যানভাসে। জয়নুল আবেদিনের পরামর্শ মতো সারা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁর ছিল (দ্র. শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর সঙ্গে লেখকের আলাপচারিতা)। সময়ের অভাবে তিনি তা করতে পারেননি। সুযোগ পেলেই শিল্পাচার্যের সঙ্গে এদেশের শিল্পকলা নিয়ে কথা বলতেন। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার মানসে বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সোনারগাঁওয়ে 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন' গঠন করেন। স্বদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশে ও প্রচারে তিনি উদগ্রীব ছিলেন। নানান কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্প-সংস্কৃতির জন্য বরাদ্দ ছিল তাঁর বিশেষ সময়। তাই গণভবনকে তিনি বাঙালির গর্বের ভবন করার মানসে শিল্পী রশীদ চৌধুরীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পছন্দের কেউ গেলে তিনি তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তা দেখাতেন। জনাব আবুল মাল মুহিতকেও তিনি তা দেখিয়েছিলেন। 'প্রধানমন্ত্রী একদিন আমাকে নতুন গণভবন দেখাতে শুরু করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে এই ভবনটি তিনি ভবিষ্যতের জন্য রেখে যাচ্ছেন, তিনি তো ৩২ নম্বরেই থাকবেন। তিনি আরও বললেন যে ভবনটির আসবাবপত্র, কুশন, ফরাস, পর্দা, দেয়াল-লিখন, ভূষণ, অলংকরণ সব কিছুতে মূর্ত হবে বাংলাদেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য এবং বাঙালির রুচি-পছন্দ। শিল্পী রশীদ চৌধুরী ছিলেন এই ভবনের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা নিরূপণে নিযুক্ত। মনে হলো (তখনো নির্মীয়মাণ) নতুন গণভবন নিয়ে তিনি খুবই গর্বিত ও তৃপ্ত।' (দ্র. আবুল মাল আবদুল মুহিত, *মহাপুরুষদের কথা কাছে থেকে দেখা*, আগস্ট ২০০১, পৃ. ১০২)। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১-৫ মার্চ বন্ধুরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকালে সেখানকার নেতৃবন্দের জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে যান কচিকাঁচার মেলার শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম। তাঁর নান্দনিক চিন্তা শুধু গানে, কবিতায় বা শিল্পকলায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি এদেশের মানুষকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখতেন সেসবও তাঁর নান্দনিক ভাবনারই অংশ। তাঁর স্বপ্নকে যেসব সাহিত্যিক ও শিল্পী ভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করতেন তাদের তিনি খুবই আপন ভাবতেন। যেকোনো সাহিত্যিক ও কবির মতো তিনিও ছিলেন এক অতৃপ্ত মানুষ। তাঁর স্বপ্ন পূরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছিল বলেই তিনি হয়ে পড়েছিলেন খানিকটা অতৃপ্ত। অস্থিরও বটে। তাই '৭৩ সালের বিজয়দিবসের প্রাক্কালে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে তাঁর ঐ অতৃপ্তির কথা তুলে ধরে বলেছিলেন, 'আমি যে সুখী ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি, সংগ্রাম করেছি, দুঃখ ও নির্যাতন বরণ

করেছি, সেই বাংলাদেশ এখনো আমার স্বপ্ন রয়ে গেছে। গরিব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে যতদিন না হাসি ফুটবে ততদিন আমার মনে শান্তি নেই।' এমন করে গরিব মানুষের কথা কি আজ আর কেউ ভাবেন? তারা ভালো নেই বলে তিনিও ভালো নেই। তারা খেতে পারে না বলে তিনিও খেতে পারেন না। গরিব মানুষের সঙ্গে এমন গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক তাঁর পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল বলেই তিনি আজও জীবন্ত হয়ে রয়েছেন তাদের অন্তরের গহীনে।

১৯৭২ সালের ৯ মে রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানের জনসভায় জনগণের কাছে তাই তাঁর অঙ্গীকার ছিল, 'আপনারা জানেন, জীবনে আমি কোনো দিন মিথ্যা ওয়াদা করি না। আমি জীবনে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হবার জন্য রাজনীতি করিনি। একদিকে ছিল আমার প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসন আর একদিকে ছিল আমার ফাঁসির ঘর। আমি বাংলার জনগণকে মাথা নত করতে দিতে পারি না বলেই ফাঁসিকাষ্ঠ বেছে নিয়েছিলাম। আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার, কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণ ভরে হাসুক।' লক্ষণীয় যে, রাজনীতির এই অমর কবির প্রতিটি পঙ্‌ক্তিই নন্দনতত্ত্বের জারক রসে সিক্ত। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। মানবিকতা ও গরিব-হিতৈষী উচ্চতর অনুভূতিসম্পন্ন।

আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণভরে হাসুক।

(—বঙ্গবন্ধু; রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দান, ৯ মে, ১৯৭২)

বাংলার কৃষক-শ্রমিকের প্রতি তাঁর অনিঃশেষ ভালোবাসার কারণেই বিশ্বাসঘাতকদের হাতে তিনি প্রাণ দিলেন। তাই গরিব মানুষ তাঁর এই আত্মবলিদানের কথা কোনো দিন ভুলবে না। যে আত্মত্যাগ তিনি করেছেন বাংলাদেশের জন্য তারই প্রতিদানে কতিপয় বিশ্বাসঘাতক কেড়ে নিল তাঁর

প্রাণ। এমন মৃত্যু অবিশ্বাস্য, মর্মান্তিক, হৃদয়বিদারক এবং অমোচনীয়ভাবে জাতির জন্য কলঙ্কময়। বাঙালি জাতির তিনি এক অমর জাতীয় মহাবীর। তাঁর মতো মহামানবের প্রতিকৃতি জনমন থেকে বহিষ্কৃত করা কখনোই সম্ভব হবে না। দেশ পরিচালনার জন্য খুব বেশিদিন সময় তো তিনি পাননি। বিধ্বস্ত অবকাঠামো, কোটি মানুষের পুনর্বাসন, তারুণ্যের আকাশচুম্বী চাহিদা, সম্পদের অভাব, দেশে-বিদেশে নানা ষড়যন্ত্র–এত কিছু সত্ত্বেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

শিল্প-সংস্কৃতির চেতনাসম্পন্ন উপযুক্ত নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সর্বজনীন শিক্ষার প্রসারে তৎপর বঙ্গবন্ধু 'কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন এবং তার চূড়ান্ত প্রতিবেদনও গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতেই তিনি পাশ করেছিলেন তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ। শত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমুন্নত রাখার জন্যই তিনি আসতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় ক্যাম্পাসে। বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর সেই আশা পূরণ হতে দেয়নি।

যে মৃত্যুর ভার হিমালয় সমান

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে কেড়ে নিয়েছে নিয়তি। সেই থেকেই বিপর্যয় শুরু বাঙালি জাতির। সভ্যতার কাছে আমাদের হেরে যাবার সেই যে সূচনা তাঁর যেন আর শেষ নেই। নামছি তো নামছিই। কখনো-বা মনে হয় রক্তের দামে কেনা দেশটিকে যেন আর চেনাই যাচ্ছে না। যে অসাম্প্রদায়িক, মানবিক, ন্যায়নিষ্ঠ বাঙালি জাতির অভ্যুদয়ের প্রক্রিয়ায় বিশ্বরণ্যে শিল্পী রবিশঙ্কর, জর্জ হ্যারিসন, কবি গিন্সবার্গ, সাহিত্যিক আঁদ্রে মালরো ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের নৈতিক সংস্পর্শ ছিল, সেই জাতির কপালে এখন জুটছে সাম্প্রদায়িকতা ও সহিংসতার কলঙ্ক। আজ বিশ্ব জুড়ে বাংলাদেশের পরিচয় ঘটছে এটি বোমার দেশ, সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য। বাংলাদেশকে 'বাংলাস্তান' বানানোর কত অপচেষ্টাই-না আমরা দেখেছি। যে-দেশে জাতির স্থপতিদের হত্যা করে পার পাওয়া যায়, ৩৩ বছরেও যদি এমন হত্যাকাণ্ডের বিচার না করা যায় তাহলে সে দেশে সব ধরনের অপরাধ করা ও প্রশ্রয় পাবার সংস্কৃতি সুদৃঢ় হওয়ারই কথা। বাস্তবেও তাই হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনের দামই যে শুধু তুচ্ছ তাই নয়, নেতৃবৃন্দের জীবনের দামও প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গিয়েছিল এদেশে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রীর ওপর গ্রেনেড হামলায় আইভি রহমানসহ ২২ জনের মৃত্যু, এস. এ. এম. এস. কিবরিয়া, আহসানউলাহ মাস্টার, মঞ্জুরুল ইমাম বা কাজী আরিফের হত্যাকাণ্ড সেই অপসংস্কৃতিরই

শেকড় পোক্ত করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালের ১৭ আগস্টে ফেটেছে পাঁচশর মতো বোমা। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়েই চলেছে সেই তাণ্ডব। প্রতিদিনই এমন অসংখ্য আক্রমণ এবং অস্বাভাবিক মৃত্যু আমাদের সেই অপসংস্কৃতির অংশ করে ফেলেছে। এ কেমন দেশ যেখানে বিচার না করে মানুষ মারতে পারলে অন্য মানুষেরা উল্লসিত হয়? সেদিনের সরকারই-বা মানুষ মারার এই মহৎ দায়িত্ব কেমন করে নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে পেরেছিল?

এমন দুর্ভাগা দেশ নিশ্চয় বঙ্গবন্ধু চাননি। আর তাই কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন তাঁকে উদ্দেশ্য করে লিখতে পারেন–'তুমি কেমন আছ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান? তুমি কি দেখতে পাও তোমার প্রিয় বাংলাদেশকে? এখন তোমার নদীগুলোয় চড়া পড়েছে, এখন তোমার বৃক্ষসমূহ পত্রশূন্য, তোমার অবারিত মাঠ-প্রান্তর মানুষের লাশে পরিপূর্ণ। তোমার বাংলাদেশের বাতাস নির্যাতিত নারীর আহাজারিতে বিদীর্ণ। মুক্তবুদ্ধির চর্চা এখন ঘাতকের চাপাতির নিচে।' (সেলিনা হোসেন, 'বঙ্গবন্ধু তোমার জন্মদিনে', *ভোরের কাগজ*, ১৭ মার্চ ২০০৬)। জাতি হিসেবে আমাদের এই অধোগতি শুরু হয় সেই ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট থেকেই। ১৯৭৫ সালে ঘটেছে এমন কিছু অন্যায় ও কলঙ্কজনক মৃত্যু যার ভার হিমালয়ের পর্বতসমান। আজও আমাদের অস্তিত্বের সমতুল্য মানুষটির হত্যার বিচার আমরা পাইনি। যাঁকে মারতে পশ্চিম-পাকিস্তানি হায়েনাদের হাত কেঁপেছিল, কবর খুঁড়েও যাঁর মৃত্যুর আদেশটি বাস্তবায়নের সাহস রাখেনি শত্রুর দল, আর তাঁকেই কিনা গুলিবিদ্ধ করে তাঁর প্রাণপ্রতিম বাংলাদেশের মাটিতেই লুটিয়ে ফেলল কিছু বিশ্বাসঘাতক। সেদিন বাংলার ব্যর্থ দিগন্ত ছুঁয়ে লালসূর্য ঠিকই নমিত হয়েছিল, কিন্তু অর্ধ-নমিত হয়নি তাঁরই তৈরি লাল-সবুজ পতাকা। শোকে-ক্ষোভে সাধারণ মানুষ পাথর বনে গেলেও কুলাঙ্গার ঘাতকদের ঘেরাও করা সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে। সেই ব্যর্থতার গ্লানি আজও আমরা বয়ে চলেছি। তীব্র এক পাপবোধ আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। 'আমি মনে করি না যে সারা দেশের প্রতিটি গাছ থেকে ফুল তুলে এনে তোমার কবরে দিলে আমাদের পাপ ক্ষয় হবে।' (সেলিনা হোসেন, প্রাগুক্ত)। আজও তাঁকে আমরা সঙ্গী করে উঠতে পারিনি আমাদের নিশ্বাসের-প্রশ্বাসের। রণাঙ্গনের লড়াকু, বীর, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের মানুষ, প্রিয় প্রজন্মের অহংকারী সন্তানেরা, তাহলে তোমরা কোথায়? কেন আমরা সবাই ব্যস্ত প্রতিদিনের স্বার্থপরতায়, সীমাহীন নির্লিপ্ততায় এবং ভাবলেশহীন এক রুটিনমাফিক জীবনযুদ্ধে? যে পরিমাণ ঋণী আমরা তাঁর কাছে, তা কি এমনি এমনি শোধ হয়ে যাবে? আমাদের কি কিছুই করার নেই? তাঁকে নিশ্চয় শারীরিকভাবে আর ফিরে পাব না। কিন্তু রাষ্ট্র কি পারত না তাঁর জন্মদিন ও শাহাদৎ দিবস পালনে অগ্রণী হতে? তিনি তো কেবল বিশেষ কোনো দলের কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সকল বাঙালির।

তাঁকে আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী করার ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিকদের পক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব। এদেশের কবিরা যেমন শ্রেষ্ঠ সব কবিতা উৎসর্গ করেছেন তাঁকে, তেমন করেই অন্য সাহিত্যিকদের এগিয়ে আসতে হবে তাঁকে উপজীব্য করে কালজয়ী গল্প, নাটক, উপন্যাস সৃষ্টির লক্ষ্যে। বিদেশ থেকে এসে রবার্ট পেইন যদি লিখতে পারেন সেই দুঃসময়, আমাদের নিজেদের কথাসাহিত্যিকরা কেন পারবেন না তাঁকে এবং তাঁর সময়কে ধরে রাখতে? মনে রাখা চাই, মুক্তিযুদ্ধ একটি আদর্শভিত্তিক চলমান প্রক্রিয়া। ব্যক্তির মৃত্যু হয়, জাতির জীবনে উত্থান-পতন ঘটে, কিন্তু আদর্শের মৃত্যু হয় না। আদর্শ অবিনশ্বর। আমাদের মুক্তিযুদ্ধও একটি আদর্শের নাম। এটিও এক নিরন্তন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া কখনো শেষ হওয়ার নয়। এই চেতনার অনির্বাণ শিখা জ্বলতেই থাকবে। যুগে যুগে এই চেতনা শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষকে মুক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস চলমান সেই মুক্তিযুদ্ধেরও নেতৃত্ব দেবেন অশরীরী কিন্তু অবিনশ্বর বঙ্গবন্ধু।

দুঃশাসন, দারিদ্র্য, ব্যাধি, সন্ত্রাস, যুদ্ধ, অন্যায়-অনাচারের মতো সকল মানুষের 'কমন এনেমি' বা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের বার বার রুখে দাঁড়াতে হবে। এই শত্রু ঘরের ভেতরের বা বাইরের–দুই-ই হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের এই কালজয়ী চেতনার কথা আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও সংগ্রাম থেকে জেনেছি। আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁকে যথার্থভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব থেকে আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-নাট্যকার তথা নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্টজনেরা কিছুতেই সরে দাঁড়াতে পারেন না।

চির অম্লান শেখ মুজিব

এদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃজনশীল কাজকর্মে বঙ্গবন্ধুকে আরও ভালোভাবে তুলে ধরতে এগিয়ে আসবেন বলে আমি প্রত্যাশা করছি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, যতই মন্দ হোক আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির বেদনার প্রায় পুরোটাই বয়ে বেড়িয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তিনি না জন্মালে 'বাংলাদেশ' নামের দেশটি আজও হয়তো বিশ্বমানচিত্রে স্থান করে নিতে পারত না। আমরাও হতে পারতাম না একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। সুতরাং, আমাদের নিজেদের প্রয়োজেনই এই বিশাল আকৃতির মানুষটিকে তুলে ধরা চাই আমাদের কবিতা, গান, উপন্যাস, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নাটক ও চলচ্চিত্রে। তিনি ছাড়া বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশ আসলেই যে অপূর্ণ, অচেনা। তাঁর জীবন ও কর্মের কথা তাই শিল্পী-সাহিত্যিকদেরই বেশি করে মনে পড়ার কথা। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চ এবং তাঁর মহাপ্রয়াণ-দিবস ১৫ আগস্টকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা হোক বা না হোক, পুরো সমাজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের অস্তিত্বের

প্রতীক বঙ্গবন্ধুকে স্মরণীয় করে রাখার সংগ্রামে। বিশেষ করে, এই দুটি দিন আমরা আরও ব্যাপকভাবে নিশ্চয় পালন করতে পারি। আসুন, নানান আয়োজনে, নানান উদ্যোগে আমরা তাঁকে আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের নিত্যসঙ্গী করে তুলি। আসুন শামসুর রাহমানের মতো আমরাও প্রতিজ্ঞা করি :

'যতদিন আমি এই পৃথিবীতে প্রত্যহ ভোরে
মেলব দু'চোখ, দেখব নিয়ত রৌদ্র-ছায়ার খেলা,
যতদিন পাব বাতাসের চুমো দেখব তরুণ
হরিণের লাফ, ততদিন আমি লালন করব শোক।'

(শামসুর রাহমান, 'ইলেকট্রার গান')

অথবা, আসুন সিকান্দার আবু জাফরের মতো দৃঢ় প্রত্যয়ে বলে উঠি :

'বাঙালির ঘরে ঘরে বাঁচবে বাঙালি তার যথার্থ সম্মানে
মৃত্যুমুখে জননীর কোনো পুত্র কন্যা নয়
অশক্ত নির্জীব
সে নাম মুজিব।'

(সিকান্দার আবু জাফর, 'সে নাম মুজিব')

ঠিক যেমন প্রত্যয় নিয়ে বলে গেছেন আরেক কীর্তিমান বাঙালি অন্নদাশঙ্কর রায় :

'যতদিন রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।'

(অন্নদাশঙ্কর রায়, 'বঙ্গবন্ধু')

পুরো জাতির কাছে আমার আবেদন–টুঙ্গিপাড়ায় নির্বিঘ্নে শুয়ে থাকা এই শ্রেষ্ঠ বাঙালির ঘুম যেন আমরা 'স্বাধীনতার ঘোষণা কে করেছেন' এমন অনর্থক বিতর্কের কর্কশ আওয়াজে ভাঙিয়ে না দিই। মাও সে তুংকে নিয়ে চৈনিকরা এমন নিম্নমানের বিতর্ক করেন না। গান্ধীকে নিয়ে ভারতীয়রা এমন রুচিহীন কথা বলেন না। অথচ এই অকৃতজ্ঞ বাঙালি জাতির একাংশের রুচির কী বিকারই-না ঘটেছে যে, তারা আকাশ-সমান এই মানুষটির অস্তিত্বই অস্বীকার করতে চায়! অথচ তিনি মিশে আছেন আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এদেশের প্রকৃতির প্রতিটি অঙ্গনে-প্রাঙ্গণে। কেউ কেউ ভুলে যান যে, 'কোনো কোনো রক্তের দাগ কিছুতেই শুকোবার নয়' (পাবলো নেরুদা)। মনে রাখা চাই, তিনিই আমাদের একমাত্র জাতীয় বীর–যিনি একবার নয়, দুই-দুইবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন।

একবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময়, আরেকবার একাত্তরে পাকিস্তানি বন্দীশালায়। দুবার তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি ছিলেন সংশয়হীন, সত্যনিষ্ঠ ও অবিচল। যিনি মৃত্যুকে ভয় পান না, তাঁকে কে মারতে পারে? বিদেশিদের মৃত্যুজাল জনগণের ভালোবাসায় ছিন্ন করে বের হতে পারলেও স্বভূমিতে তিনি বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়তে পারেননি। তবে শত্রুরা শারীরিকভাবে কেড়ে নিলেও তিনি রয়ে গেছেন আমাদের অন্তরের গভীরে। এ সময়ের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁকে আরও স্পষ্ট করে কীভাবে তুলে ধরা যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা ইতিহাস নিয়ে যেভাবে ধস্তাধস্তি শুরু করুক, নায়ককে খলনায়ক এবং খলনায়ককে নায়ক বানানোর অপচেষ্টায় যেভাবেই মেতে উঠুক তাঁর পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের সন্তানদের আরও বেশি করে প্রকৃত ইতিহাস-সংলগ্ন করে গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করা প্রয়োজন। যদিও জানি ইতিহাস কারও নির্দেশে চলে না, ইতিহাসকে ছাই চাপা দিয়েও রাখা যায় না, তবুও নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে। যেমনটি চালিয়ে যাচ্ছেন লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। শিশুদের জন্য মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখেই তিনি বসে নেই, সর্বক্ষণ বলছেন মুক্তিযুদ্ধের গল্প, বঙ্গবন্ধুর গল্প। আসুন এভাবেই আমরা আমাদের সন্তানদের আরও বেশি বেশি মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলি। নাম-না-জানা শহিদদের আত্মদানের কথা বলি। জাতীয় বীরদের কথা বলি। আরও বলি শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর জীবন ও সংগ্রামের কথা। বলি দেশকে ভালোবেসে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করার এই অতুলনীয় জাতীয় বীরের কথা। বলি আমাদের অস্তিত্বের সমান এই মানুষটির কথা। নিরন্তর স্মরণে রাখি বাংলাদেশের আরেক নাম এই সাহসী বীরশ্রেষ্ঠতমের কথা।



১৩

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'

বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের সূচনাপর্বের দলিল

বাঙালির পরম সৌভাগ্য এই যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তাঁর দেখা সমকালীন রাজনীতির কথাগুলো গুছিয়ে লিখে গেছেন। বিশেষ করে, ১৯৬৬-৬৯ কালপর্বে তিনি তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তির সাহায্যে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* লিখেছেন। তাঁর কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্পাদনায় আমরা বঙ্গবন্ধুর ঝরঝরে ভাষায় লেখা এই আত্মজীবনীর মাধ্যমে বিকাশমান বাঙালি জাতিসত্তার এক অনবদ্য রেখাচিত্রই শুধু খুঁজে পেয়েছি তা নয়, সমকালীন সমাজ বাস্তবতারও এক জটিল চিত্রের সন্ধান পেয়েছি। লেখক বঙ্গবন্ধু বাগ্মী বঙ্গবন্ধুর চেয়ে কোনো অর্থেই যে কম পারদর্শী নন—এই আত্মজীবনী সেই সত্যিটিই পাঠকদের সামনে স্পষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়েছে।

'আমি এ খবর শুনে আশ্চর্য হলাম। কারণ, আমার কাছে তখন হিন্দু মুসলমান বলে কোনো জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসাথে গান-বাজনা, খেলাধুলা, বেড়ান–সবই চলত।'

(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১১)।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটিতে মূলত গত শতাব্দীর চল্লিশ দশকের শুরু থেকে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়টি ধরা পড়েছে। তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চে জন্ম নেয়া একজন শেখ মুজিব (ডাক নাম খোকা) কী করে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক জীবনকে আপন করে নিলেন সেই কথাগুলো একজন দক্ষ কথা সাহিত্যিকের মতোই লিপিবদ্ধ করেছেন এই

বইটিতে। নিজ গ্রামের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়া শেষ করে বাবার কর্মস্থল গোপালগঞ্জ স্কুলে ভর্তি হন শেখ মুজিব। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি বেরি বেরি রোগের শিকার হন। ফলে তাঁর লেখাপড়া ব্যাহত হয়। ১৯৩৬ সালে বাবার নয়া কর্মস্থল মাদারিপুর হাইস্কুলে দুবছর পর ফের সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ঐ সময় তাঁর চোখে গ্লুকোমা রোগ ধরা পড়লে কলকাতায় গিয়ে চোখে অপারেশন করান এবং চশমা পরা শুরু করেন। এরপর মাদারিপুরে ফিরে এসে স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত তরুণদের সাথে মেলামেশা শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে তাঁকে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করা হয়। কিছু দিনের মধ্যে তাঁর পিতাও গোপালগঞ্জে বদলি হলেন। এ সময় তাঁর গৃহশিক্ষক কাজী আব্দুল হামিদ প্রয়াত হলে তারই প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সেবা সমিতি' পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

১৯৩৮ সালে বাংলায় প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ সফর উপলক্ষে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক দলের তিনি প্রধান ছিলেন। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করলেও এক পর্যায়ে তিনি খেয়াল করলেন হিন্দু ছেলেরা সরে পড়তে থাকল। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে, কংগ্রেস তাদের মানা করেছে। এতে তিনি খুবই অবাক হয়েছিলেন। তাছাড়া, অতিথিদের উদ্দেশে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে তাতেও হিন্দুদের দোকান যাতে অংশগ্রহণ না করে তাও বলে দেওয়া হয়েছিল। শেখ মুজিব লিখেছেন, 'আমি এ খবর শুনে আশ্চর্য হলাম। কারণ, আমার কাছে তখন হিন্দু মুসলমান বলে কোনো জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসাথে গান-বাজনা, খেলাধুলা, বেড়ান–সবই চলত।' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১১)। শহরে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি। তাই গ্রাম থেকে অনেক লোক এল। দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কাও ছিল। হক সাহেব ও সোহরাওয়ার্দী এলেন, সভাও হলো। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিবের অনেক আলাপ হলো। তাঁর নাম ঠিকানা তিনি লিখে নিলেন। কিছুদিন পর সোহরাওয়ার্দী তাঁকে চিঠি দিলেন এবং তিনিও সে চিঠির উত্তর দিলেন। এভাবেই বাংলার দুই প্রজন্মের দুই নেতার মাঝে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক বন্ধনের সূত্রপাত হলো। তাঁদের এ সম্পর্ক আজীবন অটুট ছিল এবং বাঙালির রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাট প্রভাব রেখেছে। বিশেষ করে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে উদার গণতান্ত্রিক প্রভাব এই দুই নেতার দৃষ্টিভঙ্গিরই ফসল বলা চলে।

ঐ সময়টায় সারা বাংলাতেই হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বেশ অবনতি হতে দেখা যায়। তাঁর এক বন্ধু মালেকের ওপর আক্রমণ হওয়ায় শেখ মুজিব ও তাঁর বন্ধুরা এর প্রতিবাদ করেন। এ নিয়ে থানাপুলিশ ঘটে যায়। তাঁর নামে এজাহার দেওয়া হয় এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। দিনসাতেক তিনি আটক ছিলেন। এ

কারণে তাঁর মনে সাম্প্রদায়িক কোনো সংকীর্ণতার দাগ যে পড়েনি পরবর্তী সময়ে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আমরা স্পষ্টতই তা দেখতে পাই। সেটিই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম জেল। শেষ পর্যন্ত এই মামলা আর চলেনি। এরপর সোহরাওয়ার্দীর সাথে আলাপ করে গোপালগঞ্জে মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। এর পাশাপাশি খেলাধুলাও চলতে থাকে। ১৯৪২ সালে তিনি মেট্রিক পরীক্ষা দেন।

তদ্দিনে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। এরপর কলকাতায় এসে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হলেন। থাকেন বেকার হোস্টেলে। আর সারাক্ষণ যুক্ত থাকেন মুসলিম লীগ রাজনীতির সঙ্গে। ইসলামিয়া কলেজ বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু এবং শেখ মুজিবের হাতে তার মূল চাবি। তাঁর ইচ্ছেমতোই তখন বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি প্রসারিত হতে থাকে। এল ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের সময় খাজা নাজিমউদ্দীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষদের জন্য রাতদিন শেখ মুজিব এবং তাঁর অনুসারী ছাত্র-ছাত্রীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে লঙ্গরখানা পরিচালনা করতেন। তিনি রিলিফের কাজের মাধ্যমে রাজনীতির মানবিক দিকটাও গভীরভাবে অনুভব করলেন। এ সময়টায় মুসলিম লীগ ছেড়ে যাওয়ার কারণে শেরে বাংলাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন হক সাহেব জনগণের অন্তরে বিরাট স্থান নিয়ে বসে আছেন। এরপর থেকে তিনি আর হক সাহেবের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করা থেকে সরে আসেন। তবে আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দীর প্রতি অনুগত শেখ মুজিব মুসলিম লীগকে জমিদার ও নবাবদের পকেট থেকে বের করে আনার এক নিরলস সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। এরই মাঝে জিন্নাহ্‌র ডাকে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ সম্মেলনে' যোগদানের জন্য তিনি ও তাঁর বন্ধুরা দিল্লী রওনা হলেন। অল্প পয়সায় দিল্লী যাওয়া, কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করা, অসুস্থ হয়ে পড়া এবং কলকাতা ফিরে আসার এক হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর এই বইতে। ১৯৪৬ সালের গণভোটের সময় করিমগঞ্জে গিয়ে সিলেটকে পাকিস্তানের অংশ করার জন্য ব্যাপক জনমত গড়ে তোলেন এবং নির্বাচনে তার সুফলও পান।

এর কিছুদিন পর বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের পতন হয়। মন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগকে আরও ভালোভাবে সংগঠিত করার দিকে মন দেন। আর এই প্রক্রিয়ায় শেখ মুজিব তাঁকে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করেন। বেকার হোস্টেলকে কেন্দ্র করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে মন দিলেন শেখ মুজিব। মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভায় সোহরাওয়ার্দী সমর্থকরাই জিতে গেলেন। এর পরপরই নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। তখন মুসলিম লীগ থেকে

নির্বাচনী প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য জেলায় জেলায় গিয়ে কাজ করার নির্দেশ এল। ফরিদপুরের ভার পড়ল শেখ মুজিবের ওপর। এতে স্থানীয় কোন্দল বেশ ভালোভাবেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। শহীদ সাহেবের মাদারিপুর হয়ে গোপালগঞ্জ সফরের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগ আরও চাঙ্গা হলো। কিন্তু শহীদ সাহেবের উদারতরার সুযোগে নবাবজাদা ও জমিদার শ্রেণির সুবিধাবাদী নেতারা নানা ধরনের দলীয় কোন্দলের ইন্ধন দিতে থাকে। শহীদ সাহেবের সাফল্যকে তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। বাঙালি মুসলমানের এই হীন দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ধারণা বেশ স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : 'আমাদের বাঙালির মধ্যে দুইটা দিক আছে। একটা হলো আমরা মুসলমান, আর একটা হলো আমরা বাঙালি। 'পরশ্রীকাতরতা' এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধহয় দুনিয়ার কোনো ভাষায়ই একথাটা পাওয়া যাবে না, 'পরশ্রীকাতরতা'। পরের শ্রী দেখে যে কাতর হয়, তাকে 'পরশ্রীকাতর' বলে। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষায়ই পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে 'পরশ্রীকাতরতা'। ভাই, ভাইয়ের উন্নতি হলে খুশি হয় না। এই জন্যই বাঙালি জাতির সকল রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সুজলা, সুফলা বাংলাদেশ সম্পদে ভর্তি। এমন উর্বর জমি দুনিয়ায় খুব অল্প দেশেই আছে। তবুও এরা গরিব। কারণ, যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দেশে। নিজেকে এরা চেনে না, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৪৭-৪৮)। বাঙালির চরিত্র বিষয়ে এই গভীর সত্য উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়েই শেখ মুজিব এই জাতির বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছিলেন। এ সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্যই তিনি উপরতলার মানুষগুলোর চেয়ে অতি সাধারণের মন জয় করার জন্য নিরন্তর কাজ করে গেছেন। মাটি ও মানুষ ঘেঁষা এই রাজনীতিক তাই সকলের ভরসার প্রতীক হতে পেরেছিলেন।

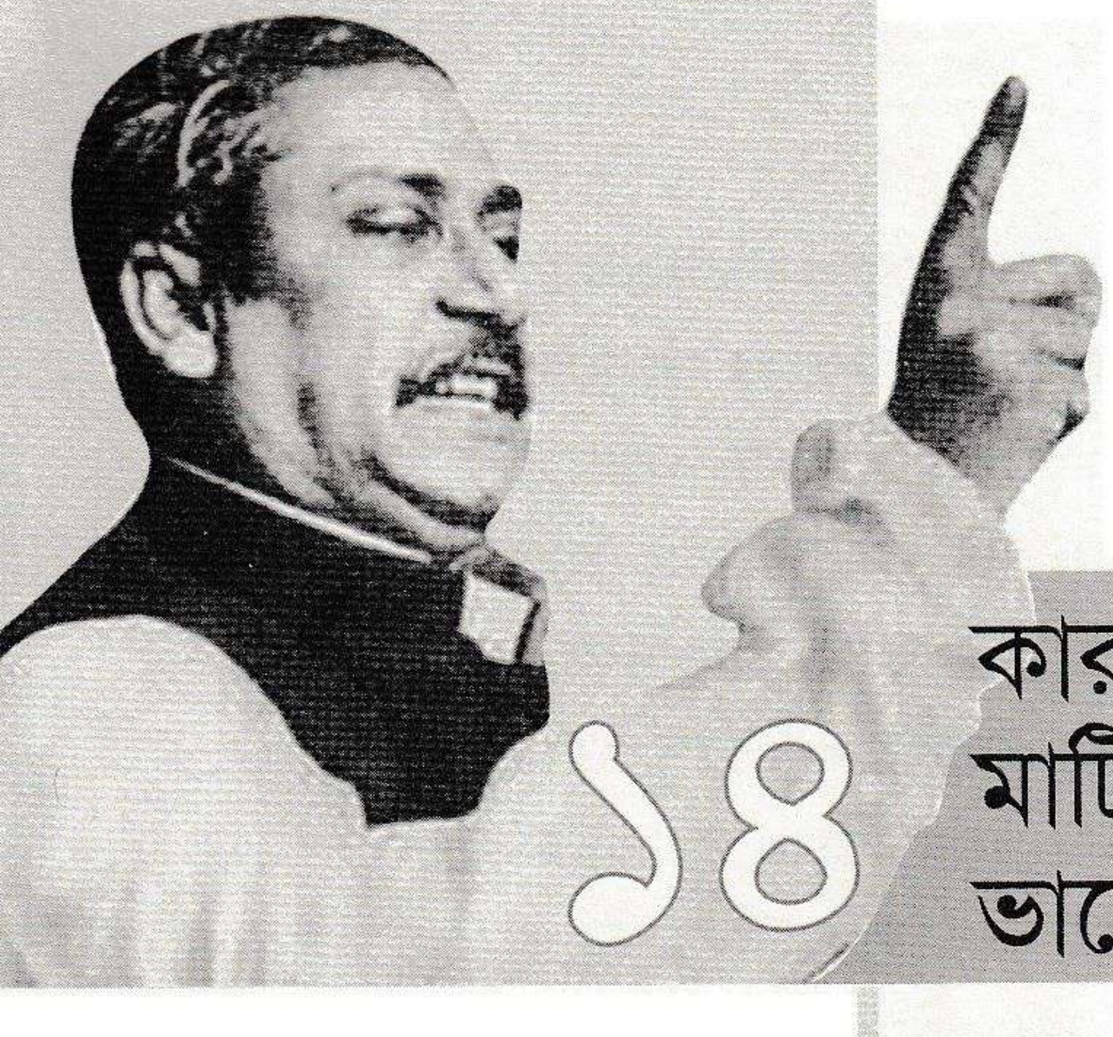
দেশভাগ হওয়ার সময় বাংলার উঁচুতলার মুসলিম লীগ নেতারা লিয়াকত আলী খানদের সাথে আপস করে কলকাতা, করিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ছেড়ে ঢাকাকে রাজধানী করার অভিপ্রায়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখলেন। আর সোহরাওয়ার্দী দিনরাত পরিশ্রম করছেন কলকাতা, বিহার, নোয়াখালির দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে। আরও বেশি সংখ্যায় রিফিউজি যাতে দুদেশেই পাড়ি না জমায় সেজন্য তিনি দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি দৃঢ় করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই কাজে শেখ মুজিবও তাঁর পাশে ছিলেন।

শেখ মুজিবও এক সময় কলকাতা ছেড়ে ঢাকা চলে এলেন। এসেই 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ' গড়ে তুললেন। এরপর পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ

প্রতিষ্ঠা করার কাজে তিনি হাত দিলেন। সমকালীন মুসলিম লীগ সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট ব্যাপক ছাত্রসমাজ এই ছাত্রলীগে শামিল হলো। ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগই শেষ পর্যন্ত বাঙালি তরুণদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এরাই প্রথম ধাপের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ শেখ মুজিব এজন্য গ্রেফতার হন। পরে মুক্তি পান। আবার গ্রেফতার হন। ফের মুক্তি পান। ছাত্র রাজনীতিকে পেছন থেকে অনুপ্রেরণা দিয়ে তিনি মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান, শামসুল হক এবং সর্বোপরি শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। সে সময়ের মুসলিম লীগ সরকারের বাংলা ভাষা ও বাঙালির স্বার্থ-বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে গিয়ে এই দলটি এক পর্যায়ে শুধুই পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ হিসেবে আবির্ভূত হয়।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনেরও নেপথ্যে নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিব। মওলানা ভাসানী, শামসুল হকের সাথে জেলে যান তিনি। বের হয়ে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার কাজে নেমে পড়েন। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও শুধু শেরে বাংলাকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠনে সম্মত হন শেখ মুজিব। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। তবুও হক সাহেবকেই পার্লামেন্টারি দলের নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী করতে রাজি হলেন শেখ মুজিব ও তাঁর গুরুদ্বয়। শেষ পর্যন্ত হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। কিন্তু টানাপড়েন শুরু হয়ে গেল যুক্তফ্রন্টে। আওয়ামী লীগ থেকে কেউ শপথ নিতে রাজি হলেন না। কেননা, হক সাহেব শুরুতে বড় মন্ত্রিসভা করতে রাজি ছিলেন না। অথবা তাঁকে সেরকম কুবুদ্ধি দেওয়া হয়েছিল। শেষপর্যন্ত শেখ মুজিব মন্ত্রিসভায় যোগদান করলেন। শপথ নিয়েই ছুটলেন নারায়ণগঞ্জের আদমজি পাট কলে। সেখানে, আমলারা বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়েছিল। অনেক কষ্টে দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে এনে মন্ত্রী হিসেবে কাজ শুরু করার কয়েক দিন পরেই হক সাহেব আতাউর রহমান খান ও তাঁকে নিয়ে করাচি গেলেন। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা হলো। ঐ সময় তিনি বুঝতে পারলেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে। সামরিক-বেসামরিক আমলাদের এই ষড়যন্ত্র অচিরেই স্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি করাচি থেকে ফিরেই জানতে পারলেন যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং ঐ মন্ত্রিসভার একমাত্র তাঁকেই গ্রেফতার করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পার্টির কাজে লেগে গেলেন। মওলানা ভাসানী ও শামসুল হক তখনও জেলে। সোহরাওয়ার্দী তখন দলকে সংগঠিত করতে সাহায্য করছেন। কিন্তু অচিরেই আবার শেখ মুজিবকে জেলে পাঠানো হলো। শহীদ সাহেব জুরিখ গেলেন চিকিৎসার জন্য। সুস্থ হয়ে ফিরে এসে দেশের অবস্থা না বুঝে আইনমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন। দলের ভেতরে এ নিয়ে অসন্তোষ। হক সাহেব সোহরাওয়ার্দীকে যুক্তফ্রন্টের কেউ নন বলায় পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ ধারণ করল। শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান ও আবুল মনসুর আহমেদ হক সাহেবের নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব আনার প্রস্তুতি নিলেন। 'কোথায় গেল একুশ দফা, আর কোথায় গেল জনতার রায়'—এ প্রশ্ন করেই *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* শেষ করেছেন লেখক। এরপরে পূর্ববাংলায় নেমে আসে নানা রাজনৈতিক কুটচাল। এক পর্যায়ে সামরিক-বেসামরিক আমলারা সামরিক শাসন জারি করে পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ করে। অনেক চড়াই উৎরাইয়ের পর আইয়ুব খান সামরিক শাসক হিসেবে পাকাপোক্তভাবে দেশ পরিচালনায় সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবকে ফের গ্রেফতার করা হয়। আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। ফের জেলে নেওয়া হয়। তদ্দিনে তিনি পূর্ববাংলার মানুষের নয়নের মণি হয়ে গেছেন। ১৯৬৬ সালে জেলে নেওয়ার পর দীর্ঘ দিন আর তিনি মুক্তি পাননি। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে তাঁকে বন্দী দেখানো হয়। সেই বন্দীশালা ভেঙেই জনগণ তাঁকে মুক্ত করে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ সময়ের বন্দীজীবনের কথা *কারাগারের রোজনামচায়* তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। সকল বিচারে বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও *কারাগারের রোজনামচা* বাঙালি জাতির আত্মবিকাশের অনবদ্য দুই দলিল।



১৪

কারাগারের রোজনামচা মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার দলিল

বঙ্গবন্ধুর লেখা *কারাগারের রোজনামচা* একনাগাড়েই পড়ে ফেলার মতো একটি বই। তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*ও একই ধাঁচের আরেকটি বই। অতি সহজে মনের কথা বলবার এবং লিখবার এক অভাবনীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। এ বইদুটো পড়েই আমার মনে হয়েছে রাজনৈতিক সাহিত্যিক হিসেবে বিশ্বজুড়ে তাঁর সুনাম চিরদিনই বহাল থাকবে। এই দুটো বইয়ের সম্পাদক তাঁরই সুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে তাঁর আরও কয়েকটি বই অচিরেই বের হবে। আরও সন্তুষ্টির কথা যে বইগুলোর ইংরেজি অনুবাদও বের হবে। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র ইংরেজি অনুবাদ এরই মধ্যে বের হয়েছে। সবকটা বই যখন বের হবে তখন বিশ্বমানের এক সাহিত্যিক হিসেবেও আমরা আমাদের জাতিসত্তার জনকের পরিচয় সর্বত্র গর্বের সাথে তুলে ধরতে সক্ষম হব। তাঁর লেখায় মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং স্বদেশ প্রেম যেভাবে এসেছে তা তাঁর মাটি ঘেঁষা রাজনীতিরই স্পষ্ট প্রতিফলন। আর সে কারণেই তিনি হতে পেরেছিলেন বাংলার বন্ধু—বঙ্গবন্ধু। জীবনের প্রধান অংশই তিনি যাপন করেছেন জেলে। প্রথম জেলে গিয়েছিলেন ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাইবার অপরাধে। এরপর থেকে নিত্য তাঁর যাওয়া-আসা। জেলের বাসিন্দাদের কাছে তিনি এক প্রিয় মুখ। কয়েদি,

'আগামীকাল ধর্মঘট। পূর্ববাংলায় জনগণকে আমি জানি, হরতাল তারা করবে। রাজবন্দীদের মুক্তি তারা চাইবে। ছয় দফা সমর্থন করবে।'

বঙ্গবন্ধুর লেখা কারগারের রোজনামচা

পাহারাদার, বন্দী পাগল, গাছ, পাখি, বিড়াল সকলেই তাঁর পরিচিত ও প্রিয়ভাজন। আলোচ্য বইটির ২৭ থেকে ৫৪ পাতা 'জেলের ভিতর অনেক ছোট ছোট জেল আছে' শিরোনামে লেখা। 'জেলে যারা যায় নাই, জেল যারা খাটে নাই–তারা জানে না জেল কি জিনিস'। এই শব্দগুচ্ছ দিয়ে শুরু করা জেলের ভেতরের ২৭ পৃষ্ঠার এই বিবরণই প্রমাণ করে তিনি কতটা মানবিক ছিলেন। জেলের ভেতরে যে একসাথে থাকা যায় না, এর ভেতরে যে আরও ছোট ছোট জেল আছে, জেল যে 'আলাদা এক দুনিয়া' তা এই বই না পড়লে আমার মতো অনেকের কাছে তা অজানাই থেকে যেত। এই 'রোজনামচা' পড়েই জানতে পারি যে ১৯৬৬ সাল নাগাদ তিনি পাঁচবার জেলে গেছেন। এমনকি হাজতি হিসেবেও তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে। কত রকম জেল, কত রকম বন্দী মানুষ, কী তাদের কষ্ট তা এই বই পড়লে জানা যায়। হাজতিরা, রাজবন্দীরা কিভাবে আলাদা আলাদাভাবে থাকেন, সেল এরিয়া কাকে বলে এসব কথা এই বই পড়েই জানতে পারলাম। বারে বারে কয়েদির গুনতি দিতে হয়, লাইন বেঁধে বসিয়ে তাদের গণনা করা হয়। এক সেলে একজন, তিনজন, চার, পাঁচ বা তারও বেশি জনকে বন্ধ করে রাখা হয়। কিন্তু দুজনকে এক সেলে রাখা হয় না। জেলের ভেতরে হাসপাতাল, ডাক্তার সবই আছে। জেলে কাজ করতে হয়। যারা লেখাপড়া জানে তাদের রাইটারের কাজ দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর কেউ বাইরে থাকতে পারে না। সাজার সময় ভেদে কয়েদিদের প্রমোশনও দেওয়া হয়। পাহারাদার, মেট হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। নাইট গার্ডদেরও রকম ফের আছে। তাদের ক্ষমতারও হেরফের আছে। কয়েদিদের একজন আরেকজনকে কাজ বুঝিয়ে দিতে হয়, কাজ বুঝে নিতে হয়। কয়েদির চিঠি জেলের কর্মকর্তারা পড়ে তবেই পাঠানো হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের চিঠি কাটাকুটি করা হয়। কালি ঢেলে অস্পষ্ট করা হয়।

তাছাড়া, জেলের ভেতরে রয়েছে নানা শব্দভাণ্ডার যা শুধু সেখানেই প্রচলিত। অনেকদিন জেলে থাকলেই কেবল এসব শব্দের মর্মার্থ বোঝা সম্ভব। কয়েদিরা তাদের মতো করে ইংরেজি শব্দের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। 'থালা বাটি কম্বল জেলাখানার সম্বল' শিরোনামে এই লেখাটিতে অদ্ভুত সব শব্দভাণ্ডারের পরিচয় পাই। কেস ফাইল বা কেস টেবিল হয়ে যায় 'কেসটাকোল, 'রাইটার দফা'। 'চৌকি দফা', 'জলভরি দফা', 'ঝাড়ু দফা', 'বন্দুক দফা', 'পাগল দফা', 'শয়তানের কল', 'দরজি খাতা', 'মুচি খাতা'–এমন সব শব্দকোষ ব্যাখ্যাসহ তিনি এই বইতে অত্যন্ত যত্নসহকারে লিখেছেন। জেলের ভেতরের এই অজানা কথাগুলো আমরা কোনো দিনই জানতে পারতাম না এই বইটি না বের হলে। শুধু কি শব্দকোষ? এই শব্দকোষ তৈরি করেছে যেসব জেলের অধিবাসী তাদের

কথাও রয়েছে এই বইতে। তিনি তাদের কথা লিখেছেন দরদ দিয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি তাঁর সাথে যুক্ত থাকা বা আশপাশের কয়েদিদের দুঃখ-ভরা জীবনের কাহিনি শুনতেন। তাদের সেসব কথাও স্থান পেয়েছে এই বইতে। মনে হয় এরা তাঁর কতই-না আপন জন। উদাহরণ হিসেবে 'লুদু'র কথা বলা যায়। ১৯৫০ সালে যখন জেলে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধুর তখন পরিচয় হয় লুদু ওরফে লুৎফর রহমানের সঙ্গে। ১৯৫৪ ও ১৯৫৮ সালেও তাকে তিনি দেখেছেন জেলে। ১৯৬৬তেও এসে পান তাকে। তার গল্প তিনি লিখেছেন অসীম মমতায়। চুরি ও পকেটমারাকে কেন পেশা হিসেবে নিয়ছিল লুদু? তার বাবার সাত বিয়ে ও নানা বদভ্যাসের ফসল লুদু। নানাবাড়ির পাশের বাড়ির গোপাল নামের এক যুবকের কাছে তাঁর চুরিবিদ্যায় হাতেখড়ি। এরপর একা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল লুদু। থানার পুলিশ ও দারোগার সাথে 'দেখা-সাক্ষাৎ করে' কী করে আরও বড় পকেটমার হয়ে উঠল সে কাহিনি বঙ্গবন্ধুর বইতে ফুটে উঠেছে। এরপর জিআরপি, সিআইডিসহ পুলিশের নানান পর্যায়ে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'বন্দোবস্ত' করতে পারেনি এমন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ফের লুদু জেলে। জেলের ভেতরেও রয়েছে অপরাধ জগৎ। সেই জগতেরও পাকা সদস্য লুদু। গলায় 'খোকড়' কেটে জেলখানা থেকে বের হয়ে নানা জায়গায় পকেটমারি করে। ফের ধরা পড়ে। মাঝখানে বের হয়ে বিয়েও করেছে লুদু। তার স্ত্রীর জন্য খুব দরদ অনুভব করে লুদু। একটা ছেলে ছিল। সেও মারা গেছে। লুদুর চিন্তা কী করে বাঁচবে তার স্ত্রী। 'জীবনের উপর একটা ধিক্কার এসেছে' লুদুর। এইভাবে একেবারে সাধারণ এক অপরাধীর কষ্টের কথা সযত্নে তুলে এনেছেন বঙ্গবন্ধু তাঁর লেখায়।

এরপর নিয়মিত ডায়েরি। ২রা জুন ১৯৬৬। বৃহস্পতিবার। প্রায় প্রতিদিনই তিনি লিখেছেন জেলের জীবন নিয়ে। প্রায় সব দিনের লেখাতেই রাজনৈতিক সহকর্মী ও কর্মীদের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা, দরদ ও ভালোবাসা ফুটে উঠেছে। ৭ জুনের হরতালকে বানচাল করার জন্য তাঁদের যেভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে তাতে তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ। বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের বাড়াবাড়ি বিষয়ে তিনি বিস্তর লিখেছেন। আর লিখেছেন সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের আপসকামীতার কথা। তবে ছয়-দফার প্রশ্নে তিনি যে আপসহীন সে কথা বলতে ভোলেননি। 'এত জনপ্রিয় সরকার তাহলে গ্রেফতার শুরু করেছেন কেন!'–এমন বিস্ময় তাঁর মুখেই সাজে। কাকে কাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই খবর জানার জন্য তিনি উতলা ছিলেন। সত্যি কথা বলতে তিনি কখনো দ্বিধা করতেন না। মওলানা ভাসানীকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ছয় দফা নিয়ে তাঁর মন্তব্যে বঙ্গবন্ধু বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাই লিখেছেন,

'মওলানা সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানে যেয়ে এক কথা বলেন, আর পূর্ব-বাংলায় এসে অন্য কথা বলেন। যে লোকের যে মতবাদ সেই লোকের কাছে সেইভাবেই কথা বলেন। আমার চেয়ে কেউ তাঁকে বেশি জানে না।' এ কথা বলেই তিনি রাজনীতির মূলনীতি বিষয়ে মুখ খুলেছেন। 'তবে রাজনীতি করতে হলে নীতি থাকতে হয়। সত্য কথা বলার সাহস থাকতে হয়। বুকে আর মুখে আলাদা না হওয়াই উচিত।' বুকে মুখে এক কথা বলতেন বলেই পাকিস্তানি রাষ্ট্র তাঁকে একদণ্ডের জন্যও স্বস্তি দেয়নি। কারারক্ষীদের অনেকেই বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই তারা তাঁর খোঁজ নিতেন। প্রয়োজনীয় তথ্য দিতেন। ঐ সময়টায় যে প্রচুর 'শেখ সাহেবের লোক' জেলে ঢুকছে সে তথ্য তিনি এদের কাছ থেকেই পান। আর এ তথ্য পেয়ে তিনি অস্থির হয়ে যান।

'আজ আর লেখাপড়ায় মন দিতে পারছি না। কি হবে বাইরে, কর্মীদের কি অবস্থা, অত্যাচার ও গ্রেপ্তার সমানে চলছে, আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর। দিনভরই ছটফট করতে লাগলাম, কাগজ কখন পাব?' এই ছটফটানি তাঁর শেষ হওয়ার নয়। তাঁর সহকর্মীদের ডিভিশন দেওয়া হচ্ছে না, তার কর্মীদের ভালোভাবে খাবার দাবার দেওয়া হচ্ছে না। তাই তাঁর উদ্বেগের কোনো শেষ নেই। যারা তাঁর কথা ভাবেন, তার জন্য দোয়া করেন তাদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'দুঃখ হয়, এদের কোনো কাজেই বোধ হয় আমি লাগব না। ... একথা সত্য, যখন আমি জেল অফিসে যাই তখন কয়েদিদের সাথে দেখা হলে, জেল অফিসারদের সামনেই আমাকে সালাম দিতে থাকে। যারা দূরে থাকে তারাও এগিয়ে আসে। বুড়া বুড়া দু-একজন বলেই ফেলে, 'বাবা আপনাকে আমরা দোয়া করি।' জেলের রান্না ভাত খেতে কষ্ট হয়। তবু খেতে হয়। শুধু বাঁচার জন্য। তা সত্ত্বেও তাঁর উদ্বেগ, 'যারা এই দুদিনে জেলে এসেছে, তাদের ডিভিশন দেয় নাই, কিভাবে কোথায় রেখেছে–জানার উপায় নেই।'

এরই মধ্যে ঝাড়ুদার এক কয়েদি নাছোড়বান্দা। 'আমাকে আপনি ছেড়ে দিন, আপনি বললেই জেল থেকে বের করে দিবে।' তার এ কথার উত্তরে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি তো তোমার মতো একজন কয়েদি, আমার ক্ষমতা থাকলেই আমিও-বা জেলে আসব কেন?' সে বলে, 'আপনি কলম মাইরা দিলেই কাজ হয়ে যায়।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কলম আছে, কিন্তু মাইরা দিবার ক্ষমতা নাই।' তাদের সকলের বিশ্বাস তিনি বললেই হবে। এই যে মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতি মানুষের বিশ্বাস, তা তো একদিনে হয়নি। আজীবন তিনি যে তাদের পাশেই ছিলেন। সকল অর্থেই যে তিনি হতে পেরেছিলেন 'তাদের লোক'। বাবুর্চির রান্না ভালো হয় না বলে নিজেই রান্না করতে নেমে যান। পাইলসের অসুখটা ফের দেখা দিয়েছে। জেলের খাবারে তার ঐ অসুখ

আরও বেড়েছে। কিন্তু পরিবার, বিশেষ করে, স্ত্রী রেনুকে জানানো যাবে না। তারা দুশ্চিন্তা করবেন।

ইত্তেফাক ও তার মালিক-সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে নিয়ে তাঁর চিন্তার শেষ নেই। *ইত্তেফাক* তাঁর এবং তাঁর দলের কথা বলত। মানিক মিয়া বঙ্গবন্ধুর বড়ভাইয়ের মতো। তাই ইত্তেফাকের ওপর সরকারের চাপাচাপিতে তিনি খুবই বিক্ষুব্ধ। বন্ধু শহীদুল্লাহ্ কায়সারের *সংশপ্তক* বইটি পড়ে তাঁর খুব ভালো লেগেছে। ঐ বই পড়তে পড়তেই লিখেছেন, 'বেপরোয়া গ্রেফতারের পরেও ভেঙে পড়ে নাই দেখে ভালোই লাগছে। রাজনৈতিক কর্মীদের জেল খাটতে কষ্ট হয় না যদি বাইরে আন্দোলন থাকে।' রাজনীতি আর জীবন এভাবেই এক 'অর্গানিক' সম্বন্ধে বাঁধা পড়ে যায় সন্ধ্যেবেলা তাঁর ঘর বন্ধ করে দেয়। পরের দিন পাশেই রাখা পাগলদের গোসল করানোর কথা লিখেছেন। পাগলদের সাথে যে নিষ্ঠুর আচরণ করা হয় তাতে তিনি খুবই আহত। যদিও পাগলদের চিৎকারে প্রায়ই তিনি ঘুমুতে পারেন না, তবু তাদের জন্য রয়েছে তাঁর দরদি মন। সুযোগ পেলেই তাদের সাথে কথা বলেন, তাদের জন্য কিছু করতে চেষ্টা করেন। খাবার পাঠান।

৬ জুনে ডায়েরির পাতায় তিনি লিখেছেন, 'আগামীকাল ধর্মঘট। পূর্ববাংলায় জনগণকে আমি জানি, হরতাল তারা করবে। রাজবন্দীদের মুক্তি তারা চাইবে। ছয় দফা সমর্থন করবে।' মানুষের সমর্থন তাঁর প্রতি রয়েছে বলেই তিনি এই নিঃসঙ্গ জেলজীবন হাসিমুখেই বরণ করে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর মনের অবস্থা বোঝাতে এভাবে লিখেছেন, 'আমি একা থাকি, আমার সাথে কাউকে মিশতে দেওয়া হয় না। একাকী সময় কাটানো যে কত কষ্টকর তাহা যাহারা ভুক্তভোগী নন বুঝতে পারবেন না। আমার নিজের উপর বিশ্বাস আছে, সহ্য করার শক্তি খোদা আমাকে দিয়েছেন। ভাবি শুধু আমার সহকর্মীদের কথা। এক একজনকে আলাদা আলাদা জেলে নিয়ে কিভাবে রেখেছে? ত্যাগ বৃথা যাবে না, যায় নাই কোনো দিন। নিজে ভোগ নাও করতে পারি, দেখে নাও যেতে পারি, তবে ভবিষ্যৎ বংশধররা আজাদি ভোগ করতে পারবে। ... জয়ী আমরা হবই। ত্যাগের মাধ্যমে আদর্শের জয় হয়।' ভয়কে জয় করার জন্যই কবিগুরুর কাছে ফিরে যেতেন। গুনগুনিয়ে উঠতেন, 'বিপদে মোরে রক্ষা করো/এ নহে মোর প্রার্থনা,/বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

এর পরের দিন ৭ জুন। হরতালের দিন। বাইরে কী হচ্ছে কে জানে। সর্বক্ষণ ছটফট করছেন তিনি। লিখেছেন, 'বন্দী আমি, জনগণের মঙ্গল কামনা ছাড়া আর কি করতে পারি! ... গুলি ও মৃত্যুর খবর পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। শুধু পাইপই টানছি। ...কি হবে? কি হতেছে? দেশকে এরা কোথায় নিয়ে

যাবে, নানা ভাবনায় মনটা আমার অস্থির হয়ে রয়েছে। এমনিভাবে দিন শেষ হয়ে এল। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা জেলে আছি। তবুও কর্মীরা, ছাত্ররা ও শ্রমিকরা যে আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে, তাদের জন্য ভালোবাসা দেয়া ছাড়া আমার দেবার কিছুই নাই। মনে শক্তি ফিরে এল এবং দিব্যচোখে দেখতে পেলাম 'জয় আমাদের অবধারিত'। কোনো শক্তি আর দমাতে পারবে না।' রাতে আর ঘুম আসে না। শুধুই চিন্তা। এর পরের দিন (৮ জুন) ডায়েরির পাতাজুড়ে রয়েছে গ্রেপ্তার করা কর্মীদের বিবরণ। 'কারও পায়ে জখম, কারও কপাল কেটে গিয়েছে, কারও হাত ভাঙ্গা, এদের চিকিৎসা বা ঔধধ দেয়ার কোনো দরকার মনে করে নাই কর্তৃপক্ষ।' দিনভরই জেলভর্তি করা হচ্ছিল। কিছু স্কুলের ছাত্রও তাদের মধ্যে ছিল। কেউ কেউ এদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছিল। তাই বাধ্য হয়ে তিনি জেল কর্তৃপক্ষকে জানালেন, 'অত্যাচার বন্ধ করুন। তা না হলে ভীষণ গোলমাল হতে পারে।' ঐ দিন বিরাট করে ডায়েরি লিখেছেন তিনি। ছয় দফা যে বৃথা যাবে না সে কথা জোর দিয়ে বলেছেন। 'যে রক্ত আজ আমার দেশের ভাইদের বুক থেকে বেরিয়ে ঢাকার পিচঢালা কাল রাস্তা লাল করল, সে রক্ত বৃথা যেতে পারে না।' সারা দিন তিনি পাগলের মতো ঘরে বাইরে করছিলেন। ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরে এনেছে। জানালা দিয়ে চিৎকার করে ডেকে বলছিলেন, 'জমাদার সাহেব এদের খাবার বন্দোবস্ত করে দিবেন। বোধ হয় দুই দিন না খাওয়া।' এরপরের পাতাগুলোও এমন মানবিক আবেদন ও ছটফটানিতে ভর্তি। মানুষকে কতটা ভালোবাসলে কারাবন্দি এক নেতা দেশবাসীর জন্য এমন করে দুঃখ পেতে পারেন তা পাঠকই বিবেচনা করবেন। এই স্বল্প পরিসরে তাঁর মানবিকতার বিবরণ সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা আমার জন্য সত্যি অসাধ্য।

এরপর রয়েছে মায়ের অসুখের কথা। তাঁর জন্য গভীর কষ্টের কথা। জেলে জেলে ঘুরছেন। মাকে দেখতে পারছেন না। মা বাবার ছোট্ট 'খোকা'র সে যে কী আকুতি তা পড়ে চোখ ভিজে আসে। এসব কথা সম্পাদনার সাথে যুক্ত তাঁর কন্যাদেরও চোখের পানি ছল ছল করে বয়ে গেছে। টাইপ করেছে যে মেয়েটি তার চোখের জলে ভিজে গেছে কম্পিউটারের কীবোর্ড। একদিকে মায়ের অসুখ, অন্যদিকে অনেক কর্মী জেলে, অনেকেই আহত নিহত। তিনি অস্থির। ট্রেন দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু, সিলেটের বন্যায় মানুষের কষ্ট–সবই তাঁকে উতলা করে তোলে। তাঁর কিছুই ভালো লাগে না। তবুও অর্থমন্ত্রী শোয়েবের বাজেট বিবরণ ঠিকই তুলে ধরেছেন। ঐ বাজেটে যে বাঙালির হিস্যা খুবই সামান্য সে কথা অঙ্ক কষে বের করেছেন জেলে বসে। কর ধার্য বেশি করায় জনগণের কি কষ্ট হবে সে কথা ভেবেই তিনি উদ্বিগ্ন। পাশাপাশি, পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী এম এন

হুদার বাজেট নিয়েও তাঁর মন্তব্য রয়েছে। বিশেষ করে, ছয়-দফার বিরুদ্ধে বলায় তাঁকে এক চোট নিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। এরপর পরিবারের কথা লিখেছেন। ছেলেমেয়েরা ও স্ত্রী তাঁকে দেখতে আসেন। বড় দুটো ছেলেমেয়ে বুঝলেও ছোট দুটো তো বোঝে না। তারা বাবাকে ছেড়ে ফিরতে চায় না। তাই বাচ্চাদের সাথে সাক্ষাতের পর তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। বাবা-মার দেখা পান না বলে তাঁর মন আরও ভারাক্রান্ত।

ইত্তেফাকের সম্পাদক মানিক ভাইয়ের গ্রেফতারে তিনি দারুণ উদ্বিগ্ন। তিনি সত্য কথা বলেন বলে তাঁকে জেলে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি কিভাবে জেলের এই জুলুম সহ্য করবেন সেই চিন্তাতেই তাঁর ঘুম আসে না। কয়েক দিন ধরে *ইত্তেফাক* ও মানিক মিয়াকে নিয়ে কত কথাই না তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন। *সংবাদের* কথাও বারকয়েক এসেছে। এসেছে ন্যাপের কারাবন্দী নেতাদের সাথে জেলে দেখা হওয়ার কথা। ভিন্ন দলের হলেও তাদের জন্য তাঁর দরদ কম নয়। যেসব কর্মী জেলে থেকে পরীক্ষা দিচ্ছিল তাদের জন্যও তাঁর উৎকণ্ঠার শেষ নেই।

এছাড়া জেলে বন্দিরা তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান, তাদের তিনি খিচুড়ি রান্না করে খাওয়ান, মেটসহ কয়েদিদের ভালো মন্দ খাবারের ভাগ দেন, পাশের গাছে দুটো হলুদ পাখি, বারান্দায় কবুতরের বাচ্চাটির বেড়ে ওঠা, একটি মুরগির মৃত্যু যন্ত্রণা–সব কিছুই তাঁর দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শুধু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না তাঁর নিজের জীবন। এই ডায়েরির পাতায় পাতায় জায়গা পেয়েছে রাজনৈতিক সহকর্মী, কর্মী এবং সাধারণ কয়েদিদের কথা। আর জায়গা পেয়েছে স্বদেশের মুক্তি চিন্তা। এর মাঝেই আচমকা তাঁকে আসামি করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়। নিয়ে যাওয়া হয় কুর্মিটোলায়। সামরিক আদালতে বিচার শুরু হবে। সর্বক্ষণ পাহারা। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। নিঃসঙ্গ। টানটান উত্তেজনা। সারা পূর্ববাংলায় চলছে আন্দোলন। এক পর্যায়ে, ১৯৬৯ সালে ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে মুক্তি পান শেখ মুজিব। তাদের ভালোবাসায় হয়ে ওঠেন 'বঙ্গবন্ধু'। মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না বলেই এমন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে পেরেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের দিকে। ডাক দিতে পেরেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের। তিনিই প্রকৃত বীর যিনি মৃত্যুকে ভয় পান না। বারেবারে তিনি মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বীরের বেশে জেল থেকে বের হয়ে এসেছেন।

মাটি ও মানুষের প্রতি নির্ভেজাল ভালোবাসার দলিল এই রোজনামচা। তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার তত্ত্বাবধানে শেষ পর্যন্ত যে বইটি বাংলা একাডেমি প্রকাশ

করেছে তাঁর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। যুগে যুগে তাঁর এই ত্যাগের কথা, মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা আমাদের দেশে এবং সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। বইটির সম্পাদনায় প্রচুর মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে। সংযোজনীতে ছয় দফা, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, টীকা, নির্ঘণ্ট বইটির সম্পাদনায় পেশাদারিত্ব ও আধুনিকতা স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের দিন বলেছেন যে, এই বইয়ের পাতায় পাতায় সাধারণ মানুষের দুঃখ ও গ্লানি ঘোচানোর যে আকুতি রয়েছে তার আলোকেই তিনি স্বদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। গরিব-দুঃখী মানুষের মঙ্গল চিন্তাই হবে তাঁর সকল নীতির মূল কথা। সেটাই স্বাভাবিক। মানুষকে যে বঙ্গবন্ধু কতটা ভালোবাসতেন তা এই বই পড়ে যেমন বোঝা যায়, তেমনি তাঁর ভাষণগুলো পড়লেও অনুভব করা যায়। আমি অন্যত্র তাঁর জীবন ও ভাষণগুলো নিয়ে গবেষণা করেছি। সেই বইতে (আতিউর রহমান, *শেখ মুজিব : বাংলাদেশের আরেক নাম*) বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী শাহরিয়ার ইকবালের সৌজন্যে অন্য আরেকটি ডায়েরির ইংরেজিতে লেখা একটি পাতা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পাচ্ছি না। 'As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bengalee, I am deeply involved in all that concerns Bengalees. This abiding involvement is born of and nourished by love, enduring love, which gives meaning to my politics and to my very being.'

রাজনীতির এই অমর কবি অক্ষরে অক্ষরে তাঁর কথা রেখেছেন। মানুষকে চিরদিনের ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে ঘুমিয়ে আছেন তিনি বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলজুড়ে।



১৫

গুণীজনদের দৃষ্টিতে বহুমাত্রিক বঙ্গবন্ধু

যে যা বলুক না কেন, আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, আমি আপনাদের ধোঁকা দিতে পারব না। কারণ আমি গদির জন্য রাজনীতি করিনি। আমি মরবার জন্য রাজনীতি করেছিলাম।

—বঙ্গবন্ধু; রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দান, ৯ মে, ১৯৭২

দীর্ঘ সময় ধরে জাতির পিতার জন্মদিনে জাতীয় কোনো অনুষ্ঠান চোখে পড়েনি। সামাজিক অনুষ্ঠানও খুব বেশি হয়নি। শিক্ষায়তনেও তেমন উচ্চবাচ্য কানে বাজেনি। সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোও ছিল নিশ্চুপ। অবশ্য আওয়ামী লীগ দিনটিকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করেছে। কিন্তু তিনি তো শুধুই একটি বিশেষ দলের নেতা ছিলেন না। সমগ্র জাতির মুক্তির জন্যই তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত জীবনও দিয়েছেন। তবুও কেন আমরা তাঁকে জাতীয়ভাবে জন্মদিনের শ্রদ্ধা জানাতে পারিনি? গান্ধী বা মাওকে নিয়ে তো এমন জাতীয় অবহেলা চোখে পড়ে না। জাতি হিসেবে তাহলে কি আমরা এতটাই ক্ষুদ্রমনা হয়ে গিয়েছিলাম যে ইতিহাসের এই মহানায়কের অবদানকে আমলেই নিতে চাইনি? আমরা কি শেষ পর্যন্ত একটি ঐতিহ্যবিহীন উন্মুল জাতি হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিতে যাচ্ছিলাম? তা না হলে যার জন্ম না হলে হয়তো 'বাংলাদেশ' নামের রাষ্ট্রটিই সৃষ্টি হতো না–তাঁকে এমন উপেক্ষা করেছি কেন? বিশ্বায়নের সুযোগ নিয়ে নিশ্চয় আমরা আধুনিক হতে চাই। উন্নত অবকাঠামো ও প্রযুক্তির প্রসার চাই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা ইতিহাস ও শিকড়বিহীন এক দুর্ভাগা জাতির পরিচয় দিতে আগ্রহী। ইতিহাস আমাদের চলার

পথে এক গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারত। কিন্তু আমাদেরই অপরিণামদর্শিতার কারণে ইতিহাসই বাঙালির সবচেয়ে দুঃখের কারণ হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসের অমোঘ সত্যকে বিতর্কিত করে আমরা আমাদের নবীন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করেছি। তাদের আমরা সমৃদ্ধ অতীত অর্জনের অংশীদার হতে দিইনি। আশা করা যায়, পরিবর্তিত এই সময়ে তরুণ প্রজন্ম ঠিকই তাঁকে খুঁজে নেবে। কেননা, তিনিই যে আমাদের মহত্তম অহংকারের উৎস।

পঞ্চাশোর্ধ্ব আমরা সকলেই স্বচক্ষে দেখেছি বাঙালির ইতিহাসের উজ্জ্বলতম দিনগুলো। আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সেসব দিনের নিয়ন্ত্রণ ছিল একজনেরই হাতে। ধীরে ধীরে একটি জাতির বেড়ে ওঠার চূড়ান্ত পর্বের পরিচালক শেখ মুজিব নিজগুণেই হয়েছেন 'বঙ্গবন্ধু'। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বক্ষণ নিবেদিতপ্রাণ এই মহান নেতাকে সাধারণ মানুষ যেমন আজও গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন তেমনি দেশ-বিদেশের অনেক গুণীজনও তাঁর বহুমাত্রিক অবদানকে বিপুলভাবে মূল্যায়ন করে থাকেন। তাঁকে নিয়ে যত কবিতা এদেশের ও বিদেশের কবিরা লিখেছেন তেমনটি অন্য কারও ভাগ্যে জুটেছে বলে আমার জানা নেই।

একইভাবে দেশ-বিদেশের উঁচু মাপের বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধাঞ্জলিতেও তিনি প্রতিনিয়ত সিক্ত হয়েছেন এবং আজও হচ্ছেন। যত দিন যাচ্ছে তাঁর অবদান ও মহিমা ক্রমশ তত বেশি স্পষ্ট হচ্ছে এবং তাঁর আসন মানুষের হৃদয়ে চিরস্থায়ী রূপ নিচ্ছে। কত আঙ্গিক থেকেই না তাঁকে দেখা সম্ভব। অস্ট্রিয়া-প্রবাসী এম. নজরুল ইসলামের অক্লান্ত পরিশ্রমের কল্যাণে আমরা *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে* গ্রন্থের দুটো পর্ব পেয়েছি। তৃতীয় পর্বের কাজ এখনো চলছে। দেশ ও বিদেশের নানা গুণীজনের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু কেমন ছিলেন তার একটা আভাস মেলে এই গ্রন্থে। এই প্রবন্ধে আমার পছন্দের ১৬ জন বুদ্ধিজীবী ও মানবতাবাদীর দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর নানামাত্রিক মূল্যায়নের খানিকটা পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি। বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান নোবেল-বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালির বন্ধু ও অধিনায়ক ছিলেন না, 'তিনি ছিলেন মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও মহানেতা। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর উৎসাহ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সভ্যতা, সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা, সব মানুষের মানবাধিকারের স্বীকৃতি। তাঁর সাবলীল চিন্তাধারার সঠিক মূল্য শুধু বাংলাদেশ নয়, সমস্ত পৃথিবীও স্বীকার করবে এ আশা আমাদের আছে এবং থাকবে।' ('মুখবন্ধ', এম. নজরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ*, ১ম খণ্ড, ২০০৭, পৃ. ১৯)। 'স্বাধীনতা' শব্দটির নানা মাত্রার কথা অমর্ত্য সেন তাঁর নানা

লেখায় এনেছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়াও যে এর অন্যান্য গভীর ব্যঞ্জনা রয়েছে–সে কথা তিনিই সুশৃঙ্খলভাবে তাঁর Development as Freedom বইতে তুলে ধরেছেন। সেই তাত্ত্বিক কাঠামোর এক সুন্দর প্রয়োগ তিনি করেছেন বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও চেতনার বিশ্লেষণ করার সময়। বিশেষ করে, অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া যে অন্য কোনো মুক্তি অর্থহীন সে বিষয়টি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনাকে যথার্থ বলে মনে করেন অমর্ত্য সেন।

ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম দিকপাল প্রবীণতম সিপিএম নেতা এবং আরেক উজ্জ্বল বাঙালি জ্যোতি বসু মনে করেন বঙ্গবন্ধু ছিলেন 'অবিসংবাদিত নেতা'। তাঁর ভাষায়, 'তখনো বাংলাদেশ হয়নি। পূর্ব-পাকিস্তান বলা হতো। তখন সেখানে খুবই অত্যাচার চলেছিল। গণতন্ত্র বলে কিছুই ছিল না। পূর্ব-পাকিস্তানকে একটা কলোনির মতো মনে করত পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা। বাংলা ভাষাকেও ওরা মর্যাদা, সম্মান কিছুই দিত না। এসবের বিরুদ্ধেই মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেক মৃত্যুর বিনিময়ে অবশেষে সেখানে স্বাধীনতা আসে এবং পূর্ব-পাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নামে ভূষিত হয়। ... উনি যে অবিসংবাদী নেতা এবং বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছিলেন এটা সকলেই স্বীকার করেন নিয়েছিলেন।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮)

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মানুষ বঙ্গবন্ধুর আন্তরিকতায় অভিভূত। তিনি লিখেছেন, 'গোটা বাংলাদেশটাই তো শেখ মুজিবের নিজের বাড়ি, তবু নিজের জেলার প্রতি বোধহয় তাঁর কিছুটা বেশি টান ছিল। 'আপনারা তো আমার দেশের লোক' বলে তিনি দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন আমাদের। সেই উষ্ণ আলিঙ্গনে আমরা অভিভূত। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কোন গ্রামে আমাদের বাড়ি, এখনো কেউ আছে কিনা ইত্যাদি। ... তিনি আমাদের সঙ্গে এমন সহজ-সরল ব্যবহার করলেন, যেন কত দিনের চেনা। কোথায় গেল সে ১৫ মিনিটের গণ্ডি, ছাড়িয়ে গেল ৪৫ মিনিটে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০)

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (১৯৭৪) মানবাধিকার আন্দোলনের পুরোধা শন্ ম্যাকব্রাইড্ (Sean Mack Bride) জানতেন বঙ্গবন্ধুকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এক মহান নেতা হিসেবে। সর্বদাই তিনি ছিলেন সাম্য তথা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সমর্থক। শুধু ভৌগোলিক স্বাধীনতা যে অর্থহীন সে কথা বঙ্গবন্ধু খুব ভালো করেই জানতেন। তাঁর ভাষায়, 'Bangabandhu had realised that obtaining of national freedom meant nothing unless it also involved freedom for the people—freedom to live, freedom not

to starve, but to earn a living and to share the wealth with others. So, he was fundamentally a socialist, while at the same time an ardent nationalist, because he realised the importance of protecting and saving the culture of Bengal. He also was determined that the state that he had created, should be a secular state. Obviously, theocratic state of a dictatorship would not show justice or allow freedom to the people of Bengal. So he fought a struggle always to try and establish his four principles in your country.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬১)

জগণকে ছাড়া গণবিপ্লব ছাড়া বিপ্লব হয় না। রাতের অন্ধকারে গুলি মাইরা কোনদিন বিপ্লব হয় নাই। পড় সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস, পড় আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাস। দেখ সেখানে কি হয়েছে। দেখ আমাদের সাবকন্টিনেন্টে কি হয়েছে। পড়, জান, শেখ, বোঝ। তারপর বিপ্লবের কথা বল। বিপ্লব রাতের অন্ধকারে গুলি কইরা, টেরোরিজম কইরা হয় না।।

(—বঙ্গবন্ধু; আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭৪)

শুধু বিদেশের গুণীজন কেন, স্বদেশের লেখক-বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতেও বঙ্গবন্ধুর অবস্থান সুউচ্চ। বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা, সুলেখক বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বঙ্গবন্ধুর নানা গুণের পাশাপাশি উপস্থিত বুদ্ধিরও দারুণ প্রশংসা করেছেন। উল্লিখিত স্মারকগ্রন্থে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে কিছু কথা' প্রবন্ধে লিখেছেন যে তাঁর 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও ছিল বিস্ময়কর'। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭)। তিনি আরও লিখেছেন, 'নাইজেরিয়ার জেনারেল ইয়াকুব গাওয়ান যখন বললেন, 'অবিভক্ত পাকিস্তান একটি শক্তিশালী দেশ, কেন আপনি দেশটাকে ভেঙে দিতে গেলেন।' উত্তরে শেখ মুজিব বললেন, 'শুনুন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। আপনার কথাই হয়তো ঠিক। অবিভক্ত পাকিস্তান হয়তো শক্তিশালী ছিল। তার চেয়েও শক্তিশালী হয়তো হতো অবিভক্ত ভারত। কিন্তু সেসবের চেয়ে শক্তিশালী হতো সংঘবদ্ধ এশিয়া, আর মহাশক্তিশালী হতো একজোট এই বিশ্বটি। কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সবকিছু চাইলেই কি পাওয়া যায়?' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭)

ইতিহাসবিদগণ অধ্যাপক সালাহ্উদ্দীন আহমদ কী করে বঙ্গবন্ধু সকল বাঙালির হৃদয় এক করেছিলেন সেই কথা লিখেছেন এইভাবে : 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনসাধারণ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ–হিন্দু,

মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান–সকল একত্রিত হয়ে এক অখণ্ড বাঙালি জাতিতে পরিণত হয়েছিল যেটা আগে কখনো হয়নি। বস্তুত, এই সময় এই অঞ্চলের সর্বস্তরের বাঙালিদের মধ্যে যে অভূতপূর্ব স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছিল, যেটা গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে অর্থাৎ বিগত স্বদেশি যুগের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সে আন্দোলনটা খণ্ডিত আন্দোলন। এর প্রধান সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে, তখনকার মুসলমান সমাজের বৃহত্তর অংশ ঐ আন্দোলনে যোগ দেয়নি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে স্বদেশি আন্দোলনে বাংলার মুসলমানদের যোগ না দেওয়ার প্রধান কারণ ছিল তাঁর ভাষায়–'তাঁহাদের সঙ্গে আমরা কোনো দিন হৃদয়কে এক হইতে দেই নাই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩)

অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বর্তমান সময়ের একজন ক্ষুরধার সমাজ-বিশ্লেষক। তাঁর মতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন ইতিহাসের মহানায়ক। 'তিনি তাঁর অপরিসীম ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাহস ও প্রজ্ঞা দিয়ে ধাপে ধাপে রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে, যথাসময়ে সঠিক রণকৌশল উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে, বাঙালি জাতিকে পরিণত করেছিলেন একটি একতাবদ্ধ লড়াকু জাতিতে। তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের মূল্য কেউ কমাতে পারবে না। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্ব বিষয়ে জীবনীকার ও ইতিহাসবিদ সম্ভবত একমত হবেন না। এই প্রশ্নে আমরা আজও ইতিহাসের রায় পাইনি। হয়তো সে সময়ও আসেনি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫)

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ. কে. খন্দকার ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সহ-অধিনায়ক। 'বঙ্গবন্ধু : কিছু স্মৃতি' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিরাট এবং উদার মনের মানুষ। আমি জানি, স্বাধীনতার পর স্বাধীনতা-বিরোধী কিছু নেতা জেলে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু কিন্তু তাদের পরিবারের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য আর্থিক সাহায্য করতেন। আরও অনেক ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। কোনো একটি অপরাধে সরকারি আইন অনুযায়ী সম্ভবত একজন কেরানির চাকরিচ্যুতি ঘটে। কোনো এক প্রয়োজনে আমি সেদিন সেইসময় বঙ্গবন্ধুর অফিসে ছিলাম। বঙ্গবন্ধুর মুখ্য-সচিব এই লোকটির চাকরিচ্যুতির ফাইলে তাঁর স্বাক্ষরের জন্য নিয়ে আসেন। অনেক ইতস্তত করার পর তিনি ফাইলটি সই করে দেন। যখন মুখ্য-সচিব ফাইল নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন বঙ্গবন্ধু তাঁকে ডেকে বললেন, 'চাকরি তো গেল, লোকটি যেন পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে তার একটা বন্দোবস্ত করো।' বঙ্গবন্ধু ছিলেন এরকম বড় মনের মানুষ।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯)

ড. আনিসুজ্জামান মনে করেন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছেন বলেই তাঁকে এভাবে জীবন দিতে হলো। 'বঙ্গবন্ধুকে অবলোকন' নিবন্ধে তাই তিনি লিখেছেন,

'হত্যাকারীদের কাছে বঙ্গবন্ধুর–এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরদের–একমাত্র অপরাধ ছিল বাংলাদেশ সৃষ্টি। একথা যারা বোঝেই না, তাদের বোঝাতে চাওয়া বৃথা। যারা বঙ্গবন্ধুকে খাটো করার চেষ্টা করেন কিংবা আরও বড় করতে গিয়ে ছোট করে ফেলেন, তাদের জানতে হবে, ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু অমরতা লাভ করেছেন, তিনি যা তিনি তাই, তার আসন ধূলিমলিন হওয়ার নয়।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬)

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের মতে, বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে পাবলিক ডোমেইন বা গণভুবনের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'শেখ মুজিব ঠিকই বুঝেছিলেন যে, পাবলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রমধ্যে প্রোথিত সমাজ ম্যানেজমেন্টের যুক্তি এবং সমাজ রাজনৈতিক প্রভুত্বের ক্ষেত্রে এলিটদের স্বার্থের মধ্যে মিল নেই, কিংবা প্রভুত্ব কখনোই নিরঙ্কুশ নয়। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রের যুক্তি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে রাষ্ট্রের স্বরূপ তদন্ত করা দরকার। এই যুক্ততা থেকে নির্মিত হয় গণভুবন, যে ভুবন হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে নাগরিকত্বের জায়গা। এই জায়গায় অন্তরিত পাবলিক প্রতিষ্ঠান এবং পাবলিক ডিসকোর্স : পাবলিক প্রতিষ্ঠান আরোপিত কিন্তু পাবলিক ডিসকোর্সের একটা অংশ শেখ মুজিব এবং তাঁর সঙ্গীরা নিজেরাই নির্মাণ করেছেন : গণতন্ত্র, ভোট, নির্বাচন, স্ব-শাসন, স্বাধীনতা অংশগ্রহণ প্রত্যয়গুলোর ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে। সেজন্য বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র হয়েছে নির্দিষ্ট অর্থে রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে।' (দ্র. *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৬)

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালির ঐক্যের প্রতীক। বিশিষ্ট নাট্যকার ও শিক্ষাবিদ মমতাজউদ্দীন আহমদ লিখেছেন। 'আমি তো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম, শেখ মুজিব কখনো বাঙালি জাতি ও দেশ সম্পর্কে একটিও বিভেদমূলক কথা বলেননি। যেখানে গেছেন, যেখানে সুযোগ পেয়েছেন, সেখানে বাঙালির ন্যায্য পাওনার কথা বলেছেন। কখনো কোনো কারণে পিছপা হননি। কাউকে ভয়ও করেননি। কারও কাছে কোনো পারিতোষিক নেননি। বাংলাকে আর বাঙালিকে এমন করে ভালোবাসতে যিনি পারেন, তিনি যদি বঙ্গবন্ধু না হবেন, তবে আর কে হবে। ... শেখ মুজিব তো বিভ্রান্ত হতে বাংলাতে আসেননি। তাঁর এক লক্ষ্য, এক গন্তব্য। আমার নিপীড়িত বঞ্চিত বাংলাকে মুক্তি দাও।' (দ্র. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯)

শিক্ষাবিদ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক–কেবলই কী নির্বাচিত শব্দনিচয় মাত্র? তা তো নয়। গভীরে ইতিবাচক ব্যঞ্জনাগর্ভ। ছিলেন রাজনৈতিক দলের একজন আপষহীন কর্মী। প্রত্যন্ত প্রদেশব্যাপী দুঃসাহসিক পরিচালনা-কৃতিত্বে তিনি অনন্য নেতৃত্বে বরিত। তারপর কখন সেই মানুষটি

নিজেকে ছাড়িয়ে, দলীয় সংগঠনকে ছাড়িয়ে সমগ্র জাতির কোটি মানুষের পিতা হয়ে গেলেন। সবাই আমরা তাঁকে আত্মার সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতম করে হৃদয়ে ধারণ করে নিলাম। যেমন কিনা আতাতুর্ক, মহাত্মাজী, আঙ্কল হো–বুঝটা কী ছিল? আবেগটাই বা কী?' (দ্র. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৯-৭৫০)

বিশিষ্ট প্রবন্ধকার অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মনে করেন তিনি ছিলেন জনগণের নেতা। ছিলেন সাহসী মানুষ। 'শেখ মুজিবের মতো সাহস আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি। ফাঁসির মঞ্চ থেকে তিনি একাধিকবার ফিরে এসেছেন, আপষ না করে। ...শেখ মুজিবের সাহস ব্যক্তিগত স্বার্থের পুষ্টি সাধনে নিয়োজিত হয়নি। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটি পরিচিত দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিপক্ষে। তিনি তাঁর দলের লোক ছিলেন, শ্রেণীরও ছিলেন। কিন্তু পার হয়ে গিয়েছিলেন ওই দুই সীমান্ত, পরিণত হয়েছিলেন জনগণের নেতায়। তাঁর সাহস জনগণের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত করার জাতীয়তাবাদী সাহস।' (দ্র. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮০)

বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী তাঁর 'লিডার'-কে এভাবে স্মরণ করেছেন : 'শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। তৃণমূল থেকে যাঁর গৌরবদৃপ্ত উত্থান। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের তেজস্বী ও বুদ্ধিদীপ্ত কিশোর পরিণত হয়েছিলেন সাহসী সংগঠকে। চারাগাছ থেকে মহীরুহ যেমন মাথা উঁচিয়ে আকাশ ফুঁড়ে ওঠে একদিন, তেমনি স্বভাবজাত সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধ পথপরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও গড়ে তুলেছিলেন তাঁর গৌরবময় রাজনৈতিক জীবন।

চল্লিশের দশক থেকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি, সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের যথার্থ বন্ধু, সৈনিক এবং ক্রমান্বয়ে নেতা এবং অবশেষে বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অবিসংবাদিত নায়কে পরিণত হয়েছিলেন। তাই তো সাধারণ মানুষের অফুরন্ত ভালোবাসা পেয়েছিলেন শেখ মুজিব।' (দ্র. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫৩-৯৫৪)

সে কারণেই বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন তাঁকে 'মৃত্যুঞ্জয় মুজিব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। লিখেছেন, 'যে মানুষের নামে ইতিহাসের দরজা খুলে যায় সেই মৃত্যুহীন মানুষের সঙ্গেই তো আমরা ইতিহাসের দীর্ঘ সড়কে হেঁটে যাব। স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে বিছিয়ে থাকা তাঁর বিশাল শরীর আমাদের জীবনে বটের ছায়া। এই ছায়া থেকে আমরা দূরে যেতে পারব না। শুধু আমরা চাই আমাদের পথের দুপাশে অবিস্মরণীয় আলো থাকুক, যে আলোয় ফুটে থাকবে পথ, পথের ধারের উজ্জ্বল বুনোফুল এবং আমাদের ইতিহাসের খুলে যাওয়া নতুন দিগন্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে নতুন আলো। আমরাও গগনবিদারী কণ্ঠে চিৎকার

করে বলব, মুজিবের মৃত্যু সহজ কথা নয়। (দ্র. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৭-৩২৮)। আরও অনেকেই বঙ্গবন্ধুর বিরল গুণের কথা এই স্মারকগ্রন্থে লিখেছেন। এসব লেখা থেকেই বোঝা যায় কেন তিনি সাধারণের দৃষ্টিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। স্থানাভাবে সকলের কথা এখানে তুলে ধরা সম্ভব হলো না।

নির্বাচিত গুণীজনদের লেখা খণ্ড খণ্ড এসব চিত্রকে এক করলে বহুমাত্রিক উজ্জ্বল এক মানুষকে আমরা খুঁজে পাই। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এমন আরেকজন দিঘল পুরুষের আবির্ভাব ঘটেনি। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি নিবেদন করে গেছেন বাঙালির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য। এমন করে স্বদেশকে তাঁর জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করতেন বলেই তিনি হতে পেরেছিলেন এক অবিসংবাদিত নেতা। বৈরী সময়ে অনেকেই তাঁকে উপেক্ষা করতে পারেন, আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা নাও দিতে পারেন, আবার কেউ কেউ তাঁকে চিনেও না চেনার ভান করতে পারেন। কিন্তু এ কথা কি অস্বীকার করার উপায় আছে যে :

‘একদিন তুমিই এখানে পাখিদের মতো গেয়েছ ভোরের গান
...
তুমি কেউ নও, বলে ওরা, কিন্তু বাংলাদেশের আড়াই শত নদী বলে,
তুমি এই বাংলার নদী, বাংলার সবুজ প্রান্তর
তুমি এই চর্যাপদের গান, তুমি এই বাংলা অক্ষর,
বলে ওরা, তুমি কেউ নও, কিন্তু তোমার পায়ের শব্দে
নেচে ওঠে পদ্মার ইলিশ;
তুমি কেউ নও, বলে ওরা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান আর নজরুলের
বিদ্রোহী কবিতা বলে,
তুমি বাংলাদেশের হৃদয়।’

(মহাদেব সাহা, ‘এই নাম স্বতোৎসারিত’)

বাংলার আকাশ, বাতাস, শস্যক্ষেত, ফুল-ফলের আরেক নাম ‘শেখ মুজিব’ বাংলাদেশেরই আরেক নাম ‘বঙ্গবন্ধু’। আমরা চাই বা না চাই এদেশের সাধারণ মানুষ তাঁকে তাদেরই ‘লোক’ বলে যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবেন। সে কারণেই তিনি বেঁচে থাকবেন চিরদিন।



১৬

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ: নিরবচ্ছিন্ন এক ইতিহাস

প্রধানমন্ত্রী হবার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারাজীবন মনে রাখবো। অত্যাচার নিপীড়ন এবং কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু জনগণের ভালবাসা যেন আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে।

–বঙ্গবন্ধু; এম.এন.এ ও এম.পি.এ-দের শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠান রেসকোর্স ময়দান, ঢাকা, ৩ জানুয়ারি ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ মূলত একই। যেন মাটি আর বৃক্ষের মতো। কেউ কাউকে ছেড়ে আলাদা নয়। দুজনের এ শেকড় সম্পর্কের চিত্র তৈরি হয়েছে দীর্ঘ ইতিহাসের রংতুলিতে। এটি অনুধাবন করতে হলে অবশ্যই ধৈর্য ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী* এবং অতি সম্প্রতি প্রকাশিত *কারাগারের রোজনামচা* পড়তে হবে। ১৯৬৬ সালে স্বাধীন বাংলার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উপস্থাপন করেন। এরপর থেকেই তাঁর দল আওয়ামী লীগ ও তাঁর ওপর যে নির্যাতনের খড়্গ নামে তা ছিল আসলেই নির্মম। এ সকল কিছুই তাঁর ডায়েরিতে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা আমার মনকে ছুঁয়ে গেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন করার ক্ষেত্রে তাঁর যে ভালোবাসা ও ধৈর্য পরিলক্ষিত হয় তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। ৭ জুন, ১৯৬৬ এবং পরবর্তী দিনগুলোতে পার্টির সংগ্রামী কর্মীদের জন্য তাঁর যে উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় সত্যিকার অর্থে তা অনন্য।

আমরা সকলেই জানি, বঙ্গবন্ধুর স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সেদিন হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির জন্যও সেদিন ঐ হরতালের ডাক পড়েছিল। এটি ছিল সকল কিছু বন্ধ করার জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পন্থা।

শান্তিপূর্ণ সাধারণ হরতালের ডাক দিয়েছিল তারা, যাদের বিরুদ্ধে গুলি ব্যবহার করেছিল সেদিনকার সে স্বৈরাচারি সরকার এবং হত্যা করেছিল ডজনখানেক পার্টি কর্মী এবং সাধারণ জনগণ। জেলে তিনি যথেষ্ট উদ্বেগের মধ্যে থাকতেন যখন দেখতেন তাঁর শত শত নেতা, কর্মী এবং ছাত্রদের সাজা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জেলে পাঠানো হচ্ছে। তিনি তখন কিছু খেতে পারতেন না। শুতেও পারতেন না। জেলে নতুন প্রবেশকারী অর্থাৎ প্রথমবার জেলে আসা কর্মীদের জন্য তিনি জেল কর্তৃপক্ষকে বারবার ন্যায় বিচার করার জন্য অনুরোধ করতেন। তিনি জেল বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন এবং জেল পরিচালনাকারীদের সকলকে মোটামুটি চিনতেন। কারারক্ষী সকলই তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তাই তিনি কারারক্ষীদের কাছে অনুরোধ করতেন এসব তরুণ কারাবন্দী যাতে সঠিকভাবে খাবার, ঔষধ ও কাপড় পায়। যাতে তারা তাদের কারাবাস সাফল্যের সাথে আয়ত্ত করতে পারে। আসলে সমভাবে সহকর্মী এবং সাধারণ কারাবন্দীদের জন্য তাঁর সমবেদনা ছিল যথেষ্ট এবং তাদেরকে সকল ধরনের সমর্থন তিনি দিতেন। কারাবন্দীরা কারাবন্দী কালে সকলেই অনুভব করতেন যে বঙ্গবন্ধুই একজন যিনি তাদেরকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতেন। কারাবন্দীদের মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য তিনি আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা করে যেতেন। তিনি কারারক্ষীদের সর্বদা জেল কোড মানার জন্য অনুরোধ করতেন এবং কারাবন্দীরা যা পাওয়ার যোগ্য তা দিতে বলতেন। কারা কর্মীরা তাঁর কাছে সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী থাকত এবং উচ্চমহলকে দোষারোপ করত। তিনি ছিলেন একজন নিঃসঙ্গ কারাবন্দী এবং সর্বদা মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাতেন। তারপরও সংগ্রামের পরিণতি সম্পর্কে তিনি আশাবাদী ছিলেন বলে সকল মানসিক যন্ত্রণাকে সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করতে পারতেন। তিনি বাগান করার পাশাপাশি পড়াশোনা এবং মাঝে মাঝে রান্না করা শুরু করেছিলেন। এমনকি কারাগারের গাছে থাকা হলদে রঙের দুটো পাখি এবং ঘরের পাশে থাকা কবুতরের বাচ্চাগুলোও তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। ডায়েরির সকল পৃষ্ঠায় তাঁর জীবনের প্রতি ভালোবাসা ও আশাবাদের কথা লেখা আছে। একজনের সাথেই তাঁর এই অভিজ্ঞতার তুলনা করা যায় তিনি হলেন নেলসন মেন্ডেলা। তিনিও একই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিন কাটিয়ে ছিলেন।

আইয়ুব খানের রাজনৈতিক নির্মমতার কথা শুনে তিনি অনুধাবন করেছিলেন তার দিন শেষ এবং উপলব্ধি করেছিলেন একটি বিকাশমান স্বাধীন এবং ন্যায্য বাংলাদেশের। পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন সরকারের দ্বারা দুর্ব্যবহার এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বঙ্গবন্ধুকে আরও আত্মবিশ্বাসী করেছিল একটি স্বাধীন বাংলাদেশের। এমনকি সে কঠিন দিনগুলোতে তিনি গণতান্ত্রিক উত্তরণের পক্ষে ছিলেন এবং অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণজাগরণ নিয়ে আশাবাদী ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন সত্য হলো যখন তিনি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে জনগণের জাগরণ অনুধাবন করলেন এবং মানুষ তাঁকে মুক্ত করে বঙ্গবন্ধু

উপাধিতে ভূষিত করেন। সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং একটি নির্বাচনী ম্যান্ডেটের জন্য জনগণকে সংগঠিত করেছিলেন যাতে এর উপর ভিত্তি করে একটি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুবিচার ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেন। পরবর্তীকালে তিনি ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে বিশাল ম্যান্ডেট পেয়েছিলেন। তাঁর নির্বাচনী সফলতা পাকিস্তানের মিলিটারি এবং আমলাতন্ত্রকে পরাজিত করেছিল এবং পাকিস্তানের বৈধ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের অভিজাতেরা এটা সহজে হজম করতে পারেনি এবং জনগণের রায় অকার্যকর করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। রাষ্ট্রপতি দ্বারা ডাকা সংবিধান সভা আচমকা পহেলা মার্চ, ১৯৭১ মুলতবি ঘোষণা করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনগণ রাস্তায় রূঢ়ভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিকভাবে একটি শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ডাক দেন যা ২৫ দিন ব্যাপী চলে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে বলেন। তিনি এমনকি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছিলেন। ইয়াহিয়া ও তার সঙ্গীদের মনে অন্য কিছু ছিল। তারা মধ্যস্থতার ভান করে ও বাঙালি নিধনের জন্য পাকিস্তানি সেনাদের বাংলাদেশে আসার সময় করে দেয়। ২৫ মার্চ বিকেলে হঠাৎ করে ইয়াহিয়া বাংলাদেশ ত্যাগ করে এবং বাংলাদেশে গণহত্যা চালানোর জন্য আদেশ দিয়ে যায়। ঐ সন্ধ্যায় পাকিস্তানি হানাদারেরা স্বাধীনচেতা বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৬ মার্চ, ১৯৭১, প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী করে। এবং এভাবেই তাঁর ডাকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী এ মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ প্রাণ হারায় এবং ১ কোটিরও বেশি মানুষ প্রতিবেশী ভারতে উদ্বাস্তু হিসেবে স্থান পায়। হাজার হাজার বাঙালি নারী ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয়। মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে এবং সাহস জোগাড় করে বঙ্গবন্ধুর শক্তিশালী এবং আপসহীন নেতৃত্ব হতে। সবশেষে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সেনাবাহিনী যুক্ত হয় এবং এ মানবিক ট্র্যাজিডির সমাধান হয়। সবশেষ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দক্ষ নেতৃত্ব এবং বিশ্ব বিবেকের চাপে বঙ্গবন্ধু অবশেষে পাকিস্তানি কারাগার হতে মুক্ত হন। ১০ জানুয়ারি, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা হিসেবে লন্ডন ও দিল্লী হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তিনি ফিরে এসে এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্নির্মাণ শুরু করেন। তাঁর হাতে তখন কোনো কিছুই ছিল না। এক ডলারও বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ছিল না। তিনি তাঁর শাসনামলে বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সফল ছিলেন এবং

পৃথিবীর শান্তিময় জনগণ এবং সরকারের কাছে সহায়তা পেয়েছিলেন। ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থন চিরদিন বাঙালির মনে থাকবে। এরপর তিনি তাঁর সকল শক্তি নিয়ে নতুন অবকাঠামো, নতুন আইন প্রণয়ন, নতুন সংবিধান লেখা, একটি নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সেনাবাহিনী পুনর্নির্মাণ এবং আমলাতন্ত্র এবং আরও অনেক কিছু পুনর্নির্মাণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যখন তিনি গভীরভাবে বাংলাদেশ গঠনে মশগুল তখন পাকিস্তানি অপশক্তি এক গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে। চক্রান্তকারীদের দ্বারা তিনি হঠাৎ আক্রান্ত হন এবং ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ তিনি এবং তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা লাইনচ্যুত হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে নির্বাচিত হয়ে শাসনভার গ্রহণ করে। ফের শুরু হয় উন্নয়ন অভিযাত্রা।

কিন্তু আমরা এমন এক দুর্ভাগ্য জাতি যে আমাদের মানুষেরাই আমাদের স্বপ্ন পূরণের রূপকারকে হত্যা করেছিল। আর সেখান থেকে আমাদের অধঃপতন শুরু হয়। রবি ঠাকুর বলেছিলেন, 'ভাগ্যবান জাতি তাঁরা যাঁরা তাঁদের ইতিহাসের মাধ্যমে দেশকে আবিষ্কার করে।' পরিহাসের বিষয় হলো যে, আমাদের জাতীয় জীবনে একটি কালো অধ্যায়ের শুরু হয় যখন আমরা আমাদের ইতিহাসকে এবং আমাদের জাতীয় নেতাদের অশ্রদ্ধা করতে শুরু করি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিতর্কিত করে আমরা নয়া প্রজন্মকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের গৌরবান্বিত অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত করেছি। সফল দেশের একটি নির্দেশক হলো–এটি কখনো তাঁর ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে বির্তকিত করে না। বস্তুত, রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে স্বদেশের ইতিহাসকে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কাছে ধোঁয়াচ্ছন্ন হিসেবে উপস্থাপন করা ঠিক না। আজকের শ্রেণিকক্ষে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ কোনপথে হাঁটবে তার রেখাচিত্র। যদি একটি শ্রেণিকক্ষ মানসম্পন্ন শিক্ষা দেয়, শিক্ষকেরা সত্যি ইতিহাস শেখায় তাহলে তরুণ সমাজ অবশ্যই সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। মানসম্পন্ন শিক্ষার অভাবে একটি জাতি কতটা বিপন্ন হতে পারে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কী নির্মম পরিহাস! সংকীর্ণ রাজনীতির জন্য আমরা আমাদের অনুভূতিপ্রবণ সন্তানদের বিভ্রান্ত করেছি। একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অগণিত জাতীয় বীরদের আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছিল আমাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা। আমরা অত্যন্ত সাবধানে শিশুদের কাছে গোপন করেছি তাঁদের বীরত্বগাথা। মানুষের ভালোবাসা ও বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন। মানুষের মনে বাংলাদেশ ও তিনি ছিলেন অভিন্ন একসত্তা। বিনিময়ে মানুষ আবিষ্কার করেছিল তাঁর প্রতিরূপ একটি দেশের। অনেকদিন পর্যন্ত মানুষের চিন্তা অনুপ্রেরণা তাঁকে কেন্দ্র করেই ঘুরত। এখন পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে তিনি উজ্জীবিত। সুবিধাভোগী স্বার্থান্বেষী মহলের কাছে তিনি বিস্মৃতি হতে পারেন,

কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন, থাকবেন বঞ্চিত মানুষদের মাঝে। সময়ের সাথে সাথে তাঁর প্রতিচ্ছবি গগণচুম্বী হচ্ছে।

তিনি সকল বীরদের উর্ধ্বে। আর এ কারণে তিনি একটি স্বাধীন দেশে আশাবাদের বীজ বপন করে গেছেন। এই বীজ আমাদের স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করছে। মানুষ এখন তাঁর মধ্যেই দেশকে অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়–তাঁর সাথে যোগাযোগ মানেই সকলের সাথে যোগাযোগ। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেন তিনি ঐক্যের প্রতীক। তিনি অকাতরে তাঁর দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই তিনি আমাদের স্বপ্নের বাতিঘর। তিনি বাঙালির একটি আলাদা সত্তা দিয়ে গেছেন। তিনি বরাবরই সাহসী ছিলেন। এ সাহস তিনি সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্বপ্ন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আমাদের মাঝে বপন করেছিলেন, যার ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। সকল সীমাবদ্ধতা দূর করে, শেখ মুজিবুরের নামে ইতিহাসের দরজা খুলে যায়।

আগেই বলেছি, আমাদের জাতীয় জীবনে একটি অশুভ অধ্যায় এসেছিল যখন আমরা আমাদের অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলাম। এমন সংকট মোকাবিলার জন্য আমাদের গভীরভাবে দূরদর্শী হতে হয়েছিল। এমন সংকট যেন আর কখনো না আসে আমাদের জাতীয় জীবনে। সেজন্য জনগণ ও নেতৃত্ব প্রদানকারীদের মধ্যে সম্পর্ক থাকতে হবে অটল। হিমালয়ের মতো সাহসী হতে হবে যা ছিল বঙ্গবন্ধুর মধ্যে। যখন তাঁর সাহস ও জনগণের সাথে তাঁর সম্পর্কের দিকে লক্ষ করি। তখন আমরা খুঁজে পাই অদম্য অনুপ্রেরণা, বিশ্বস্ততা ও সৎ সাহস। আমরা অনুধাবন করি তাঁর নান্দনিক রাজনৈতিক জীবন, মানবিক গুণাবলি ও সংবেদনশীলতা। আমরা তাঁর জীবন হতে বুদ্ধিমত্তা এবং সাহস সঞ্চয় করতে পারি যা বস্তুতপক্ষে তাঁর জীবন হতে বড়। তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসন আমল হতে আমরা অনেক গাইডলাইন এবং উদাহরণ পাই যা আমাদের নিজের দেশকে সুইজারল্যান্ডের মতো উন্নত ও শান্তিপ্রিয় হতে সাহায্য করতে পারে। ইতিমধ্যে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হতে পেরেছি। এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হব বলে স্বপ্ন দেখছি। আমাদের সামষ্টিক অর্থনৈতিক রূপান্তর এককথায় বিস্ময়কর। জিডিপি সাত শতাংশ বা তারও বেশি। জন্মহার কমে এসেছে। কিছু মানুষ ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে অলৌকিক কিংবা বিস্ময়কর দেশ হিসেবে উল্লেখ করছে। অনেকের কাছে বাংলাদেশ উন্নয়নের অভিযাত্রা অসাধারণ। আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর দারিদ্র্য এবং দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার আদর্শে বিশ্বস্ত হই তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশের মানুষ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্মিলনে ধুমধাম এবং জাঁকমকের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে পারবেন। তার পরপরই আমরা পালন করব দ্রুতবেগে এগিয়ে চলা বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী। শত প্রতিকূলতা পায়ে দলে এগিয়ে যাবে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ।



১৭ উপসংহার

শুনুন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। আপনার কথাই হয়তো ঠিক। অবিভক্ত পাকিস্তান হয়তো শক্তিশালী ছিল। তার চেয়েও শক্তিশালী হয়তো হতো অবিভক্ত ভারত। কিন্তু সেসবের চেয়ে শক্তিশালী হতো সংঘবদ্ধ এশিয়া, আর মহাশক্তিশালী হতো একজোট এই বিশ্বটি। কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সবকিছু চাইলেই কি পাওয়া যায়?

—এম. নজরুল ইসলাম
সম্পাদিত, বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ
১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৭

আসলেই বাংলাদেশের আরেক নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমাদের স্বদেশকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপরেখায় পরিচিত করতে তিনি যে পরিশ্রম, সাহস ও আত্মত্যাগ করেছেন তা সত্যি অতুলনীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা যে তাঁর কাছে কতভাবে ঋণী তা বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু আমরা তাঁর এই অবদানের কথা সঠিকভাবে আমাদের সন্তানদের কাছে তুলে ধরতে পারিনি। প্রচলিত ইতিহাসচর্চায় আমরা একের পর এক বিতর্ক সৃষ্টি করেছি। ইতিহাসকে বিকৃত করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী-স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করেছি। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য জাতীয় বীরদের অনন্য অবদানের কথা নির্মোহভাবে আমরা লিপিবদ্ধ করে উঠতে পারিনি। কিংবা তা করতে চাইনি। সে কারণে সম্ভবত উজ্জ্বল অতীতকে ভিত্তি করে আমাদের কর্মমুখর বর্তমানকে কাঙ্ক্ষিতরূপে সাজাতে পারিনি। পারিনি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নকে জনমনে গেঁথে দিতে। এমন নৈরাশ্যজনক পরিবেশে একটি আশাবাদী নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা মোটেও সহজ নয়। অথচ বর্তমানের দুঃখ ও বেদনা থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতে চাইলে অতীত দিনের অর্জন, বীরত্ব, অহংকার থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে সৃজনশীল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়তে তাদের উৎসাহী করার কোনো বিকল্প নেই। সে কারণেই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসচর্চার প্রয়োজন এতটা।

স্বার্থান্বেষী মহল ইতিহাসের এই অন্তর্নিহিত শক্তির কথা ভালো করেই জানেন। আর জানেন বলেই তারা সর্বদা ইতিহাসকে অস্পষ্ট বিভ্রান্ত, বিতর্কিত করে রাখতে চেষ্টা করেন। তারা চান না অতীতের গৌরব ও গর্বের সন্ধান পেয়ে সাধারণ মানুষ আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বর্তমানের অধঃপতনকে চ্যালেঞ্জ করুক। পরিবর্তনের পথে হাঁটুক। স্বার্থলোভী মহল নিশ্চয় চান না সীমাহীন নৈরাজ্য, অনৈতিকতা, বৈষম্য ও অসত্যের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষও সোচ্চার হোক, সংগঠিত হোক। এমন বাস্তবতাকে বদলাতে চাইলে স্বদেশের সত্যিকার ইতিহাস আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের জানতেই হবে। নিঃসন্দেহে তা জানানোর এক নয়া সুযোগ এখন সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগকে যথার্থভাবে কাজে লাগানোর সময় যে বয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। স্বদেশকে জানতে হয়। ভালোবাসতে হয়। স্বদেশকে জানার অংশ হিসেবেই আমাদের জাতীয় বীরদের জানা অপরিহার্য। বিশেষ করে, আমাদের জাতীয় বীরদের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ আসনটি দখল করে আছেন সেই বঙ্গবন্ধুর জীবন ও সংগ্রামের ধারা নতুন প্রজন্মকে জানানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কোমলমতি শিশুদের কাছে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া আমাদের পরম এক দায়িত্ব হওয়া উচিত। কেননা, তিলে তিলে তিনি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথরেখা গড়ে তুলেছেন। অতীতের সকল জাতীয় বীরের অর্জনকে আত্মস্থ করে তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতির আত্মবিশ্বাসের মূল চালিকাশক্তি। সে এক বিস্ময়কর জাতীয় বীরে উত্থানের কাহিনি। সাধারণের ভেতর থেকে অসাধারণ হয়ে উঠবার এক কাহিনি সত্যি চমকপ্রদ। এমন এক সময় আমাদের জাতীয় জীবনে এসেছিল যখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেই সমস্ত বাঙালি সমাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যেত। এটা সম্ভব হয়েছিল এ কারণে যে, তিনি নীলকণ্ঠ হতে পেরেছিলেন : এদেশের সকল উপেক্ষিত, অপমানিত, বঞ্চিত, দুঃখী মানুষের উপেক্ষা, অপমান, বঞ্চনা ও দুঃখকে তিনি বুকে ধারণ করতেন আর সর্বক্ষণ তিনি এঁদের মুক্তির কথা ভাবতেন। নিজের জীবন ছাড়া অন্য সবার জীবনকেই তিনি বিশেষ মূল্যবান মনে করতেন। মৃত্যুকে তিনি কখনো ভয় পেতেন না। বার কয়েক মৃত্যুর চোখে চোখও তিনি রেখেছিলেন। আর সে কারণেই তিনি মহাবীর। কেননা একমাত্র বীরেরাই এমন নিঃশঙ্ক চিত্তের অধিকারী হতে পারেন। এজন্যই তিনি সাধারণের এতটা আপনজন হতে পেরেছিলেন। হয়তো-বা সে কারণেই এদেশের এলিটদের তাঁকে নিয়ে এত ভয়। তিনি কখনোই তাদের মতো দ্বিচারী হতে পারেননি। দুঃখী মানুষের সমব্যথী এ মানুষটির মনের কথা আর মুখের কথার মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। বুলেটের আঘাতে তাঁর বুক ঝাঁঝরা করেও তারা তাঁর আকাশ সমান দেহকে নিয়ে পড়েছিলেন এক মহা

বিড়ম্বনায়। টুঙ্গিপাড়ায় সাধারণ মানুষের পাশে সমাহিত করার সময়েও অস্ত্রধারীদের ভীত-সন্ত্রস্ত আচরণের ঘটনাটি তাই সহজেই বোধগম্য।

এমন মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মালিকানা জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া। আরও সম্ভব ছিল জনকর্তৃত্বের রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার করা। জনগণকে প্রজাতন্ত্রের মালিক করার এই যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার তা কিন্তু একদিনেই সৃষ্টি হয়নি। চারপাশের বৈষম্যপূর্ণ পরিবেশে জনগণের বঞ্চনা ও দুঃখ-দুর্দশা দেখতে দেখতে বঙ্গবন্ধুর মনে সাধারণের জন্য পক্ষপাতিত্ব বাড়তে থাকে। এই বইয়ের অধ্যায়গুলো থেকেই জানা যায় যে, শৈশব ও কৈশোর-জীবনে তিনি কৃষকদের দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, ছাত্রজীবনেও সারা বাংলা চষে বেড়িয়েছেন রাজনৈতিক সতীর্থদের সঙ্গে নিয়ে এবং সেই সুবাদে কৃষক-সমাজের দুরবস্থা, বেদনা ও হতাশা স্বচক্ষে দেখেছেন। ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং জেলে গিয়েছেন। যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি তৈরি করার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছেন। এমনকি সাংগঠনিক কাজে মনোযোগ দেওয়ার কারণে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগও করেন। এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। বাঙালির স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি কীভাবে পাকিস্তানের গণ-পরিষদে সোচ্চার ছিলেন তাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। আইয়ুব খানের সামরিক আইনের আওতায় জেলে গেলেন, বের হয়ে এলেও তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। '৬২-তে আবার জেলে গেলেন। কিছুদিন পর মুক্তি পেলেন। ফের জেলে গেলেন। বলা যায় রাজনৈতিক জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তিনি জেলে কাটিয়েছিলেন। জেল থেকে বের হয়ে পঁয়ষট্টি সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইয়ুব-বিরোধী প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষ নিয়ে সারা বাংলাদেশ চষে বেড়ালেন। প্রতিটি জনসভায় পাকিস্তানের বৈষম্যপূর্ণ অর্থনীতি, পক্ষপাতমূলক প্রশাসনের কথা বললেন। নির্বাচনের কয়েকদিন আগেই তাই আবার গ্রেফতার হলেন। জেল থেকে বের হয়ে ছেষট্টি সালে ৬ দফা ঘোষণা করলেন এবং একই বছর আগরতলা মামলায় ফের তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। এবার তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা দেওয়া হলো। প্রমাণ করা গেলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হতো। কিন্তু তাঁর পক্ষে ছিল পুরা বাঙালি সমাজ। এমনকি উদারপন্থী সকল বিশ্ববাসী। তাই তাঁর মুক্তি-আন্দোলন দৃঢ় ভিত্তি পায়। ঊনসত্তরের উত্তাল গণ-আন্দোলনের মুখে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেলে এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার ভালোবাসার উপহার 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব পেলেন। সেদিন যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন তাতে সাধারণ মানুষের সঠিক মুক্তির কথা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছিল। এরপর আইয়ুব খানের পতন হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান নতুন সামরিক শাসক

হন। মূলত, বঙ্গবন্ধুর চাপেই ইয়াহিয়া জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বেই তিনি প্রথম 'বাংলাদেশ' শব্দটি উচ্চারণ করেন। ঊনসত্তরেই 'বাংলাদেশ' হবে পূর্ব-পাকিস্তানের নাম এ কথা বলে তিনি তাঁর মনের গহীনে রেখে দেওয়া বাংলা মায়ের প্রতি ভালোবাসার এক অনন্য প্রকাশ ঘটান। এর পরের ঘটনাপ্রবাহে অতিদ্রুত বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয়ের দিকে ধাবিত হতে থাকে। একাত্তরের মতো শ্রেষ্ঠ সময়ের পরিপ্রেক্ষিত তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান কেউ ইচ্ছে করলেই আমাদের ইতিহাসের পাতা থেকে কখনো মুছে ফেলতে পারবে না। তাঁকে ছাড়া বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরিপ্রেক্ষিত চিন্তাও করা যায় না। আর সেজন্যই বলি, তিনিই বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রটির সৃষ্টির এই মহিমান্বিত সংগ্রামের প্রধান নায়ক বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও চেতনাকে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নীতিতে ও কর্মে মধ্যমণি করতে না পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় অধঃপতনের ধারা ঠেকানো যাবে বলে মনে হয় না। তাঁকে আঘাত করেছিল যে নষ্ট হাত তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত বিচার করে গুঁড়িয়ে না দিতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত এ জাতির শাপমোচন করা সম্ভব হবে না। শুধু মুখে স্তুতিবাক্য নয়, নয় অযথা তাঁকে বড় করা। আমাদের নিরন্তর সংগ্রাম করা উচিত তাঁকে আরও ভালো করে জানার। আমাদের একান্ত প্রচেষ্টা হওয়া উচিত কী করে আমাদের উন্নয়ন-ভাবনা ও কর্মকে এদেশের কৃষক, শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষের মঙ্গলাশ্রয়ী করা যায়। কী করে আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিতে চলমান বৈষম্যের ধারাকে পাল্টানো যায়। কী করে ভবিষ্যতের উন্নয়ন-ভাবনাকে আরও মানবিক করা যায়। সেজন্য আমাদের অবশ্যই ফিরে যেতে হবে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে। আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার দিকে। অনুসন্ধান করে দেখতে হবে তিনি তাঁর ভাষণে সর্বক্ষণ কাদের কথা বলতেন। খুঁজে বের করতে হবে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলো দেওয়ার সময় তিনি কোনধরনের মন্তব্য করতেন। জানতে হবে 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?'—এ প্রশ্নটি তিনি কেন অন্তরের গভীরতম পর্যায় থেকে তুলে এনেছিলেন। তাই আজকের দিনেও আমাদের অনুসরণ করতে হবে, তাঁরই দেওয়া উন্নয়ন-নীতিমালার মূল চেতনাকে। তাঁরই নির্দেশিত সাংবিধানিক অঙ্গীকার-নির্ভর জনকল্যাণময়, কৃষক ও শ্রমিকের মঙ্গলাশ্রয়ী উন্নয়নের পথে আমাদের ফিরে আসতেই হবে। মুষ্টিমেয় মানুষের কল্যাণের ঘোরবিরোধী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। সর্বসাধারণের মঙ্গলচিন্তাই তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল। তাই আজ আমরা যদি সত্যি সত্যি তাঁর আদর্শের রূপায়ণ চাই, তাহলে আমাদের স্বতন্ত্র স্বদেশচিন্তায় উদ্ভাসিত গণমুখী উন্নয়ন-কৌশল অবলম্বন করতেই হবে। স্বদেশি এই উন্নয়ন-কৌশলের মূলে থাকবে তাঁর সাধারণ মানুষের কল্যাণচিন্তা। সেই চিন্তার খানিকটা আভাস

আমরা এরই মধ্যে নিশ্চয় তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চারণ থেকে জেনে ফেলেছি। বিদেশি সাহায্যদাতারা এখনো আমাদের নীতিনির্ধারকদের চিন্তা ও চেতনাকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করছে। কিছুদিন আগেও লক্ষ করেছি যে, এদেশের পরিশ্রমী মানুষ যখন নানা সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করে নানা সম্ভাবনাময় উদাহরণ সৃষ্টি করে চলেছেন তখন অপরিণামদর্শী দুর্নীতিপ্রিয় নীতিনির্ধারকগণ দেশটির উন্নয়ন-নীতিকে দেশি-বিদেশি স্বার্থান্বেষী মহলের স্বার্থে সর্বক্ষণ রূপান্তর করতে চেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু-বিদ্বেষী শাসকগোষ্ঠী ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহৎ হৃদয়ের এই মানুষটির প্রান্তজন-প্রীতিকে এদেশের উন্নয়ন-ভাবনার মূলে আনতে মোটেও উদ্যোগী হননি। গণবিরোধী এই উন্নয়ন-প্রক্রিয়াকে কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এ প্রক্রিয়াকে ঠেকাতে হলে আমাদের স্বদেশি উন্নয়ন-ধারায় ফিরে আসতেই হবে। আর ফিরে আসার সেই প্রক্রিয়ায় নিশ্চিতভাবেই বঙ্গবন্ধুর গণহিতৈষীর চেতনাকে আমাদের সঙ্গী করতে হবে। তাঁর মানবিকতা ও গরিবের প্রতি পক্ষপাতিত্বের পথ ধরেই আমরা এগুতে চাই সম্ভাবনাময় সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে। যতদিন তাঁর এই আদর্শের প্রতি আমরা অনুগত থাকব ততদিন বাংলাদেশ তাঁর প্রদর্শিত 'অন্ধকার থেকে আলোর পথে' হাঁটতে থাকবে। বঙ্গবন্ধু আর সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ তখন সমার্থ হয়ে উঠবে। আমরা স্বপ্নময় সেই সুদিনের প্রত্যাশা নিরন্তর করে চলেছি। নিশ্চয়, কোটি কোটি দুঃখী মানুষের সেই স্বপ্ন একদিন পূরণ করা সম্ভব হবে। স্বপ্নপূরণের সেই আত্মশক্তি আমাদের সাধারণ মানুষের অন্তরেই রয়েছে। তাদের অন্তরের সেই অর্গল খুলে দেওয়ার প্রয়োজনেই অহর্নিশ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও তাঁর সংগ্রামকে আমাদের জাতীয় জীবনের অংশ করা প্রয়োজন। কেননা, তিনিই আমাদের স্বাধীন বাঙালি জাতি ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে মর্যাদা দিয়েছেন, মহিমান্বিত করেছেন। তিনি সর্ব অর্থেই আমাদের অস্তিত্বের সমান। দীর্ঘদিন পর দিন বদলের সহায়ক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সেই পরিবেশে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী করার এই সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করা যাবে না। আসুন, সবাই মিলে এই সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করি।

পরিশিষ্ট



পরিশিষ্ট ১

আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচি

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬-দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনি ভাবে হৈ হৈ করিয়া উঠিয়াছে। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয় শিক্ষালাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ

নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি—তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬-দফা দাবি অনুমোদন করিয়াছে। ফলে ৬-দফা দাবি আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, তাঁদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এঁদের অফুরন্ত, মুখ এঁদের দশটা, গলার সুর এঁদের শতাধিক। এঁরা বহুরূপী।

ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকার দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনির বেলায় এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এঁদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাতেও আমার কোনো সন্দেহ নাই। তথাপি ৬-দফা দাবির তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী, বিশেষত আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁরা সকলে অবিলম্বে ৬-দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি, সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রেই এইসব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোরপ্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কদের সরসারি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ একবাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোটও দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুণই। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হয়েছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরানো দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর-প্রস্তাবের নাম শুনলেই যাঁরা আঁতকাইয়া ওঠেন, তাঁরা হয় পাকিস্তান-সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্বের যে দাবি করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভালো, না প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাহীন আইনসভাই ভালো, এ বিচার-ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এই সব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁরা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক।

২নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার

প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল ; পেশাওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ-পোস্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আবার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুই বিষয় দিলাম কেন? এই প্রশ্নের জবাব আমি ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'স্টেট' বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থ শোষকেরা জনগণকে এই বলিয়া ধোকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'স্টেট' অর্থে আমি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট' বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেটস' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,

সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানি, এমন কি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট' ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট' হওয়ার সম্মান হইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজেই বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় এ মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, একথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজি না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজি হইবেন। আমরা তাদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থাগতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না। পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া ব্রিটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও

মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাংকের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিকসমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাংক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে, তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শনস্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশার মুদ্রা প্রচলন করা হইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সি সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ার থাকায় অতি সহজে পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্পবাণিজ্য, ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে।

সকলেই জানেন সরকারি স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকসহ সমস্ত ব্যাংকের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাংক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এইসব ব্যাংকের ডিপজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মতো একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউবওয়েল খুঁদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউবওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতিহেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মুল্য, জনগণের বিশেষত পাটচাষিদের দুর্দশা সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পরিবে না। কারণ এ অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশি চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর

নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব, এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তারা এসব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত-স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তারা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মতো যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারি তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তারা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁরা এ খবরও রাখেন না যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান ব্রিটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশরক্ষা বাহিনী ও পররাষ্ট্র দফতর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই, আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না; কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। দ্বিতীয়ত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়ত, অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা

যাইবে। অফিসারবাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থবিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিংগল ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিংগল ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :

১। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

২। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩। ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি রফতানি চলিবে।

৫। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠারো বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর দিলে দেখা যাইবে যে :

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না-ওঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত। বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানি করে আমদানি করে সাধারণত তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশি। বিদেশ হইতে আমদানি করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষিকে পাটের ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা, আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষিদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু চাষিকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যত দিন পাট থাকে চাষির ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনেরো-বিশ টাকা। ব্যবসায় গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এই খেলা গরিব চাষি চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানীকে সরকারি আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থায় প্রতিকার করিয়া পটচাষিকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমাদানি-রফতানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়াও উপায়ান্তর নাই।

৬নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার

দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্রবাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তা তো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই.পি.আর. বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা ও নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বারো বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচানো হইবে ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতেরো দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যত আমাদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। নৌ-বাহিনী অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে অল্প খরচে ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধাসামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ঐসব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরীবি হালে আত্মরক্ষা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানী ভাই-বোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে :

এক. তাঁরা মনে করিবেন না, আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচিতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই. আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, ঐ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পাশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে আমাদের মতো দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না? কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেই অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা বাষট্টি টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুনে শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইবে পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থবিজ্ঞানের কথা : সরকারি আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারি ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবহিত থাকায় সরকারি, আধা-সরকারি, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে, প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরিব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত। তবে এইসব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণ গরিব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যেসব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তহমত দিতেছেন সেইসব দাবি আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মতো আঠারো বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন. আপনারা ঐসব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ, আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ওসব আপনাদের

হক্ পাওনা। নিজের হক্ পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক্ আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক্ দাবি করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হক্টাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হক্টাই চাই। আপনাদের হক্টা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে :

(১) প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বার সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমারা ইচ্ছা করিলেই গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদরদপ্তর পূর্বপাকিস্তানে আনিতে পারিতাম তা করি নাই।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাইয়ের দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বর নির্বাচন করিয়াছিলাম।

(৩) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

(৪) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

(৫) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার. সুতরাং, পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে-যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত। তবে আপনাদের দাবি করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্যসত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পূর্ব পাকিস্তানী মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানীর।

পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সব অধিকার ও চাকুরী গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পি-আই-ডি-সি, আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি-আই-টি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইনসাফ-বোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে— কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এইসব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন, পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন, ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া-শুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মতো বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ৬-দফা কর্মসূচির বিচার করিবেন। তা যদি তাঁরা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ৬-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬-দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান-বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন।

এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়—পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মতো মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে-বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহ্‌রাওয়াদীকেও দেশদ্রোহীর অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদের হাতে। অতএব দেখা গেল, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়া সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তকদির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে-সব সহ্য করিবার মতো মনের বল আল্লাহ্‌ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালোবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে-কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম শহীদ সোহ্‌রাওয়াদীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তার পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা, আল্লাহ্‌র দরগায় শুধু এই দোওয়া করিবেন, বাকি জীবনটুকু আমি যেন তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি-সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম

শেখ মুজিবুর রহমান

৪ চৈত্র, ১৩৭২



পরিশিষ্ট ২

বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য ভাষণের অংশবিশেষ (১৯৫৫-১৯৭৫)

তারিখ : ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

ফোরাম : পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : গভর্নর এবং গভর্নর জেনারেলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : তরুণ সাংসদ শেখ মুজিবুর রহমান আইন পরিষদের অধিবেশনে গণতন্ত্রের পক্ষে জোরাল বক্তব্য প্রদান করে বলেছিলেন যে, গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। তিনি বলেন, এই ক্ষমতার বিধান রাখা হলে গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা পূর্ণমাত্রায় থেকে যাবে। কারণ, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পদে পদে দুর্নীতি বয়ে আনবে। এই জন্য, সংবিধান থেকে এতদসংক্রান্ত ধারা বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'Definitely we believe in democracy and we are fighting for democracy. I do not know when it will come but we are fighting for it. We are the representatives of the people and the Governor-General in this country is appointed by Her Majesty the Queen of England. That being the position, the Ministers who are the direct representatives of the people, should advise the Governor-General and the must be bound to act according to the advice tendered to him by his Minister.' এ প্রসঙ্গে তিনি ভারত ও

ইংল্যান্ডের শাসনব্যবস্থার উদাহরণ তুলে ধরেন, 'The Honourable Members sitting opposite can emulate the example of India. There the President is Dr. Rejendra Prasad and do you think that he can do anything without the advice of the Prime Minister, without the permission of the council of Ministers? That is not possible. Even the queen of England will not be able to do so because she will have to accept the advice of the Council of Ministers.' তিনি আরও বলেন, 'We are the representatives of the people and we have to give a constitution to the country in respect of which we have made promises to the nation.' তিনি অনুযোগ করে বলেন, 'Please do not give absolute power to one man who is not our representative—may be he is the Head of the state. But I say: Absolute power corrupts absolutely.' (দ্র. মোনায়েম সরকার সম্পা. *বাঙালির কণ্ঠ*, পৃ. ৪-৬)

তারিখ : ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

ফোরাম : পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি
বিষয় : করাচিকে ফেডারেল রাজধানী করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : করাচিকে ফেডারেল রাজধানী এবং প্রাদেশিক গভর্নরদের বেতন প্রসঙ্গে আইন পরিষদে অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু পূর্ববঙ্গের জনগণকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'We are here to decide the issue, what should be the Federal Capital, whether Gadap or Karachi. The people have sent us here. We are the representatives of the people here who have to decide whether it will be Karachi, Hydrabad, Peshawar or Lahore.' তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন যে, জনগণকে ধোঁকা দিয়ে কিছুদিন টিকলেও পরিণামে সত্যটাই বেরিয়ে আসবে। পূর্ববঙ্গে ফিরে গিয়ে মাননীয় সদস্যগণ তাদের ঘরবাড়ি থেকেও বের হতে পারবেন না, কারণ আজ তারা এখানে যা বলছেন বা করছেন তা পূর্ববঙ্গের জনগণের সাথে ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'Do justice to the people care for the sentiments of the people, respect the sentiments of the people, and allow them to decide.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮)

বিষয় : প্রাদেশিক গভর্নরদের বেতন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা: গভর্নরদের ৬০০০ রুপীর পরিবর্তে ৩০০০ রুপী বেতনের স্বপক্ষে শেখ মুজিব বলেন, 'Now is it following the Islamic principles when you give Rs. 6000 to the Governor while the poor people of our

country are dying of starvation and hunger. Sir, the people of my country have not got any shelter. They can not get food, they can not get clothes and sometimes respectable women have to sell their honour for food and cloth. ... It is the money of the poor cultivators of this country—the jute and cotton cultivators and it is the money of the common man who pays taxes and out of those taxes we are going to pay Rs. 6,000 per month to the Governor. ... I will ask my friend not to insult Islam any more. You have no right to talk of Islam when you are going to pay Rs. 6,000 to your Governors.' তিনি অত্যন্ত আফসোস করে বলেন, 'The people of our country are without food, without shelter, and when they die for want of food, Government will make a report that the man had died due to cholera or malaria.' তিনি তাঁর বক্তৃতায় বারবার গরিব মানুষের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১১)

তারিখ : ১ অক্টোবর, ১৯৫৫

ফোরাম : পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : গভর্নর জেনারেলকে অসীম ক্ষমতা প্রদান বাঞ্ছনীয় নয় প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : গভর্নর জেনারেলদের যে অসীম ক্ষমতা থাকা ঠিক না তা বঙ্গবন্ধু ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'Sir, you must have seen during the short history of eight years of Pakistan, how Governors have dismissed Ministers without assigning any cause whatsoever.' তিনি আরও বলেন, 'Prime Minister is the man who is the representative of the people and in whom people have confidence and in whom even the members of this House have confidence because they have elected him by a majority and so we want to give these powers to him and not to a man who is not a representative of the people but has been appointed by Her Majesty the Queen of England. Now, Sir, how is it possible for the people of Pakistan to expect justice from a man who is not their representative.' গভর্নর জেনারেলের হাতে অসীম ক্ষমতা প্রদান করা হলে তার কুফল সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন যে, গভর্নর জেনারেল তাঁর মর্জিমাফিক তথাকথিত অসন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে ৯২-ক ধারা বলবৎ করবেন এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ধর-পাকড় করাবেন। কাজেই গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং দেশের মঙ্গলের জন্য কোনো এক ব্যক্তির হাতে অসীম ক্ষমতা না দেওয়ার পক্ষে তিনি প্রস্তাব করেন। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪)

তারিখ : ৯ নভেম্বর, ১৯৫৫

ফোরাম : পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : ক্ষমতাসীন দলের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ সম্পর্কে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সময় পূর্ববঙ্গের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেন এবং তীব্র ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'I do not know how they say that Karachi has not been taken away and still remains the Capital of Pakistan. It can not be denied that deceiving is such a way will not bring any gain to them. I request my friends of the united Front to explain the reasons for deceiving the people of East Bengal in this way. They should admit that Karachi is no more our Federal Capital. You may do what you like, you may make the Capital at Gadap, or take it in the Arabian Sea or in the Bay of Bengal instead of Karachi but I know that the people of East Bengal are aware of this fact. The mere fact that Karachi is electing its own representatives to the West Pakistan Assembly is a helping factor to make the people understand that Karachi no more has the status of the Capital of the Federation.' এ অধিবেশনে তিনি অভিযোগ করে বলেন যে, জনগণের অর্থ ব্যয় করে তামাশা করা হলে তা জনগণ সহ্য করবে না। এই বলে তিনি সকলকে হুঁশিয়ার করে দেন। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮)

তারিখ : ১৭ জানুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : সংসদের দৈনন্দিন কার্যসূচি বাংলায় মুদ্রিত হওয়া প্রসঙ্গ সম্পর্কে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব এ সময় থেকে সংসদের দৈনন্দিন কার্যসূচি বাংলা ভাষায় মুদ্রণ করার দাবি জানাতে থাকেন। সে সময় এই কার্যসূচি শুধু ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় মুদ্রিত হতো। এ প্রসঙ্গে তিনি সংসদে বলেন, 'Sir, in the Rules of Procedure of the Constituent Assembly of Pakistan under Rule 29, the official languages of the Assembly have clearly been mentioned as three: English, Bengali and Urdu. But as you know, Sir, the Orders of the Day are circulated in English and Urdu and not in Bengali. I do not know either you know it or not and whether it has been done intentionally or not. But, Sir, I would like to know why these things have been happening from the office of the Constituent

Assembly, why it has been done and why Bengali has been excluded. This was my point of privilege to which I wanted to draw your attention.' তিনি আরও বলেন, 'The proceedings have definitely been kept in Bengali. But the question is that since three languages have been recognized as official languages, all the three should get equal status. If the Orders of the Day is issued in English and Urdu, they must definitely issued in Bengali, also because Orders of the Day is part of the proceedings. When the Orders of the Day has been issued in two languages, i.e. in English and Urdu, then why not in Bengali? So far, Orders of the Day were issued in English only, but when it has been issued now in English and Urdu, what is the intention of excluding Bengali?' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২২)

তারিখ : ২১ জানুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার পাওয়া প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রসঙ্গে এদেশের, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী অমুসলমান নাগরিকদের অধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, 'Sir, We want to make an Islamic Republic of Pakistan. The name is already here. May I ask a question from my Nizam-i-Islam friends, particularly and from the members of the United Front, whether a non-Muslim can preside over the Constituent Assembly to frame an Islamic Constitution or not? Sir, I have respect for you. It is, I think and I feel, that my country has given a non-Muslim the responsibility for a little while over seven cores of the people of Pakistan, but have started in the name of Allah, but, Sir, when we hare going to make an Islamic Constitution I ask whenever a non-Muslim who does not believe in La Ilaha Illal-lah Muhammadur Rasulallah, who does not believe in the last Prophet of Allah, can preside over such a constitution-making body as ours? I know that I will get an answer from the Holy Quran or from the Sunnah or from the history of Islam or from the history of the Muslim Rule.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯)

বিষয় : জনগণের মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব বলেন, খসড়া সংবিধানে যে-সকল মৌলিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেগুলো ক্ষমতাসীন সরকারের খেয়াল খুশির অধীন করা হয়েছে। এর ভবিষ্যৎ কুফল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, ভবিষ্যতের যেকোনো সরকার (এর ফলে) জনগণের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে এবং তাদের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে। তিনি বলেন, 'However, in the fundamental rights enumerated in our draft Constitution, we have a serious handicap. They are subordinate to the whims of the government of the day. Today the Muslim League and the United Front Party are in power but tomorrow some other party may assume the control of the executive power of the country and they may or they may not show respect to these fundamental rights because ample powers have been given to the government to violate these provisions of fundamental rights.' শেখ মুজিব সংবিধান প্রণেতাদের চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'I challenge my honorable friends to quote a single injunction in Islam whereby a man may be permitted to hold ten or fifteen lakh acres of land simultaneously another Mussalman may die of starvation on the streets of Karachi and Dacca. Can they show an injunction in Islam? Can they produce anyhing to support them in their feudalism of jagirdiari and zamindaries; 'Nobody can take the property of a zamindar without providing compensation?' Who will give the compensation to the people who have tilled and toiled to whom will the compensation be paid; to the people who have enjoyed in the name of Islam? How long will they bluff the people of Pakistan in the name of Islam? You are insulting Islam before the whole would. You are discrediting Islam.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২)

বিষয় : সম্পদের সমবণ্টন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : সম্পদের সুষ্ঠু ও সমবণ্টনের দিকে বঙ্গবন্ধুর নজর সবসময়ই ছিল। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'It is clearly said by Islam that there should be equal distribution of wealth. The whole property should be equally distributed. We do not want that their properties should be confiscated; give them so much as they can live peacefully in their homes with their families. Taka their other properties and give it to the masses. Give them 10 bighas or 10 or 5 acres. Work on

the principles of islam. Establish Islamic principles and philosophy and then speak about Islam. This is absolutely a mockery of Islam and democracy. Here the chaprasi is getting R. 45 per month while the head of the State gets 12,000 rupees per month is this Islamic State? What our Khalifas took in the Islamic State, what was the expenditure of our Khalifas; what hazrat Muhammad (Sallallaho-alaihe-wasallam) took from the Public Exchequer? He did not spend to single penny from the state funds.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪)

বিষয় : বিচার বিভাগের ওপর শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব বলেন, 'In every constitution you will find that Judiciary has been separated from the Executive. Here the ruling junta and the privileged classes want to keep power intact in their own banks. Can you expect justice in such conditions where the Executive wants to control the Judiciary? Now they will say we will transfer you from Lahore to Dacca and from Dacca to Lahore. This is a new thing that have done that the High Court Judges can be transferred from this province to that.' তিনি এখানে প্রশ্ন করেন এ অবস্থায় ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব কিনা? তিনি আরও বলেন, 'Now Executive wants to control the Judiciary, is this Islamic constitution? I want to know what was the position of the Qazi? Even the Khalifa had to go in front of the Qazi for the chares. That is Islamic consitution, but here we want to separate Judicary from the Executive. God knows in how many years; it may take 25 years! It may be after our death. (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬)

বিষয় : বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব সরকারি ভাষা ও রাষ্ট্রভাষার মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে বলেন, সংবিধানে 'সরকারি ভাষা' ও 'জাতীয় ভাষা' শব্দমালা ব্যবহার করে জনগণকে, বিশেষত পূর্ববাংলার মানুষকে, ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'West Pakistan is not against Bengal becoming State language. I have visited Lahore, I have gone to people in Karachi, in Peshawar and Rawalpindi and I find that people as a whole are not against Bengali becoming State language because the people as a East Bengal do not claim that there will be only one State language and that will be Bengali. They do so because they know in Punjab they

speak Punjab language but Urdu is the medium of instruction and so is the case in frontier, where their language is Pushto but the medium of instruction is Urdu and so is Sind, the langauge is Sindhi but medium of instruction is Urdu. Urdu-speaking people in Pakistan are less than Punjabi-speaking people but most of the people in West Pakistan receive instructions in Urdu. We have told that people of East Bengal are not sectarian. Do not say that. Never have they declared that they want only one State language, that is Bengali, although they are 59 per cent in the country and their medium of instruction is Bengali. They have asked for two State languages for Pakistan. They have sacrificed blood for this. Everybody whether Minister or Prime Minister who has been elected from East Bengal, has promised that he will make Bengali as one of the State languages.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭)

বিষয় : রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব প্রেসিডেন্টকে আইনসভা ভেঙে দেওয়া, জরুরি পরিস্থিতি তলব করে সংবিধান স্থগিত রাখাসহ প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'My point is that by giving such wide powers to the President, they have virtually created a dynasty. If you permit me, I can read out the whole section to you. They have given power to one man—a person who is not directly elected. The Head of the State can dissolve an elected Parliament though he himself is elected indirectly. He will nominate Chief Minister and the Cabinet who will function according to his advice and during his pleasure. He will not act on the advice of the Cabinet, that is the whole point. So, I say that this is quite contrary to democratic principles. Under the democratic Constitution, the Head of the State is only a figurehead, but unfortunately in Pakistan it is not so.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০)

বিষয় : একত্রে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব সংবিধানে সকল জাতিগোষ্ঠীর একত্রে ভোট প্রদানের ব্যাপারে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা উল্লেখের দাবি জানান। তিনি বলেন, 'Sir I recently had been to East Bengal and there I had the chance of discussing the Constitution with the masses in general. There, the people want joint electorate, but they are helpless. They cannot raise their feeble voice agaist the Centre and if they dare to do that, the

next day the Ministry of Mr. Abu Hussain Sarkar will fall. I fall to understand why they do not want to give joint electorate to the people when they are themseles asking for it. Nowhere in the world, theere are separate electorates excepting in South Africa where they have got two classes, the privileged class and the unprivileged class. Here inspite of the persistent demand by the minority for joint electorates, you are not agreeable to it. What is this all? Is it democracy or what that you are denying the right to the people to exercise their own free-will. I say they had not the moral courage to put down in writing that there shall be joint electorate or separate electorate. They have not the courage to face the masses and therefore they want to hoodwink them. I know the views of the people in Bengal over this Constitution I had been to Dacca recently.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১)

বিষয় : পূর্ববঙ্গের রেলওয়ে প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব পূর্ববাংলার রেলওয়ের দুরবস্থা ও এর ওপর পূর্ববাংলার নিয়ন্ত্রণহীনতার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'Sir, the Railways of East Bengal have been absolutly runied during the last eight years.' তিনি বাস্তব তথ্যের আলোকে তুলে ধরেন কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় অব্যবস্থার দরুন পূর্ববাংলার লাভজনক রেলওয়ে লোকসানি খাতে পরিণত হয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'Railway is a commercial subject. The administration of any subject in East Pakistan from distant Karachi is a well-nigh impossibility. It would be we exemplified from gross mismanagement and bunglings that have taken place in the administration of Eastern Bengal Railway during the last eight-years. ... East Bengal Railway keeps its accounts separate form that of the Government and keeps a separate. Accounts Department, only its total receipts and out-going on revenue accounts month by months enter into the monthly returns of the Accountant-General of Pakistan Revenues as a separate item. The difference between these incomings and outgoings over a number of years, must necessarily show whether East Pakistan Railway has been a profitable concern.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫)

বিষয় : ২১ দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব ২১ দফা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন, জনগণ তাদেরকে ২১ দফার জন্যই ভোট দিয়েছে এবং সেই দফাসমূহের একটি হচ্ছে

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। তিনি তখন থেকেই কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রার ভার অর্পণ করে প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকেন। তিনি স্বায়ত্তশাসন চাওয়ার পেছনে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করান কেন্দ্রের পাঞ্জাবি শাসকদের শোষণকে। এদের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'তারা পাকিস্তানের এক হাতকে (পশ্চিম পাকিস্তানকে) শক্তিশালী করে অপর হাতকে (পূর্ব পাকিস্তানকে) দুর্বল করছে। এই নীতি ভুল এবং এটাই দেশকে ধ্বংস করবে।' তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, যে তার অভিযোগ পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নয়, বরং পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিপক্ষে। তিনি আইনমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'If you want to push through the Constitution, you could do so, but if you press this constitution then you are playing with fire. I have just now come from East Bengal, and I know the sentiments of the people there, of the agriculturists, the poor businessmen and other people of East Bengal. If you push through this consittution, God alone knows what will happen. We want that Pakistan should be saved from the ruling junta for the poor masses, who have achieved Pakistan after great sacrifices. These people who are now ruling were not 2-anna members in the struggle for Pakistan. They want to destroy Pakistan in the name of Islam. If you frame the Constitution on the basis of 21-point programme, we will co-operate with you, we will join you, but if you go against the wishes of the people we will mobilize opinion not only in East Pakistan but also in West Pakistan against this dictatorial and undemocratic Constitution. If you agree to pass a democratic constitution, we will help you to pass it within seven days, even within three days, but that Constitution should be on the democratic basis, on the basis of 21-point programme, otherwise we will oppose it tooth and nail.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২)

তারিখ : ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'You say that 'freedom of expression' means freedom of press. Do you know that in East Bengal how the editors are called and it is said 'you can not

write this, you can not write that.' They can not even write facts. Sir, I can prove it. The Government of East Bengal writes, or a clerk writes it; the order goes from the Secretariat that 'you can not discuss these thigs'. A sub-inspector goes on behalf of the Government to stop the press from writing a particular thing.' তিনি আরও বলেন, 'Sir, we are making a Constitution for the whole country, not for 80 persons sitting here. We want that freedom of press should be guaranteed specifically. Instances have been given here how our friends in the Government are behaving.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪)

বিষয় : বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে নাগরিকদের মতামত প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব বলেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে পাকিস্তানের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বা বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি সে বিষয়ে জানার ও মতামত প্রকাশ করার অধিকার রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের রয়েছে। তিনি বলেন, 'Sir, they want only one party in Pakistan, because if there is one party, there will not be any opposition or criticism about foreign relations. Our Government does not like criticism; whatever foreign relations they make, you have to accept them. This is the fundamental point. The framers of the Bill say it is a small point and why we take so much time discussing it. But, Sir, it is a very important point.' তিনি অনুরোধ করে বলেন যে, 'I request the Honorable Law Miniser and the Coalition party to accept this amendment so that the poeple will have some right to say something about our foreign relations with the foreign countries, which is the fundamental right of the people. Sir, this is an important matter, because if the Government formulates a wrong foreign policy, the country will be ruine. It is, therefore, necessary that the people should have right to speak about these matters. The country as a whole is responsible for the conduct of foreign relations. (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬)

বিষয় : মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব এখানে জনগণের মৌলিক অধিকার সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'We are getting the fundamental rights for the first time after we took birth. During the British days we had the right to deliver speeches, address the public meetings and mobilize publc opinion against the British Government. This is the first time

that after independence we are getting these fundamental rights and therefore these rights should be granted.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬)

তারিখ : ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : আলোচনার জন্য উত্থাপিত খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেখ মুজিব বলেন যে, এই সংবিধানে ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দল গঠনের গণতান্ত্রিক অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'Sir, I am speaking of the Government, the party is power and still they would not allow trade unions to be formed, would not allow the workers to work in the country in their best interests. How can it be proved that it is a trade union if it is not mentioned in the Constitution that you have the right to form trade unions?' তিনি আরও বলেন, 'If anybody goes against the fundamental rights provided by the State and if he has extra-territorial loyalty, Government can always take action against him; even hang him, but if any party declares categorically that it wants to fight for the interests of the country, it has the right to organise the party for the interest of the country, particularly when it says that its members are loyal citizens of the State. The Government has no right to declare them illegal.' আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কারখানার শ্রমিকদের অধিকার রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'Citizens shall have the right to form associations, trade-unions and political parties for the end which are not forbidden to individuals by Penal Law.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫)

বিষয় : সরকারি চাকরিতে বাঙালিদের সমান অধিকার প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে (সেন্ট্রাল সার্ভিসের ২৫ শতাংশ বাঙালি লোক) চ্যালেঞ্জ করেন এবং বলেন যে সময়মতো তিনি এটাকে ভুল প্রমাণ করবেন। তিনি পূর্ববাংলার চাকরি বা কাজ প্রত্যাশী মানুষের সমস্যা তুলে ধরে বলেন, 'Sir, this fact must be realised that it costs an individual Rs. 200 to come from East Bengal to this place. If you recruit in East Bengal and give a job you will find a large number of people from East Bengal coming forward. There are such a large

number of M. A.s. and B. A.s. ... (Interruptions)... Sir, my time has been spoiled. There must be parity in all respects. We do not say that you implement parity at once. What we say is that unless and until parity is reached, Bengalees must get first preference. We must co-operate and there should not be a step motherly treatment met out to East Bengal. When you want to accertain thing to be done, you agree to a thing and the next day you disagree.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬)

তারিখ : ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি, চেম্বার, করাচি

বিষয় : প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব শাসনতন্ত্রের ওপর আলোচনার সময় দেশের সকল মানুষের জন্য খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান। তিনি জনগণের দুরবস্থা তুলে ধরে বলেন, 'We do not mind if they put on beautiful clothes, but people should also get it. Sir, what is the position? People are not getting Kafan. In East Bengal they do not get that piece of cloth to be buried and they are either thrown in the river or put in the grave without any cloth. This is the position. The people should get food, cloths, shelter, education, medical relief and employment. Sir, these guarantees should be given in the Constitution. In every clivilsed country they give this guarantee. People are going from place to place, they are not getting employment. They must get jobs. You curtail your pay, curtail your allowances; give the employment somehow.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮)

বিষয় : জনগণের ন্যায়বিচার না পাওয়া প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : ন্যায়বিচার থেকে জনগণ অনেক দূরে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'People are not getting justice, because the Executive is controlling the Judiciary. We see that even in party cases the Judiciary is sometimes influenced by the Executive to pass their verdict in their favour.' তিনি আরও বলেন যে, 'People can respect the constiution when they can get justice. If the people do not get justice, they will revolt against the government. Therefore, in order to do justice to the people, Judiciary must be separated from the Executive.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০)

তারিখ : ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : রাষ্ট্রভাষা বাংলা করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিবুর রহমান খসড়া শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত জাতীয় ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে উল্লেখ করেন, পূর্ববঙ্গ আমরা সরকারি ভাষা বলতে রাষ্ট্রীয় ভাষা বুঝি না, কাজেই খসড়া শাসনতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা কুমতলবে করা হয়েছে। পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ৫৬ ভাগ লোকই বাংলা ভাষায় কথা বলে, একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি হুঁশিয়ার করে দেন যে, রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রশ্নে কোনো ধোঁকাবাজি করা যাবে না। বাংলাও রাষ্ট্রীয় ভাষা হোক এ দাবি পূর্ববঙ্গের জনগণের দাবি উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, 'This is the demand of the people, of everyone—little boys and girls, men and women, male and female and everybody in East Pakistan wants to get this amendment that Bengali and Urdu should be the State languages of Pakistan from today and onwards.'
(দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১ ও ৬৪)

তারিখ : ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি, চেম্বার, করাচি

বিষয় : কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : আইন পরিষদে ভাষণ দান কালে শেখ মুজিব উল্লেখ করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এমন কোনো ক্ষমতা প্রদান করা উচিত নয় যা দ্বারা এই সরকার প্রাদেশিক সরকারের সকল বিষয়ে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ করতে পারে। শুধু প্রতিরক্ষা, মুদ্রা ও পররাষ্ট্র বিষয়াবলিই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকতে পারে। তিনি বলেন, 'In the last general election in East Bengal we had told the people that if we come to power and if we frame the Constitution of the country, then only these three subjects will go to the Centre and other powers will go to the provinces of East Bengal and West Pakistan. Unfortunately, Sir, I do not know what the Honorable Interior Minister will do of course, he will not accept the amendment. But is his heart of hearts, he is convinced that he should fulfill the pledges given to the people at the time of general election.'
(দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫ ও ৬৬)

বিষয় : শিল্পায়ন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব পূর্ববাংলার লবণশিল্পের বিকাশে কেন্দ্রের সমর্থন চেয়ে বলেন, 'The intelligentsia remarked that formerly East Bengal was a colony and by this constitution they want to make East Bengal still greater colony and a market of the Industirally developed areas of West Pakistan. All this may not be a fact but you know that here is salt industry in Karachi. You cannot say that salt industry cannot be developed in East Pakistan; we have resources there and yet we have suffered. You may recollect that salt shortage when it was sold at Rs. 16 per seer in East Bengal whereas in Karachi it was being sold at four piece per seer; the same Pakistan, the same people. What is the cause? It is the bad policy of the Government, the Government will not allow the people of East Bengal to prepare salt. Salt is a big cottage industry of East Bengal and if they give Rs. 10 lakhs, within five years, East Bengal will be self-sufficient in salt. But they would not allow.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭ ও ৭০)

তারিখ : ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : পাকিস্তানের উভয় অংশে সকল বিষয়ে সমতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : প্রতিরক্ষা বিষয়ক চাকরিসহ অন্যান্য সকল প্রকার চাকরিতে সমতা প্রদান এবং অন্য সকল বিষয়ে সৃষ্ট বৈষম্য দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করে শেখ মুজিব আইন পরিষদের অধিবেশনে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানের জনগণ এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সকল বিষয়ে সমতা চায়। তিনি আরও বলেন, 'Please request your friends from West Pakistan to try to understand the sentiments of the people of East Pakistan. It will create disaffection and distrust if these things are not accepted. For all these reasons I support the amendment.' তিনি ঐ অধিবেশনেই সংবিধানের ৯২ক ধারার বিরুদ্ধে যুক্তি স্থাপন করেন এই বলে যে, 'পূর্ববঙ্গের শতকরা ৯৭ জন মানুষের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রিয় সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার এই ধারায় বরখাস্ত করেছিলেন।' তিনি এই ধারার ঘোর বিরোধিতা করেন। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২ ও ৭৪)

তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : গণবিরোধী আইন, ছাত্র রাজনীতি, পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব জনবিরোধী নিরাপত্তা ও নিবর্তনমূলক আইনের বিপক্ষে বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, 'Islam permits a man to be detained without trial. Sir, in East Bengal during the last seven years this particular law has been used against the political opponents of the party in power in such a way that is never to be seen in the history of the world. The people who fought for the achievement of Pakistan, the people who suffered for achievement of Pakistan, the people who ruined their careers for the achievement of Pakistan, were the very persons against whom this particular law had been used. It was used against those persons who sacrificed their all for the sake of Pakistan. Why? তিনি বলেন, 'you must learn from history that if you do not allow people to work constitutionally, then they overthrow Government by violent means.' তিনি আরও বলেন, 'The Ministers sitting there who claim to be politically conscious and represent the people of East Bengal, I appeal to them to look to the interest of East Bengal; sit with your brothers from West Pakistan and find out ways and means for the agricultural and industrial development of the Province of East Bengal. Be honest to your pledge given to them. Do not forget them. Do not be misguided by the promises of the persons who are sitting by your side. Why are you incorporating this clause in the Constitution unnecessarily when you know that this Economic Council absolutely has no power and cannot do anything?' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮ ও ৮৬)

তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : গরিব, কৃষক শোষণ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রীদের ইসলামের নাম ভাঙিয়ে জনসাধারণকে শোষণ করার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'Sir, the salaries which the Leaders and Ministers of our country are drawing. I think,

are taxing heavily the poor masses of the country. Now, what is the economic condition of the country? What is the condition of the poor masses of the country? We are making an Islamic Constitution and we are Musalmans. Sir, Islam has taught us the lesson of equal distribution of wealth according to the needs of the individuals. But Sir, here what we are seeing? A poor peon is getting Rs. 50 a month and the head of the State, who is also a Musalman, will get Rs. 12000 per month and everything free. Are we not Musalmans? Why are we exploiting our own brethren?' এর পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'If you want to earn money you can earn outside, but when you have come as representative of the people to serve the people, then you should not become rich at the expense of the poor, because it is the poor who give the taxes, it is their money; you have no right to enjoy at their expense.' শেখ মুজিব ভূস্বামী, জমিদারদের কৃষক শোষণের বিষয় তুলে ধরে বলেন, 'Our amendment is based on this that the property of the zamindars should be confiscated; no compensation should be paid to them. I wanted to show how these zamindars have luxuriously enjoyed their life at the cost of these landless cultivators who are working day and night and are dying of starvation. In Pakistan these landless cultivators have got the right to get back the lands because we have achieved Pakistan not for rich people but for the economic emancipation the poor masses of Pakistan. We achieved independence for bettering the lot of the poor man otherwise the Britishers were better than these people who are ruling our country at present. We wanted economic emancipation from the British imperialists and the zamindars. But what have we seen for the last eight years?' তিনি আবারও উল্লেখ করেন, দয়া করে দরিদ্রদের আর শোষণ করবেন না। তাদেরকেও কিছু ভাগ দেন, তাদের সাথে ভাইয়ের মতো আচরণ করুন, আপনারাও তাদের সম্মান আর ভালোবাসা পাবেন। আর যদি তাদের উপর নিপীড়ন চালিয়ে যান, তাহলে শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যেদিন তারা আপনাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭ ও ৯২)

তারিখ : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : উভয় অংশে সমতা বিধান প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র প্রশ্নে আলোচনাকালে পাকিস্তানের

উভয় অংশের মধ্যে সমতা বিধানের ক্ষেত্রে স্পষ্ট বৈষম্যের বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরেন তিনি বলেন, 'They have now violated the fundamental principles of parity on which we agreed for parity. That is why we no longer want parity. We want representative according to population, because as I told you earlier it is a vital question for the people of East Bengal.' পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা বিভেদ সৃষ্টি করছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি সংসদে বলেন, 'You have decided for 50:50 from both the sides. Out of 150 seats, 30 Hindus will come from East Pakistan and in West Pakistan 150 seats will go to the Muslims. Now, Sir, these West Pakistani leaders want to divide and rule us. It is impossible to tolerate this.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬ ও ৯৭)

তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : এ দিন আইন পরিষদে রাষ্ট্রভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। শেখ মুজিব এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'On the expiration of ten years from the Consitution Day, the President shall appoint a Commission to make recommendations for the replacement of English. This is all very vague. Everything should be categorically stated here, because God knows what will happen and we have seen many times how the people of Bengal have been cheated; how the people of Pakistan have been cheated. I hold the same views about Urdu. They also want, with us, that English should be replaced by Urdu and Bengali within ten years. They are very anxious; it is their demand. In all their meetings they are demanding the same thing. I am not speaking for Bengali alone. I am speaking for Bengali and Urdu, because these are the two State languages of Pakistan today.' তিনি আরও বলেন, 'We must provide in the Constitution that the West Pakistan Government must take all steps to develop these four languages. Otherwise what will happen? It might be that a particular province who are in a majority, may suppress the other languages of the Unit. This is the point to which I wish to draw the attention of the House. I would appeal to them to accept the amendment of Mr. Mahmud Ali and our amendments about ten years. If I speak in Bengali they cannot follow; if they speak in Urdu. I cannot follow.

But if we can develop, I will speak in Urdu and they will speak in Bangali and this will lead to greater friendship and co-operation and Pakistan will become stronger. Ten years is a sufficient period.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪ ও ১০৫)

তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : সামরিক শাসন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করার হুমকি এক নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দেখা দেয়। বঙ্গবন্ধু দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এর অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে আইন পরিষদের অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'You have passed this Constitution and everywhere you have taken everything from the people of the Province. There is only one power there; and in the name of emergency and internal disturbances you are taking back this particular power also.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬ ও ১০৯)

তারিখ : ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : ইসলামি আদর্শ ও শাসনব্যবস্থা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণের সাথে প্রতারণার অভিযোগ তুলে বলেন, 'You are not making a democratic and Islamic Constitution. You are making a reactionary Constitution, a Constitution not for the people but for the ruling junta to govern the country according to their own fancy and desire.' তিনি সরকারের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রয়াসের সমালোচনা করে বলেন, '...if in the people of Pakistan say to our party that the Awami League has no right to govern the country, we will leave politics, we have got that moral courage. But my friends opposite do not have that moral courage because they want to keep power in their own hands and pockets. But, Sir, they cannot do it because history has so many times proved it that you cannot bluff the people for all the time. For some time you can bluff the people, but for all times you cannot bluff them. Why do

you not give the country a character? Why do you not say that it will be a Socialistic State where land will be distributed among the poor classes of the people and His Excellencies will get Rs. 12,000 a month. Sacrifice some money and give it to the poor masses who are dying of hunger and starvation.'

শেখ মুজিব আরও বলেন, 'Sir, is it you Islamic State? Suppose I have some money and a Hindu beggar comes to me and asks for money. Should I not give him because he is a Hindu? No, whether he is a Hindu beggar, or a muslim beggar or a Christian beggar, they are one and the same. There is no difference between poor and poor as there is no difference between a big landlord and a big landlord. I have seen, Sir, in Calcutta riots, how big and moneyed people who had crores of rupees saved their lives and came over to Pakistan. It were the poor *rickshawwaalas* and *gariwaalas* who sacrificed their lives for Pakistan. Can you tell me sir, whether any big man died in the same of Pakistan? It was the poor masses of India who died and made sacrifices for Pakistan. Now you are playing with the poor masses of Pakistan in the name of Islam. Sir, let Pakistan be a pure and simple Pakistan of the People. Do not try to hoodwink the people of Pakistan in the name of Islam.' তিনি শাসকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'If you want an Islamic Republic of Pakistan, do justice on the basis of Islam so that people may feel that it is Islam.You cannot bluff them in the name of Islam. (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯ ও ১১৫)

বিষয় : যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী (joint electorate) বিষয় বলেন, 'It is the demand of every person in East Pakistan that we want joint electorate. There is no party and if they pass this Constitution by brute majority, we know how to deal with that because the people of East Bengal are behind us and they will not accept it. You are giving this bluff to the people of East Bengal and you will see its consequences.'

শেখ মুজিব পাকিস্তানের দুই ইউনিটের জন্য দুটি স্বতন্ত্র ফেডারেল রাজধানী (করাচি ও ঢাকাতে) করার আহ্বান জানিয়ে এর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, '... it is impossible to work without two Capitals, one should be at Dacca and the other at Karachi. Is it possible on the part of the people of East Bengal to come over to Karachi to ask for a small remedy, even so far at the business is concerned service is concerned

or other matters are concerned? Now in this Constitution what do we see? In the Federal Constitution, they have made Unitary Constitution and as such all powers vest in the hands or Centre and for everything the people of East Pakistan will have to come to Karachi. If the people, of East Pakistan have to come to Karachi, they have to spend at least 400 rupees for coming and going. How, is it possible for a poor man to come from East Bengal to Karachi for a small remedy? It is impossibles, specially when the country has been divided into two wings separated by 1,200 miles by a foreign territory. Therefore, Sir, what is the harm in keeping two Capitals. ... Two Capitals "Dhaka and Karachi". This is my point of view to which I want to draw your attention that there should be two Capitals for the people of Pakistan, because the majority of the people are living in East Bengal. We may accept parity for any other recommendation. But it must always be kept in mind that at least 56 percent of the population of the people of Pakistan are living in East Bengal and the Capital is Karachi and the people of East Pakistan are not getting any direct fruit of the Federal Capital being here because it is impossible for the people of East Bengal to come every now and then for the redress of their small grivances. Sometimes our Central Ministers go there for two or three days to visit their houses and come back. The people do not get any chance to see them.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২ ও ১২৩)

তারিখ : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

ফোরাম : আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : সংসদে মহিলা আসন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : জাতীয় আসনে মহিলা-আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিতর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন। তিনি সংসদে মহিলা আসন বৃদ্ধির প্রস্তাব করে বলেন, 'I only wish to point out that in East Bengal Assembly where there are 309 members, 12 seats have been reserved for women. Whereas in our Constitution we are only giving 10 seats to our women. What would be the position? Though we have not yet decided the question of electorate whether it will be joint electorate or separate, how many seats will got to the minorities and how many seats will go to the majoirty. On the basis of separate electorate we have 9 Muslim seats and 3 non-Muslim for women in East Bengal Assembly. Therefore, I appeal to the Honourable Prime Minister that

when we have got 12 seats reserved for women in our East Bengal Assembly, what is the harm if we have 20 seats reserved for them in our National Assembly because they are half the population of Pakistan. Our Mulla elements might give a fatwa and raise a voice as some of them have already started saying that our womenfolk must remain inside their houses and should not dabble in politics. For this reason I was thinking to give a suggestion to the Honourable Minister of Industries to instruct Valika mills to produce more burquas because sooner those Mullas start saying that they should remain inside their house, more burquas will be needed. Therefore, Sir, I appeal to them to accept the amendment of my friend Mr. Zahiruddin for the reservation of 20 seats for women in the National Assembly because they are our sisters and they have got every right. They are equal citizens of Pakistan. If we do not provide this safeguard for them, it will be difficult for them to compete in open seats with men. If the amendment of Mr. Zahiruddin is accepted, then we will be doing a great service to our womenfolk and that will also be better for the development of nation and by that men and women can work together for the emancipation of the country.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩ ও ১২৬)

তারিখ : ১১ অক্টোবর, ১৯৫৬

ফোরাম : আইন পরিষদের অধিবেশন; এসেম্বলি চেম্বার, করাচি

বিষয় : যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী পদ্ধতি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব জাতীয় সংসদের অধিবেশনে আবার যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী সম্পর্কে বক্তৃতায় বলেন, 'West Pakistan has given their verdict in favour of separate electorate and East Pakistan for joint electorate. The people of East and West Pakistan have accepted this verdict. So there can be no question of obtaining further publc opinion in the matter. It is only delaying tactics adopted by the Muslim Leaue during their long eight years' rule in the country. ... I want to tell Mr. Fazlur Rahman that Muslims wanted Pakistan not on the question of religion but on the question of economy. Because the Muslims in India were poor, they wanted safeguard for the minorities and they wanted a homeland. ... According to them East Pakistani Muslims are not Mulims because we want joint electorate and in West Pakistan they are Muslims because they want separate electorate.' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯)

তারিখ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

বিষয় : ছয় দফা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : ৬ দফা দাবির তাৎপর্য ও এর অপরিহার্যতা জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব ৬ দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারি সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ একটি পুস্তিকা প্রচার করে। পুস্তিকাটির প্রারম্ভ-বক্তব্যে তিনি বলেন, 'আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচকোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। ... ৬-দফা দাবি আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে।' তিনি তাঁর পুস্তিকার শেষে জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, '...পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। ...সাড়ে পাঁচকোটি পূর্ব পাকিস্তানের ভালোবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই-বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার জন্য সংগ্রাম করার মতো মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না।'

শেখ মুজিব ৬ দফার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা তুলে ধরেন তাঁর পুস্তিকায়, যা সংক্ষেপে তাঁর জবানিতে নিম্নে বর্ণিত হলো :

১নং দফা

দফাসমূহ : 'ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন সভ্যসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।'

তাৎপর্য/যৌক্তিকতা

- 'লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে-আজম সহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা।'
- '১৯৪৬ ও ১৯৫৫ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব-বাংলার মানুষ এই প্রস্তাবের পক্ষেই তাদের রায় দিয়েছে।'
- 'কাজেই আজ লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনো নতুন দাবি তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরোনো দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র।'

২নং দফা

দফাসমূহ : 'ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের হাতে থাকিবে।'

তাৎপর্য/যৌক্তিকতা

- 'ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই গ্রহণ করিয়াছিল তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল, বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হয়েছিল।'
- 'যে যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়।'

৩নং দফা

দফাসমূহ : 'এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়াছি। যে কোনো একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দু'টি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।'

তাৎপর্য/যৌক্তিকতা

* 'কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে।'
* 'মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব

পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চালিয়া যাইতেছে। ...উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এ কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই।'

* 'ফ্লাইট অব ক্যাপিটেল বন্ধ করতে না পারলে পূর্ব পাকিস্তানিরা নিজেরা শিল্প ও বাণিজ্যে এক পাও আগাইতে পারবে না।'

৪নং দফা

দফাসমূহ : 'সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউয়ের নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এভাবে জমাকৃত টাকাই এই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।'

তাৎপর্য/যৌক্তিকতা

* 'কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বীকৃত।'

* '(এ ব্যবস্থায়) ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনো দফতর বা অফিসারবাহিনী রাখিতে হইবে না।'

* 'অঞ্চল ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না।'

* 'ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একত্রীকরণ সহজতর হইবে।'

৫নং দফা

দফাসমূহ: 'এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :

১। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

২। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩। ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয়-অঞ্চলের মধ্যে আমদানী রফতানী চলিবে।

৫। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।'

তাৎপর্য/যৌক্তিকতা

* 'পূর্ব-পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্প-জাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।'

* 'পূর্ব-পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না ওঠায় পূর্ব পাকিস্তানে অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারে ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহার করা হচ্ছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।'

* 'পূর্ব-পাকিস্তানে যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। ...ফলে অর্থনৈতিক অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব-পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো লাগিয়াই আছে। ...বিদেশি মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।'

* '...পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না।'

* '...আমাদের অর্জিত বিদেশি মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশি লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানকেই।'

৬নং দফা

দফাসমূহ : 'এই দফায় আমি পূর্ব-পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারমিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়।'

তাৎপর্য/যৌক্তিকতা

* 'একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। ...পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ১২ বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৫২)

তারিখ : ২৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯

ফোরাম : বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা সেনানিবাস

বিষয় : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব বলেন, 'আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চেয়েছিলাম ৬-দফা কর্মসূচিতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী ও স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের উপর শোষণ ও নির্যাতন অব্যাহত রাখিতে চায়।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮)

তারিখ : ২৮ অক্টোবর, ১৯৭০

ফোরাম : পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান

বিষয় : নিরন্তর সংগ্রাম চালানো সম্পর্কে

বক্তব্য/ঘটনা : সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই। কারণ, আমাদের মূল লক্ষ্যে এখনো আমরা পৌঁছাইনি। জনগণকে ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। মানুষের উপর শোষণ, অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটাতেই হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১)

(দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০, *দৈনিক আজাদ*, ২৯ অক্টোবর, ১৯৭০)

বিষয় : দেশবাসীর রাজনৈতিক অধিকার এবং ধনী দরিদ্রের বৈষম্য সম্পর্কে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব বাঙালিদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ বিশ্লেষণ করে বলেন, 'আজকে জাতীয় সংকটের প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত জনগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত। তৃতীয়ত অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে।' শেখ মুজিব তাঁর বক্তব্যে ধনী দরিদ্রের তীব্র বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে বলেন, '...অসহায় দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটছে। কেবল বেঁচে থাকার তাগিদে জনসাধারণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯০ লাখ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবনযাত্রার দ্রুত ব্যয় বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্প, শ্রমিক ও মেহনতি সম্প্রদায়ের উপর।'

(দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২ ও ১৬৩)

বিষয় : অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, 'অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে গত ২২ বছরে সরকারের রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র ১৫ শত কোটি টাকার মতো (মোট ব্যয়ের এক-পঞ্চামাংশ মাত্র) বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে। অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দেশের সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে বাংলাদেশে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি।'

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বঞ্চনার চিত্রও তিনি তুলে ধরেন, 'স্বাধীনতার ২২ বছর গত হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে বাঙালির সংখ্যা আজও শতকরা ১৫ ভাগ। দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙালির সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগেরও কম।'

(দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩)

বিষয় : আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব বলেন, '৬-দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে, সেই মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি শেষবারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি।

অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোনো কিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না। আমরা এই শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরান ও সুন্নাহর নির্দেশিকা ইসলামি নীতির পরিপন্থী কোনো আইনই এ দেশে পাস হতে পারে না, চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮)

বিষয় : ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলো জাতীয়করণ এবং একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথা বিলোপ করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, 'জাতীয়করণের মাধ্যমে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলো ও অর্থনীতির অন্যান্য মূল চাবিকাঠিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থনীতির এসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হতে হবে সরকারি অর্থাৎ জনগণের মালিকানায়। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। ...একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধন করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। ...গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে, যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪-১৬৫)

বিষয় : যমুনা সেতুসহ অন্যান্য সেতু নির্মাণ করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, 'যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে উত্তরবঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেই। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সিন্ধু নদীর উপর এবং বুড়িগঙ্গা, কর্ণফুলী ও শীতলক্ষার উপরেও সেতু নির্মাণ করতে হবে।'

(দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬)

বিষয় : দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু এ প্রসঙ্গে বলেন, 'অর্থনীতির সর্বত্র মজুরি কাঠামো ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিম্ন বেতনভুক কর্মচারী ও অল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্য দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭)

বিষয় : প্রকৃত ও প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যের শেষের দিকে বলেন, 'জাতি হিসেবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে–আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবিলা করবই। প্রকৃত ও প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে...।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯)

তারিখ : ৩০ অক্টোবর, ১৯৭০

ফোরাম : নির্বাচনী জনসভা, জয়দেবপুর

বিষয় : পূর্ব-বাংলার জন্য নির্বাচনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আসন্ন নির্বাচনকে শুধুই ক্ষমতা লাভের নির্বাচন নয় বলে উল্লেখ করে বলেন এই নির্বাচনে স্বাধীনতার পর থেকে শোষিত ও অবহেলিত বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হবে। তিনি বলেন, 'বাংলার উর্বর মাটিতে যেমন সোনা ফলে, ঠিক তেমনি পরগাছাও জন্মায়! একইভাবে বাংলাদেশে কতকগুলো রাজনৈতিক পরগাছা রয়েছে, যারা বাংলার মানুষের বর্তমান দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী। ...আসন্ন নির্বাচনে এসব রাজনৈতিক পরগাছাদের শুধু উৎপাটিতই করা হবে না, তাদেরকে চিরতরে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হবে এই বাংলার মাটি থেকে।' তিনি আরও বলেন, 'নির্বাচনের পর স্বার্থবাদী মহল আবার ষড়যন্ত্র চালানোর চেষ্টা কররে তাদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য আমি গণ-আন্দোলনের ডাক দেব। বাংলার মানুষের কল্যাণ এবং মুক্তির জন্য এটা আমার শেষ সংগ্রাম।' তিনি ঘোষণা করেন, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা পাকিস্তানি যে কোনো নাগরিকের মতোই সমান নাগরিক এবং সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১, *দৈনিক পাকিস্তান*, ১ নভেম্বর ১৯৭০)

তারিখ : ২৬ নভেম্বর, ১৯৭০

ফোরাম : সাংবাদিক সম্মেলন, হোটেল শাহবাগ, ঢাকা

বিষয় : ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে নিহত মানুষ ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : ১২ নভেম্বর, ১৯৭০ মধ্যরাত থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত মানব ইতিহাসের সবচেয় ভয়াবহ প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে আঘাত হানে। এতে প্রায় ১০ লাখ লোক প্রাণ হারায়।

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অনেক আগেই বিদেশী সংবাদদাতারা এ মর্মান্তিক সংবাদ বিশ্বব্যাপী প্রচার করে। পাকিস্তানি সরকারের আগেই বিদেশি সাহায্য সংস্থাগুলো কর্মতৎপরতা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ত্রাণ সামগ্রীসহ নয় দিন পর্যন্ত দুর্গত এলাকায় ব্যাপক সফর করেন। পরে ত্রাণ তৎপরতা থেকে ফিরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তার নির্বাচিত অংশ নিচে তুলে ধরা হলো : 'আমাদের হিসাবে মৃতের সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ। অবশ্য কারও কারও মতে এই সংখ্যা ১০ লাখেরও বেশি।...

'পটুয়াখালী, ভোলা ও নোয়াখালীর বহু অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২০/২৫ ভাগ এই মহাপ্রলয়ের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। তারা প্রাণে বেঁচেছে সত্য, কিন্তু ঘরবাড়ি, ফসল, গবাদিপশু অর্থাৎ পার্থিব সহায়সম্বল হারিয়ে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। ...অসহায় বাত্যাবিধ্বস্ত অধিবাসীরা অনাহারে, অনাশ্রয়ে এবং রোগগ্রস্ত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৩)

বিষয় : সরকারের উদাসীনতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো দায়িত্ব পালনের সকল পর্যায়ে সরকারের চরম ব্যর্থতা। ...যদি প্রলয়ের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাপকভাবে উদ্ধার কাজ ও সাহায্য অভিযান চালানো হতো, তাহলে হাজার হাজার লোককে বাঁচানো সম্ভব হতো, হাজার হাজার লোক–যারা প্রলয়ের ধাক্কা সামলেও টিকে ছিল তাদেরকেও অনাহার, অনাশ্রয় ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতে হতো না। ...ভাগ্যের পরিহাস, যে সময় পশ্চিম পাকিস্তান বাম্পার ক্রপ উপভোগ করছে, সে সময় দুর্গত এলাকায় প্রথম খাদ্যবাহী জাহাজ এসেছে বিদেশ থেকে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪)

বিষয় : পশ্চিম পাকিস্তানিদের অসহযোগিতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'পশ্চিম পাকিস্তানের যে সমস্ত বস্ত্রশিল্প ও যাবৎকাল বাংলাদেশকে তাদের প্রধানতম বাজার হিসেবে ব্যবহার করেছে, তাদের কেউই এ পর্যন্ত মৃতের সৎকারের জন্য একগজ কাপড় দেয়নি। এজন্যই কি বিগত দুদশক ধরে আমরা আমাদের সম্পদের শতকরা ৭২ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করেছি?' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫)

বিষয় : রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, 'প্রতিটি বাঙালি সেই মহাসত্য হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে, তা হলো এতদিন যাবৎ আমাদের একটি কলোনি ও বাজার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের জন্মগত অধিকার আমাদের ভোগ করতে দেওয়া হয়নি।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের শাসনভার আমাদের হাতেই থাকতে হবে। আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের মালিক-মোক্তার আমাদেরই হতে হবে। আমাদের সম্পদ কিভাবে ব্যয়িত হবে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও ক্ষমতা থাকতে হবে আমাদের। ...শাসকদের মধ্যে যারা মনে করেন যে, জনগণের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করা যাবে, তারা হুঁশিয়ার হোন, বাংলাদেশ আজ জেগেছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৭)

তারিখ : ১ ডিসেম্বর, ১৯৭০

ফোরাম : গণমাধ্যম

বিষয় : নির্বাচনী আবেদন : ঐক্য বজায় রাখা ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনী আবেদনের নির্বাচিত অংশ নিচে তুলে ধরা হলো : 'আগামী ৭ ডিসেম্বর সারা দেশব্যাপী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। জনগণের ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এই নির্বাচন। সারা দেশ ও দেশের মানুষকে তীব্র সংকট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত করার সুযোগ এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।'

তিনি আরও বলেন, 'যদি আমরা বিভক্ত হয়ে যাই এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও মতাদর্শের অনৈক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আত্মঘাতী সংঘাতে মেতে উঠি তাহলে যারা এদেশের মানুষের ভালো চান না ও এখানকার সম্পদের ওপর ভাগ বসাতে চান তাদেরই সুবিধা হবে এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যাহত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিনটি পিছিয়ে যাবে।' তিনি মনে দারুণ এক সংকল্প নিয়ে বলেন, 'নিজেদের প্রাণ দিয়েও যদি এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করতে পারি, আগামী দিনগুলোকে সকলের জন্য সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারি এবং দেশবাসীর জন্য যে কল্পনার নকশা এতদিন ধরে মনের পটে এঁকেছিলেন–সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নের পথ প্রশস্ত করে দুঃখের বোঝা যদি কিছুটাও লাঘব করে যেতে পারি–তাহলে আমাদের সংগ্রাম সার্থক হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০)

তারিখ : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭০

ফোরাম : গণমাধ্যম

বিষয় : প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ প্রধান দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'ক্ষমতার প্রত্যাশী আমি নই। তবে শক্তির প্রত্যাশী আমি বটে–কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন মহলের হাত থেকে দেশবাসীর স্বার্থ ও অধিকার ছিনিয়ে আনতে শক্তি আমার চাই-ই চাই। সে শক্তি যোগাতে পারেন কেবল আপনারই।' তিনি জনগণের প্রতি জাতীয় পরিষদের বাংলাদেশের ১৬২টি আসনের প্রত্যেকটিতে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনাদের চাহিদা মতো শাসনতন্ত্র পাস করিয়ে আনতে হলে অনিচ্ছুক প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আমার চাই নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি আপনারা আমাকে জাতি, ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে দেন, তাহলে ওয়াদা করছি আপনাদের স্বার্থ ও অধিকার আমি আদায় করে আনবই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০)

তারিখ : ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭০

ফোরাম : সাংবাদিক সম্মেলন

বিষয় : জনসাধারণের প্রথম মহান বিজয় প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর আওয়ামী লীগ প্রধান দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের বলেন, 'আওয়ামী লীগের এই বিজয় প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের লাখো লাখো নির্যাতিত মানুষেরই বিজয়। ...আমরা মনে করি, কায়েমি স্বার্থবাদীদের শোষণ ও প্রকৃতির অভিশাপ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সব শক্তি ও সহায়সম্বল নিয়োজিত করার পবিত্র ওয়াদা করাই হলো জনসাধারণের এই বিজয় উৎসব উদ্‌যাপনের একমাত্র উত্তম পন্থা।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা আজ যে ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছি, তা আমরা আমাদের জনগণের ব্যাপক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে পারব।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬, *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০)

তারিখ : ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭০

ফোরাম : জনসভা, সন্দ্বীপ হাইস্কুল মাঠ

বিষয় : সাত কোটি বাঙালির জয় প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, '...ইনশাআল্লাহ আমরা এমন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করব যার ফলে বাঙালিদের শোষণের যুগের অবসান হবে। যদি নির্বাচনে জনগণ অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিত তাহলে তাদের কুকুর-বিড়ালের মতো মরতে হতো। এখন কেমন করে বাংলার দাবি ঠেকিয়ে রাখা হয় সেটা আমি দেখব।' তিনি জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেন, 'আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য আপনারা রক্ত দিয়েছেন এবং প্রয়োজন হলে সে ঋণ শোধ করার জন্য আমিও রক্ত দান করব।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭, *দৈনিক পূর্বদেশ* ও *আজাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭০)

তারিখ : ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭০

ফোরাম : তারবার্তা

বিষয় : ৬ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্রেই সুবিচারের নিশ্চিতি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অভিনন্দনের জবাবে বলেন, 'একমাত্র ৬-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রণীত শাসনতন্ত্রই অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭০)

তারিখ : ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭০

ফোরাম : সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য বিবৃতি

বিষয় : ৬ দফা কর্মসূচির পক্ষে ঐতিহাসিক রায় প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব সংবাদপত্রে প্রেরিত বিবৃতিতে বলেন, 'আমাদের ৬-দফা কর্মসূচির পক্ষে এক ঐতিহাসিক রায় প্রদানের জন্য আমি জনসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এই রায় বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিতেছি। ৬-দফা কর্মসূচি ছাড়া কোনো শাসনতন্ত্র হতে পারে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০ *দৈনিক সংবাদ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭০)

তারিখ : ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭০

ফোরাম : সংবাদপত্রে বিবৃতি

বিষয় : জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়া প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : অল্প দিনের ব্যবধানে পরপর দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে শেখ মুজিব সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন,

'এ ব্যাপারে ত্বরিত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে এবং তারা এই সকল গণ-বিরোধী দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানতে পারে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২, *দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ*, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭০)

তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭০

ফোরাম : শোকসভা

বিষয় : উস্কানিমূলক হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : আওয়ামী লীগ নেতা আহমদ রফিকের স্মরণে আয়োজিত শোকসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার দল যিশুর নীতিতে বিশ্বাসী নয়। আমি একজন মুসলমান এবং আমি জানি কি করতে হয়। ঢিলটি মারলে যে পাটকেলটি খেতে হয়, আমি সে নীতিতে বিশ্বাসী। তবে আমি বলব তার আগে জনগণের উচিত সরকার এই ব্যাপারে কি করে তার জন্য অপেক্ষা করা।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩, *দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ*, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭০)

তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭০

ফোরাম : সাপ্তাহিকী *পূর্বাণী*র ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান; হোটেল পূর্বাণী, ঢাকা

বিষয় : বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে শিল্পী-সাহিত্যিকদের আত্মনিয়োগ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে ভাষা, সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি শিল্পী সাহিত্যিকদের দায়িত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন, 'জনগণের স্বার্থে এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য সাহিত্যিকদের প্রাণ খুলে আত্মনিয়োগ করার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। আমি তাদের আশ্বাস দিচ্ছি শিল্পী, কবি এবং সাহিত্যিকদের সৃষ্টিশীল বিকাশের যে কোনো অন্তরায় আমি এবং আমার দল প্রতিহত করব।' তিনি সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান, 'দেশের সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি-কান্না-সুখ-দুঃখকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্য শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫, *দৈনিক আজাদ, ইত্তেফাক ও সংবাদ*, ১ জানুয়ারি ১৯৭১)

তারিখ : ৩ জানুয়ারি, ১৯৭১

ফোরাম : এম. এন. এ ও এম. পি. এ-দের শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠান; রেসকোর্স ময়দান, ঢাকা

বিষয় : শপথবাক্য পাঠ করা এবং শাসনতন্ত্র রচনার ম্যান্ডেট প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : আনুমানিক ২০ লাখ লোকের এক সমাবেশ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণকে জনগণের সামনে শপথবাক্য পাঠ করবার পর বঙ্গবন্ধু বিবিধ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে একটি নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেন, যার নির্বাচিত অংশ নিচে উদ্ধৃত হলো। আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। শুধু বাংলারই নই। 'আমরা সারা পাকিস্তানেরই 'মেজরিটি'। আমরা যে শাসনতন্ত্র রচনা করব, সেটাই জনগণ গ্রহণ করবে এবং তা বানচালের অধিকার কারো নেই। মরহুম নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছেন, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই শেষ কথা। আর সে রায় আমরা পেয়েছি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭-২০১, *দৈনিক পূর্বদেশ*, সংগ্রাম ও পাকিস্তান, ৪ জানুয়ারি ১৯৭১)

বিষয় : ৬ দফা বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ৬-দফার ভিত্তিতে প্রণীত হবে এবং তাতে ১১-দফার প্রতিফলন থাকবে–কেউ তা রোধ করতে পারবে না। ৬-দফা ও ১১ দফা এখন আর আওয়ামী লীগের সম্পত্তি নয়, বাংলার জনগণ গত নির্বাচনে ৬ দফার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ৬-দফার পরিবর্তন আর পরিবর্ধনের কোনো ক্ষমতা বা অধিকার এখন আর আওয়ামী লীগ বা আমার নেই। কিন্তু সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা নেব না, এ ধরনের কথা আমরা বলি না। আমরা অবশ্যই তাদের সহযোগিতা কামনা করি। কিন্তু একটি কথা আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই নীতির প্রশ্নে কোনো আপষ নাই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭-১৯৮)

বিষয় : বৈষম্যের শিকার পূর্ব-পাকিস্তান প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে তোমরা ৮৫ জন, আমরা ১৫ জন। সামরিক বিভাগে তোমরা ৯০ জন, আমাদের দিয়েছ ১০ জন। বৈদেশিক সাহায্যের তোমরা খরচ করছ ৮০ ভাগ, আমাদের দিয়েছো ২০ ভাগ। মহাপ্রলয়ে দক্ষিণ বাংলার ১০ লাখ লোক মারা গেল। লাখ লাখ লোক অসহায় অবস্থায়

রইল। রিলিফ কাজের জন্য বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার এসে কাজ করে গেল–অথচ একখানা মাত্র সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কোনো হেলিকপ্টার আসল না। আমরা এসব বে-ইনসাফির অবসান করব।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮)

বিষয় : শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাংলার গরিব আর পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের গরিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং যেসব শোষকদের কারণে বাংলার মানুষ গৃহহারা হয়েছে, বাস্তুহারা হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। এসব শোষকদের সাথে আপোষ নাই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮)

বিষয় : সমাজতন্ত্র কায়েম করা ও খাসজমি বণ্টন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আওয়ামী লীগ সরকার যদি গঠন হয় তবে দেশের সমাজতান্ত্রিক-অর্থনীতি গ্রহণ করা হবে। ধনীকে আরও ধনী এবং গরিবকে আরও গরিব হতে দেওয়া হবে না।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের দল ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দিবে। আর ১০ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলায়ও এই একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। আইয়ুবী আমলে বাস্তুহারা হয়েছে বাংলার মানুষ। সরকারের খাসজমিগুলো বণ্টন করা হয়েছে ভুঁড়িওয়ালাদের কাছে। তদন্ত করে এদের কাছ থেকে খাসজমি কেড়ে নিয়ে তা বণ্টন করা হবে বাস্তুহারাদের মধ্যে। ভবিষ্যতে এ সকল খাসজমি বাস্তুহারাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং চর এলাকাও বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। আমি কৃষক এবং শ্রমিকদের কথা দিচ্ছি, আওয়ামী লীগ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কারণ আমি বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগের মাথা কেনার মতো ক্ষমতা পুঁজিপতিদের নেই। এরা কেউ এমনকি আমি নিজেও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি তবে আমাদের জীবন্ত কবর দেবেন।' (দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯)

বিষয় : দরিদ্র দেশগুলোকে ধনী দেশগুলোর সহযোগিতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিবেশী ভারত, চীন, রাশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান, তুরস্ক, সিংহল ও বার্মাসহ সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে, কারো সাথে শত্রুতা নয়।

কোনো বিরোধ দেখা দিলে শান্তিপূর্ণভাবে তার সমাধান হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করে সে অর্থ দিয়ে দরিদ্র দেশের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। বর্তমানে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয় করা বিপুল অর্থের এক-দশমাংশও যদি জনগণের জন্য খরচ করা হয় তবে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য মুছে যাবে এবং তাতে বৃহৎ ব্যক্তিবর্গের মর্যাদাই বৃদ্ধি পাবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০)

বিষয় : সকল ধর্মের সমতাবিধান প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'এদেশে ইসলাম, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবই থাকবে এবং বাংলাদেশও থাকবে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের ওপর গত এক দশকে যে অত্যাচার হয়েছে তারও অবসান হবে। মহিলাদের সমান অধিকার প্রদান করা হবে এবং তারা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক থাকবে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১)

বিষয় : জনগণের ভালোবাসা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'প্রধানমন্ত্রী হবার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারা জীবন মনে রাখব। অত্যাচার নিপীড়ন এবং কারাগারে নির্জন প্রকোষ্ঠকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু জনগণের ভালোবাসা যেন আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১)

তারিখ : ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১

ফোরাম : রমনা গ্রীন, ঢাকা

বিষয় : সত্যিকারের ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : পূর্বপাকিস্তানে ছাত্রলীগের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাংলা ও বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্য লেখকদের প্রতি আহ্বান জানান যাতে করে পাকিস্তানি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত বাঙালির বিকৃত ইতিহাস বর্জন করা যায়। নিচে তাঁর ভাষণের নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত হলো :

'বাংলার মানুষ বিশেষ করে ছাত্র এবং তরুণ সম্প্রদায়কে আমাদের ইতিহাস এবং অতীত জানতে হবে। বাংলার যে ছেলে তার অতীত বংশধরদের ঐতিহ্য গৌরময় ইতিহাস রচিত হয়নি। নতুন করে বাঙালির ইতিহাস রচনা করার জন্য

দেশের শিক্ষাবিদদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। এই ইতিহাস পাঠ করে যেন বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধররা তাদের গৌরবময় অতীতের পরিচয় পেয়ে গর্ব অনুভব করতে পারে এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২, *দৈনিক আজাদ*, *পাকিস্তান*, *পূর্বদেশ*, ৪ জানুয়ারি ১৯৭১)

বিষয় : বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'নির্বাচনের ফলাফলই বলে দিচ্ছে বাঙালি বাঙালি হিসেবেই বেঁচে থাকবে, কেউ তা রুখতে পারবে না। এবারকার নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের রায়ের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে যে, বাংলাদেশের সম্পদ এবং বাঙালির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার আর কোনো মতেই দাবিয়ে রাখা যাবে না। বিগত ২৩ বছর ধরে একটানা শোষণ ও অবিচারের ফলে বাঙালিরা আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগ এই অন্যায় ও অবিচার মেনে নিতে পারে না। জনগণের স্বাধীনতার ফলভোগকে নিশ্চিত করার জন্য আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩)

বিষয় : বিপ্লবের সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'দেশে যদি বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সে বিপ্লবের ডাক আমিই দেব। যদি ৬-দফা আদায়ের সংগ্রামকে ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়, তবে কয় দফা দিতে হবে তারও আমার জানা আছে। অতি বিপ্লবী কয়েকটা স্লোগান বা রাতের অন্ধকারে আকস্মিকভাবে নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের উদ্ভব হয় মাটি থেকে এবং এর একটি বিশেষ অবস্থা ও ধাপ রয়েছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩)

তারিখ : ১১ জানুয়ারি, ১৯৭১

ফোরাম : নবগঠিত পটুয়াখালী সদর দপ্তর

বিষয় : কায়েমি স্বার্থবিরোধী শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'কায়েমি স্বার্থবাদী ও শাসকগোষ্ঠী আজও একের পর এক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। এই মহলই ৮৩ বছর বয়সে দেশদ্রোহিতার অপরাধে শের এ-বাংলা এ কে ফজলুল হককে অন্তরীণ ও মরহুম হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ

করেনি। অথচ এসব নেতা না হলে পাকিস্তান সৃষ্টি তো না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫, *দৈনিক আজাদ*, *পাকিস্তান*, *সংগ্রাম*, *পূর্বদেশ*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭১)

বিষয় : রিলিফ দ্রব্য বিতরণে বিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'রিলিফ দ্রব্য বিতরণে বিশৃঙ্খলা ও অবহেলার খবর পাওয়া যাচ্ছে। সরকারি কর্মচারীরা ভুলে যাবেন না এটা আইয়ুবের আমল নয়। দুই-তিন মাসের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হলেই রিলিফ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবে চাওয়া হবে এবং এই ব্যাপারে কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, দীয়ত্বহীনতা কিংবা অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫)

বিষয় : নিজের আপসহীন এবং দেশপ্রেমী মানসিকতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'শোষণে আর নির্যাতনে সোনার বাংলাকে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ আজ বুভুক্ষু। কারও বিরুদ্ধে আমার শত্রুতা নেই। কিন্তু যারা বাংলাদশকে লুট করেছে তাদের সঙ্গে কোনো আপোষ নেই। দেশকে এবং দেশের মাটিকে ভালোবাসি বলেই আমি রাজনীতিতে আছি। আমি অন্যের পয়সা চাই না। কিন্তু বাংলাদেশের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় ফিরিয়ে দিতে হবে। দুঃখী বাংলার মানুষের মুখের হাসি ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজনবোধে জীবনদান করতে আমি প্রস্তুত আছি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১৫)

তারিখ : ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭১

ফোরাম : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, ঢাকা

বিষয় : নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'দেশের গণমুখী সংস্কৃতিকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য-সঙ্গীত কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখকে প্রতিফলিত করতে হবে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুখ শান্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬, *দৈনিক আজাদ*, *ইত্তেফাক*, *পাকিস্তান*, *সংগ্রাম*, *পূর্বদেশ*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭১)

বিষয় : ভাষা-আন্দোলনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'একটি জাতিকে পঙ্গু ও পদানত করে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা। বাংলার মানুষ মুসলমান নয়, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নেই–এই ধরনের অভিযোগ দিয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে ২৩ বছর ধরে তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে। আর বাংলার মানুষও এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শুধু বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন ছিল না, এই আন্দোলন ছিল বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭)

বিষয় : সকল ভাষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি যখন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কথা বলি তখন সিন্ধি, পাঞ্জাবী, বেলুচি, পশ্তু তথা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্যের সমান সমৃদ্ধি কামনা করি। কারণ আঞ্চলিক পরিবেশ ও জনগণের ধ্যানধারণার ভিত্তিতেই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে। ধর্মের নামে ভাড়াটিয়া সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া মানুষের আত্মার স্পন্দনকে পিষে মারারই শামিল।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮)

বিষয় : চরম সংগ্রাম প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'মনে রাখবেন, বিপদ আমাদের কাটে নাই। লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয় নাই। চরম সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেদিনের জন্য প্রস্তুত হন। আপনাদের সমস্যা শুধু আপনাদেরই নয়–এ সমস্যা সারা জাতির। শিল্পীদের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতিই এগিয়ে আসবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮)

তারিখ : ২৯ জানুয়ারি, ১৯৭১

ফোরাম : সাংবাদিক সম্মেলন, বাসভবন, ঢাকা

বিষয় : ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'গত ২৩ বছর বাংলাদেশকে শাসন ও শোষণ করা হয়েছে সেই পরিস্থিতি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে সনাতন ষড়যন্ত্র আজও চলছে। তবে ভরসা হচ্ছে, দেশবাসী আজ সম্পূর্ণ সচেতন ও জাগ্রত এবং ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্নভিন্ন করে কায়েমী স্বার্থবাদীকে খতম করার ক্ষমতা দেশবাসী রাখে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯, *দৈনিক ইত্তেফাক*, *পাকিস্তান*, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১)

বিষয় : অবনতিশীল পরিস্থিতি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশে দুর্ভিক্ষবস্থা বিরাজমান, উপকূল অঞ্চলে সাহায্য ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। এই অবস্থায় আমরা জড়ভরতের মতো বসে থেকে আমাদের মানুষকে মরতে দিতে পারি না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-২১০)

তারিখ : ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

ফোরাম : সংবাদপত্র

বিষয় : গণসতর্কতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের সকল প্রচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য জনসাধারণের সম্পূর্ণ সতর্ক থাকা উচিত।' (দ্র. গ্রাগুক্ত, পৃ. ২১১, *দৈনিক আজাদ*, *পূর্বদেশ*, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১)

ফোরাম : সংবর্ধনা সভা, মৌলভীবাজার

বিষয় : ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আওয়ামী লীগ শুধু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই নয়, সারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কাজেই শাসনতন্ত্র আওয়ামী লীগ একাই প্রণয়ন করতে পারে। তবে আমরা এই ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করব। যদি কেউ সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে তাহলে সে তার নিজ দায়িত্বেই করবে। আমরা একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে চাই এবং ৬-দফা পরিকল্পনার ভিত্তিতেই করবে। আমরা একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবো। জনসাধারণ আমার দলের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছে এবং একমাত্র জনপ্রতিনিধিরাই দেশের শাসনতন্ত্রের অধিকারী।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২)

বিষয় : জনসাধারণের দুরবস্থা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'সাধারণ মানুষ কিভাবে যে বেঁচে আছে তা কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশে ৭০ থেকে ৮০ লাখ মানুষ বর্তমানে বেকার। প্রদেশের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসলীলা এবং চক্রান্তকারীরা ও শোষণকারীরা এত বেশি সমস্যার সৃষ্টি করেছে যে, আমার দল ক্ষমতায় আসলেও সঙ্গে সঙ্গে সেসব সমস্যা সমাধান খুব কঠিন হবে। বাংলাকে আজ একটি বাজার ও উপনিবেশে পরিণত করা হয়েছে। আমরা আমাদের জনসাধারণকে মরতে বা শোষিত হতে

দিতে পারি না। আমার দল শোষণকারীদের হাত থেকে সম্পদ ফিরিয়ে আনবে এবং তা জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেবে। আওয়ামী লীগাররা সত্যবাদী এবং তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩)

বিষয় : জনকল্যাণের প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'ক্ষমতা পেলে জনগণের সমস্যার সার্বিক সমাধান করব। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ এবং পৌর এলাকার ১ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যের ঘর-বাড়ির পৌরকর ও মওকুফ করা হবে।

'বাংলার মানুষের ভালোবাসার প্রতিদানে আমার দেবার কিছু নাই। একমাত্র প্রাণ দিতে পারি। আর তা দেওয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত আছি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩)

তারিখ : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

ফোরাম : জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের যৌথ অধিবেশন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, ঢাকা

বিষয় : জাতির কাছে ওয়াদা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমরা জাতির সাথে ওয়াদাবদ্ধ আছি ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র তৈরি করার জন্যে। কোনো পরিস্থিতেই আমরা আমাদের ওয়াদার সাথে বেঈমানী করতে পারি না। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতনত্র প্রণয়ন করা হলে দেশের সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপকার হবে। যদি এই কর্মসূচি পুরোপুরি গ্রহণ করা হয় তাহলেই আমরা একসাথে ভাইভাই-এর মতো বাস করতে পারি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪, *দৈনিক ইত্তেফাক*, *পাকিস্তান*, *সংগ্রাম*, *সংবাদ*, *আজাদ*, *পূর্বদেশ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১)

বিষয় : শোষিতের অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমার দল কোনোদিন পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলেনি। বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। ৬-দফা কর্মসূচি বাংলাদেশের সাথে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের জন্যও আমরা ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন চাই। সেখানকার নির্যাতিত, শোষিত জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আমরা তাদের সাথে আছি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫)

বিষয় : নির্বাচিত সদস্যদের দায়িত্ব প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, আমরা ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি না। জনগণের অধিকার আদায়ের জন্যই আওয়ামী লীগ রাজনীতি করে।' তিনি আরও বলেন, 'সহকর্মী ভাইয়েরা আমার, আপনাদের দায়িত্ব অপরিসীম। জনগণ অনেক আশা, অনেক আস্থা নিয়ে আপনাদের নির্বাচন করেছে। চরম মূল্যের বিনিময় হলেও সেই আশা ও আস্থার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। যেদিন আপনারা বাংলার মানুষের এই ভালোবাসা ও আস্থার অমর্যাদা করবেন, সেদিনই আপনাদের মুজিব ভাইয়ের, আপনাদের এবং আপনাদের প্রিয় আওয়ামী লীগের মৃত্যু হবে। আর সেই সঙ্গে চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে বাঙালির ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬-২১৭)

তারিখ : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

ফোরাম : বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ, ঢাকা

বিষয় : সর্বস্তরে বাংলা চালু করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি ঘোষণা করছি আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সকল সরকারি অফিস আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু করবে। এ ব্যাপারে আমরা পরিভাষা সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করব না। কারণ তাহলে সর্বক্ষেত্রে কোনো দিনই বাংলা চালু করা সম্ভব হবে না। এ অবস্থায় হয়তো কিছু কিছু ভুল হবে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এভাবেই অগ্রসর হতে হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮, *দৈনিক আজাদ*, *সংগ্রাম*, *ইত্তেফাক*, *পাকিস্তান*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১)

বিষয় : গণমানুষ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাঙালির স্বাজাত্যবোধ টুঁটি চেপে হত্যার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বারবার এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ভাষার উপর আঘাত হেনেছে, আর তাকে প্রাণ দিয়ে প্রতিহত করেছে এই দেশের তরুণরা। কিন্তু তাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ক'জন আছেন? বিবেকের কাছেই তাদের জবাবদিহি করতে হবে। আপনাদের লেখনী দিয়ে বের হয়ে আসা উচিত ছিল এ দেশের গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সন্তান সূর্যসেনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রচেষ্টাই করা হয়

নাই। তার কথা বলতে আপনারা ভয় পান। কারণ তিনি ছিলেন হিন্দু। এদের ইতিহাস লেখা এবং পাঠ করার জন্য দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানাই। একদিন বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলা যেত না। কিন্তু আজ এই জাতীয়তাবাদ সত্য। একে রোধ করতে পারে এমন কোনো ক্ষমতা নাই। এই প্রথমবারের মতো বাঙালি জাতি একতাবদ্ধ হয়েছে। নিজেদের দাবিতে বাঙালিরা আজ ঐক্যবদ্ধ।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯)

বিষয় : দাবি আদায় প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমরা জনগণের দাবি আদায়ের জন্য রাজনীতি করি। তবে তার মানে এই না যে, আমরা ক্ষমতা চাই না। আমরা দাবি আদায়ের জন্যই ক্ষমতায় যেতে চাই। ক্ষমতা পেলে আমরা একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করব। আমাদের 'জয় বাংলা' স্লোগানের মধ্যেই এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি নিহিত আছে। তবে দাবি আদায় না হলে আমরা ক্ষমতা ছেড়ে চলে আসব।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০)

তারিখ : ২০-২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

ফোরাম : কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ঢাকা

বিষয় : শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাঙালিদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে আরও রক্তদানের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত থাকুন। বাঙালি আর শহীদ হবে না। এবার তারা গাজী হয়ে বাঁচবে। যারা বুকের রক্ত দিয়ে দেশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, যারা নিজের রক্ত দিয়ে আমাকে মুক্ত করে এনেছে, মধ্যরাতে এই শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলছি, তাদের রক্তের ঋণ আমি শোধ করবোই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১, *দৈনিক পূর্বদেশ*, ইত্তেফাক, *পাকিস্তান*, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১)

বিষয় : চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুতি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি আপনাদের মাঝে নাও থাকতে পারি। মানুষকে তো একদিন মরতেই হয়। আমি জানি না, আবার কবে আপনাদের সামনে দাঁড়াতে পারব। তাই আজ আমি আপনাদের এবং সারা বাংলার মানুষকে

ডেকে বলছি, চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন। বাঙালি যেন আর অপমানিত-লাঞ্ছিত না হয়। শহীদদের রক্ত যেন বৃথা না যায়।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২)

তারিখ : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

ফোরাম : সাংবাদিক সম্মেলন, ঢাকা

বিষয় : ইচ্ছাকৃত কৃত্রিম সঙ্কট প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচালের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্তিম সংকট তৈরি করা হচ্ছে। পাকিস্তানের জনগণের প্রতি দায়িত্ব সচেতন আওয়ামী লীগ ইচ্ছা করেই নীরব রয়েছে। কারণ আওয়ামী লীগ তিক্ত বিরোধের দ্বারা পরিবেশ বিষিয়ে তুলতে চায় না। গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিতে বিশ্বাসী বলে আওয়ামী লীগ এই মত পোষণ করেছে যে, শাসনতান্ত্রিক সমস্যাগুলো জাতীয় পরিষদে বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত এবং বাস্তবিকই তা করা যেতে পারে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩, *দৈনিক পূর্বদেশ*, *পাকিস্তান*, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১)

বিষয় : পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাংলাদেশের ৭ কোটি লোকের ঔপনিবেশিক শোষণ এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের কল্যাণের জন্য এ দেশের সম্পদ অন্য অংশে স্থানান্তর প্রধানত কেন্দ্র কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে করা হয়েছে। এভাবে বিদেশ থেকে পাওয়া সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীদের কল্যাণের কাজে লাগানো হয়েছে। গত ২৩ বছরে যে আমদানি করা হয়েছে তার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যয় করা হয়েছে। বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় শিল্পপতির কল্যাণের জন্য ৭ কোটি লোকের রক্ষিত বাজার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের শোষণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার পর্যায়ে পৌঁছেছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫)

বিষয় : জনগণের দুরবস্থা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'দুর্ভিক্ষ কবলিত ও জীবনধারণের সর্বনিম্ন প্রয়োজন বঞ্চিত বাংলাদেশের জনগণকে পুরোপুরি দারিদ্র্যের কবলে ফেলা হয়েছে। আমরা কোনোভাবেই এই অবস্থা চলতে দিতে পারি না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫)

বিষয় : পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাংলাদেশের জনসাধারণ এবং দেশের পশ্চিম অংশের শোষিত জনসাধারণের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির প্রচেষ্টা বর্তমানে চরমে পৌঁছেছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বাঙালিদের 'শত্রু' নামে অভিহিত করা হচ্ছে। যার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যরা নিজেদেরকে 'জিম্মি' স্বরূপ মনে করবেন। জাতীয় পরিষদের বাঙালি সদস্যদের নামে মিথ্যা দুর্নাম হয়েছে। পরিষদকে 'কসাইখানা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় আহ্বান করা হয়েছে বলেই এ ধরনের অযৌক্তিক অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ধরনের প্রতিক্রিয়া অশোভন, অযৌক্তিকও। কারণ গত ২৩ বছর যাবৎ বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রধান দপ্তরগুলো পশ্চিম পাকিস্তানেই অবস্থিত। এভাবে যদি পরিস্থিতিকে বিষাক্ত করে তোলা হয় তবে বাঙালিরা কি আইনত প্রশ্ন করতে পারে না যে, কেন তাহলে বাঙালিদেরকেই পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য বলা হবে?' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২২৭)

বিষয় : ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আগামী প্রজন্মের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আজ পাকিস্তানের জাগ্রত জনগণ, কৃষক, মজুর এবং বাংলাদেশের ছাত্র সমাজকে জনগণের বিজয়ের পথ যারা রুদ্ধ করতে চায় তাদের সেই ষড়যন্ত্র রোখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। 'সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব' ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 'স্বেচ্ছাচার'-এর অবাঞ্ছনীয়তার প্রশ্নে যারা উদ্বিগ্ন তাদের আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে, তাদের সামনে শক্তির যত বড়; দুর্গ প্রাচীরই থাকুক না কেন, পাকিস্তানের জনগণ কখনই সংখ্যালঘুদের একনায়কত্ব বরদাস্ত করবেন না বা অন্য কোনো রকমের স্বৈরাচার মেনে নেবেন না। একমাত্র যে শক্তিতে আমরা বিশ্বাসী তা হলো–জনগণের শক্তি। জনগণ সবরকম স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছে, জাগ্রত জনগণের সুদৃঢ় সংগ্রামের মুখে তাদের ক্ষতার দুর্গ-প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। যদি কেউ স্বৈরাচারী হতে চান—তিনি যেন ইতিহাস থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করেন। আমরা সুস্পষ্টভাবে ষড়যন্ত্রের সেইসব অশুভ শক্তিকে জানিয়ে দিতে চাই যে, তারা যেন ১২ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় মেতে ওঠার চেষ্টা না করেন।' তিনি আরও বলেন যে, 'আমাদের আগামী বংশধরদের যাতে উপনিবেশে বাস করতে না হয়, যাতে তারা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাধীনভাবে এবং মর্যাদার সাথে বাঁচতে পারে সে জন্যে প্রয়োজন হলে আমাদের জীবন বিসর্জন দেওয়ার প্রতিজ্ঞা আমরা আবার নতুন করে গ্রহণ করছি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮-২২৯)

তারিখ : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

ফোরাম : প্রাদেশিক ভবন প্রাঙ্গণ

বিষয় : শাসনতন্ত্র প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিবুর রহমান আশা প্রকাশ করেন যে, 'শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নির্ধারিত সময়ে পরিষদে দিন রাত আলোচনার ভেতর দিয়ে সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। যদি একজন সদস্যও সুষ্ঠু ন্যায্য সুপারিশ করেন, তা মেনে নেয়া হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০, *দৈনিক আজাদ, সংগ্রাম, পূর্বদেশ, পাকিস্তান*, ১ মার্চ, ১৯৭১)

বিষয় : ৬ দফা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : সংবর্ধনা সভায় আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তিনি ভুট্টো সাহেবকে কোনো আশ্বাস দিতে পারেন না। কারণ ৬ দফা বর্তমানে জনগণের সম্পত্তিতে পরিনত হয়েছে। তিনি বলেন, '৬-দফা শুধু বাংলার মানুষের জন্য নয়। আমরা সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলোকেও বাংলাদেশের সমপরিমাণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার পক্ষপাতি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০)

বিষয় : পাকিস্তান প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : সংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, 'পাকিস্তানও থাকবে, বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানও থাকবে। যা থাকবে না তা হচ্ছে মানুষে মানুষের শোষণ থাকবে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০)

বিষয় : জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে পুঁজি সৃষ্টি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের ২৩ বছরের শোষণের কথা উল্লেখ করেন, 'বাংলার মানুষের উদারতার সুযোগ নিয়ে সারা বাংলাদেশকেও লুট করা হয়েছে। যাদের ৫ লাখ টাকা ছিল তারা এখন ৫ কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। এই টাকা আসমান থেকে আসেনি। পাকিস্তানের নামে দরিদ্র জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে এই পুঁজি সৃষ্টি হয়েছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২)

বিষয় : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : তিনি বলেন, 'আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তবে তা বিপ্লবের মাধ্যমে নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিবর্তনের মাধ্যমেই অর্জিত

হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ছাড়া ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকার ৭ কোটি লোক কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১)

বিষয় : ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি জাতীয়করণ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : তিনি বলেন, 'আমি আবারও ঘোষণা করছি, দরিদ্র জনগণের স্বার্থে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিসমূহ জাতীয়করণ করা হবে। পাকিস্তানের নামে দরিদ্র জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে পুঁজি সংগ্রহ করে ২২ পরিবার গড়ে উঠেছে। আজ ব্যাংক তাদের হাতে, বীমা কোম্পানি তাদের নিয়ন্ত্রণে। ২২ পরিবার টেলিফোনে কোটি কোটি টাকার 'এলসি' খুলে ফেলে আর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা শতকরা ৪৫ ভাগ টাকা জমা দিয়েও 'এলসি' খোলার জন্য হয়রান হয়।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২)

তারিখ : ১ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : হোটেল পূর্বাণী

বিষয় : অধিবেশন স্থগিতাদেশ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বেলা সাড়ে ৪টায় হোটেল আহুত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'আমি আগেই বলেছি ষড়যন্ত্র চলছে। এই ঘোষণা এক সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্রেরই ফলশ্রুতি এবং আমরা এক কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ না করে পারি না। একটি সংখ্যালঘু দলের একগুঁয়ে দাবির ফলে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবি ঘোষিত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে–এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। জনগণের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, তাই আমরা একে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিতে পারি না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪, *দৈনিক পূর্বদেশ*, *আজাদ*, *পাকিস্তান*, *সংগ্রাম*, ২ মার্চ, ১৯৭১)

বিষয় : নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। আপনারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তবে সব রকম হিংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকবেন। আমাদের দল একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং আমরা শান্তিপূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাব। ...বাঙালিদের আর কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রাম করছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫)

তারিখ : ২ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : হোটেল পূর্বাণী

বিষয় : হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন

বক্তব্য/ঘটনা : 'আজ এখানে নিরস্ত্র বালকের উপর গুলি চালানো হয়েছে, কমপক্ষে ২ ব্যক্তি নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হয়। তাদের উপর গুলি চালানো হয়েছে, কারণ তারা বাংলাদেশেরই প্রতি এত চরম অবমাননার বিরুদ্ধে সারা বাংলারই অপরাপর জনমানুষের সাথে একাত্ম হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সে যে কোনো অবমাননা করুক না কেন। আমি এই গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা জানাই এবং যারা শক্তি দিয়ে জনগণ মোকাবিলা করতে চান, তাদের এই ধরনের বেপরোয়া পথ থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন জানাচ্ছিল।' (দ্র. প্রাগুক্ত পৃ. ২৩৬, *দৈনিক আজাদ, পাকিস্তান, সংগ্রাম*, ৩ মার্চ, ১৯৭১)

বিষয় : অধিবেশন স্থগিত প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা বাংলাদেশের ৭ কোটি লোকের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিদের সাথে ৩রা মার্চ অধিবেশনে বসতে রাজি ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু প্রতিনিধি এর মধ্যেই এ ব্যাপারে ঢাকা এসে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু এক আকস্মিক হস্তক্ষেপের ফলেই অধিবেশন স্থগিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী দলের ত্রাণকারীরূপে একটি সংখ্যালঘু দল এই হস্তক্ষেপে উৎসাহ দেয়। ... বাংলাদেশের মানুষ এই ধরনের নির্দেশ কিংবা ভীতির কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি নয় বলে বর্তমানে শক্তি দিয়ে তাদের মোকাবিলা করছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬-২৩৭)

বিষয় : সৈন্য ও অস্ত্র স্থানান্তর প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : তিনি বলেন, 'এটা মার্মান্তিক যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বহনের জন্য যে বিমানগুলো ব্যবহার হতে পারত তা এখন সামরিক অফিসার ও সেনাবাহিনীর লোকদের অস্ত্রশস্ত্র বহন করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭)

বিষয় : জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, 'স্মরণ রাখতে হবে বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রত্যেক, তা তাঁরা যেখানকারই হোন না কেন বা যে ভাষায়ই কথা বলুন না কেন,

তাঁরা আমাদের কাছে বাঙালি। তাঁরা নিজেরা, তাঁদের সম্পত্তি ও ইজ্জত আমাদের পবিত্র আমানত এবং এসব অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। ... আমি শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের সাধারণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, কোনোপ্রকার শৃঙ্খলা ভঙ্গ আমাদের আন্দোলনের স্বার্থের পরিপন্থী হবে এবং উস্কানিদাতা ও গণবিরোধী চক্রের স্বার্থের অনুকূল হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮)

তারিখ : ৩ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : পল্টনের জনসভায়

বিষয় : লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রতিরোধ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। পল্টনের জনসভায় লাখো লাখো জঙ্গি মানুষের সমাবেশে তিনি বলেন, 'বাঙালি হোক, বিহারি হোক, স্থানীয় হোক আর বহিরাগত হোক–সবাই আমাদের জিম্মায়, এদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।' তিনি আরও বলেন, 'যারা বাংলার স্বাধিকার আমাদের আন্দোলন নস্যাৎ করতে চায় তারাই হরতালের সুযোগ লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গা করছে। যদি আপনারা আমাকে ভালোবাসেন, যদি সংগ্রামে জয়ী হতে চান, তাহলে আপনারা এইসব লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও গুণ্ডামিকে দৃঢ়তার সাথে বাধা দিবেন।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০, *দৈনিক সংগ্রাম*, *পূর্বদেশ*, *আজাদ*, *পাকিস্তান*, ৪ মার্চ, ১৯৭১)

বিষয় : সেনাবাহিনীর কাজ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সেনাবাহিনীর কাজ বিদেশী শত্রুর মোকাবিলা করা, ভাইকে হত্যা করা না। গুলি করার জন্যই আমাদের করের পয়সায় আপনাদের অস্ত্র দেওয়া হয়। মেহেরবাণী করে আপনারা ব্যারাকে ফিরে যান। আমার মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯)

বিষয় : ৭ মার্চ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এই কয়দিনের মধ্যে যদি সরকারি মনোভাব পরিবর্তন না হয়, তাহলে ৭ মার্চ আমি আমার যা বলার তা বলবো।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১)

বিষয় : খাজনা ট্যাক্স প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : তিনি ঘোষণা করেন, 'সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত সকল প্রকার ট্যাক্স ও খাজনা প্রদান থেকে প্রত্যেকে বিরত থাকুন।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১)

বিষয় : বাংলার মানুষ তাদের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাবে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন যে, 'যারা আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে এবং ভোট দিয়েছে আমি মরে গেলেও আমার আত্মা তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি যখন দেখতে পারে, তখন শান্তি পাবে। ৭ কোটি মানুষকে হত্যা করতে পারবেন না। আমি না থাকলেও বাংলার মানুষ তাদের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০)

বিষয় : সংশয় প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'আমি আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে জনতার সামনে আসতে বাধ্য হয়েছি। ইচ্ছা ছিল ৭ মার্চ সব বলবো। কিন্তু পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আবার ছাত্রলীগের সভায় এসেছি। জানি না আপনাদের সামনে আর বক্তৃতা করতে পারবো কিনা।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০)

বিষয় : হত্যা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : তিনি বলেন, 'গতকাল আর আজ এই শহরের অলিতে গলিতে শত শতনিরপরাধ মানুষকে গুলি করা হয়েছে। অনেকেই আহত ও নিহত হয়েছেন। এ ধরনের হত্যাকাণ্ড যারা করেছেন, তাদের সতর্ক করে দিতে চাই, হত্যা করে এ আন্দোলন থামানো যাবে না। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯)

বিষয় : বর্তমান অবস্থার জন্য কে দায়ী প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, '...পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কথা শোনা হয়নি। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ জানাই। কিন্তু জনাব ভুট্টো তাতে অসম্মতি জানিয়ে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন আহ্বানের কথা বলেন। তার কথা মতো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের কথা ঘোষণা করেন। আমরা প্রেসিডেন্টের ঘোষণা অনুযায়ী পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের প্রস্তুতি নেই। কিন্তু জনাব ভুট্টো

আবার এই অধিবেশন পিছিয়ে দেবার দাবি তোলেন। আমরা অধিবেশন বাতিল না করার কথা বলি। জনাব ভুট্টো তখন শুধু অস্বীকৃতিই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানে আগুন জ্বালাবেন বলে হুমকি দিলেন। অথচ তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে ৭ কোটি বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা হলো। এর চেয়ে বড় লজ্জার আর কিছু নেই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০)

তারিখ : ৩ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : বিবৃতি

বিষয় : ১০ মার্চের বৈঠক প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে বলেন, 'ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় যে মুহূর্তে ব্যাপকভাবে নিরস্ত্র বেসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করা হচ্ছে, যে সময় আগামী ১০ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সাথে রাজনৈতিক নেতাদের এক সম্মেলনে মিলিত হবার প্রস্তাবিত আমন্ত্রণ বেতারে ঘোষণা করা হয়। এখনো যখন বিভিন্ন সড়কে অসংখ্য শহীদদের রক্ত শুকিয়ে যায়নি, এখনো যখন কিছু কিছু লাশ কবর না দেয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং শত শত ব্যক্তি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করছে, সে সময় একটি নিষ্ঠুর পরিহাসের মতো এই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর এমন কিছু ব্যক্তির সাথে মিলিত হবার জন্য এই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যাদের দুরভিসন্ধিই নিরপরাধ ও নিরস্ত্র কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের মৃত্যুর জন্য দায়ী।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২)

বিষয় : ১০ মার্চের বৈঠক প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : তিনি বলেন, সেনাবাহিনী মোতায়েনসহ আমাদের কানে এখনো যে অস্ত্রের কর্কশ ভাষা শোনা যাচ্ছে, তাতে এই আমন্ত্রণ কার্যত: বন্দুক উঁচিয়েই জানানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এ ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণের প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাই আমি এ ধরনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২)

তারিখ : ৪ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : বিবৃতি

বিষয় : কর্মচারীদের বেতন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : আওয়ামী লীগ প্রধান এক বিবৃতিতে বলেন, 'যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি অফিসে কর্মচারীদের এখনো বেতন দেওয়া হয়নি, সে সমস্ত

অফিস কেবল কর্মচারীদের বেতন প্রদানের জন্য বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। বেতনের চেকের টাকা প্রদান এবং বাংলাদেশের মধ্যে নগদ অর্থ আদান-প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলো উক্ত সময় (বেলা আড়াইটা থেকে ৪টা) খোলা থাকবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩-২৪৪, *দৈনিক পাকিস্তান*, ৫ মার্চ, ১৯৭১)

বিষয় : রেমিটেন্স প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বেতনের ব্যাপারে বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব দেড় হাজার টাকার চেক স্টেট ব্যাংক থেকে ভাঙানো যাবে তবে স্টেট ব্যাংকের মারফত বা অন্য কোনোভাবে বাংলাদেশের বাইরে কোনো টাকা পাঠানো যাবে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪)

বিষয় : সংগ্রামী জনতাকে অভিনন্দন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষণ ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আহূত প্রতিবাদে বাংলাদেশের প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশু তেজোদীপ্ত সাড়া দেওয়ার জন্য বীর জনতাকে অভিনন্দন জানান। শেখ মুজিব বলেন, 'বাংলাদেশের বেসামরিক জনগণ যেমন : শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্ররা তাদের অধিকার কেড়ে নেয়ার বিরুদ্ধে বুলেটের সামনে যে সাহস ও দৃঢ়সংকল্প নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে, বিশ্বের জনগণের তা জানা দরকার।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩)

তারিখ : ৭ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : রেসকোর্স ময়দান

বিষয় : আরটিসিতে যোগদান প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ লাখো লাখো মানুষের সমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে শেখ মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।' বঙ্গবন্ধু দাবি করেন, 'সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭, *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ মার্চ, ১৮৭১, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের টেপ)

বিষয় : গরিব-দুঃখী মানুষের ওপর গুলি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, 'কি পেলাম আমরা? জামার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে–তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭)

বিষয় : প্রধানমন্ত্রিত্ব নয় বরং বাংলার মানুষের অধিকার প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭)

বিষয় : দাবায়ে রাখতে পারবা না

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, '৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউই আমাদের দাবাতে পারবে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮)

বিষয় : স্বাধীনতার ডাক প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮)

তারিখ : ৭ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : সংবাদপত্রে বিবৃতি

বিষয় : শহীদদের দুর্বৃত্ত বলা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'গত সপ্তাহে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার স্বেচ্ছাচারমূলক ও অযাচিত কাজের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে গিয়েই তারা শহীদ হয়েছেন। এই শহীদদের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তি বলে চিত্রিত করা সত্যের অপলাপ মাত্র।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯)

বিষয় : প্রেসিডেন্টের অবস্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, গত সপ্তাহে যে ভয়াবহ অবস্থার অবতারণা করা হয়েছে তা দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট ঢাকা আসার একটু সময় করতেও সক্ষম হননি। প্রেসিডেন্ট যাকে 'ক্ষমতার ন্যূনতম প্রয়োগ' বলে

অভিহিত করেছেন, তার ফলেই যদি হাজার হাজার লোক হতাহত হয়ে থাকে, তাহলে কি আমাদের এটাই বুঝতে হবে যে, তিনি যাকে 'পর্যাপ্ত ক্ষমতার প্রয়োগ' বলবেন, তার লক্ষ্য হবে সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া?' (দ্র. প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪৯-২৫০)

বিষয় : আইনগত কাঠামো পরিবর্তন প্রসঙ্গে
বক্তব্য/ঘটনা : 'এরপর আরেক পর্যায়ে একটি সংখ্যালঘু গ্রুপের সদস্যরা জাতীয় পরিষদ থেকে পদত্যাগেরও সিদ্ধান্ত নেয়। সবচেয়ে যা বিস্ময়কর তা হলো এই যে, উক্ত গ্রুপের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়ার সাথে সাথেই আইনগত কাঠামো আদেশে আনা হলো একটি সংশোধনী। এতে বলা হলো পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই সদস্যরা ইচ্ছে করলে পদত্যাগ করতে পারবেন। কিন্তু এরপর উক্ত সংখ্যালঘু গ্রুপ সিদ্ধান্ত নিলেন পদত্যাগ না করার। এই দলের এই এলোপাতাড়ি ইচ্ছা-অনিচ্ছা চরমে পৌঁছাল ২৭ ফেব্রুয়ারি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০)

বিষয় : যুক্তিকে মেনে নেয়া প্রসঙ্গে
বক্তব্য/ঘটনা : 'গত ২৭ ফেব্রুয়ারি আমরা এই পর্যন্তও বলেছিলাম যে, কোনো সদস্য ন্যায় ও যুক্তিসংগত কিছু পরিষদে উত্থাপন করলে আমরা তা মেনে নেবো। কিন্তু সে প্রস্তাবও উপেক্ষা করা হয় এবং তা করা হয় সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবেই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১)

বিষয় : জনসাধারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে
বক্তব্য/ঘটনা : 'বাংলাদেশের মানুষ কি এর থেকে মনে করতে পারে না যে, একটি অগণতান্ত্রিক সংখ্যালঘু দলের নির্দেশে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে? তারা কি যুক্তিসঙ্গভাবেই ভাবতে পারে না যে, একটি সংখ্যালঘু গ্রুপ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ব্যাহত করা এবং সংখ্যাগুরু জনসাধারণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে?' (দ্রু. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১)

বিষয় : গোলটেবিল বৈঠক প্রসঙ্গে
বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, 'গোলটেবিল বৈঠকে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোক, এ ধরনের কোনো ধারণাই আমি দেই নাই। আমি প্রেসিডেন্টকে কেবল এই কথাই জানিয়েছিলাম, বাংলাদেশে কি মারাত্মক পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা দেখা এবং যথেচ্ছভাবে নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তার ঢাকা আসা উচিত।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২)

বিষয় : দাবিসমূহ

বক্তব্য/ঘটনা : বক্তৃতায় যেসব দাবি উত্থাপিত হয়েছে : ক) অবিলম্বে সকল সৈন্যকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে হবে। খ) বেসামরিক জনগণের উপর গুলিবর্ষণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, যাতে এখন থেকে একটা বুলেটও ছোড়া না হয়। গ) সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং দেশের পশ্চিম অংশ থেকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য আমদানি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ঘ) বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন শাখায় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চলবে না এবং সরকারি অফিসার ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণজনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে হবে। ঙ) আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ কেবল পুলিশ ও বাঙালি ইপিআর বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করতে হবে। যখনই প্রয়োজন হবে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের উক্ত কাজে সহায়তা করবেন। চ) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে। ছ) অবিলম্বে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩-২৫৪)

বিষয় : অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রতিটি লোকেরই দায়িত্ব এবং যেকোনো মূল্যে তা রক্ষা করতে হবে। আমাদের সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ের লক্ষ্য হচ্ছে অবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো এবং জনগণকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই লক্ষ্য অর্জিত না হয়, আমাদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪)

তারিখ : ১৪ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : বিবৃতি

বিষয় : জনগণের বীরত্ব প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এগিয়ে চলছে। মুক্তিকামী মানুষ বিশ্বের সবখানে যারা প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন মুক্তির জন্য, আমাদের সংগ্রামকেও তাদের নিজেদের সংগ্রাম বলে গণ্য করা উচিত। শক্তির সাহায্যে যারা শাসনের চক্রান্ত করে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ও সংঘবদ্ধ জনশক্তি কেমন করে মুক্তির দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলে, আমাদের জনগণ তা প্রমাণ করেছে। আজ বাংলাদেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ এমনকি শিশু পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসে বলীয়ান। নগ্নভাবে শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে দলিত করার কথা চিন্তা করেছিল যারা, তারা নিশ্চিতই পরাভূত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের

মানুষ, সরকারি কর্মচারী, অফিস আর কলকারখানার শ্রমিক, কৃষক আর ছাত্র সবাই দৃপ্তদম্ভে ঘোষণা করেছে–তারা আত্মসমর্পণের চেয়ে মরণ বরণ করতেই বদ্ধপরিকর।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬-২৫৭), *দৈনিক পাকিস্তান* ও *পূর্বদেশ*, ১৫ মার্চ ১৯৭১)

বিষয় : ১১৫ নম্বর সামরিক আদেশ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এ বড় দুঃখজনক যে, এমন পর্যায়েও কিছু অবিবেচক মানুষ সামরিক আইন বলে নির্দেশ জারি করে বেসামরিক কর্মচারীদের একাংশকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। কিন্তু আজ এ দেশের মানুষ সামরিক আইনের কাছে মাথা নত না করার দৃঢ়তায় একাট্টা। তাই আমি, সর্বশেষ নির্দেশ যাদের প্রতি জারি করা হয়েছে, তাদেরকে হুমকির কাছে মাথা নত না করার আবেদন জানাই। বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ তাদের ও তাদের পরিবারের পেছনে রয়েছে। তাদের ত্রাসিত করার উদ্দেশ্যে এই যে চেষ্টা, তা বাংলাদেশের মানুষকে রক্তচক্ষু দেখাবার অন্যান্য সাম্প্রতিক চেষ্টার মতো নস্যাৎ হতে বাধ্য।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭)

বিষয় : স্বাধীন ভবিষ্যতের জন্য ত্যাগ স্বীকার প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বালাদেশের মুক্তির স্পৃহাকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদেরকে কেউ পরাভূত করতে পারবে না, কারণ প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকে মরণ বরণ করতে প্রস্তুত। জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ হিসাবে স্বাধীনভাবে আর আত্মমর্যাদার সাথে বাস করার নিশ্চয়তা দিয়ে যেতে চাই। মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে। আমি জনগণকে যে কোনো ত্যাগের জন্য এবং সম্ভাব্য সব কিছু নিয়ে যে কোনো শক্তির মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানাই।' (দ্র.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭)

তারিখ : ১৪ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : সাংবাদিকদের সাথে আলাপ

বিষয় : প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, 'যদি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন তাহলে আমি তার সাথে দেখা করতে প্রস্তুত আছি।' জনৈক সাংবাদিক ঢাকার সংবাদপত্রে গতকাল প্রকাশিত সম্পাদকীয়

নিবন্ধের প্রতি শেখ মুজিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন যে, 'দয়া করে অপেক্ষা করুন এবং দেখুন। আমি এখনো সংগ্রাম করছি। যতদিন জনগণের মুক্তি না আসে এবং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচবার অধিকার অর্জিত না হয়, ততদিন সংগ্রাম চলবে।'

তারিখ : ১৬ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : প্রেসিডেন্ট ভবন

বিষয় : এর বেশি বলার নেই

বক্তব্য/ঘটনা : প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে জাতির ভাগ্য নির্ধারণকারী রাজনৈতিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট ভবনে। দুজনের মধ্যকার আলোচনা আড়াই ঘণ্টা স্থায়ী হয়। বেলা দেড়টায় আলোচনা শেষে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে আসার পর শেখ মুজিবুর রহমান দেশি ও বিদেশি শতাধিক সাংবাদিককে বলেন, 'বর্তমান অবস্থায় এর চাইতে বেশি কিছু আমার বলার নেই। আলোচনা চলছে এবং অব্যাহত থাকবে।' আলোচনার পরিবেশ সোহার্দ্যপূর্ণ ছিল কিনা জনৈক বিদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করেন এবং গাড়িতে প্রবেশ করতে করতে বলেন, 'আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না। আলোচনা অব্যাহত থাকবে এবং এ জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন। এক বা দুমিনিটের আলোচনার ব্যাপার এটি নয়।'

তারিখ : ১৭ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : ধানমণ্ডি বাসভবন ও প্রেসিডেন্ট ভবনের ফটক

বিষয় : আলোচনা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। শেখ সাহেব বলেছেন, 'আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং আমাদের মধ্যে আরো আলোচনা হতে পারে। তবে সময় নির্ধারিত হয়নি।' আওয়ামী লীগ প্রধান তার ধানমণ্ডি বাসভভনে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি কি আন্দোলন প্রত্যাহার করেছি?' প্রেসিডেন্ট ভবন ফটকে বিপুল সংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক তাকে ঘিরে ধরে আলোচনার অগ্রগতি এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্নবাণ ছুড়তে থাকেন। উত্তরে শেখ সাহেব বিমর্ষচিত্তে বলেন, 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, আমার কিছু বলার নেই।' আলোচনা অব্যাহত থাকবে কিনা জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন, 'আমি তো তাই মনে করি। অবশ্য পরবর্তী আলোচনা বৈঠকের সময় নির্ধারিত হয়নি।' শেখ

মুজিব অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তারা উভয়ে কারও সাহায্য ছাড়াই এক ঘণ্টা আলোচনা করেন।

বিষয় : আলোচনার স্থান প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : আলাপ আলোচনার জন্য শেখ মুজিবের বাড়িতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আগমনের সম্ভাবনা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে, আওয়ামী লীগ প্রধান উল্টো প্রশ্ন করেন, 'প্রেসিডেন্ট ভবন কি ঢাকায় অবস্থিত নয়?' তারপর তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সব বাড়িই আমার বাড়ি।'

বিষয় : বিদেশী সাহায্য প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদেশী মিশনগুলোর সাথে যোগাযোগ করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব নেতিবাচক জবাব দেন এবং বলেন যে, তারা এখানেই আছেন এবং সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করছেন। বিদেশী সাহায্য চেয়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমার প্রয়োজন নেই।' এই পর্যায়ে শেখ মুজিব বলেন, 'পাট, চা ইত্যাদিসহ আমাদের যা প্রয়োজন বাংলাদেশের তা আছে।' কি নাই, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব বলেন, 'স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকার শুধু বাঙালিদের নেই।'

তারিখ : ১৭ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : ধানমণ্ডি বাসভবন

বিষয় : জন্মদিনে শুভেচ্ছা ও অন্যান্য প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রশাসন চলার দিনগুলোতে ১৭ মার্চ শেখ মুজিবের ৫২তম জন্মদিন সমুপিস্থত হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে দ্বিতীয় দফা বৈঠকের পর বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বলেন, 'আমি আমার জন্মদিনের উৎসব পালন করি না। এই দুঃখিনী বাংলার আমার জন্মদিনই-বা কি আর মৃত্যুদিনই-বা কি?' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯)

তারিখ : ১৮ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : বিবৃতি

বিষয় : সামরিক কর্তৃপক্ষ গঠিত তদন্ত কমিশন প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি দুঃখের সাথে বলছি যে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমি যে দাবি জানিয়েছিলাম, ঘোষিত "তদন্ত কমিশন" সে দাবি পূরণ করতে

পারবে না। সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ বলে এ তদন্ত কমিশন গঠন এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা অত্যন্ত আপত্তিজনক। কারণ এর শর্তাবলী পূর্বাহ্নে বিবেচ্য প্রধান প্রধান মৌলিক বিষয়গুলো নস্যাৎ এবং প্রকৃত ঘটনাবলী সম্পর্কে তদন্ত করার পথ রুদ্ধ করে দেবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬)

তারিখ : ১৯ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : ধানমণ্ডি বাসভবন

বিষয় : জয়দেবপুরে গুলিবর্ষণ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : জয়দেবপুরে জনতার ওপর নৌবাহিনীর গুলিবর্ষণের খবর পাওয়ার পর মিছিল করে তার বাসভবনে আগত বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীদের সমাবেশে বক্তৃতায় শেখ সাহেব বলেন, 'সাত কোটি বাঙালির দাবি উদ্যত সঙ্গীনের মুখে স্তব্ধ করা যাবে বলে যারা মনে করে থাকেন তারা বেকুবের স্বর্গেই বাস করছেন। বাঙালির ফিনকি দেওয়া রক্তের দাগ শহরে বন্দরে ছড়িয়ে আছে, জয়দেবপুরের মাটিও আমার ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে বাঙালির মুক্তি আন্দোলন স্তব্ধ করা কোনো শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।'

বিষয় : সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিব

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে রাতে সমবেত সাংবাদিকদের বলেন যে, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে যেতে পারে তা ভেবে তিনি বিস্মিত না হয়ে পারছেন না। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের ঢাকা উপস্থিতিকালেই গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মানুষ সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আগ্রহী কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শক্তির নগ্ন প্রকাশের মাধ্যমে তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলা যাবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য রক্ত দানে প্রস্তুত বীর জনতাকে পর্যুদস্ত করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। শেখ মুজিব বলেন যে, গুলিবর্ষণের খবর শোনার পরই তিনি বিস্তারিত খবর সংগ্রহের জন্য দলীয় কয়েকজনকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছেন এবং এতে কতজন নিহত বা আহত হয়েছেন সে খবর তিনি এখনো পাননি। তিনি বলেন যে, এলাকায় কারফিউ জারি করায় আহতদের হাসপাতালে আনা সম্ভব হয়নি।

তারিখ : ২০ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : সংবাদপত্রে বিবৃতি

বিষয় : শান্তি-শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'একটি স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য

জনগণ যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তাই মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে এ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য আমি বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮, *দৈনিক আজাদ*, ২১ মার্চ ১৯৭১)

বিষয় : আন্দোলনে অংশগ্রহণ

বক্তব্য/ঘটনা : আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, 'এবারের সংগ্রামে প্রতিটি শহর, নগর, বন্দর ও গ্রামে আবালবৃদ্ধবনিতা বাংলাদেশের দাবির পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ সারা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের হৃদয় জয় করতে পেরেছে। একটি ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় সংকল্প জাতি কিভাবে স্বীয় লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে পারে, বিশ্বের সামনে বাংলার মানুষ আজ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮)

বিষয় : জনগণের ওপর আস্থা

বক্তব্য/ঘটনা : আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'আমাদের জনগণ প্রমাণ করেছে তারা সুচারুভাবেই তাদের নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯)

বিষয় : অর্থনৈতিক তৎপরতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বলেন যে, জনসাধারণের নিত্যদিনের প্রয়োজন মিটানো অব্যাহত রাখার স্বার্থেই অর্থনৈতিক তৎপরতার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের জনগণকে কঠোর শৃঙ্খলা পালন করতে হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭)

তারিখ : ২১ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : ধানমণ্ডি বাসভবন, সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা

বিষয় : সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব বলেন যে, 'পূর্বের আলোচনার কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা নেয়ার জন্য তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছেন। এ সাক্ষাৎ আকস্মিকও নয় এবং এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। যেহেতু প্রেসিডেন্ট এবং আমি ঢাকায় রয়েছি সেহেতু ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনে আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হতে পারে।'

তারিখ : ২২ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : ধানমণ্ডি বাসভবন

বিষয় : মিছিলের বর্ণনা

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের বাইশতম দিবস। এদিন সকাল ১০টা থেকে ১২টা এবং দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ৪০টিরও বেশি মিছিল ৩২ নম্বর ধানমণ্ডি রোডস্থ বাসভবনের সামনে গমন করে এবং এসব মিছিলের উদ্দেশ্যে তাঁকে কমপক্ষে ১০ থেকে ১২টি ভাষণ দিতে হয়।

বিষয় : দাবি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাংলার মানুষ আজ ইস্পাত দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ। কোনো বুলেট বেয়নেট বা কোনো শক্তিই আজ আর তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমাদের দাবি মেনে নিলে আমরা বন্ধু হিসাবে বসবাস করার কথা চিন্তা করতে পারি। বাংলার সাত কোটি মানুষ আজ আমাকে সমর্থন করেছে এবং নৈতিক ও বৈধভাবে বাংলার নিয়ন্ত্রণ ভার আজ আমারই ওপর।'

বিষয় : নতুন ইতিহাস প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাঙালি এই অসহযোগ আন্দোলনকালীন সময়ে যে শৃঙ্খলা আর দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে বিশ্বের ইতিহাসে তা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। শত শহীদের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দিতে পারি না। তাদের রক্তের শোধ আমাদের নিতেই হবে। যে পর্যন্ত পূর্ববাংলার সাত কোটি মানুষ মুক্তি না পাবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলতেই থাকবে।'

বিষয় : ত্যাগ স্বীকার প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : প্রাক্তন সৈনিকদের এক জঙ্গি মিছিলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে শেখ মুজিব বলেন, 'বাংলার স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে আপনাদের সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। যে কোনো চক্রান্তের বিরুদ্ধে যা কিছু আছে তা নিয়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এবার আমাদের শেষ সংগ্রাম। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।'

বিষয় : আলোচনা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া গতকাল (সোমবার) প্রায় সোয়া এক ঘণ্টার বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এই আলাপ-আলোচনার পর শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে ফিরে এসে সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁর সাথে প্রেসিডেন্টের যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে তা তিনি (প্রেসিডেন্ট) জনাব ভুট্টোকে জানিয়েছেন এবং জনাব ভুট্টোর সাথে আলাপ-আলোচনা করেছেন। শেখ মুজিব আলোচনার ওপর এর বেশি কিছু বলতে অস্বীকার করেন। আলাপ আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, 'যদি কোনো অগ্রগতি না হতো, তাহলে আমি কেন আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি?' সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিব বলেন, আমি অনেক আগেই দাবি করেছি যে, আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা পরিষদের অধিবেশনে বসবো না।' এর প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাগণ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হবেন। শেখ মুজিব অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, বাংলাদেশে এখন গুরুতর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জনগণের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

তারিখ : ২৩ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : বাসভবন

বিষয় : নতিস্বীকার না করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব গতকাল 'লাহোর প্রস্তাব দিবস' উপলক্ষে তাঁর বাসভবনের সম্মুখে আওয়ামী লীগ গণবাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে মন্তব্য করেন, 'আমরা বাংলাদেশের জনগণকে মুক্ত করিবই এবং এই ব্যাপারে কাহারও নিকট আমরা নতি স্বীকার করিব না। প্রয়োজনে আমরা আরো রক্ত দিব, তবু বাংলাদেশের জনগণ পরাধীন হইয়া থাকিবে না।

বিষয় : আপোষ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, 'কোনো অবস্থাতেই মৌলিক নীতিসমূহের ব্যাপারে কোনো আপোষ করা হইবে না। যেকোনো পন্থাই আজ আমরা অনুশীলন করি না কেন, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলাদেশের

মুক্তির জন্যই আমাদের এই আন্দোলন। এই আন্দোলনে যোগ্য সিপাহসালার সেই ব্যক্তিই হইবে, যে অপেক্ষাকৃত কম রক্তপাতের বিনিময়ে লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হইবে।'

বিষয় : দাবির কথা

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব বলেন, 'আমরা অবশ্যই এই সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ সমাধান কামনা করি। কিন্তু ভুলিয়া যাওয়া চলিবে না যে দাবি আদায়ের জন্য প্রয়োজন হলে আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধা করিব না। যতদিন পর্যন্ত ৭ কোটি বাঙালির একজনও জীবিত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।'

বিষয় : শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : শেখ মুজিব বর্তমান আন্দোলনের সকল স্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনাদের এই আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে আমার সঙ্গে থাকিতে হইবে এবং আমার নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে। আমি আমার রক্তের বিনিময়ে হইলেও দাবি আদায় করিব।'

বিষয় : সংগ্রাম প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : তিনি জনগণকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, '২২ দিনের শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনে শাসক কোনো দিন আর কোমর সোজা করিতে পারিবে না। বাঙলার এই ঐক্য অটুট থাকিলে কোনো শক্তিই তাহাদের শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতে পারিবে না।'

তারিখ : ২৪ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : বাসভবন

বিষয় : দাবি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : বঙ্গবন্ধু বুধবার ঘোষণা করেছেন, 'বাংলাদেশের জনগণের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হলে তা বরদাশত করা হবে না। কারো চোখ রাঙানির কাছে আমরা মাথা নত করবো না। আমাদের দাবি ন্যায্য। আমাদের দাবি মানতে হবে। আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। যদি কেউ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করে দিতে না চান, কিংবা দাবিকে দাবিয়ে রাখতে চান তাহলে তারা

তা পারবে না। আমার মাথা কেনার শক্তি কারও নেই। বাংলার মানুষের সাথে, শহীদের রক্তের সাথে আমি বেঈমানি করতে পারবো না।'

বিষয় : ষড়যন্ত্রের বাধা পেরিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : তিনি জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'কিছু সংখ্যক লোক আমাদের সংগ্রামকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে। তারা আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছে। যে কোনো পরিণতির জন্য প্রস্তুত হওয়ার কঠোরতম সংগ্রামের নির্দেশ দেওয়ার জন্য বেঁচে থাকবো কিনা জানি না। তবে দাবি আদায়ের জন্য আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। আমরা সাতকোটি মানুষ আজ সংঘবদ্ধ। কোনো ষড়যন্ত্রই আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। আমরা রক্ত দিয়েছি, প্রয়োজন হলে আরও রক্ত দেবো। আমরা শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।'

তারিখ : ২৫ মার্চ, ১৯৭১

ফোরাম : সংবাদপত্রে বিবৃতি

বিষয় : গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে হরতাল আহ্বান

বক্তব্য/ঘটনা : ২৫ মার্চ বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে সেনাবাহিনীর গুলিতে কমপক্ষে ১১০ জন নিহত হন। চট্টগ্রাম বন্দরে একটি জাহাজ থেকে মাল খালাসের সময় জনসাধারণ বাধা দিলে সেনাবাহিনীর গুলিতে অনেকে প্রাণ হারায়। শেখ মুজিবুর রহমান এসব গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ২৭ মার্চ বাংলাদেশব্যাপী হরতালের আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। ২৫ মার্চ সামরিক বাহিনীর অপারেশনের কারণে ২৬ মার্চ বাংলাদেশে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত না হওয়ায় বিবৃতিটি কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধু বিবৃতির এক পর্যায়ে বলেন, 'এটা তাই স্পষ্ট যে যারা উত্তেজনা সষ্টি করেছে তারা একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা বানচাল করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে এবং নিরস্ত্র মানুষের ওপর আক্রমণ চালাবার অজুহাত সৃষ্টি করার জন্যেই তা করছে। বিশ্ববাসী আজ দেখুক, একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পেতে আমরা যখন যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, তখন জোর করে একটি সমাধান চাপিয়ে দিতে একটি অশুভ চক্র শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংসের সেসব অশুভ শক্তিকে আমি জানিয়ে দিতে চাই, তাদের চক্রান্ত সফল হবে না, কারণ জোর করিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার

বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ।' বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গুলিবর্ষণ করা হয়েছে আমি তার নিন্দা করি। এ ধরনের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২৭ মার্চ, ১৯৭১ সারা বাংলাদেশব্যাপী হরতাল পালিত হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩, ডন, করাচি ২৬ মার্চ ১৯৭১)

তারিখ : ২৫ মার্চ মধ্যরাত, ১৯৭১

ফোরাম : পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচারের জন্য চট্টগ্রামে পাঠানো বার্তা

বিষয় : স্বাধীনতার ঘোষণা

বক্তব্য/ঘটনা : সেনা-অভিযান শুরু হওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচারের জন্য চট্টগ্রামে একটি বার্তা পাঠান। বঙ্গবন্ধু এখানে বলেন, 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারীর মোকাবিলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।' (দ্র. বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশনা– বঙ্গবন্ধু স্পিকস, [মূল, ইংরেজি] ১৯৭২)

তারিখ : ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২

ফোরাম : সাংবাদিক সম্মেলন, লন্ডন

বিষয় : নির্মম হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের মতো এত উচ্চমূল্য, এত ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় জীবন ও দুর্ভোগ আর কোন দেশের মানুষকে ভোগ করতে হয় নাই। বাংলাদেশের নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য পাকিস্তানি সৈন্যরা দায়ী। হিটলার যদি আজ বেঁচে থাকত, বাংলাদেশের হত্যাকাণ্ডে সেও লজ্জা পেত।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭)

বিষয় : পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক

বক্তব্য/ঘটনা : 'প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যে কোনো একটি সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারটি বিবেচনা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

আমি তাঁকে বলেছি, আমার দেশবাসীর সাথে আলাপ আলোচনা না করে আমি কোনো কিছু বলতে পারবো না।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭)

বিষয় : জনগণের কাছে ফেরার আকাঙ্ক্ষা

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি আর এক মুহূর্তে এখানে থাকতে রাজি নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭)

তারিখ : ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

ফোরাম : পালাম বিমান বন্দর, নয়াদিল্লী

বিষয় : স্বাধীনতায় অবগাহন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'এ অভিযাত্রা অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দীদশা থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশা থেকে আশায় অভিযাত্রা। অবশেষে আমি নয় মাস পর আমার স্বপ্নের দেশ সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। এ নয় মাসে আমার দেশের মানুষ শতাব্দীর পথ পাড়ি দিয়েছে। আমাকে যখন আমার মানুষদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল, তখন তারা কেঁদেছিল; আমাকে যখন বন্দী করে রাখা হয়েছিল, তখন তারা যুদ্ধ করেছিল আর আজ যখন আমি তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, তখন তারা বিজয়ী। আমি ফিরে যাচ্ছি তাদের নিযুত বিজয়ী হাসির রৌদ্রকরে। আমাদের বিজয়কে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার যে বিরাট কাজ এখন আমাদের সামনে, তাতে যোগ দেয়ার জন্য আমি ফিরে যাচ্ছি আমার মানুষের কাছে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯, সূত্র : *টাইমস অব ইন্ডিয়া*, নয়াদিল্লী, ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২)

তারিখ : ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

ফোরাম : রেসকোর্স ময়দান

বিষয় : স্বাধীন দেশ হিসেবে বেঁচে থাকা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'ভাইয়েরা আমার, লক্ষ মানুষের প্রাণদানের পর আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার প্রতি জানাই সালাম। তোমরা আমার সালাম নাও। ... বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবো না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশরূপেই বেঁচে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নাই।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯-২৮০)

বিষয় : স্বাধীনতা ব্যর্থ হওয়া প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, নেতা হিসেবে নয়, আপনাদের ভাই হিসেবে বলছি–আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে, পূর্ণ হবে না। আমাদের তাই এখন অনেক কাজ করতে হবে। তোমরা আমার ভাইয়েরা, গেরিলা হয়েছিলে দেশমাতার মুক্তির জন্য। তোমরা রক্ত দিয়েছ। তোমাদের রক্ত বৃথা যাবে না।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০)

বিষয় : শান্তিতে বসবাস করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'তোমরা বাংলায় যারা কথা বলো না, তারা এখন থেকে বাংলার মানুষ হও। ভাইরা, তাদের গায়ে হাত দিও না, তারাও আমাদের ভাই। বিশ্ববাসীকে আমরা দেখাতে চাই; বাঙালিরা কেবল স্বাধীনতার জন্যেই আত্মত্যাগ করতে পারে, তাই না, তারা শান্তিতেও বাস করতে পারে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০)

বিষয় : সমস্যা সমাধানের জনঅংশগ্রহণের প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন, কিন্তু আজ আমাদের সামনে অসংখ্য সমস্যা আছে, যার আশু সমাধান প্রয়োজন। বিধ্বস্ত বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলুন। নিজেরা সবাই রাস্তা তৈরি করতে শুরু করুন। যার যার কাজ করে যান। ... আমি স্পষ্টভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১)

বিষয় : পাকিস্তানের সাথে ন্যূনতম বাঁধনও না রাখা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি ফিরে আসার আগে ভুট্টো সাহেব অনুরোধ করেছেন দুই অংশের মধ্যে বাঁধন সামান্য হলেও রাখা যায় কিনা। আমি তখন বলেছিলাম, আমি আমার মানুষের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। আজ আমি বলতে চাই—ভুট্টো সাহেব, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সাথে আর না। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২)

তারিখ : ২৬ মার্চ ১৯৭২

ফোরাম : বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ

বিষয় : যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আজ আমি যখন আমার সোনার বাংলার দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই যুদ্ধ বিধ্বস্ত ধূসর পাণ্ডুর জমি, ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম, ক্ষুধার্ত শিশু, বিবস্ত্র নারী, আর হতাশাগ্রস্ত পুরুষ। আমি শুনতে পাই সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ, নির্যাতিত নারীর ক্রন্দন ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার ফরিয়াদ। আমাদের স্বাধীনতা যদি এদেরকে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করে এদের মুখে হাসি ফোটাতে না পারে, লাখ লাখ ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে তুলে দিতে না পারে এক মুষ্টি অন্ন, মুছে দিতে না পারে মায়ের অশ্রু ও বোনের বেদনা, তাহলে সে স্বাধীনতা মিথ্যা, সে আত্মত্যাগ বৃথা। আমাদের এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতার বর্ষপূর্তি উৎসবের লগ্নে দাঁড়িয়ে, আসুন আজ আমরা এই শপথ গ্রহণ করি, বিধ্বস্তমুক্ত বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলব। গুটিকয়েক সুবিধাবাদী নয়, সাড়ে ৭ কোটি মানুষ তার ফল ভোগ করবে। আমি ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখী ও উন্নততর জীবন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪)

বিষয় : নতুন সমাজ গড়ে তোলা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি আশা করব, অতীতে আপনারা যেভাবে দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তাকে পরাভূত করেছিলেন, গভীর প্রত্যয় ও সাহস নিয়ে তেমনি বর্তমান সংকটের মোকাবেলা করবেন। আমরা পুরাতন আমলের জীর্ণধ্বংস্তূপের মধ্য থেকে নতুন সমাজ গড়ে তুলবো।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪)

বিষয় : শর্তহীন বহির্সাহায্য প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'দেশ গড়ার কাজে কেহ আমাদের সাহায্য করতে চাইলে তা আমরা গ্রহণ করবো। কিন্তু সে সাহায্য অবশ্যই হতে হবে নিষ্কণ্টক ও শর্তহীন। আমরা জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সব জাতির সমমর্যাদার নীতিতে আস্থাশীল। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেহ হস্তক্ষেপ করবেন না, এটাই আমাদের কামনা।' (গ্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫)

বিষয় : স্বাভাবিক অবস্থায় আনার সময়সীমা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী যেভাবে বাংলাদেশকে ধ্বংস করে গেছে তাতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার করতে ১০ বছর সময় দরকার। আমাদের বিপ্লবী সরকার আশা করছে ৩ বছর সময়ের মধ্যে এই কাজ সমাধা করবে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬)

বিষয় : খাদ্য-ঘাটতি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'সামনের কয়েক সপ্তাহ আমাদের জন্য ঘোর দুর্দিন। আমার প্রাণপ্রিয় দেশবাসী–আপনারা ধৈর্যধারণ করুন, উচ্চতম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাদ্যঘাটতি পূরণ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আমি মজুতদার, চোরাকারবারি ও গুজববিলাসীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, তারা যেন নিরন্ন মানুষের মুখের রুটি নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে, তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।' (প্রাগুক্ত পৃ. ২৮৬)

বিষয় : অভ্যন্তীরণ সমাজবিপ্লব প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। অবাস্তব তাত্ত্বিকতা নয়, আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে হবে। শোষণ ও অবিচারমুক্ত নতুন সমাজ আমরা গড়ে তুলবো।' (প্রাগুক্ত পৃ. ২৯৬)

বিষয় : শ্রমিক মালিক উৎপাদনশীল সম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি এমন এক নীতি নির্ধারণ করতে চাই যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারবেন। এই বলিষ্ঠ শ্রেণীর কর্তব্যবোধের উপর আমরা অনেকখানি নির্ভর করছি। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আবহমানকাল ধরে যে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে, তা আমাদের নতুন নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ থেকে অনেকখানি বিলুপ্ত হবে। শ্রমিক কর্মচারীকে আর সর্বদা মালিকের সাথে বিরোধের লিপ্ত থাকতে হবে না। কেননা, বর্তমানে তাদের মালিক হলো বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ, যারা মালিক ও ম্যানেজারদের হাতে বিশ্বাস করে নিজেদের সম্পত্তি জমা রেখেছে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭)

বিষয় : নির্যাতিত কৃষকশ্রেণি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমাদের চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণী এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮)

বিষয় : বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয় প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাংলাদেশে মানুষে মানুষে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য থাকবে না। সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থায় সমতা আনতে হবে এবং উচ্চতর আয় ও নিম্নতম

উপার্জনের ক্ষেত্রে যে আকাশচুম্বি বৈষম্য এতদিন ধরে বিরাজ করছিল সেটা দূর করার ব্যবস্থাটি উদ্ভাবনের জন্য আমি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করার কথা বিবেচনা করছি। আজ আমরা বিশ্বসভ্যতার এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। একটি নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্নে আমরা বিভোর, একটি সামাজিক বিপ্লব সফল করার প্রতিশ্রুতিতে আমরা অটল, আমাদের সমস্ত নীতি, আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এ কাজে নিয়োজিত থাকবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮-২৮৯)

বিষয় : হানাদারদের ধ্বংসলীলা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমার প্রিয় দেশবাসী, লাখ লাখ শহীদের রক্তের লাল আবরণে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবো না। আমি জীবনেও কাউকে কোনো দিন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিই নাই। শত্রুরা বাংলাদেশের সবকিছু ধ্বংস করে গেছে। কিছুই রেখে যায়নি। কি করে যে, এ দেশ চলবে, সত্যিই চিন্তা করলে আমি শিহরিয়া উঠি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯)

বিষয় : নতুন করে সোনার বাংলা গড়ে তোলা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। সে বাংলায় আগামীদিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলবো। আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। ক্ষেতখামার, কল-কারখানায় দেশ গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলুন। কাজের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়া যায়। আসুন, সকলে মিলে সমবেতভাবে আমরা চেষ্টা করি যাতে সোনার বাংলা আবার হাসে, সোনার বাংলাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯)

তারিখ : ১০ এপ্রিল ১৯৭২

ফোরাম : গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন, ঢাকা

বিষয় : গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমরা গণতন্ত্র দিতে চাই এবং গণতন্ত্র দিতেই আজ আমরা এই পরিষদে বসেছি। কারণ, আজ আমরা যে সংবিধান দেবো, তাতে মানুষের অধিকারের কথা লেখা থাকবে। যাতে ভবিষ্যতে কেউ জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। এমন সংবিধানই জনগণের জন্যে পেশ করতে হবে। আজ এখানে বসে চারটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে আমাদের ভবিষ্যৎ

বংশধরদের জন্য এমন সংবিধান রচনা করতে হবে, যাতে তারা দুনিয়ার সভ্য দেশের মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১)

বিষয় : ভারতের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমার দেশের জনসাধারণ যখন প্রাণভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে, ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষে যায়, তখন ভারতের জনসাধারণ তাদের বুকে টেনে নেয়, ভারতের জনসাধারণ, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং আসামের জনসাধারণ, বিশেষ করে, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। কারণ তারা আমাদের জনসাধারণকে বুকে টেনে নিয়েছেন। স্মরণ করি ভারতের সেনাবাহিনীর সমস্ত জোওয়ানদের, যারা তাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থেকে সংগ্রাম করেছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২)

বিষয় : স্পিকারকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান

বক্তব্য/ঘটনা : 'জনাব স্পীকার সাহেব, আপনি এই পরিষদের স্পীকার হয়েছেন। আবার আপনাকে জানাতে চাই যে, আমরা একটি গণমুখী সংবিধান তৈরি করতে চাই, এবং সেই সঙ্গে এই বিশ্বাস দিতে চাই যে, আপনি যতক্ষণ নিরপেক্ষ থাকবেন, আমাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আপনার কর্তব্যটুকু আইন ও আপনার বিবেক অনুযায়ী এবং পার্লামেন্টারি কনভেনশন মেনে নিয়ে পালন করবেন এই আশা করি। আপনি কোন্ দল বড়, কোন্ দল ছোট তা দেখবেন না, কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বিচার ও ইনসাফ করবেন। আমার দলের পক্ষ থেকে আপনাকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা জানাব।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪)

তারিখ : ১ মে, ১৯৭২

ফোরাম : বেতার ও টেলিভিশনের জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ

বিষয় : পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাধা পেরিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আপনারা অতীতে বারবার আমাকে ডাকে সাড়া দিয়ে নির্ভীক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমার বিশ্বাস, এবারও আপনারা আমার আহ্বানে মনেপ্রাণে এগিয়ে আসবেন। অতীতে আমরা একটি মর্মান্তিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক

ব্যবস্থায় নিগড়ে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। গুটিকয়েক সুবিধাবাদী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জাতীয় সম্পদ ও শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদন নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। দেশ আজ স্বাধীন। সম্পদের মালিক জনগণ। তাই কোনো শ্রেণীবিশেষের ভোগলালসার জন্য এবং লোভ চরিতার্থ করার নিমিত্তে এই সম্পদকে অপচয় করতে দেয়া হবে না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র কায়েম করা। এই ব্যবস্থায় দেশের সমুদয় উৎপাদিত ও প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষক শ্রমিক ও সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করা হবে। যদিও বাধা অনেক, সমস্যার শেষ নেই, তবুও লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬-২৯৭)

বিষয় : সমাজতন্ত্র কায়েমে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'পুরাতন পুঁজিবাদী পদ্ধতির স্থলে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি কায়েমের পথে এটা একটা সুস্পষ্ট দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুরাপুরিভাবে গড়ে তোলার কাজ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। এখানেই শ্রমজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এই নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমে শ্রমিকদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হলে, তাদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। আমরা এখন আর পুঁজিবাদী প্রভুদের ভোগের জন্য সম্পদ উৎপাদন করতে যাচ্ছি না।'

বিষয় : সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'এখন যা উৎপাদিত হবে তা শ্রমিক-কৃষক এবং বাংলাদেশের সব মানুষের কল্যাণে লাগবে। সমাজতন্ত্রের শত্রুরা এই লক্ষ্য অর্জনে বাধা এবং জাতীয়করণ কর্মসূচির সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে চায়। শ্রমিকরা সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু এটা করতে হলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিকরা যে ভূমিকা পালন করেছেন, সে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শিল্পোৎপাদনের সুফল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষীভাইদের ভোগ করতে দিতে হবে। সুতরাং, জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল দাবি-দাওয়া পেশের মনোভাব ত্যাগ করা দরকার। সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা সম্ভব নয়।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮)

বিষয় : জনগণের সমস্যা সমাধানের পরিকল্পিত উপায় অবলম্বন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'সরকারের উচ্চ ও নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতনের ক্ষেত্রে যে বিরাট ব্যবধান ছিল তা কমিয়ে আনার জন্য বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করার উদ্দেশ্যে একটি 'জাতীয় বেতন কমিশন' গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি চাকরির এই নয়া কাঠামোতে কর্মচারীরা জাতীয় পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে জনসাধারণ যে সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বেকারত্ব ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের দুর্মূল্য আমাদেরকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে আমরা জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সজাগ রয়েছি এবং পরিকল্পিত উপায়ে এ সমস্যার মোকাবিলার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮)

বিষয় : দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতিমধ্যেই বেসরকারি ডিলার এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স, পারমিট বাতিল করে দেয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নের ও সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারি ব্যক্তিদের বণ্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক স্বল্পতার সুযোগে যুক্তিহীন মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার সাথে সাথে কম বেতনের লোকদের জন্যে আমরা কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা জানেন, জিনিসপত্রের দাম না কমিয়ে কেবল বেতন বাড়িয়ে দিলেই জনসাধারণের অসুবিধা দূর হয় না। কাজেই মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে আমরা ইতিপূর্বে বর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯)

বিষয় : জনগণের দুরবস্থা ও তা লাঘবে সরকারের আন্তরিক কর্মপ্রয়াসের বর্ণনা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আপনারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের উপযোগী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুন। আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে, উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। দেশের সম্পদ বাড়িয়ে আমরা জীবনযাত্রার প্রকৃত মান উন্নয়ন করতে সফল হবো। আজকের এই মে দিবসে আসুন আমরা এই শপথ গ্রহণ

করি যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য আমরা অবিরাম সংগ্রাম করে যাবো। এ দেশের চাষী, তাঁতী, কামার, কুমার, শ্রমিক ও মজলুম জনতার জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধ ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা কাজ করবো। আমার পার্টির সহকর্মীগণ এবং সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ যে, দুঃখের মধ্য দিয়ে আপনাদের দিন কাটছে। ঘরে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই, মাথা গুজবার জন্য নেই এতটুকু ঠাঁই। ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা আপনাদের সবকিছু নষ্ট করে দিয়ে গেছে। তবে আপনারা সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে এই বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্য জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১)

তারিখ : ৯ মে, ১৯৭২

ফোরাম : রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দান

বিষয় : নিজের চাওয়া প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি কি চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি কি চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ থাক। আমি কি চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কি চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কি চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণভরে হাসুক। কিন্তু বড় দুঃখ ভাই, জালেমরা কিছুই রেখে যায়নি। সমস্ত নোটগুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। বৈদেশিক মুদ্রা, বিশ্বাস করুন, যেদিন আমি এসে সরকার নিলাম–এক পয়সার বৈদেশিক মুদ্রাও পাইনি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩)

বিষয় : কালোবাজারি, চোরাকারবারীদের ব্যাপারে ক্ষোভ

বক্তব্য/ঘটনা : 'এছাড়া দুনিয়ার অন্যান্য দেশকে বলছি, আমার লোককে বাঁচাও, আমার লোককে খাবার দাও। আমার দেশের লোক মরে গেল। খাবার দাও। দুঃখ হয় কি জানেন? আমি ভিক্ষা করে চাল নিয়ে আসি, আমি গ্রামে গ্রামে পাঠাই, আর চোরাকারবারী সে মাল চুরি করে খায়। ইচ্ছে হয়, ওদের পেটের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে আমি কালোবাজারির পয়সা বের করে আনি। বাংলার জনগণ বিনা অস্ত্রে মোকাবিলা করেছে ইয়াহিয়া সৈন্যদের। পারবেন না শেষ করতে? আমি তো অস্ত্র দিয়ে যাইনি। আমি তো পয়সা দিতে পারিনি। আমি তো দিয়েছিলাম শুধু আদর্শ, দিয়েছিলাম স্বাধীনতার ডাক।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫)

বিষয় : জনসাধারণের খাদ্যাভাব, শিক্ষার দুরবস্থা নিরসনে নিজের অক্ষমতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'কিন্তু শান্তি আমার নাই। আমার পয়সা নাই। গরিব কর্মচারী না

খেয়ে কষ্ট পায়, আমি কি করব? আমি বললাম, ২৫ টাকা বেতন বাড়িয়ে দাও। তাতে আমার ৪০ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। পাবো কোথায়? ট্যাক্স কোথায়? খাজনা কোথায়? কোথা থেকে আসবে? কার কাছ থেকে আনবো? কিভাবে দিবো? রাস্তা নেই। বাস ট্রাক নেই। ভেঙে দেয়া হয়েছে। রাস্তাগুলোর পুল উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ট্রাক ছিল না। আমি ট্রাক পাঠিয়েছি। ট্রাক আনছি দুনিয়ার কাছ থেকে। আনতে সময় লাগে না? আনতে সময় তো লাগে। স্কুল-কলেজ ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেছে। কেমন করে ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে? বই পর্যন্ত নেই। ল্যাবরেটরি নেই। টেবিল চেয়ার নেই। কি করে ছেলেরা লেখাপড়া করবে? ১০ কোটি টাকা দিয়েছি আমি তাদের জন্য। আমি কোথায় পাবো? কি করে দেবো? আমার তো কিছু নেই। আমি গরিব মানুষের উপর ট্যাক্স বসাতে পারি না। আজ পর্যন্ত তো আমি এক পয়সা ট্যাক্স বাড়াইনি। তাহলে চলবে কি করে? আপনাদের কাজ করতে হবে। ছেলেদের কাজ করতে হবে। আপনারা মনে রাখবেন, স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর। স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর। দুশমনরা বসে নেই। দুশমনরা খেলছে। দুশমনরা পয়সা লুটছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫)

বিষয় : ভবিষ্যৎ বংশধরদের গোলাম না করার প্রত্যয়

বক্তব্য/ঘটনা : 'টাকা আমি আনতে পারি। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ বংশধরকে গোলাম করে সেই পয়সা আমি মানুষের কাছ থেকে আনতে চাই না। আমি চাই না যে আমার ভবিষ্যৎ বংশধর গোলাম হয়ে থাক। যে যা বলুক না কেন, আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, আমি আপনাদের ধোঁকা দিতে পারবো না। কারণ আমি গদির জন্য রাজনীতি করিনি। আমি মরবার জন্য রাজনীতি করেছিলাম। আমি আপনাদের ১০০ কোটি টাকার মতো রিলিফ দিয়েছি। তবুও আমি বলেছি, আমি তিন বছর আপনাদের কিছু দিতে পারবো না। আপনারা যদি রাজি থাকেন, তবে হাত তুলে দেখিয়ে দেন।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬)

বিষয় : ছাত্রদের ঠিকমতো পড়াশোনা করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : ছাত্র ভাইদেরকে বলি, একটু লেখাপড়া করো। বাবার হোটেলে আর কতকাল খাবে? পয়সা কড়ি নেই। তোমাদের কষ্ট হচ্ছে জানি। কিন্তু লেখাপড়া একটু করো। আন্দোলন করো, আমার আপত্তি নেই। আমার জন্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তোমাদের একটু মানুষ হতে হবে। মানুষ না হলে দেশ গড়তে আমি পারবো না। ভবিষ্যতে তোমাদের এ দেশের শাসনভার হাতে

নিতে হবে। চুঙ্গা ফুকাও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু মেহেরবানি করে একটু কাজ করো।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬)

বিষয় : খাদ্য-ঘাটতি নিরসনে কৃষকদের কাজ করতে উদাত্ত আহ্বান

বক্তব্য/ঘটনা : 'কৃষক ভাইয়েরা, চেষ্টা করবো দুনিয়ার থেকে বীজ ও পাম্প এনে আপনাদের দেবার জন্য। কিন্তু আপনাদের কাজ করতে হবে। কাজ করে ফসল উৎপাদন করতে হবে। জানেন কত লাখ টন বাংলাদেশে খাদ্যের অভাব? আমি কোথা থেকে দেবো? কেমন করে বাঁচাব? আমার ঘুম হয় না। ৪ মাস হলো আমি জেল থেকে এসেছি। কিন্তু কেমন করে একটা দিন বিশ্রাম করতে হয় তা আমি জানি না। কিন্তু করবো কি? কি করে চালাবো? এই রাজশাহী আসলাম। রাস্তাঘাট নেই। মানুষের খাবার নেই। পানি নেই। বন্যায় সব নষ্ট হয়ে যায়। কি করে আমি চালাবো? আমি তো বুঝতে পারি না। আমি তো পাগল হয়ে যাই। আমি কি করে কি করবো? আমার তো চিন্তায় ঘুম হয় না। ভাইয়েরা আমার আপনাদের কাজ করতে হবে। কাজ না করলে কোনো কিছুই হবে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬)

বিষয় : নিজের সম্পর্কে

বক্তব্য/ঘটনা : 'তারা পালিয়ে ইয়াহিয়ার দালালি করেছে। এরা মনে করেছে শেখ মুজিবুর কিছু বলে না। বড় দয়ালু লোক। আমি সত্যিই দয়ালু লোক। কিন্তু গরিবকে যদি কেহ শোষণ করে তখন আমি দয়ালু নই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭)

বিষয় : জাতীয়করণের যৌক্তিকতা নিয়ে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বড় বড় কাপড়ের কল। বড় বড় চটকল। বড় বড় চিনির কল। আমি জাতীয়করণ করে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের সম্পত্তি করে দিয়েছি। আপনাদের এর সুফল ভোগ করতে একটু সময় লাগবে। কিন্তু এ সম্পত্তি ২/৫ জনের নয়। এই সম্পত্তি আমার বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি লোকের সম্পত্তি।' (দ্র. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩০৭)

বিষয় : সাম্প্রদায়িক রোখার দৃঢ় প্রত্যয়

বক্তব্য/ঘটনা : 'আর সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্ম-কর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্ম-কর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্ম-কর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু

ইসলামের নামে আর বাংলাদেশের মানুষকে লুট করে খেতে দেওয়া হবে না। পশ্চিমারা ২৩ বছর ইসলামিক টেবলেট দেখিয়ে আমাদেরকে লুটেছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭)

বিষয় : নিজের প্রাপ্তি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'ধোঁকা আমি দিই না। ধোঁকা আমি দেবো না। মিথ্যা ওয়াদা আমি করি না। আমার হাতে কিছুই নেই। ভাইয়েরা, আমি পেয়েছি, আমার যা পাবার। আমার চেয়ে বেশি কোনো দেশে কোনো নেতা কোনো দিন পায়নি। সেটা হলো আপনাদের ভালোবাসা। যে ভালোবাসা আপনারা আমাকে দিয়েছেন, আপনারা আমাকে দোয়া করুন, আমি যেন সেই ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮)

তারিখ : ৭ জুন, ১৯৭২

ফোরাম : সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

বিষয় : নিজের ক্ষমতাগ্রহণ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমার দেশের লোক আমাকে ভালোবাসে। তাই আমার সহকর্মীরা বললেন, তোমাকেই সব কিছুর ভার নিতে হবে। তার ফলে আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব নিতে বাধ্য হলাম। বিশেষ করে এই জন্য যে, আমার বাংলার স্বীকৃতি দরকার। আমি বাংলাদেশের মানুষের কাছে আবেদন জানালাম, তোমাদের অস্ত্র ফেরত দাও। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আমার বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা ২ লাখ অস্ত্র আমার হাতে দিয়েছে। অস্ত্র সমর্পণের এমন নজির দুনিয়ার ইতিহাসে আর দেখা যায় না।' (দ্র. প্রাদুক্ত, পৃ. ৩১৪)

বিষয় : স্বীয় সার্বভৌত্ব ও ভারতের সাহায্য প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমার দেশ স্বাধীন দেশ। ভারত হোক, আমেরিকা হোক, রাশিয়া হোক, গ্রেট ব্রিটেন হোক, কারো এমন শক্তি নাই যে, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ আমার দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু বন্ধুরাষ্ট্রকে বন্ধু বলতে লজ্জা করা উচিত নয়। যেদিন আমার সরকার ক্ষমতায় আসে, সেদিন এক ছটাক চালও ছিল না। আমি তাই ভারতের কাছে চাল চাই। ভারত তখন আমাদের সাড়ে সাত লাখ টন চাল দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫)

বিষয় : বাংলার মানুষের সাথে নিজের সম্পর্ক

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাংলার মানুষকে আমি জানি। আমাকেও বাংলার মানুষ চেনে। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমি তাদের জন্য কোনো কাজে হাত দিয়ে কখনো হাল ছাড়ি না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫)

বিষয় : জাতীয়করণের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'বড় বড় শিল্প কারখানা আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিও জাতীয়করণ করেছি। এসব জাতীয়করণের অর্থ আমাদের বুঝে দেখতে হবে। এগুলো সাড়ে ৭ কোটি লোকের সম্পদ। শ্রমিকেরা সারা জীবন শিল্প কারখানা, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইত্যাদি জাতীয়করণের দাবি জানিয়েছেন। এগুলো জাতীয়করণের অর্থ হলো শোষণের চাবিকাঠি ধ্বংস করে দেয়া। আমরা শোষণের চাবিকাঠি ধ্বংস করে দিয়েছি।' (ঐ. পৃষ্ঠা ৩১৬)

বিষয় : যার যা দায়িত্ব সম্পর্কে

বক্তব্য/ঘটনা : 'শ্রমিক ভাইয়েরা, দুধ খান, গরু জবাই করে খেয়ে ফেলবেন না। তাতে দেশ চলবে না। আর লাল বাহিনীর ভাইয়েরা, আপনারা হবেন আদর্শকর্মী। আপনাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। আর আপনাদের দেখতে হবে যে, ৮ ঘণ্টার জায়গায় লালবাহিনীর ছেলেরা যেন ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করে।' (ঐ, পৃষ্ঠা ৩১৬)

বিষয় : চোরাকারবারী মজুতদারদের হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি ভিক্ষা করে দুনিয়ার নানা দেশ থেকে জিনিসপত্র আনছি আমার গরিব-দুঃখীদের জন্য। সেই জিনিস যারা লুটপাট করে খাচ্ছে, তাদের রক্ষা নাই। আমি ১৫ দিন সময় দিলাম। ১৫ দিনের মধ্যে যদি সরকারি বাড়ি না ছাড়ো, যদি মজুদ করে রাখো, এক-একটা এলাকায় আমি কারফিউ দিব আর সমস্ত পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট আর আমার স্বেচ্ছাসেবকরা সেখানে তল্লাশি চালাবে। এতদিন আমি কিছু বলি নাই। এখন বলে দিলাম, হুকুম দিয়ে দিলাম। এরপরেও বড় বড় বক্তৃতা করবে আর রাত্রিবেলায় চোরাগাড়িতে চড়বে, এটা হবে না। আমার প্রাণ থাকতে নয়। বারবার ঘুঘু তুমি ধান খেয়ে যাও। আর ঘুঘু খাওয়ার চেষ্টা করো না। আমি পেটের মধ্য হতে ধান বের করে ফেলবো।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭)

বিষয় : শোষণহীন সমাজের জন্য সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'সমাজতন্ত্র আমি দুনিয়া থেকে ভাড়া করে আনতে চাই না, এ

সমাজতন্ত্র হবে বাংলার মাটির সমাজতন্ত্র। এ সমাজতন্ত্র বাংলার মানুষের সমাজতন্ত্র, তার অর্থ হলো শোষণহীন সমাজ, সম্পদের সুষম বণ্টন। বাংলাদেশে ধনীদের আমি আর ধন সম্পদ বাড়াতে দেবো না। বাংলার কৃষক, মজদুর, বাংলার বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক এ দেশে সমাজতন্ত্রের সুবিধা ভোগ করবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮)

বিষয় : গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা

বক্তব্য/ঘটনা : 'কিন্তু সমাজতন্ত্র যেখানে আছে সেদেশে গণতন্ত্র নাই। দুনিয়াকে আমি বাংলার মাটি থেকে দেখাতে চাই যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমি সমাজতন্ত্র কায়েম করব। আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমি জনগণকে ভালোবাসি, আমি জনগণকে ভয় পাই না। দরকার হলে আবার ভোটে যাবো। গণতন্ত্র বাংলায় অবশ্যই থাকবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮)

বিষয় : ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মহীনতা নয় প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতার মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানদের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। খ্রিস্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। এর একটা মানে আছে। এখানে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার, আল-বদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২)

বিষয় : সংবাদপত্রের নীতিমালা ও আদর্শ প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'গণতন্ত্রের অর্থ পরের ধন চুরি, খুন-জখম, লুটতরাজ বা পরের অধিকার হরণ করা নয়। তার জনকল্যাণমূলক একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও এমনি একটা নীতিমালা আছে। ...আপনারা দাবি করেছিলেন, আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতায় যেন কোনো দিন হস্তক্ষেপ না করি। কিন্তু আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। আপনাদের সাংবাদিক ইউনিয়নের যে আদর্শ আছে, সেগুলো মানলে কি মিথ্যা কথা লেখা যায়? রাতারাতি একটা কাগজ বের করে বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে কেউ যদি বাংলার বুকে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই সেটা সহ্য করবেন না। কারণ তা আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩)

বিষয় : সংবাদপত্রের সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমরা গণতন্ত্র চাই, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলা চাই না, কারও বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করতেও চাই না। অথচ কোনো কাগজে লেখা হয়েছে 'মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য সংঘবদ্ধ হও'। যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমার দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, এখানে বসে কেউ যদি তার বীজ বপন করতে চান তাহলে তা কি আপনারা সহ্য করবেন? আপনাদের যে কোনো কথা বলবার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আপনাদের একটা নীতিমালাও রয়েছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫)

বিষয় : শ্রমিক ধর্মঘট বন্ধ এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন যারা সত্যিকার শ্রমিক, তারা এসব করছে না। কিছু কিছু লোক করছে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধের জন্যই ধর্মঘট বন্ধ করা হয়েছে। তাও মাত্র ছ'মাসের জন্য। আপনারা বিশ্বাস করুন, কারও অধিকার কেউ নষ্ট করুক এই আমি কখনো চাই না। আমি জীবনভর আন্দোলন করেছি এবং আন্দোলনের ভিতর দিয়েই আমি এতদূর এগিয়ে এসেছি। সেজন্য আমি কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করতে চাই না। এ সরকারও কারও ব্যক্তিগত অধিকার নষ্ট করতে চায় না। যেখানে কাজ জানা লোক নাই, ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা নাই, সমাজতন্ত্রের জ্ঞান নাই সেখানে ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিসহ মূল শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কেউ যদি পয়সার জন্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে, তবে সেখানে আমি বাধা না দিয়ে কি করতে পারি? আমি কি বলতে পারি যে, সাড়ে ৭ কোটি লোকের সম্পত্তি মুষ্টিমেয় লোক ভোগ করুক?' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬)

বিষয় : সংবিধানের চারটি মৌল ভিত্তি প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি জানি, আমার মতো আপনারাও চারটি আদর্শ সমর্থন করেন। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা দেশকে বাঁচাতে চাই। আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই। আমরা নতুন প্রচেষ্টা নিয়েছি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা দিচ্ছি। দুনিয়ায় দেখা গেছে, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে গিয়ে অনেক সময় মানুষের মঙ্গলের খাতিরে বাধা দূর করবার জন্য রূঢ় হতে হয়েছে। সেটা আমি করতে চাই না। এজন্য যে, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা, আমি চেষ্টা করে দেখছি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমার আন্দোলন। সেই জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব

নষ্ট হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাও আমাদের আদর্শ। এখানে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮)

তারিখ : ১২ অক্টোবর, ১৯৭২

ফোরাম : গণপরিষদের অধিবেশন, ঢাকা

বিষয় : হানাদার বাহিনীর আক্রোশ প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'তারা গর্ব করে বলে গিয়েছিল যে, বাংলাদেশের লোক, জয় বাংলা স্বাধীন হবে, কিন্তু এমন ধ্বংস করে দিয়ে যাবো, এই দেশের মানুষ যাতে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে এবং দুর্ভিক্ষে যেন লাখ লাখ লোক মারা যায়।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪)

বিষয় : যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রভাব প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'গত মহাযুদ্ধে যখন গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়া জার্মানি আক্রমণ করে এবং জার্মানিকে পরাজিত করে, তখন জার্মানিতে যে ধ্বংস হয়েছিল, সেই সমপরিমাণ ধ্বংস হয়েছে বালাদেশে। এটা বাংলাদেশের শেখের কথা নয়, এটা জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের কথা–যারা বাংলাদেশে সার্ভে করেছেন। যারা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তারা অবশ্য জানেন না যে, জার্মানির লোক এক বছর, দেড় বছর রুটি খেয়ে ছিল। যারা ইতিহাস পড়েন নাই বা শোনেন নাই, তারা জানেন না যে, রাশিয়ায় বিপ্লবের পর একমাত্র লেনিনগ্রাদে ১২ লাখ লোক শীতে মারা গিয়েছিল।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫)

বিষয় : সরকারের প্রচেষ্টা ও ভারতের অবদান প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'দুনিয়ার মানুষ আমাকে বলেছিল, ৫০ লাখ লোক বাংলাদেশে না খেয়ে মারা যাবে। কতটুকু করতে পেরেছি, জানি না। শুধু এটুকু জানি যে, চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। জানি অবস্থা ভয়াবহ, বিরাট আঘাত, বিরাট ধ্বংস। একটা গাছে ফল হতে ৬ বছর সময় লাগে। বিধ্বস্ত বাংলাকে গড়ে তার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কি লাগে, তা যারা গড়ে তারা বোঝে। ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। আমি ছিলাম কলোনি। আমাকে সেখানে সাহায্য করেছে। এ কথা যদি আমি স্মরণ না করি, তাহলে অন্যায় হবে। যদি ৮ লাখ, ৯ লাখ টন খাদ্য দিয়ে ভারত আমাদের সাহায্য না করত, তাহলে কোনো সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না, দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করা। অকৃতজ্ঞ হলে চলবে না। বাংলা আর কিছু হতে পারে; কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬)

বিষয় : স্বাধীনতার পর সম্ভাব্য গণহত্যা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'আর দুনিয়ায় এমন ইতিহাস যদি কেউ দেখাতে পারে এত বড় বিপ্লবের পরে, এত বড় ধ্বংসস্তূপের পরে যেখানে হাজার হাজার, লাখ-লাখ লোকের কাছে বন্দুক ছিল, কামান ছিল, মেশিনগান ছিল, যেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করবার পরে অনেকের কাছে অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল, সেক্ষেত্রে আমার বাংলার মানুষকে মোবারকবাদ না দিয়ে পারবো না। তারা বলল, বিপ্লবের পরে বাংলাদেশে দ্বিতীয় গণহত্যা হবে। কিন্তু বাংলার মানুষ আমার জেল থেকে ফিরে আসার পরে তারা চেষ্টা করে, সহযোগিতা করে বাংলার মাটিতে গণহত্যা হতে দেয় নাই। দুঃখের বিষয়, এখন তাদের প্রশংসা না করে আমাদের গালি খেতে হয়।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬)

বিষয় : আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে গণশক্তির ব্যবহার প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'বিপ্লবের পরে দেশে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের এবং আমার জনসাধারণের সহযোগিতায় আইনশৃঙ্খলা অনেকটা ফিরে এসেছে–ভালোভাবেই ফিরে এসেছে। তবুও দুষ্কৃতিকারী কিছু আছে। তাদের প্রতি জনগণের সহযোগিতা নাই। কাজেই, শেষ পর্যন্ত তাদেরও আত্মসমর্পণ করতে হবে। চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমাইশ থাকে। তাতে কিছু যায় আসে না। তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। দেশের মানুষ যখন ক্ষতির সম্মুখীন হবেন, তখন তারাই সব রুখে দাঁড়াবে। দরকার যদি হয়, সরকার এমন থাবা দিবে যে, থাবায় কয়েকদিনের মধ্যে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬)

বিষয় : স্বল্পতম সময়ে সংবিধান প্রণয়ন প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'দুনিয়ায় ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই ধরনের অবস্থার মধ্যে মাত্র ১০ মাসের মধ্যে কোন দেশ সংবিধান দিতে পেরেছে। আমি তাই মোবারকবাদ জানাই সংবিধান কমিটির সদস্যদেরকে। মোবারকবাদ জানাই বাংলার জনসাধারণকে, রক্তে লেখা এই সংবিধানকে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭)

বিষয় : সংবিধানের চার স্তম্ভ প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'জাতীয়তাবাদ বাঙালি জাতীয়তাবাদ, এই বাঙালি জাতীয়তাবাদে চলবে বাংলাদেশ। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার আকাশ-বাতাস, বাঙালির রক্ত দিয়ে গড়া বাংলার জাতীয়তাবাদ। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী,

জনসাধারণের ভোটের অধিকারকে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্রে, যেখানে শোষণহীন সমাজ থাকবে। শোষকশ্রেণী আর কোনো দিন দেশের মানুষকে শোষণ করতে পারবে না। সমাজতন্ত্র না হলে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ ৫৪ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে বাঁচতে পারবে না, সেই জন্যই অর্থনীতি হবে সমাজতান্ত্রিক আর হবে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে না, মুসলমান তার ধর্ম পালন করবে না, বাংলার মানুষ এটা চায় না। রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭)

বিষয় : সংবিধান চূড়ান্ত করার পর ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'আজকে বাংলার মানুষ গর্বিত, আমার দল গর্বিত, পরিষদ সদস্যরা গর্বিত যে, আজ আমরা স্বাধীন বাংলার মাটিতে খসড়া সংবিধান ফিরে পেয়েছি। আশা করি, কয়েক দিনের মধ্যেই পরিপূর্ণ সংবিধান মানুষের সামনে পেশ করতে পারব। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আটকে রাখার জন্য রাজনীতি করে না। ক্ষমতায় যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে আইন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারতো। সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মুক্তির জন্য আওয়ামী লীগ রাজনীতি করেছে এবং সেই মুক্তি আজ হয়েছে। ...এটা দুনিয়ার ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়, বিশেষ করে আমাদের এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গদি যারা একবার পায়, তারা আর সেই গদি ছাড়তে চায় না। তাড়িয়ে না দিলে গদি ছাড়ে না। অথচ আমার গণপরিষদ সদস্যরা সংবিধান দিয়ে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবেন। তারা আবার জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ফিরে আসবেন।' (দ্র. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩৮-৩৩৯)

তারিখ : ৪ নভেম্বর, ১৯৭২

ফোরাম : গণপরিষদের অধিবেশন, ঢাকা

বিষয় : জনগণের প্রতি আস্থা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'বিপ্লবের পর ৯ মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেয়া, মানুষের মৌলিক অধিকার দেয়ার অর্থ হলো আমরা জনগণের উপর বিশ্বাসী, এই জনগণের উপর আস্থা নিয়েই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। জনগণের উপর আমার আস্থা রয়েছে। আমি আগেই বলেছি, জনগণকে আমরা ভয় পাই না, জনগণকে আমরা ভালোবাসি।'

বিষয় : ক্ষমতা কুক্ষিগত না করা এবং জনরায়ের প্রতি আস্থা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : '৫ বছর পর্যন্ত আমরা অনায়াসে শাসনযন্ত্র চালাতে পারতাম, কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বাংলার মানুষের কাছে গণভোট নিয়ে প্রমাণ করে দিতাম যে, বাংলার মানুষ কাদের ভালোবাসে, কিন্তু তা আমরা চাইনি, চেয়েছি মানুষের অধিকার। এই অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম। তাই আজ শাসনতন্ত্র দিয়েছি। আমার সহকর্মীর একজনও আপত্তি করে নাই যে, আমরা পরিষদ ভাঙব না। এজন্য আমি গর্বিত। যারা এই পরিষদের সদস্য হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, যারা এই গণপরিষদ সদস্য, তারা শাসনতন্ত্র পাস করে বলতে পারতেন ভবিষ্যতে আমরা জাতীয় পরিষদরূপে কাজ করবো। কারো কিছু বলার অধিকার ছিল না, কেননা কনভেনশনের রীতি রয়েছে। কিন্তু তা করা হয় নাই। আওয়ামী লীগ ক্ষমতার লোভী নয়, এটি তার একটি প্রমাণ। সে শাসনতন্ত্র দিয়েছে এবং নির্বাচনে যাবে। ...যেদিন আমার বন্ধুরা, সহকর্মীরা এখানে এসে সরকার বসান, সেদিন তারা বলতে পারতেন, Emergency, no democracy, no talk for 3 years–এবং সেটা মানুষ গ্রহণ করতো। কোনো সমালোচনা চলবে না। কোনো মিছিল হবে না, কোনো পার্টির কাজ চলবে না। কারণ দেশের যা অবস্থা ছিল, তাতে এটা সহজেই করা যেত। সব দেশে, সব যুগে বিপ্লবের পরে তাই হয়েছে। কিন্তু আমরা সেটা চাই নাই। শক্তি আমাদের ছিল। আমাদের শক্তি আমাদের জনগণ। কেউ যদি মনে করেন যে, শক্তির উৎস বন্দুকের নল, আমি তা স্বীকার করি না। আমি স্বীকার করি, আমার দল স্বীকার করে, শক্তির উৎস হলো জনগণ।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫-৩৪৬)

বিষয় : জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ছিল চরম মরণ সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না হলে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬)

বিষয় : শোষিতের গণতন্ত্র প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। মানুষের একটা ধারণা আছে এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যেসব দেশে চলেছে, দেখা যায় সেসব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিবাদের প্রটেকশন দেয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজন হয় শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্রের ব্যবহার। সে গণতন্ত্র আমরা বিশ্বাস

করি না। আমরা চাই, শোষিতের গণতন্ত্র এবং শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হলো–আমার দেশে যে গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে তাতে সে-সব বন্দোবস্ত করা হয়েছে যাতে এদেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়, শোষকরা যাতে রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা নাই। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সাথে অন্যের পার্থক্য আছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭)

বিষয় : জাতীয়করণ প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'নিশ্চয় আমরা কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, কাপড়ের কল, পাটকল, চিনির কারখানা সবকিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি। তার মানে হলো, শোষকগোষ্ঠী যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭)

বিষয় : শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতন্ত্র কায়েম প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কি আবহাওয়া, কি ধরনের অবস্থা, কি ধরনের মনোভাব, কি ধরনের আর্থিক অবস্থা সবকিছু বিবেচনা করে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে।'

'একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা ৯ মাসে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি, তা আমার মনে হয় দুনিয়ার কোনো দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সোশ্যালিজম এনেছে তারাও সেগুলো করতে পারে নাই–এ ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোনো কিছু প্রচলন করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা Process-এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮)

বিষয় : ধর্মীয় অধিকার সমুন্নত রাখা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবো না। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি

বলবো ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যদি বলে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলব সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটিকয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।' (দ্রব্য প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮)

বিষয় : সরকারি কর্মচারীদের মনোভাব প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০)

তারিখ : ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭৪

ফোরাম : আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, ঢাকা

বিষয় : গণ-আন্দোলনে জনগণকে সংঘবদ্ধ করা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'যারা মনে করেন রাতের অন্ধকারে গুলি করে কিংবা একটা রেললাইন তুলে দিয়ে টেরোরিজম করে বিপ্লব হয়, তাঁরা কোথায় আছেন তারা জানেন না। এই পন্থা বহু পুরোনো পন্থা। এ পন্থা দুনিয়ায় কোনো দিন কোনো কাজে লাগে নাই। এই পন্থা দিয়ে দেশের মানুষের কোনো মঙ্গল করা যায় না। একটা রাস্তা ভেঙে দিয়েও একজন লোককে অন্ধকারে হত্যা করে শুধু মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। এই টেরোরিজম দিয়ে দেশের বিপ্লব হয় না, হয় নাই, হতে পারে না।

জনগণকে ছাড়া, জনগণকে সংঘবদ্ধ না করে, জনগণকে আন্দোলনমুখী না করে এবং পরিষ্কার আদর্শ সামনে না রেখে কোনোরকম গণ-আন্দোলন হতে পারে না এবং সেখানে কোনো বিপ্লব হতে পারে না। দুঃখের বিষয় অনেকে এখনো টেরোরিজমে বিশ্বাস করেন। যাই হোক, ভবিষ্যতে তাদের ভুল ভাঙবে। সময় থাকতে না ভাঙলে তাদের ক্ষতি বেশি হবে। জনগণের ক্ষতি তো হবেই, কিন্তু তাদেরও ক্ষতি হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২)

বিষয় : আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'আন্দোলন গাছের ফল নয়। আন্দোলন মুখ দিয়ে বললেই করা যায় না। আন্দোলনের জন্য জনমত সৃষ্টি করতে হয়। আন্দোলনের জন্য আদর্শ থাকতে হয়। আন্দোলনের জন্য নিঃস্বার্থ কর্মী থাকতে হয়। ত্যাগী মানুষ থাকা দরকার। আর সর্বোপরি জনগণের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমর্থন থাকা দরকার।'

(দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪)

বিষয় : দেশ পরিচালনায় জনগণের সহযোগিতা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'ছেলেখেলা নয়। রাষ্ট্র চালানো এত সোজা নয়। আওয়ামী লীগ কর্মী ভাইয়েরা, আমি আগেই বলেছি আজ স্বাধীনতা সংগ্রাম করে আমরা স্বাধীন হয়েছি, এখন আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে হবে। যে জনগণ আপনাদের অশ্রদ্ধা করে, যদি আজ জনগণ আপনাদের ভালো না বাসে, জনগণ যদি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, সেই জন্য বাংলার জনগণ দায়ী হবে না, দায়ী হবেন আপনারা, দায়ী হবো আমরা।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭)

বিষয় : দেশের উন্নয়নে ছাত্রদের দায়িত্ব প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'দেশ শাসন করতে হলে নিঃস্বার্থ কর্মীর প্রয়োজন। হাওয়া-কথায় চলে না। সেদিন ছাত্ররা আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। তাদের বলেছিলাম, আত্মসমালোচনা করো। মনে রেখো আত্মসমালোচনা করতে না পারলে নিজেকে চিনতে পারবা না। তারপর আত্মসংযম করো, আত্মশুদ্ধি করো। তাহলেই দেশের জন্য মঙ্গল করতে পারবা।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭)

বিষয় : আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আওয়ামী লীগ কর্মী ভাইয়েরা, কোনো দিন তোমরা আমার কথা ফেলো নাই। জীবনে আমি কোনো দিন কন্টেস্ট করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বা প্রেসিডেন্ট হই নাই। জীবনভর তোমরা আমাকে সর্বসম্মতিক্রমে নেতৃত্ব দিয়েছ। তোমরা আমার কথায় রক্ত দিয়েছ, আজ শেষ দিনে, কেননা আমি সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি, তোমরা আমার কথা মনে রেখো। আমার কথা ভুলো না। কোনো দিন স্বার্থে অন্ধ হয়ে তোমাদের ডাক দেই নাই। কোনো দিন কোনো লোভের বশবর্তী হয়ে কোনো শয়তানের কাছে মাথা নত করি নাই। কোনো দিন ফাঁসির কাষ্ঠে বসেও বাংলার মানুষের সাথে বেঈমানি করি নাই। আমি বিশ্বাস করি, তোমরা আমার কথা শুনবা, তোমরা আত্মসমালোচনা করো, আত্মসংযম করো। তোমরা আত্মশুদ্ধি করো।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮)

বিষয় : আওয়ামী লীগের ইতিহাস সৃষ্টি করা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'তোমরা আওয়ামী লীগের কাউন্সিলররা আজ যারা এখানে বসেছে তারা মনে মনে চিন্তা করো। বুকে হাত দিয়ে খোদার উপর নির্ভর কইরা

বলো যে, আমরা মানুষকে ভালোবাসি। আমরা বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। আমরা ২৫ বছর সংগ্রাম করেছি। আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। আমরা ইতিহাস রাখবো। আমরা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবো। আমরা দেশকে মুক্ত করবো। তাহলেই আওয়ামী লীগের ইতিহাস থাকবে। তাহলে মরেও আমি শান্তি পাবো। তা না হলে আমার বড় দুঃখ, বড় কষ্ট। সহকর্মী ভাই বোনেরা, নীতি ছাড়া, আদর্শ ছাড়া এবং যে কথা আমি বলেছিলাম, আত্মসমালোনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি ছাড়া তা হয় না। ন্যায়-নীতি ও আদর্শ সামনে রাখতে হবে। সে আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮)

বিষয় : ইতিহাস থেকে বিপ্লবের শিক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'জনগণকে ছাড়া গণবিপ্লব ছাড়া বিপ্লব হয় না। রাতের অন্ধকারে গুলি মাইরা কোনো দিন বিপ্লব হয় নাই। পড়ো সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস, পড়ো অন্যান্য দেশের বিপ্লবের ইতিহাস। পড়ো আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। দেখো সেখানে কি হয়েছে। দেখো আমাদের সাব-কন্টিনেন্টে কি হয়েছে। পড়ো, জানো, শেখো, বোঝো। তারপর বিপ্লবের কথা বলো। বিপ্লব রাতের অন্ধকারে গুলি কইরা, টেরোরিজম কইরা হয় না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০)

বিষয় : গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'একদল লোক গণতান্ত্রিক পন্থাকে নস্যাৎ করা চেষ্টা করছে। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছি। পাঁচ বছর পর নির্বাচন করি। যদি নির্বাচনে তোমরা কেউ আসতে পারো, যে কোনো দল মেহেরবানি করে চলে আসো। আওয়ামী লীগ গদি ছেড়ে চলে যাবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯)

বিষয় : আওয়ামী লীগের আদর্শ পূরণ প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'আজ সেই জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের কাছে আমার কথা যে, তোমাদের কর্তব্য রয়েছে। স্বাধীনতা এনেছ। এবার খোদাকে হাজের নাজের রেখে এই প্রতিজ্ঞা করে যেতে হবে যে, বাংলার মানুষকে সুখী করতে হবে আমার। বাংলার দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। দুর্নীতি উৎখাত করতে হবে। শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। যে রাষ্ট্রীয় চার আদর্শ আছে তাকে পরিপূর্ণ করতে হবে। এ দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। তাহলেই তোমাদের আদর্শ পূর্ণ হবে এর আগে নয়।' (দ্র. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭০)

বিষয় : দুর্নীতি দূর করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'তোমরা জীবনে আমার চোখের সামনে কোনো দিন কথা বলো নাই। যা বলেছি, তোমরা তাই করেছ। তোমরা হাসতে হাসতে মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়েছ। তোমরা পারবা না আমার কথা শুনতে? দুর্নীতি আমরা দেখবো না, দুর্নীতি আমরা করবো না, দুর্নীতি এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবো। তোমরা পারবা না এদেশের মানুষকে ভালোবাসবার? আমরা দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবো। এ দেশের মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে চায়, আমরা শান্তি দেবো। পারবা না তোমরা এ কাজ করতে? বলো আমার কাছে। না পারো আমাকে বিদায় করে দাও। আমি কিছু চাই না তোমাদের কাছ থেকে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১)

বিষয় : বাংলার মানুষকে সুখী রাখা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'সহকর্মী ভাইয়েরা আমি বলে দিচ্ছি, আমি সেন্টিমেন্টালি বাংলাদেশের মানুষের সাথে অ্যাটাচড্। কথাটা তোমাদের কাছে পরিষ্কার বলে দেবার চাই। তোমরা সকলে জানো যে, প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য আমি রাজনীতি করি নাই। তোমরা সকলে জানতা ইচ্ছা করলে আমি বহু আগে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। এ প্রধানমন্ত্রিত্ব আমার কাছে কাঁটা বলে মনে হয়। আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারবো না। পারবো না, পারবো না। আমার জীবন বৃথা হয়ে যাবে। আমার যৌবন কারাগারের অন্তরালে কাটিয়ে দিয়েছি এ দেশের মানুষের জন্য। আমি ওদের কাছে থাকতে চাই, ওদের সাথে মরতে চাই, এর বেশি আমি আর কিছুই চাই না। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১)

বিষয় : সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'সমাজতন্ত্রে আমরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে যাবার চাই এবং আমরা দুনিয়াকে দেখাতে চাই যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় নতুন সিস্টেমে আমরা শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবো।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১)

বিষয় : সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'আওয়ামী লীগের কর্মীরা, তোমরা কোনো দিন সাম্প্রদায়িকতাকে পছন্দ করো নাই। তোমরা জীবনভর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছো। তোমাদের জীবন থাকতে যেন বাংলার মাটিতে আর কেউ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে না পারে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২)

বিষয় : মানুষকে সংঘবদ্ধ করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'যারা প্রগতির নামে সাম্প্রদায়িকতা করছে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। গ্রামে গ্রামে দেশের মানুষকে সংঘবদ্ধ করে বোঝাতে হবে, একেই বলে সমাজতন্ত্র। একেই বলে শোষণহীন সমাজ। একেই বলে সুষম বণ্টন।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২)

বিষয় : বৈদেশিক নীতি

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি বিশ্বাস করি নন-অ্যালাইড, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফরেন পলিসি। আমরা কারুর পকেটের খাবার চাই না। আমরা সকলের বন্ধুত্ব কামনা করি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩)

বিষয় : চীনের সাথে বন্ধুত্ব কামনায়

বক্তব্য/ঘটনা : 'যখন চীনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে ভেটো দেয়া হতো তখন এই বাংলার মানুষই বিক্ষোভ করতো। আমি নিজে ঐ ভেটোর বিরুদ্ধে বহুবার কথা বলেছি যে ভেটোর জন্য চীন ২৫ বছর জাতিসংঘ যেতে পারে নাই। দুঃখের বিষয়, সেই চীন আজ ভেটো 'পাওয়ার' হয়ে প্রথম ভেটো দিল আমার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তবুও আমি কামনা করি তাদের বন্ধুত্ব। অনেক বড় দেশ। দুশমনি করতে চাই না। বন্ধুত্ব কামনা করি। কারণ আমি সকলের বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু জানি না, আমার এই কামনায়, আমার এই প্রার্থনায় তারা সাড়া দেবেন কিনা। যদি না দেন কিছু আসে যায় না। ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা এত ছোট দেশ নই। বাংলাদেশ এতটুকু নয়। পপুলেশনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ দুনিয়ার অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩)

বিষয় : নির্যাতিত মানুষের মুক্তি-সংগ্রামে সমর্থন দান

বক্তব্য/ঘটনা : রাউন্ড টেবিল আমেরিকা হোক, আরব দেশ হোক যেখানে মানুষ শোষিত, যেখানে মানুষ অত্যাচারিত, যেখানে মানুষ দুঃখী, যেখানে মানুষ সাম্রাজ্যবাদীর দ্বারা নির্যাতিত, আমরা বাংলার মানুষ সেই দুঃখী মানুষের সাথে আছি এবং থাকবো। আমাদের নীতির পরিবর্তন হবে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪)

বিষয় : আত্মসম্মান বিক্রি করে বিদেশী সাহায্যে অনীহা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমাদের কষ্ট হবে। তবুও একটা কথা মনে রাখা দরকার যে সাহায্য আমি চাই, আওয়ামী লীগ যে সাহায্য চায় তা আত্মসম্মান বিক্রি করে

নয়। আওয়ামী লীগ সরকার সেই সাহায্য গ্রহণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। আমাদের যদি কেউ কিনতে চান ভুল হবে। কেউ যদি সাহায্যের নামে আমাদের দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তবে ভুল হবে। আমরা শোষিত মানুষ। বহু ত্যাগ করেছি। বহু রক্ত দিয়েছি। দরকার হয় আরও দেবো। কিন্তু আত্মসম্মান বিক্রি করে আমরা কারও কাছে সাহায্য চাই না। যারা বন্ধু হিসেবে সাহায্য করাতে চান তারা আমার ভাই। আসুন, আমরা সাহায্য নিশ্চয়ই গ্রহণ করবো। কারণ দেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমার দেশকে গড়তে হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪)

বিষয় : শিক্ষিত লোকদের অপরাধ জগতের সাথে সম্পৃক্ততা বিষয়ে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাংলার কৃষক, বাংলার দুঃখী মানুষ এরা কিন্তু অসৎ নয়। ব্ল্যাকমার্কেটিং করে কারা? রাগ করবেন না। আপনারা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আছেন, আপনারা রাগ করবেন না। ব্ল্যাকমার্কেটিং কারা করে? যাদের পেটের মধ্যে দুই কলম বিদ্যা হয়েছে তারাই ব্ল্যাকমার্কেটিং করে। স্মাগলিং কারা করে? যারা বেশি লেখাপড়া করেছে তারাই বেশি করে। হাইজাকিং কারা করে? যারা বেশি লেখাপড়া শিখছে তারাই করে। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলিং তারাই করে। বিদেশে টাকা রাখে তারাই। আমরা যারা শিক্ষিত, আমরা যারা বুদ্ধিমান ওষুধের মধ্যে ভেজাল দিয়ে বিষাক্ত করে মানুষকে খাওয়াই তারাই। নিশ্চয়ই গ্রামের লোক এসব পারে না, নিশ্চয়ই আমার কৃষক ভাইরা পারে না। নিশ্চয়ই আমার শ্রমিক ভাইরা পারে না। পেটের মধ্যে যাদের বুদ্ধি বেশি আছে তারা ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার। আর বিদেশী এজেন্ট কারা হয়। নিশ্চয়ই আমার কৃষক নয়, নিশ্চয়ই আমার শ্রমিক নয়। আমরা যারা লেখাপড়া শিখি, গাড়িতে চড়ি, বিদেশে যাবার পারি, বিদেশীদের সাথে মিশতে পারি, ভালো স্যুট পরতে পারি, তারাই বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে বিদেশের এজেন্ট, (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭৪)

বিষয় : দুর্নীতিসহ নানা অন্যায় প্রতিরোধে জন-অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করে

বক্তব্য/ঘটনা : 'মহাবিপদের মধ্যে আছি আমরা। আপনারা যারা বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত, যারা দেশকে নেতৃত্ব দেন তাদের কর্তব্য হবে আত্মসমালোচনা করা। আর আওয়ামী লীগের সহকর্মী ভাইয়েরা, তোমরা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের পিছনে লাগো। হেডার্ডারদের পিছনে লাগো। ঘুষখোরদের পেছনে লাগে। তোমরা আমার কথায় আগেও লেগেছ, এখনো লাগো। শুধু আইন দিয়ে, শুধু শক্তি দিয়ে দুর্নীতি দমন করা যায় না। এজন্য এমনভাবে জনমত সৃষ্টি করতে হবে, যেমনভাবে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত জনমত সৃষ্টি করে স্বাধীনতা সংগ্রাম

করেছিলাম। যেমনভাবে ২৫ মার্চ থেকে ন'মাস করতে হবে–দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর ও শোষকদের বিরুদ্ধে। আমি বিশ্বাস করি তাহলে বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি উঠে যাবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬)

বিষয় : উন্নতির জন্য উৎপাদন বাড়ানো প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'ভাইয়েরা আমার, পরিশ্রম না করলে, কঠোর পরিশ্রম না করলে সাড়ে ৭ কোটি লোকের ৫৪ হাজার বর্গমাইল এলাকার এই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যাবে না। ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না। বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে এনে দেশকে গড়া যাবে না। দেশের মধ্যেই পয়সা করতে হবে। শ্রমিক ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ। তোমাদের বারবার বলেছি এখনো বলছি, প্রোডাকশন বাড়াও।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫)

বিষয় : দলের সভাপতির পদ ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি তোমাদের পরিষ্কার বলতে চাই, আমি আওয়ামী লীগের সভাপতি থাকতে পারবো না। তোমাদের নতুন সভাপতি করতে হবে। কারণ, সময় আমি দেবার পারি না। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগের কার্যপ্রণালীর মধ্যে যেটা আমি নিজে পাশ করিয়েছিলাম তাতে পরিষ্কার বলা ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী বা গভর্নর হলে কেউই আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী বা কর্মকর্তা হতে পারবে না। এটাকে আমি পরিবর্তন করতে চাই না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬)

বিষয় : দেশ গড়ার সংগ্রাম প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমরা আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করেছি। আজ যে নতুন সংগ্রাম শুরু হয়েছে–দেশ গড়ার সংগ্রাম, দুঃখী মানুষকে বাঁচাবার সংগ্রাম–এই সংগ্রামেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বাস করি, যদি আওয়ামী লীগ কর্মীরা নিষ্ঠার সাথে কাজ করে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কামিয়াব হবো।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬)

বিষয় : সোনার বাংলা গড়তে সোনার মানুষ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি যেখানেই থাকি তোমাদের সাথেই থাকবো, তোমাদের পাশেই থাকবো। তোমাদের বাদ দিয়ে একদিনও আমি বাঁচতে পারি না। কিন্তু সভাপতি আমি থাকতে পারবো না। ...শুধু একটা কথা বলে যাই–শেষ কথা আমার, যে কথা আমি বারবার বলেছি–সোনার বাংলা গড়তে হবে। এটা বাংলার

জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের প্রতিজ্ঞা। আমার আওয়ামী লীগের কর্মীরা, যখন বাংলার মানুষকে বলি তোমরা সোনার মানুষ হও, তখন তোমাদেরই প্রথম সোনার মানুষ হতে হবে। তাহলেই সোনার বাংলা গড়তে পারবা। আর যারা দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছো, তারা বাংলার দুঃখী মানুষের কাছ থেকে সরে যেয়ো না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬)

তারিখ : ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

ফোরাম : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ

বিষয় : সব মানুষের পৃথিবী গড়ে তোলা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে আমাদের লাখ লাখ মানুষ সেই আদর্শের জন্য। সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আমি জানি শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সাথে শহীদদের বিদেহী আত্মাও মিলিত হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭)

বিষয় : দুর্যোগাক্রান্ত বাংলাদেশ

বক্তব্য/ঘটনা : 'বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশকে মারাত্মকভাবে আঘাত হানিয়াছে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার উপর সৃষ্ট বাংলাদেশ পরপর কতিপয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছে। আমরা সর্বশেষ যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছি তাহা হইতেছে এই বছরের নজিরবিহীন বন্যা।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯)

বিষয় : দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিই শুধু ব্যাহত হয় নাই, ইহার ফলে দেশে আজ দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন আমাদের মতো দেশগুলিতে দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে হাজার হাজার ডলার শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বার্ষিক মাথাপিছু এক শ ডলারেরও কম আয়ের জনগণ বর্তমানে মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহারা বর্তমান স্তরের চাইতেও তাদের জীবনযাত্রার মান কমাইয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯)

বিষয় : মানবাধিকার প্রসঙ্গ

বক্তব্য/ঘটনা : 'এই মুহূর্তে, আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবাধিকারে আন্তর্জাতিক ঘোষণার স্বীকৃত মুক্তভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনরুল্লেখ করিতেছি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০)

বিষয় : দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা, বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রত্যয়

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাংলাদেশ প্রথম হইতেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব—এই নীতিমালার উপর ভিত্তি করিয়া জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কেবল শান্তিপূর্ণ পরিবেশই কষ্টলব্ধ জাতীয় স্বাধীনতার ফল ভোগ করিতে আমাদেরকে সক্ষম করিয়া তুলিবে এবং সক্ষম করিয়া তুলিবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদকে সমাবেশ ও কেন্দ্রীভূত করিতে। এই ধারণা হইতে জন্ম নিয়াছে শান্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০)

তারিখ : ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৪

ফোরাম : জাতীয় দিবস উপলক্ষে ভাষণ

বিষয় : তিনটি মহাবিপদকে স্মরণ করে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাংলাদেশে আজ তিনটি মহাবিপদ, তিন শত্রুর মোকাবিলা করছে। (১) মুদ্রাস্ফীতি–যা আজ সারা বিশ্বে ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে, (২) প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যা এবং (৩) চোরাকারবারি, মুনাফাবাজ, মজুতদার ও ঘুষখোর—এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে সরকারকে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪)

বিষয় : সুষ্ঠু ও সুচারু বিলি-বণ্টনের মাধ্যমে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'মানবতার ডাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার পরিবর্তে বিশ্বের কোনো কোনো সংবাদপত্র যখন লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করছিল ও দুঃখী মানুষের জন্য উপদেশ খয়রাত করছিল, তখন বাংলাদেশ সরকার তথা এদেশের মানুষ বিশ্বের বৃহত্তম ত্রাণতৎপরতা চালিয়ে, অবস্থা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেছে। সম্পদ নিতান্ত সীমিত হওয়া সত্ত্বেও সুষ্ঠু ও সুচারু বিলি-বণ্টনের মাধ্যমে নতুন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫)

বিষয় : চোরাকারবারি, কালোবাজারি, মুনাফাবাজ ও ঘুষখোর—এসব নরপশুদের উৎখাত করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমাদের নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান শত্রু চোরাকারবারী (স্মাগলার), কালোবাজারি, মুনাফাবাজ ও ঘুষখোরের দল। মানুষ যখন অনাহারে মারা যায়, তখনো এইসব নরপশুর দল বাংলার দুঃখী মানুষের মুখের গ্রাস অন্যত্র পাচার করে দিয়ে থাকে। বিদেশ থেকে ধার-কর্জ, এমনকি ভিক্ষা করে আনা পণ্যও বাংলার সম্পদ মজুদের মাধ্যমে এরা মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। এদের কোনো জাত নেই, নেই কোনো দেশ। এই সব নরপশুদের উৎখাতে আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬)

বিষয় : কঠোর পরিশ্রম করে উৎপাদন বাড়ানো প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। শোষিত, নির্যাতিত ও লুণ্ঠিত বাংলাদেশের সমাজদেহে সমস্যার অন্ত নেই। এই সমস্যার জটগুলোকে খুলে সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭)

বিষয় : শোষণমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধিশালী এক ভবিষ্যৎ উপহার দেওয়া প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমাদের আজকের এই দুঃখ-কষ্ট যে নিতান্ত সাময়িক, সে সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত। এই বাংলায় সম্পদের কোনো অভাব নেই। কিন্তু সদ্ব্যবহারের জন্য সময়ের প্রয়োজন। আমরা যদি বাংলার এ সম্পদ বাংলার মাটিতে রাখতে পারি, সমাজতান্ত্রিক বিলি-বণ্টন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারি এবং সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে কলে-কারখানায় ক্ষেতে-খামারে উৎপাদন বাড়াতে পারি, তবে ইনশাল্লাহ আমাদের ভাবী বংশধরদের শোষণমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধশালী এক ভবিষ্যৎ আমরা উপহার দিতে পারবো। আসুন, ১৬ ডিসেম্বর এই পবিত্র জাতীয় দিবসে আমরা সকলে সেই শপথ গ্রহণ করি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮)

তারিখ : ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫

ফোরাম : রাজারবাগ পুলিশ লাইন

বিষয় : বাংলাদেশ সম্পর্কে

বক্তব্য/ঘটনা : 'তারা ভেবেছিল, বাংলাদেশ টিকতে পারবে না। কিন্তু বাংলাদেশ টিকেছে। বাংলাদেশ থাকবে। বাংলাদেশ থাকার জন্যই এই দুনিয়ায় এসেছে। একে কেউ কোনো দিন ধ্বংস করতে পারবে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০)

বিষয় : জনগণের পুলিশ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আপনারা স্বাধীন দেশের পুলিশ। আপনারা বিদেশী শোষকদের পুলিশ নন, জনগণের পুলিশ। আপনাদের কর্তব্য জনগণের সেবা করা, জনগণকে ভালোবাসা, দুর্দিনে জনগণকে সাহায্য করা।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০)

বিষয় : খাদ্যাভাব প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আন্তর্জাতিক বাজারে জিনিসের দাম অত্যন্ত বেড়ে গেছে। ফলে মানুষের খাবার জোগাড় করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। আজ গরিবের ওপর ট্যাক্স ধরার ক্ষমতাও আমাদের বেশি নেই। তারা টাকা কোত্থেকে দেবেন? তারা না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১)

বিষয় : জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় সরকার চলে প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'সংখ্যায় আপনারা খুব কম বলেই আপনাদের রাত দিন কাজ করতে হয়। আমি আপনাদের সব অসুবিধার খবর যে রাখি না, তা নয়। কিন্তু উপায় কি? সাধারণ মানুষের টাকা দিয়েই সব চলে। কিন্তু আজ মানুষের যে অবস্থা, দেশের যে অবস্থা, তাতে তাদের ওপর আর ট্যাক্সের বোঝা চাপানো যায় না। আজ আমরা যারা এখানে আছি, তারা সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী। পুলিশ, সামরিক বাহিনী, বিডিআর, রক্ষীবাহিনী বা আনসার যা-ই আমরা হই না কেন, সকলেই এই বাংলাদেশের জনগণের টাকা দিয়েই চলি এবং সবাইকে রাখা হয়েছে জনগণের সেবা করবার জন্য।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১)

বিষয় : বাংলায় মানুষের সেবা করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আপনারা যদি অত্যাচার করেন, শেষ পর্যন্ত আমাকেও আল্লাহর কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আমি আপনাদের জাতির পিতা, আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাদের নেতা। আমারও সেখানে দায়িত্ব রয়েছে। আপনাদের প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চাপে, আমার সহকর্মীদের ঘাড়ে চাপে। এজন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল, আমার অনুরোধ রইল, আমার আদেশ রইল, আপনারা মানুষের সেবা করুন। মানুষের সেবার মতো শান্তি দুনিয়ায় আর কিছুতে হয় না। একটা গরিব যদি হাত তুলে আপনাকে দোয়া করে, আল্লাহ সেটা কবুল করে নেন। এজন্য কোনো দিন যেন গরিব-দুঃখীর ওপর, কোনো দিন যারা অত্যাচার করেনি, তাদের ওপর অত্যাচার না হয়। যদি হয় আমাদের স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২)

বিষয় : প্রতিজ্ঞা করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আপনারা একবার আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকবো।' প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দুর্নীতিবাজদের খতম করবো। প্রতিজ্ঞা করুন, আমরা দেশকে ভালোবাসবো, দেশের মানুষকে ভালোবাসবো।' প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দেশের মাটিকে ভালোবাসবো। যারা দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, রাতের অন্ধকারে যারা মানুষ হত্যা করে, থানা আক্রমণ করে, অস্ত্র নিয়ে আপনাদের মোকাবেলা করে, বাংলাদেশের মাটি থেকে তাদের উৎখাত করুন।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২-৩৯৩)

বিষয় : পরিশ্রমী ও সৎ হওয়ার আহ্বান

বক্তব্য/ঘটনা : 'আজকে আপনারা আরো প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা এমন পুলিশ গঠন করবো, যে পুলিশ হবে মানুষের সেবক, শাসক নয়।' আমি পুলিশবাহিনীর ভাইদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে বলছি, একদিন বাংলার মানুষ সুখী হবে। এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সৎপথে থাকতে হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৯৩)

তারিখ : ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫

ফোরাম : জাতীয় সংসদ

বিষয় : অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব কর্তব্য প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'মুখে বলেছে তারা, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, নাগরিক অধিকারে বিশ্বাস করি, কিন্তু গোপনে গোপনে তারা অস্ত্র জোগাড় করেছে এবং এইসব অস্ত্র দিয়ে যাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়েছি আমরা–যারা অস্ত্র দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের হত্যা করেছে ঘরের মধ্যে যেয়ে। আমরা দেখেছি যে, প্রত্যেক দেশে নিয়ম আছে যদি আপনাকে অধিকার ভোগ করতে হয়, অন্যের অধিকারকেও রক্ষা করতে হবে, 'ইফ ইউ হ্যাভ এ লিবার্টি, ইউ হ্যাভ রেস্পনসিবিলিটি'–এ কথাটা ভুললে চলবে না। কিন্তু রেস্পনসিবিলিটি নেবে না আর সেখানে যেয়ে সরকারি কর্মচারীর মাধ্য গোলযোগ সৃষ্টি করবে, জনগণের মধ্যে যেয়ে তারা অন্য কথা বলবে এবং তারপর তারা অস্ত্র জোগাড় করবে, প্রয়োজন হলে উৎখাত করে দেয়া হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬)

বিষয় : রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা

বক্তব্য/ঘটনা : 'আজকে আপনারা জানেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এটা

একটা হট বেড অফ ইন্টারন্যাশনাল ক্লিক। এখানে অর্থ আসে, এখানে মানুষকে পয়সা দেওয়া হয়। এখানে তারা বিদেশীদের দালাল হয়। আজকে একটা কথা এখানে আমাদের ভুললে বলছে না, যে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি, সেই রক্ত দিয়েই স্বাধীনতা দরকার হলে রক্ষা করা হবে। স্বাধীনতা নস্যাৎ হতে দেওয়া হবে না এবং তাদের মনে রাখা দরকার আমরা যারা দীর্ঘদিন, ২৫ বছর মাথা নত না করে বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য, এদেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি, আমাদের রক্ত থাকতে এদেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারো নাই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬)

বিষয় : বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি আর দেশজুড়ে বন্যা

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমরা যারা অনুন্নত দেশ এ কষ্ট আমাদের ভোগ করতেই হয়। কারণ, আমাদের শোষণ করলেই তারা বড়লোক। তাদের কাছ থেকে যখন আমাদের জিনিস আনতে হয় তখন অনেক পয়সা দিয়ে আনতে হয়। আর আমরা যখন বিক্রি করি তার দাম আমরা পাই না। এ অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশ চলেছে। তারপরেও আমাদের দেশ চালাতে হয়েছে। ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দুনিয়া ঘুরতে হয়েছে, খাবার দুনিয়া থকে আনতে হয়েছে, গ্রামে গ্রামে পৌঁছাতে হয়েছে। সমস্ত দুনিয়ায় যে ইনফ্লেশান হয়ে গেল, শুধু আমরা না, সমস্ত দুনিয়ার যারা অনুন্নত দেশ তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আসল এক ভয়াবহ বন্যা।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭)

বিষয় : বাংলার দুঃখী মানুষের কাছে শিক্ষিত সমাজের ঋণ

বক্তব্য/ঘটনা : 'দুঃখের বিষয় আজ আমরা শুধু বলি আমরা কি পেলাম। তোমরা কি পেয়েছ? তোমরা পেয়েছ শিক্ষার আলো, সে শিক্ষা দিয়েছো বাংলার জনগণের টাকায়। তুমি কি ফেরত দিয়েছে বাংলার দুঃখী মানুষকে, যে দুঃখী মানুষ না খেয়ে মরে যাবে? যে মানুষের কাপড় নাই, যে মানুষ বন্ধু খুঁজে পায় না, যার বস্ত্র নাই, শার্ট নাই, বুকের হাড়গুলো পর্যন্ত দেখা যায়, তাকে আজকে তোমরা কি দিয়েছ? এ প্রশ্ন আজ এখন জেগে গেছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮)

বিষয় : শিক্ষিত সমাজই সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত

বক্তব্য/ঘটনা : 'করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ। যারা আজকে ওদের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করেছি। আজ যেখানে যাবেন, করাপশন দেখবেন।

আমাদের রাস্তা খুঁড়তে যান করাপশন, খাদ্য কিনতে যান করাপশন, জিনিস কিনতে যান করাপশন, বিদেশ গেলে টাকার উপর করাপশন, তারা কারা? আমরা যে ৫ পারসেন্ট শিক্ষিত সমাজ, আমরা হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে করাপ্ট পিপল, আর আমরাই করি বক্তৃতা। আমরা লিখি খবরের কাগজে, আমরাই বড়াই করি। আজ আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। এসব চলতে পারে না। মানুষকে একদিন মরতে হবে। কবরে যেতে হবে। কিছুই সে নিয়ে যাবে না। তবুও মানুষ ভুলে যায়–কি করে এ অন্যায় কাজ করতে পারে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯)

বিষয় : দুর্নীতিবাজদের অপতৎপরতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বড় দুঃখ নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। বহুদিন পর্যন্ত বিবেকের দংশনে জ্বলেছি। মাথা নত করি নাই কোনো অন্যায়ের কাছে। আপোষ করি নাই কোনো অন্যায়ের কাছে। জীবনভর সংগ্রাম করেছি। আর এই দুঃখী মানুষ যে রক্ত দিয়েছে, স্বাধীনতা এনেছে, তাদের রক্তে বিদেশ থেকে খাবার আনবো, সেই খাবার চুরি করে খাবে, অর্থ আনবো, চুরি করে খাবে, টাকা আনবো, বিদেশে চালান দিবে। বাংলার মাটি থেকে এদের উৎখাত করতে হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯)

বিষয় : শৃঙ্খলা ফিরিয়া আনার জন্য সংশোধন

বক্তব্য/ঘটনা : 'ভিক্ষুক জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এবং সেই জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শৃঙ্খলা আনতে হবে এবং শৃঙ্খলা দেশের মধ্যে আনতে হবে। আজকের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই, স্পীকার সাহেব। যারা জীবনভর সংগ্রাম করেছে, একথা যদি কেউ মনে করে যে, জনগণের ভোটের অধিকার আমরা কেড়ে নিয়ে গেছি। নো, আজ এখানে যে সিস্টেম করা হয়েছে তাতে পার্লামেন্টের মেম্বারদের জনগণ দ্বারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। যে প্রেসিডেন্ট হবে তাকেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০-৪০১)

বিষয় : জনগণের সেবক, জনগণের মাস্টার না

বক্তব্য/ঘটনা : 'আজ দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, কালোবাজারি, নতুন পয়সাওয়ালা এদের কাছে আমার আত্মবিক্রি করতে হবে, এদের অধিকারের নামে আমাদের এদেরকে ফ্রি-স্টাইল ছেড়ে দিতে হবে? কক্ষনো না। কোনো দেশ কোনো যুগে তা দেয় নাই। দিতে পারে না। যারা আজকে আমার মাল বিদেশে চালান দেয়,

চোরাকারবারী করে, যারা দুর্নীতি করে, এদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে। মানুষকে যারা পয়সা দেয়, তোমার মাহিনা দেয়, তোমার সংসার চালানোর জন্য ট্যাক্স দেয়, তার কাছে তুমি আবার পয়সা চাও। মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে হবে। সরকারি কর্মচারী, মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট–আমরা জনগণের সেবক, আমরা জনগণের মাস্টার নই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১)

বিষয় : দেশকে গড়ার জন্য দ্বিতীয় বিপ্লব প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'এটা কম দুঃখ আমার স্পীকার সাহেব! তবু আজকে আমূল পরিবর্তন করেছি শাসনতন্ত্রকে। কারণ সুষ্ঠু শাসন কায়েম করতে হবে। যেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে। যেখানে মানুষ অনাচার অত্যাচার থেকে বাঁচতে পারে। চেষ্টা নতুন। আজ আমি বলতে চাই–This is our second revolution, second revolution আমাদের। এই revolution এর অর্থ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এর অর্থ অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। আমি চাই এই হাউজ থেকে স্পীকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে দেশবাসীকে, দলমত নির্বিশেষে সকলকে বলব, দেশকে ভালোবাসো, জাতির চারটি প্রিন্সিপালকে ভালোবাসো। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সেকুলারিজম। তোমরা আসো, কাজ করো, দরজা খোলা। সকলকে, যারা এই মতে বিশ্বাস করে তাদের প্রত্যেককে constitution করো, আসো কাজ করো। দেশকে রক্ষা করো। দেশকে বাঁচাও। মানুষের দুঃখ দূর করো। আর দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, চোরাকারবারীদের উৎখাত করো।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩-৪০৪)

বিষয় : জনগণকে মোবিলাইজ করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমরা নতুন জীবন শুরু করবো, আমরা নতুন বিপ্লব শুরু করবো। কেন করতে পারবো না? পারি নাই ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত? আমার ঘরে বসে তিন চারজনকে নিয়ে সমস্ত বাংলার মানুষের মুভমেন্ট আমরা চালাই নাই? একটা চুরি হয় নাই, ভল্যানটিয়াররা কাজ করেছে। নতুন জীবন সৃষ্টি করতে হবে। উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে মোবিলাইজ করতে হবে। মানুষ ভালো। বাংলার মানুষের মতো মানুষ আর কোথাও নাই। বাংলার গরিব, বাংলার কৃষক ভালো, বাংলার শ্রমিক ভালো। যদি খারাপ হয়, তবে আমরা তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ। যত গোলমালের মূলে এই তারাই। যত অঘটনের মূল তারাই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫)

বিষয় : দুর্নীতিবাজদের উৎখাত প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'এত বড় দুর্ধর্ষ, এত বড় শক্তিশালী, এত বড় বন্দুক, এত কামান, এত মেশিনগান, এত পাকিস্তানি সৈন্য, এত বড় তথাকথিত শক্তিশালী আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, ইস্কান্দার মির্জা, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, বাংলার মানুষকে অত্যাচার করতে চেষ্টা করেছে বন্দুক দিয়ে, তার বিরুদ্ধে বিনা অস্ত্রে আপনাদের নিয়ে সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত যদি উৎখাত করতে পারি, তাহলে কিছু দুর্নীতিবাজ, কিছু ঘুষখোর, কিছু শোষক, কিছু ব্ল্যাক মার্কেটার্স বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে পারবো না, একথা আমি বিশ্বাস করি না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬)

তারিখ : ২৬ মার্চ, ১৯৭৫

ফোরাম : সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি যখন বাংলাদেশ সরকার পেলাম, যখন জেল থেকে বের হয়ে আসলাম, তখন আমি শুধু বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষই পেলাম। ব্যাংকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। আমাদের গোল্ড রিজার্ভ ছিল না। শুধু কাজ নিয়ে আমরা সাড়ে ৭ কোটি লোকের সরকার শুরু করলাম। আমাদের গুদামে খাবার ছিল না। গত তিন-চার বছরে বিদেশ থেকে না হলেও ২২ কোটি মণ খাবার বাংলাদেশে আনতে হয়েছে। ২২ কোটি টাকার মতো বিদেশ থেকে হেল্প আমরা পেয়েছি সেজন্য যারা আমাদের সাহায্য করেছেন সে সকল বন্ধুরাষ্ট্রকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আর একটি কথা, অনেকে প্রশ্ন করেন আমরা কি করেছি? আমরা যখন ক্ষমতায় আসলাম, দেশের ভার নিলাম তখন দেশের রাস্তাঘাট যে অবস্থায় পেলাম তাকে রিপেয়ার করার চেষ্টা করলাম। সেনাবাহিনী নাই, প্রায় ধ্বংস করে গেছে, পুলিশবাহিনীর রাজারবাগ জ্বালিয়ে দিয়েছিল সেই খারাপ অবস্থা থেকে ভালো করতে কী করি নাই? আমরা জাতীয় সরকার গঠন করলাম। আমাদের এখানে জাতীয় সরকার ছিল না, আমাদের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ছিল না, বৈদেশিক ডিপার্টমেন্ট ছিল না, প্লানিং ডিপার্টমেন্ট ছিল না। এখানে কিছুই ছিল না তার মধ্যে আমাদের জাতীয় সরকার গঠন করতে হলো। যারা শুধু কথা বলেন তারা ব্লকে হাত দিয়ে চিন্তা করে বলুন আমরা কি করেছি। ১ কোটি লোককে ঘরবাড়ি দিয়েছি। রাষ্ট্রের লোককে খাওয়ানোর জন্য বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়েছে। পোর্টগুলোক অচল থেকে সচল করতে হয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে ২২ কোটি মণ খাবার এনে বাংলার গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাংলার মানুষকে বাঁচাতে হয়েছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯)

বিষয় : ফ্রি-স্টাইল প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য। কথা হলো এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, অফিসে যেয়ে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যায়, সাইন করিয়ে নেয়, ফ্রিস্টাইল। ফ্যাক্টরিতে যেয়ে কাজ না করে টাকা দাবি করে। সাইন করিয়ে নেয়। যেন দেশে সরকার নাই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০)

বিষয় : দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

বক্তব্য/ঘটনা : 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায় যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে। যদি দুঃখী মানুষ পেট ভরে ভাত খেতে না পারে, কাপড় পড়তে না পারে, বেকার সমস্যা দূর না হয়, তাহলে মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে আসতে পারে না। আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ, যে ব্লাকমার্কেটিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। ...ঘরে ঘরে আপনাদের দুর্গ গড়তে হবে। সে দুর্গ গড়তে হবে দুর্নীতিবাজদের খতম করার জন্য। বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচন করার জন্য। এই দুর্নীতিবাজদের যদি খতম করতে পারেন তাহলে বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ দুঃখ চলে যাবে। এত চোরের চোর, এই চোর যে কোথা থেকে পয়দা হয়েছে তা জানি না। পাকিস্তান সব নিয়ে গিয়েছে কিন্তু এই চোরদের তারা নিয়ে গেলে বাঁচতাম।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১-৪১২)

বিষয় : উৎপাদন বাড়াতে আহ্বান

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্ট পরা কাপড় পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই–জমিতে যেতে হবে, ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ঐ শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে, যদি ডবল ফসল করতে পারি, আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ্ হবে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২)

বিষয় : স্বনির্ভর হওয়ার প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমি পাগল হয়ে যাই চিন্তা করে। এ বছর '৭৫ সালে আমাকে ৬ কোটি মণ খাবার আনতে হবে। কি করে মানুষকে বাঁচাব? কি করে অন্যান্য জিনিস কিনব? অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্র সাহায্য দিচ্ছে বলে বেঁচে যাচ্ছি। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে জাতি হিসেবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।' (দ্র. গ্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২)

বিষয় : জাতীয় ঐক্যের জন্য একদল করা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'এক নম্বর হলো–দুর্নীতিবাজ খতম করা, দুই নম্বর হলো–কারখানায় ক্ষেতে খামারে প্রডাকশন বাড়ানো, তিন নম্বর হলো–পপুলেশন প্ল্যানিং, চার নম্বর হলো–জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য একদল করা হয়েছে। যারা বাংলাকে ভালোবাসে, এর আদর্শে বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মেনে সৎপথে চলে তারা সকলেই এই দলের সদস্য হতে পারবেন। যারা বিদেশী এজেন্ট, যারা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে পয়সা নেয়, এতে তাদের স্থান নাই। সরকারি কর্মচারীও এই দলের সদস্য হতে পারবে। কারণ, তারাও এই জাতির একটা অংশ। তাদেরও অধিকার থাকবে এই দলের সদস্য হবার। এই জন্য সকলে যে যেখানে আছি, একতাবদ্ধ হয়ে দেশের কাজে লাগতে হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩)

বিষয় : জনসাধারণকে তাদের প্রাপ্য ফেরত দান প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'একজন ডাক্তার হতে সোয়া লাখ টাকার মতো খরচ পড়ে। একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে ১ লাখ/সোয়া লাখ টাকার মতো খরচ পড়ে। বাংলার জনগণ গরিব। কিন্তু এরাই ইঞ্জিনিয়ার বানাতে টাকা দেয়, মেডিক্যালের টাকা দেয় একটা অংশ। আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, শিক্ষিত ভাইদের, যে আপনার লেখাপড়ার খরচ দিয়েছে তা শুধু আপনার সংসার দেখার জন্য নয়। আপনার ছেলেমেয়েদের দেখার জন্য নয়। দিয়েছে তাদের জন্য আপনি কাজ করবেন, তাদের সেবা করবেন বলে। তাদের আপনি কি দিয়েছেন? কি ফেরত দিয়েছেন? কতটুকু দিচ্ছেন?' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪)

বিষয় : ভিলেজ কো-অপারেটিভ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'পাঁচ বছরের প্ল্যান-এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভে জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার অংশ যে বেকার প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে

পারে তাকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কার্স প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল-টাউটদেরকে বিদায় দেয়া হবে। তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪)

বিষয় : বাংলার সম্পদ সম্পর্কে

বক্তব্য/ঘটনা : 'এইদিন থাকবে না। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশাআল্লাহ্ এদিন থাকবে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪)

বিষয় : গ্রামে ফিরে যাওয়ার আহ্বান

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পায়জামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬)

তারিখ : ২৬ মার্চ, ১৯৭৫

ফোরাম : বঙ্গভবন, বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠক

বিষয় : ক্ষমতার জন্য নয় এই সিস্টেম

বক্তব্য/ঘটনা : 'বাংলাদেশে নির্বাচন দিয়েই ৯৭ পয়েন্ট ভোট। আউট অব থ্রি হানড্রেড ফিফটিন, থ্রি হানড্রেড সেভেন সিটস আমাদের পার্টি আওয়ামী লীগের ছিল। যদি তার পরেও ইলেকশন দিতাম, এখনো বিশ্বাস করি, দুই-এক পারসেন্ট বাদ যেতেও পারে, কিন্তু ৯০ পারসেন্টের কম পাবে না আমাদের পার্টি। সেজন্য এই সিস্টেম ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের অনেক দিন ছিল না, যদি ক্ষমতায় থাকতে চাইতাম আর, ক্ষমতার জন্য রাজনীতি যদি করতাম, তাহলে আমরা অনেকবারই ক্ষমতায় আসতে পারতাম। যদি নেগোসিয়েশন বা আপোসে আমরা ক্ষমতা চাইতাম, তাহলে কেন আমরা এই পরিবর্তন করলাম।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯)

বিষয় : সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'বিদেশি চক্র এদেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তারা এদেশের স্বাধীনতা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করল এবং ফ্রিস্টাইল শুরু হয়ে গেল। হুড় হুড় করে বাংলাদেশে অর্থ আসতে আরম্ভ করল। দেশের মধ্যে শুরু হলো ধ্বংস, একটা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ।

'মোট কয়েক হাজার কর্মীকে হত্যা করা হলো, যারা নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করেছে, মুক্তিবাহিনীর ছেলে, তাদের হত্যা করা হলো চরম ষড়যন্ত্রে। এত অস্ত্র উদ্ধার করি, তবু অস্ত্র শেষ হয় না। এই রাজীতির নামে হাইজ্যাক, এই রাজনীতির নামে ডাকাতি, টেলিফোন করে মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করে বা মানুষের বাড়িতে গিয়ে গহনা কেড়ে নেয় রাজনীতির নামে, একটা ফ্রিস্টাইল শুরু হয়ে গেল।' (দ্র. পাগুক্ত, পৃ. ৪১৯-৪২০)

বিষয় : সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমরা নন-এলায়েন্ড, আমরা ইন্ডিপেনডেন্ট ফরেন পলিসিতে বিশ্বাস করি, আমরা পিসফুল কো-একসিসটেন্সে বিশ্বাস করি। আমরা দুনিয়ার নির্যাতিত পিপলের সাথে আছি, আমরা কারও সাথে শত্রুতা করতে চাই না। আমরা সকলের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। আমরা আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি, আমরা বিশ্বে শান্তি চাই। আমরা কারও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমাদের ব্যাপারেও কেউ হস্তক্ষেপ করুক, এটা আমরা চাই না।' (ঐ, পৃ. ৪২০)

বিষয় : নয়া সিস্টেম প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'সমাজের যেখানে যিনি আছেন, তিনি বুদ্ধিজীবী হন, ডাক্তার হন, ইঞ্জিনিয়ার হন, সরকারি কর্মচারী হন, রাজনীতিবিদ হন, ল-ইয়ার হন, আর যাই হন–কারণ, আমার সমাজে তো শতকরা ২০ জনের বেশি শিক্ষিত নন–এদের মধ্যে সমস্ত লোককে একতাবদ্ধ করে দেশের মঙ্গলের জন্য যদি এগিয়ে যেতে না পারি, তবে দেশের মঙ্গল করা কষ্টকর হবে। সেজন্য নতুন সিস্টেমের কথা বহুদিন পর্যন্ত চিন্তা করেছি। আমার মনে হয়, বাংলাদেশবাসী এটাকে গ্রহণ করেছে এবং ভালোভাবে গ্রহণ করেছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২-৪২৩)

বিষয় : এক মত এক পথ এক ভাব নিয়ে দেশকে ভালোবাসার জন্য এক দল

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমার সমাজে যে সমস্ত গুণীজ্ঞানী লোক আছেন ও অন্য ধরনের মতের লোক আছেন তাঁদের নিয়ে আমার একটা পুল করা দরকার। এই পুল আমি করতে পারি, যদি আমি নতুন একটা সিস্টেম চালু করি এবং একটা নতুন

দল সৃষ্টি করি–জাতীয় দল, যার মধ্যে এক মত, এক পথ, এক ভাব এক হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায়। যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে, তারা এসে একতাবদ্ধ হয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে পারে। এজন্য আজকে এটা করতে হয়েছে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩)

বিষয় : জেলাভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : প্রভিশন হবে ৬০টি জেলায়। প্রত্যেক জেলার জন্য একজন গভর্নর থাকবেন। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। তার অধীনে এস.পি. থাকবেন। দলের প্রতিনিধিগণ থাকবেন, সংসদ সদস্যরা থাকবেন। তার অধীনে এসপি থাকবেন। কাউন্সিলে সরকারি কর্মচারীরাও থাকবেন। প্রত্যেক জেলায় অর্থাৎ বর্তমান মহকুমাসমূহে একটি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল থাকবে এবং তার একজন গভর্নর থাকবেন। তিনি স্থানীয়ভাবে শাসন ব্যবস্থা চালাবেন। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ.-৪২৪)

বিষয় : বিকেন্দ্রীকরণ প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। জেলা গভর্নরের কাছে যাবে আমার ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা। তাঁর কাছে যাবে আমার খাদ্যসামগ্রী। তাঁর কাছে যাবে আমার টেস্ট রিলিফ, লোন, বিল ও সেচ প্রকল্পের টাকা। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ডাইরেক্ট কন্ট্রোলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল ডিস্ট্রিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরিচালনা করবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪)

বিষয় : ভুল করা ও সংশোধন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমাদের বলতে হয় যে, ভুল করেছি। আমি যদি ভুল করে না শিখি, ভুল করে শিখবো না। সে জন্য আমি সবই ভুল করলে আর সকলেই খারাপ কাজ করবে, তা হতে পারে না। আমি ভুল নিশ্চয়ই করবো, আমি ফেরেস্তা নই, শয়তানও নই। আমি মানুষ, আমি ভুল করবোই। আমি ভুল করলে আমার মনে থাকতে হবে, আই ক্যান রেকটিফাইট মাইসেলফ। আমি যদি রেকটিফাই করতে পারি, সেখানেই আমার বাহাদুরি। আর যদি গোঁ ধরে বসে থাকি যে, না, আমি যেটা করেছি, সেটাই ভালো, দ্যাট ক্যান্ট হিউম্যান বিইং।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫)

বিষয় : মানসিকতার পরিবর্তন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমরা যখন কোথাও যাবো, দেখবো যে, রাস্তায় একটি ইট পড়ে

আছে, ঐটা আমার ডিপার্টমেন্টের না, ঐ কথা বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। হোয়াট ইজ দিস? দিস মেন্টালিট মাস্ট বি চেঞ্জড। প্রত্যেকটি লোক, প্রতিটি কাজই আমার, মাটি কাটা আমার কাজ, ফ্যাক্টরিও আমার কাজ রাস্তা বানানোও আমার কাজ।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬)

বিষয় : জনগণ সম্পৃক্ত উন্নয়ন ভাবনা

বক্তব্য/ঘটনা : 'সেই জন্য আজ যদি পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন স্ট্রং না করা হয় ভিলেজ লেবেল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত যাকে ওয়াচ ডগ বলা হয়, তা যদি না থাকে, তাহলে দেশের মঙ্গল করা যায় না শুধু সরকারি কর্মচারীর উপর নির্ভর করে। দেয়ার মাস্ট বি এ ব্যালেন্স। দেয়ার মাস্ট বি পিপলস মবিলাইজেশন। আমাদের হোল কান্ট্রিক মবিলাইজ করতে হবে ফর ডেফিনিট পারপাস।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬)

বিষয় : দুর্নীতি দমন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড এগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন নিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না এবং সেই মাসে সিস্টেমই পরিবর্তন করতে হবে। ঘুণে ধরা সিস্টেম দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যায় না।' (দ্র. প্রাগুক্ত পৃ. ৪২৭)

বিষয় : মাটি-ঘনিষ্ঠ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমার মাটির সাথে, আমার মানুষের সাথে, আমার কালচারের সাথে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে, আমার ইতিহাসের সাথে যুক্ত করেই আমার ইকনমিক সিস্টেম গড়তে হবে। কারণ, আমার দেশে অনেক অসুবিধা আছে। কারণ, আমার মাটি কি, আমার পানি কত, আমার এখানে মানুষের কালচার কি, আমার ব্যাকগ্রাউণ্ড কি, তা না জানলে হয় না। ফান্ডামেন্টালি আমরা একটি শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই, আমরা একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে চাই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯)

বিষয় : ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আই বিলিভ ইন পজিটিভ এ্যাপ্রোচ, নট এ নেগেটিভ এ্যাপ্রোচ। সেজন্য আমার পার্টিতে আপনারা যারা আছেন, আসুন, আমরা পজেটিভ এ্যাপ্রোচ নিই। আমি যখন খুব ইয়ং ছিলাম; আমার নেতা সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে কেউ গালাগালি করলে আমি রাগ করে তার কাছে যেতাম। তিনি

হেসে বলতেন, থাক বলতে দাও। ওতে কি হবে? উনি আমাকে বলেছেন, থিংক ফর এ পজিটিভ এ্যাপ্রোচ দ্যান এ নেগেটিভ এ্যাপ্রোচ। আমার লাইফকে আমি ঐ দৃষ্টিতেই দেখছি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯)

বিষয় : দ্বিতীয় বিপ্লব প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'সেকেন্ড রেভুল্যাশন ইজ এট দি এন্ড। সেকেন্ড রেভুল্যাশন যে করেছি আমি, চারটি রেভ্যুল্যাশন প্রোগ্রাম দিয়েছি, এটাই শেষ নয়। করাপশন, ন্যাশনাল ইউনিট এ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং। এগুলো করলেই আমরা একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়তে পারবো–যেখানে মানুষ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত. পৃ. ৪৩০)

বিষয় : দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে শোকহীন সমাজ গঠন প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমার জীবনে আমি দেখেছি, লাখ লাখ লোক দুপাশ দিয়ে কি অবস্থার মধ্যে। আমি তো কল্পনাও করতে পারি না হোয়াই দে লাভ মি সো মাচ? আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করি, মবিলাইজ দি পিপল এ্যান্ড ডু গুড টু দি হিউম্যান বিইংস অব বাংলাদেশ। দিজ আন-ফুরচুনেট পিপল হ্যাভ সাফার্ড লং-জেনারেশন আফটার জেনারেশন। এদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে, এদের খাবার দিতে হবে। ...আমাদের আদর্শ হলো বাংলাদেশকে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ইজ্জত সহকারে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখা, বাংলার দুঃখী মানুষকে পেট ভরে খাবার দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা, যেখানে অত্যাচার অবিচার জুলুম থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না।'(দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১)

তারিখ : ২১ জুলাই, ১৯৭৫

ফোরাম : বঙ্গভবন, নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বিষয় : জনগণের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'জনগণ থেকে আমাদের শাসন কাঠামো অনেকটা বিচ্ছিন্ন, প্রকৃত যোগাযোগ তাদের সাথে ততটা নাই। যারাই আমরা সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করতে গিয়েছি, তারাই মুরুব্বিয়ানা দেখিয়েছি। আমরাই হলাম মালিক, তোমরা আমাদের গোলাম। তোমরা এসো, আমাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকো, আমাদের হুকুম নাও, আমাদের হুকুম মতো চলো, আমাদের মতো চলো, আমাদের হুকুম মেনে কাজ করো, এই ছিল মনোভাব। কোনো স্বাধীন দেশে এই মনোভাব চলতে পারে না। তাতে দেশের মঙ্গল হয় না, তাতে দেশের অমঙ্গল টেনে আনা হয়।' (দ্র. প্রাদুক্ত, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪)

বিষয় : গণমুখী শাসনতান্ত্রিক কাঠামো প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আমাদের মানুষকে চিনতে হবে, জানতে হবে। তাদের সাথে মিশতে হবে, তাদের মনোভাব জানতে হবে। তাদের ইতিহাস এবং অন্য যা কিছু আছে, সংস্কার ইত্যাদি অনেক কিছুই এ দেশের মানুষের আছে, সেসব বিবেচনা করে একটা পন্থা অবলম্বন করা দরকার। যার উদ্দেশ্য হলো এ দেশের মানুষের মঙ্গল করা, এ দেশের উপর থেকে অত্যাচার, অবিচার ও জুলুম উৎখাত করা। যাতে সহজ এবং সরলভাবে মানুষের মধ্যে সোজাসুজি শাসনতান্ত্রিক কাঠামো পৌঁছে দেওয়া যায়।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩)

বিষয় : অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় কর্মকাণ্ড সম্পাদনের আহ্বান

বক্তব্য/ঘটনা : 'আপনাদের এলাকার কর্মস্থলে গিয়ে কাজ করুন। ল এ্যান্ড অর্ডার আপনাদের দেখতে হবে। ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক আপনাদের দেখতে হবে। জিনিসপত্র বিদেশ থেকে যা আসে, তার ডিস্ট্রিবিউশন ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, দেখতে হবে। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা আপনাদের দেখতে হবে। আপনাদের সাথে থাকবেন মেজিস্ট্রেট, আপনাদের সাথে থাকবেন এসপি। আপনাদের সাথে থাকবেন জয়েন্ট এসপি (ক্রাইম)। আপনাদের সাথে থাকবেন সমস্ত অফিসার, আপনাদের সাথে থাকবেন রাজনৈতিক কর্মীরা। আপনাদের একটি কাউন্সিল হবে। কাউন্সিলকে আপনাদের কনফিডেন্সে নিতে হবে। কাউন্সিলকে বাদ দিয়ে নিজে সব সময় ডিক্টেটরশিপ করতে যাবেন না। কাউন্সিল ডেকে তাদের সাথে আলোচনা করে কাজ করতে হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫)

বিষয় : সামাজিক পুঁজি ব্যবহার প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'শুধু সরকারি অর্থে জনগণের মঙ্গল হয় না, উন্নতির কাজ হয় না। জনগণকে একতাবদ্ধ করতে হবে। আপনাদের জনগণকে মবিলাইজ করতে হবে। সেজন্য জনগণের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। সেই অনুপ্রেরণা সৃষ্টির দায়িত্ব থাকবে পার্টির এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের, গভর্নরের, জয়েন্টলি। সরকার যদি দেন ৫০ হাজার টাকা আপনারা করাবেন ৫ লাখ টাকার কাজ। বাংলার মানুষকে কোনো কাজ করতে বললে তারা 'না' বলে না। বাংলার মানুষ যদি বোঝে যে, এই কাজে তাদের উন্নতি হয়, তবে তারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেজন্য আপনাদের যারা পার্লামেন্টের মেম্বার গভর্নর হয়েছেন, তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬)

বিষয় : জবাবদিহিতা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : আমার কিন্তু সাফ সাফ কথা। আপনার কে কি করলো না করলো আমি কিছু শুনবো-টুনবো না। আপনার জায়গায় মানুষ আপনাকে ভালোবাসে কিনা, আমি সেটা দেখবো। যদি আপনার বিরুদ্ধে সেখানে গণবিক্ষোভ হয়, বাংলার জনগণ যদি দেখে যে আপনি ভালো কাজ করছেন না, যদি আপনার সম্বন্ধে নেপোটিজম, করাপশনের অভিযোগ দেখা যায়, আমি কিছু শুনবো-টুনবো না। আপনাদের তো ধারণা আছে যে, আমি কিছুতে হাত দিলে কিন্তু হাত উঠাই না। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭)

বিষয় : নতুন সিস্টেম প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'এইরকম করে আমি সব জায়গা থেকে লোক এনে দেখতে চাই। এটা মনোপলি নয় আর যিনিই ফেল করবেন, চলে যাবেন। রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে বসিয়ে দেবো। যিনি ভালো কাজ করবেন, তিনিই প্রশাসন চালাবেন। আর কোনো কথাই নেই। তবে, এটা একটা নতুন সিস্টেম। আর নতুন সিস্টেমে বাধা আসে। নতুন সিস্টেমের মধ্যে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়। নতুন কিছু করতে গেলে একটা শঙ্কা আসে। মানুষের মনে দ্বিধা সংশয় দেখা দেয়। কিন্তু গত ২০-২৫ বছরে আমি দেখেছি, ইংরেজ আমলের সিস্টেম এ দেশে চলতে পারে না।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮)

বিষয় : জনগণকে তথ্যে প্রবেশাধিকার দিতে হবে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আজকে সব দিকে লক্ষ রাখতে হবে। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে যে টাকা যাবে, প্রত্যেক গভর্নরকেই একটা রুমে তার চার্ট টাঙিয়ে রাখতে হবে বড় করে। পাবলিক যাতে দেখতে পারে। আমার টেস্ট রিলিফের টাকা আসছে, এই প্রজেক্টে এইখানে খরচ হচ্ছে। এই ওয়ার্কস প্রোগ্রামে আসছে, এখানে খরচ হচ্ছে। এই ফারটিলাইজার আসছে, এই জায়গায় গেল, অমুক ইউনিয়নে গেল। সব কিছুরই চার্ট টাঙিয়ে দিতে হবে। ডিস্ট্রিক্টের লোকদের জানাতে হবে। সরকারের জিনিপসত্র কোন দিক দিয়ে আসে, কোন দিক দিয়ে যায়, কেউ জানে না। কত ফুড গেল ডিস্ট্রিক্টে, তা জানাতে হবে। কোন থানায় কত গিয়েছে; কোন ইউনিয়নে কত গিয়েছে, তাও জানাতে হবে।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯)

বিষয় : জনগণের মঙ্গলের জন্য এই শাসনব্যবস্থা

বক্তব্য/ঘটনা : 'এই শাসনব্যবস্থা হয়েছে জনগণের মঙ্গলের জন্য। জনগণ যাতে সোজাসুজি শাসনব্যবস্থার ফল ভোগ করতে পারে, তার জন্যই এই সিস্টেম করা

হয়েছে। সোজা কথায়, কোনোরকম অসুবিধা যেন তাদের ভোগ করতে না হয়। সব কিছুই যেন জনগণের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। ইডেন বিল্ডিংস বা গণভবনের মধ্যে আমি শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা রাখতে চাই না। আস্তে আস্তে গ্রামে, থানায়, ইউনিয়নে, জেলা পর্যায়ে এটা পৌঁছে দিতে চাই। যাতে জনগণ সরাসরি এসবের সুযোগ-সুবিধা পায়।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১)

বিষয় : দুর্নীতি বন্ধ করার আহ্বান

বক্তব্য/ঘটনা : 'চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, দুর্নীতি রোধ করতে হবে–এটা ভালো করে জানবেন। সাবধান, আপনাদের সবাইকেই আমি এসব বলে রাখছি এখানে। যারা এখানে আছেন, তাদের সবাইকে সাবধান করে রাখছি আমি এই ব্যাপারে সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছি। ভাবছি, কি করে এগুলো দূর করা যাবে। আমি একটা কাজের কথা বলি দুই বছর আগে। আর, একবছর পরে হাতে হাত দিই। রিমেম্বার ইট। আপনারা জানেন, আমাকে ভালো করেই জানেন। আপনাদের কাছে আমার কথা রইল, যাদের আমি গভর্নর করেছি, তারা করাপশন বন্ধ করুন।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩)

বিষয় : ভেবেচিন্তে এগুনোর পরামর্শ

বক্তব্য/ঘটনা : 'মাথা গরম না করে কাজ করতে হবে। আর সংযম ও সহনশীলতা যেন থাকে। সংযম ও সহনশীলতা না থাকলে কোনো কিছুই করতে পারবেন না এবং যে কোনো ডিসিশন নিতে চিন্তা-ভাবনা করে, পরামর্শ করে করবেন। যেটা ভালো মনে করবেন, সেটা করবেন। চিন্তা-ভাবনা করে। হঠাৎ কিছু করবেন না। হঠাৎ করলে কিন্তু মানুষের ভুল হয়। চিন্তা-ভাবনা করে ডিসিশন নিয়ে যদি মনে করেন, এটা ভালো, তাহলে সেটাই করবেন।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪)

বিষয় : মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার

বক্তব্য/ঘটনা : 'সবাই যখন কনফারেন্সে যাবেন, তখন কেউ বলবেন না যে আমার থানায় কত দিলেন। আগেই সবাই প্রোজেক্ট নিয়ে আসবেন, কাজ করবেন। তারপর যা দেওয়ার দিবেন। প্রথমে দেবেন, কোনটাতে মানুষের উপকার বেশি হবে। সেটা আগে করবেন। আজ এখানে হোক, কাল ওখানে হোক এভাবে করলে ৫ বছরে সব জায়গায় হয়ে যাবে। অসুবিধার কিছু নাই। দুটো করে প্রোজেক্ট করুন। মানুষ দেখুক বুঝুক। এটা ভুললে চলবে না আপনাদের।' (দ্র. পাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫-৪৪৬)

বিষয় : অফিসারদের প্রতি আস্থা প্রসঙ্গে

বক্তব্য/ঘটনা : 'আপনারা আমার কথা জীবনভর শুনেছেন। আজও শুনুন। দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে দেশের জন্য কাজ করুন। সিস্টেমটাকে আমাদের সাকসেসফুল করতেই হবে। আমি অনেক ভালো অফিসার দিয়েছি। যদি দরকার হয় ভবিষ্যতে আরও দেব। আমি তাদের বিশ্বাস করি বলেই দিয়েছি। বিশ্বাস করি, তাঁরা ভালো কাজ করবেন। এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নাই।' (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৭)



পরিশিষ্ট ৩

বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি ভাষণ

ঐতিহাসিক এই ভাষণটি ২০১৭ সালে ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দি ওয়র্ল্ডের ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার' হিসেবে স্বীকৃত

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম : বঙ্গবন্ধু

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখ লাখ মুক্তিপাগল বীরবাঙালির বিশাল জনসমুদ্রে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ, ঢাকা রেসকোর্স, ৭ মার্চ ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমুদ্র। মুহুর্মুহু গর্জনে ফেটে পড়ছে জনসমুদ্র, লাখ লাখ কণ্ঠে একই আওয়াজ- স্বাধীনতার বজ্রশপথ। বাতাসে উড়ছে অসংখ্য পতাকা, সোনার বাংলার মানচিত্র আঁকা লাল সবুজের পতাকা, স্লোগানের সাথে সাথে উত্থিত হচ্ছে আকাশের দিকে বাঙালির সংগ্রামের প্রতীক বাঁশের লাঠি, অসংখ্য লাঠি। মঞ্চে মাইক থেকে স্লোগান দিচ্ছে সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রলীগ নেতা আ. স. ম. আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন; স্লোগান দিচ্ছেন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান আবদুর রাজ্জাক, লাখ লাখ কণ্ঠে ফিরে আসছে স্লোগানের জবাব বজ্রনির্ঘোষে।

যেসব স্লোগানে উদ্দীপ্ত হয় বিশাল জনসমুদ্র–'জয় বাংলা'; 'আপস না সংগ্রাম–সংগ্রাম সংগ্রাম', 'আমার দেশ তোমার দেশ–বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'পরিষদ না রাজপথ–রাজপথ রাজপথ', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো–বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'ঘরে ঘরে দুর্গ

গড়ো—বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। বিকেল ৩.২০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু সভামঞ্চে এসে উপস্থিত হন এবং তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' শুরু করেন।]

ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ছয়-দফার আন্দোলনে, ৭ই জুন আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-র আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আপনারা জানেন দোষ কি আমাদের? আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো, এমনকি আমি এ-ও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, ওদের সঙ্গে আলাপ করলাম; আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। তারপরে হঠাৎ এক তারিখে এসেমব্লি ডেকেছিলেন, আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেওয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কি পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে দেশের গরিব-দুঃখী আর্তমানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তাঁরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি তো অনেক আগেই বলেছি, কিসের রাউন্ড টেবিল? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন। বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

পঁচিশ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আ.টি.সিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য যেসমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা-গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জর্জকোর্ট, সেমি-গভর্মেন্ট দপ্তর-ওয়াপদা, কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটি গুলি চলে আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল : প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে, সবকিছু, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।

আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিচ্ছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবা না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যতদূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি : আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, ততদিন খাজনা, ট্যাক্স

বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ দেবে না। শোনেন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মাইনে-পত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেওয়া-নেওয়া চলবে না। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ। **এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।**

[সূত্র : *অ্যালবাম 'জাতির জনক'*, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ঢাকা]

চারটি মৌলিক আদর্শের ওপর শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে

[১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের পূর্ণ বিবরণ নিচে উদ্ধৃত হলো।]

জনাব স্পীকার সাহেব,

আজ প্রথম সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম নজির যে, বাঙালিরা তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র প্রদান করছে। বোধহয় নয়, সত্যিই প্রথম–বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে গণপরিষদে এসে তাদের দেশের শাসনতন্ত্র প্রদান করছেন। আজ আমাকে অনেক কিছু স্মরণ করতে হয়, অনেক দিনের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়, কিন্তু আমি তা করতে চাই না। কেবল এইটুকু বলতে চাই, তদানীন্তন ভারতবর্ষ, যাকে আমরা উপমহাদেশ বলতাম–সেখানে সে যুগে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে তার হিসাব করলে দেখা যাবে তাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাই রক্তদান করেছে বেশি। তার স্বাক্ষর আছে চট্টগ্রামের জালালাবাদে, স্বাক্ষর আছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। বাংলার এমন কোনো জেলা, এমন কোনো মহকুমা ছিল না যেখানে সে আমলে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে নাই। সেই আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে সিপাহী বিদ্রোহ এই বাংলার মাটি থেকেই শুরু হয়েছিল। তারপর বাংলাদেশের জনসাধারণ বহু যুদ্ধ করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে বারবার সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তারা জেল-যন্ত্রণা ভোগ করেছে বহুবার, অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করেছে অনেক। কিন্তু দুঃখ, বাঙালির জীবনে সুখ কোনো দিন আসেনি। বাংলাদেশ সম্পর্কে ঠাট্টা করে একবার আমাকে একজন বলেছিল, তোমার বাংলার উর্বর জমি তোমার দুঃখের কারণ। তাই বোধ হয়, শকুনিদের বারবার এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেছে। কারণ তারা এ দেশের অর্থ-সম্পদের উপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিল। দুনিয়ার সেইসব লোভীরা এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষের যারা শাসক ছিল, তারা বাংলার অর্থ, বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে অন্যত্র। গৃহহারা সর্বহারা কৃষক মজুর দুঃখী বাঙালি যারা সারা জীবন পরিশ্রম করেছে, দুবেলা পেট ভরে খেতে পায়নাই, তাদেরই সম্পদ নিয়ে গড়ে উঠেছে কলকাতার বন্দর, বোম্বাই, মাদ্রাজ তাদেরই সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে, করাচি, ইসলামাবাদ, লাহোর। গড়ে উঠেছে ডাণ্ডি-গ্রেট বৃটেন। এই বাংলার সম্পদ ছিল বাঙালির দুঃখের কারণ। সংগ্রামী বাঙালিরা বারবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করেছে। যুদ্ধ ঘোষণা করেছ তিতুমীর, যুদ্ধ করেছে হাজী শরীয়তউল্লাহ। তাদের কথা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়; কারণ বাঙালি আজ শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। স্মরণ করতে হয় শেরে বাংলা ফজলুল হকের কথা, স্মরণ করতে হয় সোহরাওয়ার্দী মরহুমের কথা, আরও স্মরণ করতে হয় মানিক মিয়ার কথা। যিনি তাঁর কলম দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছেন। স্মরণ করতে হবে সেইসব সহকর্মীদের আত্মত্যাগের কথা, যারা জীবন দিয়েছেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামে। স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল ৯ মাসই হয় নাই; স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালের পর থেকে। তারপর ধাপে ধাপে সে সংগ্রাম এগিয়ে গেছে। সে সংগ্রামের একটা ইতিহাস আছে। তাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। একদিনে সে সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌঁছে নাই। ৯ মাস আমরা যে চরম সংগ্রাম করেছি, সে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল বহুদিন থেকে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভাগ করে সংখ্যায় মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও বাঙালিরা সবকিছু হারিয়ে ফেলে। জনাব জিন্নাহ সাহেব, যাকে অনেকে নেতা বলে মানতেন, বাঙালিকে এক শকুনির হাত থেকে আরেক শুকুনির হাতে ফেলে দিয়ে করাচিতে রাজধানী কায়েম করলেন। এমনকি জিন্নাহ সাহেব মরার পূর্বে তিনি সম্পত্তির যে দলিলপত্র করে গিয়েছিলেন সেই দলিল অনুসারে ভাগ পেয়েছিল পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পেয়েছিল বোম্বের হাসপাতাল এবং করাচি স্কুলকেও তিনি কিছু দান করেছিলেন। কিন্তু বাংলার কোনো মানুষের জন্য এক পয়সাও দান করে যান নাই। বাংলার মানুষ আমরা বুঝতে পারি না, হুজুগে মেতে পরের ছেলেকে বড় করে দেখি, এই ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য। দুনিয়ার কোনো দেশে 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোনো শব্দ পাই না এক বাংলাদেশ ছাড়া। বাঙালি জাতি আমরা পরশ্রীকাতর খুব বেশি। ইংরেজি ভাষায়, রাশিয়ান ভাষায়, ফ্রেঞ্চ ভাষায়, চায়নিজ ভাষায় 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোনো শব্দ নাই, একমাত্র বাংলাভাষা ছাড়া। এই কারণে বাঙালিদের মধ্যে যেমন ত্যাগ ও সাধনা করার শক্তি ছিল, তেমনি পরশ্রীকাতরতার মনোভাবও দেখা গেছে। বাংলাদেশের যেসকল নেতারা সংগ্রাম করেছেন আমরা তাদেরকে বুঝতে পারি নাই; আমরা বুঝেছি মি. জিন্নাহ বুঝি আমাদের নেতা হয়ে চলে এসেছেন বোম্বাই থেকে। যা হোক, সেই ইতিহাস এবং ১৯৪৭ সালের করুণ ইতিহাস অনেকেই জানেন।

জনাব স্পীকার সাহেব, ১৯৪৭ সাল থেকে এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছিল বাংলাদেশের মানুষকে একটা কলোনি করে রাখার জন্য। বহু আগেই পশ্চিমা শক্তিকে এদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের একদল লোক ছিল যারা স্বার্থের লোভে, পদের লোভে, অর্থের লোভে তাদের সঙ্গে বারবার হাত মিলিয়েছে, তারা বারবার চরম আঘাত হেনেছে আমাদের উপর।

আঘাত হেনেছে ১৯৪৮ সালে, আঘাত হেনেছে ১৯৫২ সালে, আঘাত হেনেছে ১৯৫৪ সালে। এমনকি ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র রচনার সময় যখন বাঙালিরা পরিষদ থেকে 'ওয়াক আউট' করে, তখনো বাঙালিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বেঈমানি করে পশ্চিমাদের সঙ্গে হাত মেলায় মন্ত্রিত্বের লোভে। ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল' বাংলার উপর আসে বাঙালিকে শোষণ করার জন্য। যখন পশ্চিমারা দেখে বাংলার মানুষ জাগ্রত হয়ে উঠেছে, বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করতে শিখেছে, তখন তারা বাংলার মানুষের উপর শক্তি প্রয়োগ করে, তাদের শক্তি ছিল একটা, সেই শক্তি তাদের সামরিক বাহিনী। ইংরেজ তাদের সাম্রাজ্যবাদ রক্ষা করার জন্য সামরিক বাহিনী গঠন করতে পাঞ্জাবের কয়েকটি এলাকা বেছে নিয়েছিল, সেখান থেকে সামরিক বাহিনীতে লোক নিয়োগ করা হতো। বাঙালিকে বিশ্বাস করা হতো না, বাঙালিকে সামরিকবাহিনীতে নেয়া হতো না; কারণ বাঙালিরা বিদ্রোহ করে, এই হচ্ছে তাদের দোষ। ১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর তদানীন্তন পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যায় ছিল বেশি, বুদ্ধিতে ছিল ভালো, লেখাপড়া ভালো জানত, আক্কেল তাদের প্রখর ছিল। কিন্তু একটা জিনিসের অভাব বাঙালিদের ছিল, যার জন্য বারবার তারা মার খেয়ে গেল, যদিও তা পূরণের জন্য আমাদের অনেক সহকর্মী চেষ্টা করেছিলেন–সেটা ছিল সামরিক বাহিনীর শক্তি। সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি তার অধিকার আদায় করতে পারে নাই। যখন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছে তখনই এসেছ চরম আঘাত। ১৯৫৪ সালে ৯২-ক ধারার বলে শেরে বাংলা ফজলুল হককে ঘরের মধ্যে অন্তরীণ করা হয়, আমিসহ ৫০ জন সহকর্মী যারা তদীন্তন এম, এল, এ, ছিলেন তাদেরকে এবং প্রায় ৫ হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। সে যুগের ইতিহাস কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস, সে কথা কল্পনা করতেও শিউরে উঠি; যখন মানুষ আমাদের একটু স্থান দিত না, কারও বাড়িতে জায়গা পাওয়া যেত না, আত্মীয়-স্বজন ভয় করত, একটা পয়সা দিয়ে কেউ সাহায্য করত না। সে যুগে ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ আমলে জিন্নাহ সাহেবের জীবিত অবস্থায় যারা এদেশে বিরোধী দল গঠন এবং সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তাদের কথা যদি স্মরণ না করি তবে অন্যায় হবে। তাদের কথা আজ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আরো স্মরণ করি তাদের কথা, যাদের রক্তে এই ২৫ বছর বাংলাদেশের পথ-ঘাট-রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে; যে হাজার হাজার লাখ লাখ মায়ের কোল খালি হয়েছে, যে লাখ লাখ মা-বোন জীবন দিয়েছে, ইজ্জত দিয়েছে—তাদের কথা! লাখ লাখ ছেলে আজ লুপ্ত হয়ে গেছে, কত মা আজ পুত্র হারা, কত বোন আজ স্বামী হারা, কত পিতা আজ সন্তান হারা, কত সংসার যে আজ ছারখার হয়ে গেছে তার সীমা নাই। পশ্চিমা শোষকরা শেষ পর্যন্ত কত খেলা খেলে গেল। উড়ে এসে এক একজন জুড়ে বসত।

জনাব স্পীকার সাহেব, আমি গত নির্বাচনের পূর্বে ও পরে বলেছিলাম যে জাতি একবার রক্ত দিতে শিখেছে সেই জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না, সেই জাতিকে কখনো কেউ পদানত করতে পারে না–সেকথা অক্ষরে অক্ষরে আজ প্রমাণ হয়ে গেছে। অনেকে দালালি করেছেন প্রগতির নামে; ইয়াহিয়া খানের দালালি, আইয়ুব খানের দালালি করেছেন। আজকের অনেকেরই তখন রাজনৈতিক জীবনের জন্ম হয় নাই, তারাও অনেক সময় আজ সমালোচনা করেন আমাদের। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলে সমালোচনা করার অধিকার দিয়েছি। সমালাচনা করুন, সত্য কথা বলতে ভয় না পাওয়া সৎ সাহসের কাজ। গত সংগ্রামের সময় ২৫ মার্চ তারিখে আক্রমণ চলে এবং আমার বাড়িতে মেশিনগান মেরে আমাকে গ্রেফতার করা হয়, সেই সময় আমার সহকর্মীদের আমি হুকুম দিয়েছিলাম–যাও, চলে যাও, যার যার এলাকাতে গিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলো এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাও। ২৫ মার্চ তারিখে যে আক্রমণ চলে, সে আক্রমণ চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি সেনাবাহিনীর উপর, বাঙালি ইপিআর, বাঙালি পুলিশ, বাঙালি রক্ষীবাহিনীর উপর, আর বিশেষ করে আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর। এবং যারা এ দেশের দুঃখী মানুষ তাদের বস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় ঢাকা শহর থেকে আরম্ভ করে সারা বাংলাদেশে সেই ২৫ তারিখ রাত থেকে অত্যাচার শুরু হয় এবং মেশিনগান চলে। যখন আমি বুঝতে পারলাম আর সময় নেই এবং আমার সোনার দেশকে চিরদিনের মতো ছেড়ে যেতে হচ্ছে–মনে হলো এই বুঝি আমার শেষ, তখন চেষ্টা করলাম কি করে বাংলার মানুষকে এ খবর পৌঁছে দেওয়া যায় এবং তা আমি পৌঁছেও দিয়েছিলাম। সেদিন আমি লাশ দেখেছি, রক্ত দেখেছি। সেই রক্তের উপর দিয়ে, রক্তাক্ত মানুষের লাশের পাশ দিয়ে আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন আগুন আমি দেখেছি। তাদের শুধু বলেছিলাম, তোমরা আমাকে হত্যা করো, আমার মানুষকে প্রাণে মেরো না। তারা আমার কথা শোনে নাই, তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে, তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তারা আমার সহকর্মীদের হত্যা করেছে, এই গণপরিষদের বহু কর্মীকে হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। মানুষ যে এত জঘন্য পশু হতে পারে, দুনিয়ার ইতিহাসে তা দেখা যায় না। হালাকু খাঁর কাহিনী পড়েছি, চেঙ্গিস খাঁর কাহিনী পড়েছি, হিটলার-মুসোলিনির কাহিনী পড়েছি, কিন্তু মানুষ যে এত জঘন্য পশু হতে পারে তা দেখি নাই। তারা দুই বছরের দুধের বাচ্চাকে হত্যা করে তার বুকে 'বল জয় বাংলা' লেখা এঁটে গাছের সঙ্গে টাঙিয়ে রেখেছে। মানুষ এত জঘন্য পশু না হলে ৭০ বছরের বৃদ্ধার উপর কি পাশবিক অত্যাচার করতে পারে? তারা লক্ষ লক্ষ দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। সে রক্তের স্মৃতি আমরা ভুলতে পারি না। তাদের কথা আমাদের স্মরণ করতেই হয়।

আওয়ামী লীগ, আমার সহকর্মীরা বা আমি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করতে চাই না। ক্ষমতা চাইলে ক্ষমতা ভোগ করতে পারতাম। সারা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। আমার সহকর্মীরা বাংলার ক্ষমতা, মন্ত্রিত্ব করতে পারত। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে, বাংলার মানুষ সুখী হবে, বাংলার সম্পদ বাঙালিরা ভোগ করবে। সেই জন্য সংগ্রাম করেছিলাম। জনাব স্পীকার সাহেব, বক্তৃতা করা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ অনেক সময় আমি ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমার সহকর্মীরা সবাই তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল, এই পরিষদের এমন কোনো সদস্য নেই যার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয় নাই, আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করা হয় নাই। আজ অনেকে এদের সম্পর্কে অনেক কথা বলে, বলাটা স্বাভাবিক। কারণ যে কাজ করে তারই বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলে, যে কাজ করে না তার বিরুদ্ধে মানুষ বলে না। আওয়ামী লীগের এমন অনেক সদস্য আমার কর্মী ভাইবোন আছে যাদের ঘরবাড়ি এমনকি সর্বস্ব চলে গেছে তবুও তারা ক্ষমতা চায়নি। সেদিন তারা সর্বস্বান্ত হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে বুঝতে পারছে না কি করবে, আমি তাদের কাছে নাই। আমি ঘোষণা করে বলে গিয়েছি, সমস্ত জেলায় মহকুমায় একসঙ্গে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করো এবং হয়েছিলও তাই। আমার সহকর্মীরা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে স্বাধীন সরকার গঠন করে দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সেদিন অনেকেই এগিয়ে আসেন নাই। শুধু আরাম করে খেয়েছেন। এই সংগ্রামের কথা চিন্তাও করেন নাই। সেই ভাঙাচুরা দল অন্যান্য যারা অত্যাচারিত হয়েছিল তাদেরকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে দুনিয়ার কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে তুলে ধরে, তারপর পুরোদমে সংগ্রাম করে চলে। নির্ভীক বাংলার সৈনিক, নির্ভীক মুজাহিদ, আনসার, পুলিশ, সাবেক ইপিআর, নির্ভীক বাংলার ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও সরকারি কর্মচারীদের একাংশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই নমরুদদের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রাম হয়েছিল চরম সংগ্রাম। তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছিল, তখনো তারা অন্যান্য জায়গা থেকে অস্ত্র পায়নি; দেশের মধ্য থেকে অস্ত্র জোগাড় করে নিয়ে তারা সে সংগ্রাম করে। সেইভাবেই একমাস দুই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকে। তারপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য পেয়ে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী ভালো ভালো আধুনিক অস্ত্র পেয়ে গ্রামের পর গ্রাম শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দেয়; কিন্তু পদানত হয়নি বাঙালি। সেজন্য আমি স্মরণ করি সেই ৩০ লক্ষ লোককে, যারা রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। আমি আরও স্মরণ করি আমার সেই পঙ্গু ভাইদের কথা যারা আজ পঙ্গু হয়ে বসে আছে। তাদের জন্য কর্তব্য করতে চেষ্টা করেছি, পঙ্গু ভাইদের জন্য ট্রাস্ট করে দিয়েছি ৪ কোটি টাকা ব্যয় করে, সেখান থেকে তারা পেনশন পাবে সারা জীবন। আমি আরও স্মরণ করি

আমার নির্যাতিত মা-বোনের কথা। ২ লক্ষ নির্যাতিতা মা-বোন আজও ক্যাম্পে ক্যাম্পে রয়েছে, তাদের ইজ্জত নষ্ট করে দিয়ে গেছে পাকিস্তানি সেই দস্যুরা যারা ইসলামের নাম নিয়ে চিৎকার করতো, মুসলিম বাংলা বলে চিৎকার করতে লজ্জাবোধ করে নাই। সেই ২ লক্ষ মা-বোনের কথা স্মরণ না করলে অন্যায় করা হবে।

যাক, সেসব কথা, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি অনেক রক্তের বিনিময়ে। আমি প্রথমেই বলেছি, এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে। কোনো দেশে কোনো যুগে আজ পর্যন্তও এত বড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে এত তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই। স্বাধীনতার পর দেশে যে অবস্থা বিরাজ করছিল জনসাধারণ তা জানে, বৈদেশিক মুদ্রা কয় পাউন্ড ছিল তা সকলের জানা আছে, রাস্তাঘাটের কি অবস্থা ছিল এই সবই আপনাদের জানা আছে। মানুষের ভুললে চলবে না যে, স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশ একটি কলোনি মাত্র ছিল, শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানি মাল এখানে বিক্রি করে তার অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হতো। সব কিছু তারা ধ্বংস করে দিয়ে যায়, যাবার বেলায় তারা গর্ব করে বলে যায়, বাঙালি যে স্বাধীনতা পেল তা আর কতদিন, দেশকে এমন করে দিয়ে গেলাম যে, লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরবে আর কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারব না। কিন্তু আজ বাংলার মানুষ কোমর সোজা করে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক, স্পীকার সাহেব, বিপ্লবের পর ৯ মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেওয়া, মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়ার কারণ হলো আমরা জনগণের উপর বিশ্বাসী, এই জনগণের উপর আস্থা নিয়েই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। জনগণের উপর আমার আস্থা রয়েছে। আমি আগেই বলেছি, জনগণকে আমরা ভয় পাই না, জনগণকে আমরা ভালোবাসি। সেই জন্য আজ আপনার মাধ্যমে আমি আমার সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। তারা রাতদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে খসড়া শাসনতন্ত্র রচনা করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। ৫ বছর পর্যন্ত আমরা অনায়াসে শাসনতন্ত্র চালাতে পারতাম, কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বাংলার মানুষের কাছে গণভোট দিয়ে প্রমাণ করে দিতাম যে, বাংলার মানুষ কাদের ভালোবাসে, কিন্তু তা আমরা চাইনি, চেয়েছি মানুষের অধিকার। এই অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম। তাই আজ শাসনতন্ত্র দিয়েছি। আমার সহকর্মীর একজনও আপত্তি করে নাই যে, আমরা পরিষদ ভাঙব না। এ জন্য আমি গর্বিত। যাঁরা এই পরিষদের সদস্য হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, যাঁরা এই গণপরিষদ সদস্য, তাঁরা শাসনতন্ত্র পাস করে বলতে পারতেন যে, ভবিষ্যতে আমরা জাতীয় পরিষদরূপে কাজ করব। কারো কিছু বলার অধিকার ছিল না, কেননা কনভেনশনের রীতি রয়েছে। কিন্তু তা করা হয় নাই। আওয়ামী লীগ যে ক্ষমতার লোভী নয়, এটা তার আর একটি প্রমাণ। সে শাসনতন্ত্র দিয়েছে এবং নির্বাচনে যাবে। আজ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

আলোচনা হয়েছে। আমার সহকর্মীরা প্রায় সকলেই বক্তৃতা করেছেন। যিনি একজন বিপক্ষে আছেন এবং দুইজন স্বতন্ত্র দলে আছেন, তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেন যে, তাঁদেরকে এখানে বেশি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁরা এখানে আসতে পারলে আরো সুযোগ পাবেন, তাতে আপত্তি নাই। আর যদি না আসতে পারেন তাতেও আপত্তি নাই, জনগণই ঠিক করে দেবে কে এখানে আসবে আর কে আসবে না। ৯ মাসের মধ্যে যে শাসনতন্ত্র দেওয়া হয়েছে, এটা হলো আর একটি নতুন দৃষ্টান্ত। আমি আগেই বলেছি শাসনতন্ত্র ছাড়া, মৌলিক অধিকার ছাড়া দেশের অবস্থা হয় মাঝিহীন নৌকার মতো। তাই মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে তারই জন্য আমাদের পার্টি এই শাসনতন্ত্র প্রদান করল। আশা করি, জনগণ শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে, তারা খসড়া শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেছেও। কারণ আমরা জনগণের প্রতিনিধি। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এখানে এসেছি। কেউ আমাদের পকেট থেকে বের করে দেন নাই অথবা আমরা আসমান থেকে পড়ি নাই কিংবা কেউ এসে আমাদের মার্শাল ল' জারি করে বসিয়ে দেন নাই। মার্শাল ল' জারি আমরাও করতে পারতাম। যেদিন আমার বন্ধুরা, সহকর্মীরা এখানে এসে সরকার বসান, সেদিন তারা বলতে পারতেন, Emergency, no democracy, no talk for 3 years-এবং সেটা মানুষ গ্রহণ করতো। কোনো সমালোচনা চলবে না, কোনো কথা বলা চলবে না, কোনো মিছিল হবে না, কোনো পার্টির কাজ চলবে না। কারণ দেশের যা অবস্থা ছিল, তাতে এটা সহজেই করা যেত। সব দেশে, সব যুগে বিপ্লবের পরে তাই হয়েছে। কিন্তু আমরা সেটা চাই নাই। শক্তি আমাদের ছিল। আমাদের শক্তি আমাদের জনগণ। কেউ যদি মনে করেন যে, শক্তির উৎস বন্দুকের নল, আমি তা স্বীকার করি না। আমি স্বীকার করি, আমার দল স্বীকার করে শক্তির উৎস হলো জনগণ।

জনাব স্পীকার সাহেব, ৪টা মূল স্তম্ভের উপর এই শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এই হাউসে হয়েছে। আমার সহকর্মীরা অনেকেই এর উপর বক্তৃতা করেছেন। আমার সহকর্মী ড. কামাল হোসেনও অনেক কথার উত্তর দিয়েছেন। এই যে ৪টা স্তম্ভের উপর শাসনতন্ত্র রচনা করা হলো এর মধ্যে জনগণের মৌলিক অধিকারই হচ্ছে মূল বিধি। মূল ৪টা স্তম্ভ-জনগণ ভোটের মাধ্যমে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে। শুধু ভোটের মাধ্যমে নয়, ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে রক্তের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে? জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ছিল চরম মরণ-সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না হলে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে। অনেক ঋষি, অনেক মনীষী, অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক শিক্ষাবিদ এ সম্পর্কে অনেক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে আর নতুন সংজ্ঞা নাই-বা দিলাম। আমি শুধু বলতে পারি আমি যে বাংলাদেশের মানুষ,

আমি একটি জাতি। এই যে জাতীয়তাবাদ, সে সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই। ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন, সকলের সাথে একটা জিনিস রয়েছে, সেটা হলো অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি না থাকে, তাহলে কোনো জাতি বড় হতে পারে না এবং জাতীয়তাবাদ আসতে পারে না। অনেক জাতি দুনিয়ায় আছে, বিভিন্ন ভাষাবলম্বী হয়েও এক জাতি হয়েছে। অনেক দেশে আছে একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সবকিছু কিন্তু সেখানে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে, তারা একটি জাতিতে পরিণত হতে পারে নাই। জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির উপর। আজ বাঙালি জাতি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে; এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল যার উপর ভিত্তি করে, এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে সেই অনুভূতি আছে বলেই আমি বাঙালি, আমার 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদ।

দ্বিতীয় কথা, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র–সেই গণতন্ত্র যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। মানুষের একটা ধারণা আছে এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যেসব দেশে চলেছে, দেখা যায় সেসব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিবাদের প্রকেটশন দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজন হয় শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্রের ব্যবহার। সে গণতন্ত্র আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই, শোষিতের গণতন্ত্র এবং শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হলো—আমার দেশে যে গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে তাতে সেসব বন্দোবস্ত করা হয়েছে যাতে এদেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়, শোষকরা যাতে রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা নাই। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সাথে অন্যের পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক শিডিউলে রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন। অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারোর সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরাং, নিশ্চয় আমরা কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, কাপড়ের কল, পাটকল চিনির কারখানা সবকিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি। তার মানে হলো, শোষকগোষ্ঠী যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সেজন্য এখানে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।

তৃতীয়, সোশ্যালিজম্–অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা ঐগুলো জাতীয়করণ করেছি। যারা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হলো না, সমাজতন্ত্র হলো না তাদের আগে বোঝা উচিত সমাজতন্ত্র কি। সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫০ বছর পা হয়ে গেল, অথচ এখনো তারাও সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্র গাছের ফল

নয়–অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিন সময় প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুর। সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো যায়। এবং সেজন্য পহেলা স্টেপ–যাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি–শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কি আবহাওয়া, কি ধরনের অবস্থা, কি ধরনের মনোভাব, কি ধরনের আর্থিক অবস্থা সবকিছু বিবেচনা করে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে। রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে চীন তা করেনি, সে অন্যদিকে চলেছে। রাশিয়ার পাশে বাস করেও যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, নিজ দেশের পরিবেশ নিয়ে নিজ জাতির পটভূমি নিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে চলেছে। ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে কোনো দিন সমাজতন্ত্রে তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারে নাই। কারণ লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না–যেমন তা পড়ে আন্দোলন হয় না। সেজন্য দেশের পরিবেশ, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের রীতিনীতি, তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সবকিছু দেখে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা ৯ মাসে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি, তা আমার মনে হয় দুনিয়ার কোনো দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সোশ্যালিজম এনেছে তারাও সেগুলো করতে পারেন নাই। এর ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোনো কিছু প্রচলন করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা process-এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

তারপর আসল ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করব না। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারো নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম করবে তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন ব্যাভিচার–এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যদি বলে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলব

সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটিকয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।

কোনো কোনো বন্ধু বলেছেন, শিডিউলে এ জিনিস নাই ও জিনিস নাই। জনাব স্পীকার সাহেব, কেবল শাসনতন্ত্র পাস করলেই দেশের মুক্তি হয় না, আইন পাস করলেই দেশের সমাজতন্ত্র কায়েম হয় না। ভবিষ্যৎ বংশধর, ভবিষ্যৎ জনসাধারণ কি করে, কিভাবে শাসনতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে তারই ওপর নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের সাফল্য, তার কার্যকারিতা। আমরা চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র দিয়েছি। কেউ কেউ বলেছেন যে, সরকারি কর্মচারীদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। তারা অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্র পড়ুন। সরকারি কর্মচারীরা একটি আলাদা জাতি নয়। তারা আমাদের বাপ, আমাদের ভাই। তারা কোনো ভিন্ন শ্রেণী নন। ইংরেজ আমলেও তাদের প্রটেকশন দেওয়া হতো, সেই প্রটেকশন আবার পাকিস্তান আমলেও দেওয়া হতো। আমলাতন্ত্রের সেই প্রটেকশনের উপর আঘাত করেছি, অন্য জায়গায় আঘাত করিনি। এই শ্রেণী রাখতে চাই না, কারণ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আইনের চোখে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের যে অধিকার, সরকারি কর্মচারীদের সেই অধিকার। মজদুর-কৃষকদের টাকা দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের মাইনে, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা হয়। মজদুর-কৃষকদের যে অধিকার, সরকারি কর্মচারীদের সেই অধিকার থাকবে। এর বেশি অধিকার তারা পেতে পারেন না। সরকারি কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে, তারা শাসক নন, সেবক। Some people came to me and wanted protection from me, I told them, 'My people want protection from you, gentelmen.' আমি তাদেরকে তাদের মনোভাব আমূল পরিবর্তন করতে বলেছি। কেউ কেউ শাসনতন্ত্রের নবম ভাগের সমালোচনা করেছেন। গত ৯ মাসে কয়েকজন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে। আজ যে কাজ করবে এবং লোকে তাকে কতটুকু ভালোবাসে তার উপর নির্ভর করবে তার প্রমোশন। প্রমোশনের ব্যাপারে গরিব, অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদেরও অধিকার থাকবে। গরিব কর্মচারীদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আজীবন সংগ্রাম করেছি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। আজও বলছি, ভবিষ্যতেও তাদের পাশে থাকব। তারা গরিব আমি জানি। তাদের অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে সংবিধানে। আমরা 'সার্ভিসেস রি-অর্গানাইজেশন কমিটি' গঠন করেছি। সেই কমিটির সদস্যদের বলেছি, ড. কামাল হোসেনও বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ১২৫টি স্টেপ বা প্রাদেশিক সরকারের ৩৩টি স্টেপ আমরা রাখব না। এই ১২৫ ও ৩৩টি স্টেপের মধ্যে যে কত ফাঁক ছিল যা সরকারি চাকরিতে থাকবে না। এতে বাধা সৃষ্টি করার জন্য কিছু কিছু লোক

গোপনে গোপনে ফুসফাস করছেন এবং এমসিএ-দের কাছে যাওয়া-আসা শুরু করেছেন। বহু ক্ষমা করা হয়েছে। আমরা রক্তের আন্দোলনের মাধ্যমে জন্মলাভ করেছি। আমরা এহিয়া খান, আইয়ুব খানের তংখা নিয়ে বেড়াইনি। আমরা চোঙ্গা ফুঁকে রাস্তায় ঘুরে জনসমর্থন নিয়ে এখানে এসেছি। কিন্তু আজ যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, এহিয়া খান, আইয়ুব খানের সেই প্রটেকশন পাবেন তাহলে ভুল করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। যারা ময়দানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন যে, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্মচারীদের খতম করো, ব্যবস্থা গ্রহণ করো, তারাই আবার সভা করে উল্টো প্রস্তাব পাস করেন। নীতি এক হওয়া উচিত। কেউ কেউ বলে সরকারকে ধ্বংস করার জন্য অফিসগুলোতে দালালে ভরে গিয়েছে। দালাল আছে, সত্য। যাদের সম্বন্ধে সঠিক খবর পাই তাদের বিরুদ্ধে একশন নেয়া হয়। তারপর আর এক কথা। কাজ না করে টেবিল চেয়ারে বসে থাকা আজকাল যেন একটা স্টাইল হয়েছে। Mentality must be changed, ঐ CSP, PSP, বাংলাদেশের থাকবে না। সরকারি চাকরিতে ৭টি স্তর থাকবে। 'সার্ভিসেস রি-অর্গানাইজেশন কমিটি' গঠন করা হয়েছে। যারা নির্বাচিত হয়ে পরিষদে আসবেন, তারা কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আইন পাস করবেন তখন সব হবে। এখন অর্ডিন্যান্স পাস করে কাজ করা হচ্ছে। স্ক্রুটিনি কমিটি করা হয়েছে, সেটা থাকবে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ হয়েছে। বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছে। সেটা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা হয়েছে, বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ ৭৫ টাকা বেতন পাবে কেউ ২ হাজার টাকা পাবে তা হতে পারে না। সকলের বাঁচবার মতো অধিকার থাকতে হবে। একজন সবকিছু পাবে, আরেকজন পাবে না তা হতে পারে না। বেতন কমিশন সরকারি কর্মচারীদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতন ঠিক করে দিবেন। সম্পদ ভাগ করে খেতে হবে।

বিরোধী দলের নাম শুনতে পাই। দেশে এ রকম কোনো পার্টি আছে কিনা জানি না। নির্বাচনের আগে এ-রকম কোনো পার্টি ছিল না। অনেকেই ভোট না পেয়ে পশ্চাৎপসরণ করেছিল। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে যদি তারা ভোট না পায় সে দোষ আমাদের হবে না। ভোট পেয়ে পরিষদে এসে বলুন, আমরা বিরোধী দল। যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ভোট পায়নি তারা বলে আমরা বিরোধী দল। ভবিষ্যতে ভোট নিয়ে এসে তারপর বলুন আমরা বিরোধী দল। তা না হলে বলুন এই এই আমাদের দাবি।

গণতন্ত্রে মৌলিক অধিকার ব্যবহার করতে হবে। তার জন্য ethics মানতে হয়। খবরের কাগজে সাংবাদিকতা করতে হলে ethics মানতে হবে। তা না

হলে ethics impose করা হয়। গণতন্ত্রের যে অধিকার তা কেবল চেঁচিয়ে বেড়ালে পালন করা হয় না, বক্তৃতা করলে হয় না। আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। ২৪ লাখ টন খাবার বিদেশ থেকে এনে ৬৫ হাজার গ্রামে দেয়া হয়েছে। এ জন্য ধন্যবাদ দেয়া উচিত। রেলওয়ে ব্রিজ নাই, কাঠ নাই, বাঁশ নাই। ৬৫ হাজার গ্রামে খাবার পৌঁছে দিয়েছি।

যাঁরা বিরোধিতা করছেন তারা মেহেরবানী করে যান না, রিলিফ কমিটি করে চাঁদা তুলে একটা গ্রামের কিছু লোককে যদি কিছু খাওয়াইতে পারেন, পাঁচটা পাঁচটা লোককে যদি খাওয়াইতে পারেন তাহলেও বুঝি যে দেশের লোকদের জন্য কিছু করছেন। শুধু খবরের কাগজে নাম ওঠার জন্য বক্তৃতা করে গণতন্ত্র চাই বললে কি হবে? গণতন্ত্রে যেমন অধিকার আছে তেমনি সাথে সাথে কর্তব্যও রয়েছে। সেই জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করার সময় আমরা ৪টি স্তম্ভ ঠিক রেখেছি। আমি শাসনতন্ত্রের উপর clause by clause বলতে চাই না। আমার সহকর্মীরা clause by clause আলোচনা করেছেন। সেই জন্য, জনাব স্পীকার সাহেব, গণতন্ত্রের কথা আমরা যেমন শাসনতন্ত্রে বলেছি তেমনি সেখানে কর্তব্যের কথাও রয়েছে। জনগণের দাবির মধ্যে আছে ভোটের দাবি। গত বছর পর্যন্ত ভোটারের সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা ছিল ২১ বছর, আমরা শাসনতন্ত্রে সেটা ১৮ বছর করেছি। এটাও জনগণের দাবির মধ্যে একটা। আমরা শাসনতন্ত্র প্রদান করেছি, এর উপর আইন পাস হবে যার দ্বারা দেশ পরিচালিত হবে। আমার ভায়েরা ভুল করেছেন, শাসনতন্ত্র বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। কেউ বুঝবার চেষ্টা করেন নাই বা বুঝবার মতো আক্কেল নাই তাই বুঝতে পারেন না কিংবা বুঝতে চান না। শাসনতন্ত্রের মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে আইন হয়। সেই মৌলিক নীতির উপর ভবিষ্যৎ এসেমব্লিতে আইন পাস করে। এই মৌলিক নীতির বিরোধী কোনো আইন হতে পারবে না। শাসনতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার দেয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্রের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, দুঃখী মেহনতি মানুষকে যেন কেউ exploit করতে না পারে। তাদের শোষণ করার জন্য যারা দায়ী সেইসব শোষকদের অধিকার খর্ব করা হবে। শোষকদের ভোটের অধিকার দেয়া হয় নাই বলে সমালোচনা করা হয়েছে। যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার দাবিও আছে। আমার দেশে ফিরে আসার আগে দেশের লোক তাদের যে মেরে ফেলে নাই সেজন্য তাদের শোকর করা উচিত। আমরা এমন শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবো যেখানে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা থাকবে। সাধারণভাবে যারা দোষী, যারা দালালি করেছে, যারা আমাদের হাজার হাজার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিলিটারির কাছে দিয়ে গুলি করে হত্যা করিয়েছে তাদের আমরা ভাত খাওয়াচ্ছি, অনেককে জেলে ডিভিশন পর্যন্ত

দিয়েছি। আইনের শাসন আমরা মানি। যারা নিরপরাধ তারা নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে। যারা দোষী, যারা জনসাধারণের সাথে শত্রুতা করেছে তাদের তারা নাগরিক অধিকার দিতে চায় না। তাদের নাগরিক অধিকার পাওয়া উচিত নয়, কারণ প্রকাশ্যে গাড়ি দিয়ে, ঘোড়া দিয়ে তারা পাক-মিলিটারিকে সাহায্য করেছে। মানুষকে ধরে, আমাদের ছেলেদের ধরে মিলিটারির কাছে দিয়েছে। নানাভাবে তারা দালালি করেছে। স্পীকার সাহেব, এই এসেমব্লিতে যে চেয়ারে আপনি বসে আছেন তার আশপাশে এবং এই এসেমব্লির এমন কোনো দেয়াল নাই যেখানে আমাদের ছেলেদের রক্তের দাগ ছিল না। এই আইন সভায় সেসব দাগ আমাদের পরিষ্কার করতে হয়েছে। আইন পরিষদ দেশের শ্রেষ্ঠস্থান, সেখানে তারা ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে কত লোককে ধরে ধরে হত্যা করেছে। আপনি দেয়ালের সেইসব দাগ দেখেছেন কিনা জানি না। এই পরিষদে যারা কর্মচারী আছেন তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন এখানকার ঘরে ঘরে, কামরায় কামরায় দেয়ালে রক্তের দাগ। অনেকে নিজে রক্ত দিয়ে দেয়ালের গায়ে 'জয় বাংলা' লিখে গিয়েছে। এই এসেমব্লি হলের মধ্যে তারা দালালদের সাহায্যে বহু মানুষকে ধরে এনে জুলুম করেছে। নিরপরাধ যারা আছে তাদের খালাস দেয়া হবে কিন্তু যারা তাদের সাথে সহেযাগিতা করে গণপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের–যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করছিলেন, তাদের আসন খালি করিয়ে আচকান গায় দিয়ে উপনির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, এহিয়া খানকে সাহায্য করেছেন, তাদেরকে বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার দেয়ারও জনগণ আপত্তি করেছে। জনগণ তাদের বাইরে পেলে কেটে ফেলত, তাদের আমরা জেলের মধ্যে রেখে ভাত খাইয়ে রক্ষা করেছি। যাই হোক, আমরা সংবিধানের সিডিউলে যা রেখেছি তাতে কেউ কেউ বলেছেন যে, পূর্বের শাসনকালের কিছু কিছু আইনকে আমরা প্রটেকশন দিয়েছি। সব দেশেই এটা করা হয়ে থাকে, তা না হলে লিটিগেশন করে সব শেষ করে ফেলবে। দেশের প্রয়োজনেই এগুলোর প্রটেকশন দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কতগুলো আইন পাস করতে হলে আইন সভায় দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির প্রয়োজন হবে, কতগুলো শুধু মেজরিটিতেই পরিবর্তন করা যাবে। এই প্রকার পার্থক্য না রাখলে অসুবিধা হবে।

জনাব স্পীকার সাহেব, আজ এই পরিষদে শাসনতন্ত্র পাস হয়ে যাবে। কবে থেকে এই শাসনতন্ত্র কার্যকরী হবে তা আমাদের ঠিক করতে হবে। আমি মনে করি সেইদিন, যেদিন জল্লাদবাহিনী রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রের মিত্রবাহিনী যুক্ত কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল সেই তারিখে। সেই ঐতিহাসিক ১৬ ডিসেম্বর তারিখ থেকে আমাদের শাসনতন্ত্র কার্যকরী হবে। সেই দিনের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। স্পীকার সাহেব সেই ইতিহাস আমরা স্মরণে রাখতে চাই। আজ আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে, আপনি ১৪

ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিষদ মুলতবি করতে পারেন। ১৪ ডিসেম্বর তারিখে সদস্যরা এসে আপনার সামনে মূল সংবিধানে দস্তখত করবেন। শাসনতন্ত্র বাংলায় হাতে লেখা হচ্ছে তাতে সদস্যরা আপনার সামনে দস্তখত করবেন। ১৪ ও ১৫ তারিখের পর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ তারিখে শাসনতন্ত্র চালু হবে। চালু হবে বাংলার মানুষের নতুন ইতিহাস।

স্পীকার সাহেব, আপনার কাছে আজ আর একটা কথা ঘোষণা করতে চাই। আমি নির্বাচন কমিশনারের সাথে কথা বলেছি, সরকারের সমস্ত সাহায্য তাঁকে দেব, আমি আশা করি তিনি তা গ্রহণ করবেন। আমি উল্লেখ করছি যে, নির্বাচনের তারিখ স্থির করা হোক ঐ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। সেইদিন, যেদিন বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছিলাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই ৭ মার্চ বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হবে। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা সমস্ত সাহায্য করতে চাই এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণ সাহায্য করবে বলে আমি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে এ ব্যাপারে আবেদন করবো।

জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার ধৈর্য আর নষ্ট করতে চাই না। আপনি গত রাত্রে আড়াইটা পর্যন্ত কাজ করেছেন, আমিও কিছু সময় এখানে ছিলাম। আপনাকেসহ পরিষদের সকল কর্মচারীকে তাই ধন্যবাদ জানাই, যারা কষ্টের ভিতর কর্তব্য পালন করেছেন। সেই সাথে সরকারি কর্মচারীদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তারা শ্রদ্ধার সাথে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছেন। আমি যদি সাংবাদিকদের কিছু না বলি তাহলে মহা অন্যায় হবে, তাই শ্রদ্ধার সাথে বলি আপনারা যে এত কষ্ট করেছেন–এত কষ্টের মধ্যে বসেছেন–বসবার জায়গা আপনাদের ভালোভাবে দিতে পারি নাই, এই কষ্টের মধ্যে যে ভালোভাবে পরিষদের কার্য বিবরণীর রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেছেন তার জন্য এই গণপরিষদের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, জানাই মোবারকবাদ। আশা করি ভবিষ্যতে আরো কয়েক বছর কষ্ট স্বীকার করবেন, কারণ নতুন পরিষদ ভবন না নেয়া পর্যন্ত আপনাদের কষ্টের সীমা নাই, আমারও নাই। আর দেশবাসী যখন কষ্ট করছে তার কিছু ভাগ আমাদেরও নেয়া উচিত। জনাব স্পীকার সাহেব, এই কক্ষের পক্ষ থেকে আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। জনাব ডেপুটি স্পীকার সাহেব, আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই, তারপর যারা প্রেসে কাজ করেছেন এবং রাত জেগে শাসনতন্ত্রের জন্য ২/৩ শিফটে কাজ করতে হয়েছে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ দিই ৩৪ জন সদস্যকে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে শাসনতন্ত্র রচনা করেছেন ১১ এপ্রিল তারিখ থেকে। সেই ১১ তারিখে আমরা শাসনতন্ত্র কমিটি গঠন করি তখন দেশবাসীর কাছে

আবেদন করেছিলাম যে, দলমত নির্বিশেষে আপনাদের কাছে যে কোনো প্রস্তাব হোক বা কোনো মতামত থাকলে মেহেরবানী করে কমিশনের কাছে পাঠাবেন। যদিও তা দু-একটা কেউ দিয়েছেন, কিন্তু যারা খবরের কাগজে বিবৃতি দেন, মাঠে বক্তৃতা করেন, তারা একখানাও দেন নাই। অন্য মানুষদের কাছ থেকে, অধ্যাপকদের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি–সেটা সাহায্য করেছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র যারা মানেন না, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' যারা এই ধরনের লোক আছে তারা কষ্ট করে এক কলমও লিখে পাঠান নাই। এটা আমাদের অভ্যাস, এটা স্বাভাবিক! কথায় আছে জাত যায় না ধুলে, খাসলত যায় না মরলে।

জনাব স্পীকার সাহেব, আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আজ আবার স্মরণ করি আমার জীবনের বিপদসমূহের কথা যেসব থেকে আমি উদ্ধার পেয়েছি; কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকে আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন, সে আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে। আজকে আমার দল যে ওয়াদা করেছিল তার এক অংশ পালন করল—কিন্তু জনতার শাসনতন্ত্রে কোনো কিছু লেখা হয় না। তারা এটা গ্রহণ না করলে প্রবর্তন করা হবে না, ব্যবহার না করলে হবে না। ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ গঠন করতে পারে, তাহলে আমার জীবন সার্থক। স্পীকার সাহেব, আজ বিদায় নেয়া হচ্ছে, সদস্যরা আবার সই করতে আসবেন। যারা ৫ বছরের জন্য এখানে এসেছিলেন তারা যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিলেন, যে উদারতা দেখালেন তা বিরল। ভবিষ্যতে যারা এখানে আসবেন তারা যেন উপলব্ধি করেন। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।

(সূত্র : মোনায়েম সরকার সম্পাদিত *বাঙালির কণ্ঠ*, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪০-৩৫৪)

ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়া প্রয়োজন

[১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুই প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দেন।]

জনাব সভাপতি,

আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।

আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সহিত শহীদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবেন। ইহা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকাকালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হইয়াছে।

জনাব সভাপতি,

গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্স অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যের ব্যাপারে আপনাদের মূল্যবান অবদানের কথা আমি স্মরণ করিতেছি।

যাঁহাদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্ব-সমাজে স্থান লাভ করিয়াছে, এই সুযোগে আমি তাঁহাদেরকেও অভিবাদন জানাই। বাংলাদেশের সংগ্রামের সমর্থনদানকারী সকল দেশ ও জনগণের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহতকরণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ও ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বাংলাদেশকে যাঁহারা মূল্যবান সাহায্য দিতেছেন

তাঁহাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। জাতিসংঘ যাঁহারা আমাদের স্বাগত জানাইয়াছেন তাঁহাদেরকে আমি বাংলাদেশের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম হইতেছে সার্বিক অর্থে শান্তি এবং ন্যায়ের সংগ্রাম। আর সেই জন্যই জন্মলগ্ন হইতে বাংলাদেশ বিশ্বের নিপীড়িত জনতার পাশে দাঁড়াইয়া আসিতেছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পরে এই ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, এইসব নীতিমালার বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে কি তীব্র সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইতেছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধার চরম আত্মদানের মাধ্যমে শুধু জাতিসংঘ সনদ স্বীকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পুনরুদ্ধার সম্ভব।

আগ্রাসনের মাধ্যমে বেআইনীভাবে ভূখণ্ড দখল, জনগণের অধিকার হরণের জন্য সেনাবাহিনী ব্যবহার এবং জাতিগত বৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনো অব্যাহত রহিয়াছে। আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ এবং গিনিবিসাউ এই সংগ্রামে বিরাট বিজয় অর্জন করিয়াছে।

চূড়ান্ত বিজয়ের ইতিহাস জনগণ ও ন্যায়ের পক্ষেই যায়। এইসব বিজয় এই কথাই প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বের বহু অংশে এখনো অবিচার ও নিপীড়ন চলিতেছে, অবৈধ দখলকৃত ভূখণ্ড পুরাপুরি মুক্ত করার জন্য আমাদের আরব ভাইদের সংগ্রাম অব্যাহত রহিয়াছে এবং প্যালেস্টাইনী জনগণের বৈধ জাতির অধিকার এখনো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। উপনিবেশ বিলোপ প্রক্রিয়ার যদিও অগ্রগতি হইয়াছে কিন্তু এই প্রক্রিয়া এখনো চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছায় নাই। বিশেষ করিয়া আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই সত্যটি স্পষ্ট করা হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের জিম্বাবুয়ে (দক্ষিণ রোডেশিয়া) এবং নামিবিয়ার জনগণ জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়তার সহিত লড়াই করিয়া যাইতেছে। বর্ণবৈষম্যবাদ, যাহাকে মানবতার বিরোধী বলিয়া বারবার আখ্যায়িত করা হয়েছে তাহা এখনো আমাদের বিবেককে দংশন করা অব্যাহত রাখিয়াছে।

একদিকে অতীতের অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটাইতে হইতেছে, অপরদিকে আমরা আগামী দিনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইতেছি। আজিকার দিনে বিশ্বের জাতিসমূহ কোন পথ বাছিয়া নিবে তাহা লইয়া সংকটে পড়িয়াছে। এই পথ বাছিয়া নেওয়ার বিবেচনার ওপর নির্ভর করিবে আমরা সামগ্রিক ধ্বংসের ভীতি এবং আণবিক যুদ্ধের হুমকি নিয়া এবং ক্ষুধা, বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে মানবিক দুর্গতিকে বিপুলভাবে বাড়াইয়া তুলিয়া আগাইয়া যাইব, না কি আমরা এমন এক বিশ্ব গড়িয়া তোলার পথে আগাইয়া যাইব, যে বিশ্বে

মানুষের সৃজনীলতা এবং আমাদের সময়ের বিজ্ঞান ও কারিগরি অগ্রগতি আণবিক যুদ্ধের হুমকিমুক্ত উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের রূপায়ণ সম্ভব করিয়া তুলিবে এবং যে বিশ্ব কারিগরি বিদ্যা ও সম্পদের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে সুন্দর জীবন গড়িয়া তোলার অবস্থা সৃষ্টি করিবে। যে অর্থনৈতিক উত্তেজনা সম্প্রতি সমগ্র বিশ্বকে নাড়া দিয়াছে তাহা একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া জরুরিভাবে মোকাবিলা করিতে হইবে।

এই বছরের প্রথম দিকে এই পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বর্তমান জটিল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশকে মারাত্মকভাবে আঘাত হানিয়াছে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার ওপর সৃষ্ট বাংলাদেশ পরপর কতিপয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছে। আমরা সর্বশেষে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছি তাহা হইতেছে এই বছরের নজিরবিহীন বন্যা। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সাহায্য করার ব্যাপারে সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করায় আমরা জাতিসংঘ, তার বিভিন্ন সংস্থা ও মহাসচিবের কাছে কৃতজ্ঞ।

আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুতোফ্লিকা বাংলাদেশের সাহায্যে আগাইয়া আসার জন্য জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। মিত্রদেশগুলি এবং বিশ্বের মানবিক সংস্থাসমূহও এ ব্যাপারে সাড়া দিয়াছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিই শুধু ব্যাহত হয়নি, ইহার ফলে দেশে আজ দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন আমাদের মতো দেশগুলিতে দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে হাজার হাজার ডলার শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বার্ষিক মাথাপিছু একশ' ডলারেরও কম আয়ের জনগণ বর্তমানে মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহারা বর্তমান স্তরের চাইতেও তাদের জীবনযাত্রার মান কমাইয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিশ্বখাদ্য সংস্থার বিবেচনায় শুধুমাত্র বাঁচিয়া থাকার জন্য যে সর্বনিম্ন সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহার চাইতেও কম ভোগ করিয়াছে যেসব মানুষ তাহারা আজ অনাহারের মুখে পতিত হইতেছে। দরিদ্র দেশগুলির ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার। শিল্পোন্নত দেশগুলির রফতানি পণ্য, খাদ্য সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যের দরুন তাহা আজ ক্রমশ তাহাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য তাহাদের প্রচেষ্টাও প্রয়োজনীয় উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতার ফলে প্রচণ্ডভাবে বিঘ্নিত

হইতেছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির ফলে ইতঃমধ্যেই দারিদ্র্যও ব্যাপক বেকারত্বের নিষ্পেষণে পতিত দেশগুলি তাহাদের পাঁচ হইতে ছয় শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির হার সংবলিত পরিমিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাঁটাই করতে ভয়ানক আশঙ্কার হুমকিতে পতিত হইয়াছে। এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে কেবল উন্নয়ন প্রকল্পের খরচই বহুগুণ বাড়িয়া যায় নাই, উপরন্তু তাহাদের নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য তাহাদের সামর্থ্যও প্রতিকূলভাবে কমিয়া গিয়াছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিশ্বের জাতিসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে না পারিলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আরো চরমে উঠিবে, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষের সেই দুঃখ-দুর্দশার আর কোনো পূর্ববর্তী নজির পাওয়া যাইবে না। ইহার পাশাপাশি অবশ্য থাকিবে গুটিকয়েক লোকের অপ্রত্যাশিত সুখ-সমৃদ্ধি। শুধুমাত্র মানবিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়িয়া তোলা এবং পারস্পরিক স্বনির্ভরতার স্বীকৃতি এই পরিস্থিতির যুক্তিযুক্ত সমাধান আনিতে পারে এবং এই মহাবিপর্যয় পরিহার করিবার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

একটি যথার্থ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘকে এর আগে কোথাও এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে হয় নাই। এই ধরনের ব্যবস্থায় শুধু নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারকে নিশ্চিত করাই নয়, ইহাতে একটা স্থায়ী এবং যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য বিশ্বের দেশগুলির সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রণয়নেরও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বীকৃত মুক্তভাবে অর্থনৈতিক-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনরুল্লেখ করিতেছি–আন্তর্জাতিক ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

আমরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট শুধুমাত্র শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতার পরিবেশেই সমাধান করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বর্তমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করার জরুরি ব্যবস্থা নিতে হইবে। ইহাতে শুধুমাত্র এই ধরনের পরিবেশই সৃষ্টি হইবে না, ইহাতে অস্ত্রসজ্জার জন্য যে বিপুল সম্পদ অপচয় হইতেছে তাহাও মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করা যাইবে।

বাংলাদেশ প্রথম হইতেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব–এই নীতিমালার ওপর ভিত্তি করিয়া জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কেবল

শান্তিপূর্ণ পরিবেশই কষ্টলব্ধ জাতীয় স্বাধীনতার ফল ভোগ করিতে আমাদের সক্ষম করিয়া তুলিবে এবং সক্ষম করিয়া তুলিবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদ সমাবেশ ও কেন্দ্রীভূত করিতে। এই ধারণা হইতে জন্ম নিয়াছে শান্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। এই জন্য সমঝোতার অগ্রগতি, উত্তেজনা প্রশমন, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা-বিশ্বের যে কোনো অংশে যে কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হউক না কেন, আমরা তাহাকে স্বাগত জানাই। এই নীতির প্রতি অবিচল থাকিয়া আমরা ভারত মহাসাগরীয় এলাকা সম্পর্কে শান্তি এলাকার ধারণা, যাহা এই পরিষদ অনুমোদন করিয়াছে, তাহাকে সমর্থন করি।

আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ এলাকায় পরিণত করার প্রতিও সমর্থন জানাই।

আমরা বিশ্বাস করি যে, সমবেত উন্নয়নশীল দেশসমূহ শান্তির স্বার্থকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগুরু জনগণের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা তাহারা প্রকাশ করিয়াছেন।

মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের নর-নারীর গভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটাইবে এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার প্রমাণের জন্য উপমহাদেশে আপস মীমাংসার পদ্ধতিকে আমরা জোরদার করিয়াছি। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, বাংলাদেশের অভুদ্যয়, বস্তুতপক্ষে এই উপমহাদেশে শান্তির কাঠামো এবং স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবদান সৃষ্টি করিবে। ইহা ছাড়া আমাদের জনগণের মঙ্গলের স্বার্থেই অতীতের সংঘর্ষ ও বিরোধিতার পরিবর্তে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ও নেপালের সঙ্গে শুধুমাত্র সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করি নাই, অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলিয়া গিয়া পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক করিয়া নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছি।

পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোনো উদ্যোগ বাদ দেই নাই এবং সবশেষে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমরা চূড়ান্ত অবদান রাখিয়াছি। ঐ সকল যুদ্ধবন্দীর মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে। ইহা হইতেছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ

শান্তি ও স্থায়িত্ব গড়িয়া তোলার পথে আমাদের অবদান। এই কাজ করিতে গিয়া আমরা কোনো পূর্বশর্ত আরোপ অথবা কোনো দর কষাকষি করি নাই। আমরা কেবল আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কল্পনায় প্রভাবিত হইয়াছি।

তেষট্টি হাজার পাকিস্তানি পরিবারের অবস্থা এখনো মানবিক সমস্যারূপে রহিয়া গিয়াছে। তাহারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছে এবং নিজ দেশে ফিরিবার জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির কাছে নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছে। যে দেশের প্রতি তাহারা আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছে সেই দেশে তাহাদের যাইবার অধিকার আছে। আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারেই এই অধিকার তাহাদের ওপর বর্তাইয়াছে। এই মানবিক সমস্যার অবিলম্বে সমাধান প্রয়োজন।

আরো একটি জরুরি সমস্যা হইল সাবেক পাকিস্তানের পরিসম্পদ বণ্টন। পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত রহিয়াছে। আমরা আশা করি, উপমহাদেশের জনগণের কল্যাণের স্বার্থে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এইসব অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান হইবে, যাহাতে স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া সফল হইতে পারে।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী সকল দেশের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখিবে। আমাদের অঞ্চলে এবং বিশ্বশান্তির অন্বেষায় সকল উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকিবে।

জাতিসংঘ অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহার পঁচিশ বছরের কার্যকালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানবিক অগ্রগতির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছে। এক কথায় বলা যায়, বিরোধ ও মানবিক দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও জাতিসংঘ ভাবীকালের দিকে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সমুজ্জ্বল রাখিয়াছে। বিশ্ব সংস্থার সুনির্দিষ্ট সাফল্য ও সম্ভাবনাময় দিক সম্পর্কে বাংলাদেশ যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছে এমনটি আর কেউ করে নাই। ড. কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব এবং তাঁর নিবেদিত প্রাণ সহকর্মীদের জন্যই বাংলাদেশে যুদ্ধের দাগ মুছিয়া ফেলিতে, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে এবং ভারত হইতে ফিরিয়া আসা এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসিত করিতে জাতিসংঘ আমাদের দেশে ব্যাপক সাহায্য ও পূনর্গঠন কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছিল। এইসব শরণার্থী মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নিয়াছিল। জাতিসংঘের মহাসচিব, তাঁর সহকর্মী এবং বিভিন্ন মানবিক সংস্থা যাহারা আমাদের দেশে বিরাট কর্মসূচিতে অংশ নিয়াছিল, তাহাদেরকে

বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমরা বিশ্বাস করি, জাতিসংঘের গঠনমূলক নেতৃত্বে উপমহাদেশের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানে সহায়ক হইবে। আমি আগেই বলিয়াছি, সাম্প্রতিক বিপর্যয়কারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে জাতিসংঘের প্রয়াসে আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়িয়াছে। বাংলাদেশ বিশেষ অসুবিধার জন্য এমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই, যাহার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাইয়া আসিতে পারে। জাতিসংঘ দুর্যোগ ত্রাণ সমন্বয় অফিস স্থাপন করিয়াছে। এই ব্যাপারে স্বল্প হইলেও ইহা একটি দৃষ্টান্ত সূচনা করিয়াছে। লক্ষ্য পূরণে উদ্যোগ সমন্বিত করার ব্যাপারে তাই জাতিসংঘের সদস্যদের একটি বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে।

জনাব সভাপতি,

মানুষের অজেয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের অসম্ভবকে জয় করার ক্ষমতা এবং অজেয়কে জয় করার শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখিয়া আমি আমার বক্তৃতা শেষ করিতে চাই। আমাদের মতো যেইসব দেশ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এই বিশ্বাস তাহাদের দৃঢ়। আমরা দুঃখ ভোগ করিতে পারি, কিন্তু মরিব না। টিকিয়া থাকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে জনগণের দৃঢ়তাই চরম শক্তি–আমাদের লক্ষ্য স্ব-নির্ভরতা। আমাদের পথ হইতেছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির ওপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে। আর লক্ষ্য পূরণ এবং সুন্দর ভাবীকালের জন্য আমাদের নিজেদের গড়িয়া তুলিবার জন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা আগাইয়া যাইব।

(সূত্র : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭-৩৮৮)



পরিশিষ্ট ৪

একুশ দফা (১৯৫৪)

ছয় দফা (১৯৬৬)

এগারো দফা (১৯৬৯)

ঐতিহাসিক একুশ দফা (১৯৫৪)

নীতি : কোরান ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩. পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির-শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর করিয়া কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসনব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসঙ্গত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীত ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারীর ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ

লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করত বিনা বিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলাভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া ইহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্ব দান করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করত, পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার-বাহিনীকে স্বতন্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয়মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিনমাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পরপর তিনটি নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদ্যাতগ করিবেন।

সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৭৪, (১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে যুক্তফ্রন্ট প্রচার দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত)

বাঙালির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা (১৯৬৬)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তিসনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন।

লাহোর, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

১. শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমন হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং এর ভিত্তিতে হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারি ধরনের। আইন পরিষদের (Legislatures) ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে–যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

৩. মুদ্রা বা অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুটির যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে :

ক. সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। অথবা

খ. বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবল একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভেরও পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

৪. রাজস্ব, কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলির সবরকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

৫. বৈদেশিক বাণিজ্যবিষয়ক ক্ষমতা

ক. ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

খ. বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকবে।

গ. কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মেটাবে।

ঘ. অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না।

ঙ. শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

৬. আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্র অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

[সূত্র : *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যালবাম*, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত, ধানমণ্ডি, ঢাকা, পৃ. ৫৪]

ঐতিহাসিক ১১ দফা (১৯৬৯)

স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘদিনের অনুসৃত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলেই ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শাসনে-শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্র-জনতা ছাত্র-গণ-আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন।

আমরা ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত ১১ দফার দাবিতে ব্যাপক ছাত্র-গণআন্দোলনের আহ্বান জানাইতেছি :

১. ক. সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হবে।

খ. শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরি

শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

গ. প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আই এ, আই এস সি, আই কম ও বি এ, বি এস সি, বি কম, এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহ নৈশ এম এ ও এম কম ক্লাস চালু করিতে হইবে।

ঘ. ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং অত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

ঙ. হল, হোস্টেলের ডাইনিং ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসেবে প্রদান করিতে হইবে।

চ. হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

ছ. মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

জ. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাইতে হইবে।

ঝ. মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইতে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবি মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

ঞ. প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষ বর্ষেও ক্লাস দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

ট. পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনভেন্স কোর্সের' সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনালে পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

ঠ. টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবি অবিলম্বে মানিয়া লইতে হবে। আই. ই. আর. ছাত্রদের দশ-দফা, সমাজকল্যাণ ছাত্রদের, এমবিএ ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবি মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা 'ফ্যাকাল্টি' করিতে হইবে।

ড. কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

ঢ. ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কন্সেসনে' টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকেটেও এই 'কন্সেসন' দিতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মতো বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোনো স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতের শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে। ছাত্রদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ও আধা-সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে।

ণ. চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

ত. কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

থ. শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের

স্বাধীনতা দিতে হইবে। *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩. নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে :

ক. দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

খ. ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

গ. দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

ঘ. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোনো কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

ঙ. ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলিবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানি করিবার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

চ. পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করিতে হইবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে সাব ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫. ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোটবহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

সংগ্রামী ছাত্র-সমাজের পক্ষে

আবদুর রউফ খালেদ
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

সাইফুদ্দিন আহমেদ
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

সামসুদ্দোহা
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

মোস্তফা জামাল হায়দার
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

দীপা দত্ত
সহ-সম্পাদিকা
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

তোফায়েল আহমেদ
সহ-সভাপতি
ডাকসু

নাজিম কামরান চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
ডাকসু

সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৫-৪০৮, (১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত এগারো দফার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান সংবলিত সংগ্রামী ছাত্র-সমাজের প্রচারপত্র)



পরিশিষ্ট ৫

স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র

১০ এপ্রিল, ১৯৭১
মুজিবনগর বাংলাদেশ

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
তারিখ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু বাংলাদেশে ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ হইতে ১৭ জানুয়ারি ১০৭১ পর্যন্ত সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জনের মধ্যে ১৬৭ জনপ্রিতিনিধি নির্বাচিত করেন যাঁহারা আওয়ামী লীগের সদস্য,

এবং

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি সংবিধান প্রণয়নের নিমিত্তে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকে মিলিত হওয়ার জন্য ১৯৭১ সালে ৩ মার্চ আমন্ত্রণ জানান,

এবং

যেহেতু সেমত আহূত সভাটি অযৌক্তিক ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু তাহাদের অঙ্গীকার পালন করিবার বদলে এবং সেই সময়ে তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিদের সহিত

আলোচনায় রত থাকিয়াও, পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ একটি অনৈতিক ও বিশ্বাসহন্তা যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এহেন বিশ্বাসহন্তা আচরণের ঘটনায় ও পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের বৈধ অধিকার পূরণের জন্য ঢাকায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার একটি যথোচিত ঘোষণা দেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন,

এবং

যেহেতু নৃশংস ও অসভ্য যুদ্ধাচরণ দ্বারা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বহু সংখ্যক গণহত্যা ও নজিরবিহীন যন্ত্রণাদায়ক নিপীড়নের কার্যসমূহ করিয়াছে এবং অন্যদের মধ্যে বেসামরিক ও নিরস্ত্র বাংলাদেশের জনগণের উপর এখনো করিতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া গণহত্যা করিয়া এবং অন্য পীড়নমূলক পদক্ষেপসমূহ দ্বারা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে সম্মিলিত হওয়া ও একটি সংবিধান প্রণয়ন করা এবং নিজেদেরকে একটি সরকার প্রদান করা অসম্ভব করিয়া ফেলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী ঐকান্তিকতা দ্বারা বাংলাদেশের এলাকায় কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,

জনগণ কর্তৃক আমাদের উপরে অর্পিত নির্দেশের প্রতি, যাহাদের নির্দেশই চূড়ান্ত, সশ্রদ্ধ অনুগত থাকায় আমরা বাংদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আমাদের নিজেদেরকে লইয়া যথাযথভাবে সংবিধান রচনার গণপরিষদ গঠন করিলাম,

এবং

পারস্পরিক পরামর্শ করিবার পর,

এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে,

ঘোষণা দিতেছি ও প্রতিষ্ঠা করিতেছি যে, বাংলাদেশ হইবে সার্বভৌম জনগণের প্রজাতন্ত্র এবং এতদ্বারা ইতঃপূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাকে নিশ্চিত করিতেছি,

এবং

এতদ্বারা নিশ্চিত করিতেছি ও সিদ্ধান্ত লইতেছি যে, সংবিধান যে-সময় পর্যন্ত প্রণীত না হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপরাষ্ট্রপতি থাকিবেন,

এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

(রাষ্ট্রপতি) ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী ও যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করেন সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা তাহার থাকিবে, কর ধার্য ও আদায় করিবার এবং অর্থসমূহ ব্যয় করিবার ক্ষমতা থাকিবে,

গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতবি করার ক্ষমতা থাকিবে,

বাংলাদেশের জনগণকে একটি সুশৃঙ্খল ও ন্যায়ানুগ সরকার দিবার জন্য যেরূপ প্রয়োজন হইবে সেমত কার্য করিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি আরো সিদ্ধান্ত লইতেছি, যদি এমন ঘটে যে রাষ্ট্রপতি নাই কিংবা রাষ্ট্রপতি তাহার পদে যোগদান করিতে অসমর্থ কিংবা যে কোনো কারণে হউক তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগে তিনি অসমর্থ তখন এতদ্বারা রাষ্ট্রপতিকে প্রদত্ত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপরাষ্ট্রপতি পাইবেন ও প্রয়োগ করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি, জাতিসমূহের পরিবারভুক্ত একজন সদস্য হিসাবে আমাদের উপর অর্পিত সকল কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা মানিবার ও বলবৎ করিবার অঙ্গীকার করিতেছি এবং জাতিসংঘের সনদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবারও;

আমরা আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে;

আমরা আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি, এই দলিল কার্যকর করার জন্য আমরা রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে তাহাদের পদের শপথ দেওয়ার জন্য অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ নিয়োগ ক্ষমতাবলে নিয়োগ করিলাম।

* ইংরেজি ভাষায় লিখিত ও পঠিত মূল ঘোষণাপত্রের বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী কৃত অনুবাদ। (বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী রচিত, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সহজ পাঠ*, সমুন্নয়, ২০০৮, পৃ. ১৫)

THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE

Mujibngar, Bangladesh, Dated 10th of April, 1971

Whereas free the elections were held in Bangladesh from 7th December 1970 to 17th January 1971, elect representatives for the purpose of framing a Constitution,

AND

Whereas at these elections the people of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League,

AND

Whereas General Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to met on the 3rd March 1971, for the purpose of framing a Constitution.

AND

Whereas the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponded for indefinite peirod,

AND

Whereas instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangladesh, Pakistan authorities declared an unjust and tracherous war,

AND

Whereas in the facts and circumstances of such teacherous conduct Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of the 75 million people of Bangladesh, in the fulfilment of the legitimate right of self-determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971 and urged the people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh,

AND

Whereas in the conduct of a ruthless and savage war the Pakistan authorities committed and are still continuously committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed people of Bangladesh,

AND

Wheras the Government by levying and unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constutiton and give to themselves a Government,

AND

Whereas the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangladesh,

We, the elected representatives of the Bangladesh, as honour-bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme, duly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and having held mutual consultations, and

in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignify and social justice,

declare and constitute Bangladesh to be Sovereign People's Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman, and

do hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice-President of the Republic, and that the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic,

shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon, shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers

necessary, shall have the power to levy taxes and expend monies,

shall have the power to summon and adjuorn the Constituent Assembly, and do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh and orderly and just Government.

We, the elected representatives of the People of Bangladesh, do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers and duties due to any resason whatsoever, the Vice-President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President.

We further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations that devolve upon us as a member of the the family of nations and under the Charter of United Nations.

We further resolve that this proclamation of independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971;

We further resolve that in order to give effect to this instrument we appoint Prof. Yusuf Ali our duly Constituted Potentiary and to give to the President and the Vice-President oaths of office.

(দ্র. *জাতির জনক* অ্যালবাম, পৃ. ১০২-১০৩)



পরিশিষ্ট ৬

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু কবিতা

বঙ্গ-বন্ধু

জসীম উদ্‌দীন

মুজিবর রহমান!
ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান।
বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে
জ্বালায় জ্বলিছে মহা-কালানল ঝঞ্ঝা-অশনি বেয়ে।
বিগত দিনের যত অন্যায় অবিচার ভরা-মার,
হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে সহ্যের অঙ্গার;
দিনে দিনে হয়ে বর্ধিত স্ফীত শত মজলুম বুকে,
দগ্ধিত হয়ে শত লেলিহান ছিল প্রকাশের মুখে;
তাহাই যেন বা প্রমূর্ত হয়ে জ্বলন্ত শিখা ধরি
ওই নামে আজ অশনি দাপটে ফিরিছে ধরণী ভরি।

মুজিবর রহমান!
তব অশ্বেরে মোদের রক্তে করায়েছি পূত-স্নান!
পীড়িত-জনের নিশ্বাস তারে দিয়েছে চলার গতি,
বুলেটে নিহত শহীদেররা তার অঙ্গে দিয়েছে জ্যোতি।
দুর্ভিক্ষের দানব তাহারে দেছে অদম্য বল,
জঠরে জঠরে অনাহার-জ্বালা করে তারে চঞ্চল।
শত ক্ষতে লেখা অমর কাব্য হাসপাতালের ঘরে,
মুহুর্মুহু যে ধ্বনিত হইছে তোমার পথের পরে।
মায়ের বুকের ভায়ের বুকের বোনের বুকের জ্বালা,
তব সম্মুখ পথে পথে আজ দেখায়ে চলিছে আলা।
জীবন দানের প্রতিজ্ঞা লয়ে লক্ষ সেনানী পাছে,
তোমার হুকুম তামিলের লাগি সাথে তব চলিয়াছে।

রাজভয় আর কারাশৃঙ্খল হেলায় করেছ জয়,
ফাঁসির মঞ্চে—মহত্ব তব তখনো হয়নি ক্ষয়।
বাংলাদেশের মুকুটবিহীন তুমি প্রমূর্ত রাজ,
প্রতি বাঙালির হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার তক্ত-তাজ।
তোমার একটি আঙুল হেলনে অচল যে সরকার
অফিসে অফিসে তালা লেগে গেছে—স্তব্ধ হুকুমদার।
এই বাংলায় শুনেছি আমরা সকল করিয়া ত্যাগ,
সন্ন্যাসী বেশে দেশ-বন্ধুর শান্ত-মধুর ডাক।

শুনেছি আমরা গান্ধীর বাণী—জীবন করিয়া দান,
মিলাতে পারেনি প্রেম-বন্ধনে হিন্দু-মুসলমান
তারা যা পারেনি তুমি তা করেছ, ধর্মে ধর্মে আর,
জাতিতে জাতিতে ভুলিয়াছে ভেদ সন্তান বাংলার।
তোমার হুকুমে রেল-জাহাজের চাকা যে চলেনি আর,
হাইকোর্টের বন্ধ-দরজা খুলিবে সাধ্য কার!

সেনাবাহিনীর অশ্বে চড়িয়া দম্ভ-স্ফীত ত্রাস,
কামান গোলার বুলেটের জোরে হানে বিষাক্ত শ্বাস।
তোমার হুকুমে তুচ্ছ করিয়া শাসন ত্রাসন ভয়,
আমরা বাঙালি মৃত্যুর পথে চলেছি আনিতে জয়।

ধন্য এ কবি ধন্য এ যুগে রয়েছে জীবন লয়ে,
সম্মুখে তার মহাগৌরবে ইতিহাস চলে বয়ে।
ভুলিব না সেই মহিমার দিন, ভাষার আন্দোলনে;
বুলেটের ভয় তুচ্ছ করিয়া ছেলেরা দাঁড়াল রণে।
বরকত আর জব্বার আর সালাম পথের মাঝে,
পড়ে বলে গেল, "আমরা চলিনু ভাইরা আসিও পাছে।"
উত্তর তার দিয়েছে বাঙালি, জানুয়ারি সত্তরে,
ঘরের বাহির হইল ছেলেরা বুলেটের মহা-ঝড়ে!
পথে পথে তারা লিখিল লেখন বুকের রক্ত দিয়ে,
লক্ষ লক্ষ ছুটিল বাঙালি সেই বাণী ফুকারিয়ে।
মরিবার সে কি উন্মাদনা যে, ভয় পালাইল ভয়ে,
পাগলের মত ছোটে নর-নারী মৃত্যুরে হাতে লয়ে।

আরো একদিন ধন্য হইনু সে মহাদৃশ্য হেরি,
দিকে দিগন্তে বাজিল যেদিন বাঙালির জয়ভেরী।
মহাহুঙ্কারে কংস-কারার ভাঙিয়া পাষাণ দ্বার,
বঙ্গ-বন্ধু শেখ মুজিবেরে করিয়া আনিল বার।

আরো একদিন ধন্য হইব, ধন-ধান্যতে ভরা,
জ্ঞানে-গরিমায় হাসিবে এদেশ সীমিত বসুন্ধরা।
মাঠের পাত্রে ফসলেরা আসি ঋতুর বসনে শোভি,
বরণে সুবাসে আঁকিয়া যাইবে নকশী-কাঁথার ছবি।
মানুষে মানুষে রহিবেনা ভেদ, সকলে সকলে সকলকার,
এক সাথে ভাগ করিয়া খাইবে সম্পদ যত মার।
পদ্মা মেঘনা যমুনা নদীর রূপালীর তার পরে,
পরাণ ভুলানো ভাটিয়ালী সুর বাজিবে বিশ্বভরে।
আম-কাঁঠালের ছায়ায় শীতল কুটিরগুলির তলে,
সুখ যে আসিয়া গড়াগড়ি করি খেলাইবে কৌতূহলে।

আরো একদিন ধন্য হইবে চির-নির্ভীকভাবে,
আমাদের জাতি নেতার পাগড়ি ধরিয়া জবাব চাবে,
"কোন অধিকারে জাতির স্বার্থ করিয়াছে বিক্রয়?"
আমার এদেশ হয় যেন সদা সেইরূপ নির্ভয়।

[ঢাকা, ১৬ মার্চ ১৯৭১]

ডাকিছে তোমারে

সুফিয়া কামাল

এই বাংলার আকাশ বাতাস, সাগর গিরি ও নদী
ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু? ফিরিয়া আসিতে যদি
হেরিতে এখনো মানব হৃদয়ে তোমার আসন পাতা
এখনও মানুষ স্মরিছে তোমারে, মাতা-পিতা বোন ভ্রাতা।

যত অসহায় অক্ষম আর উপেক্ষিতরা সব
করুণ নয়নে হেরিছে এ দেশে বিলাসের উৎসব

শূন্য উদরে সুরম্য পথে চলিতে চলিতে তারা
ভাবিছে তোমার এ দেশে আবার আসিয়া বসিল কারা?

তোমার জীবন যৌবন ভরি সুদীর্ঘ কারাবাস
মুক্ত করিল, স্বাধীন করিল মুক্তির নিশ্বাস
ত্যাজিয়া মানুষ বাংলার মাটি বাংলার এ বাতাসে
তোমারই দেওয়া মুক্তির বাণী জীবনের আশ্বাসে
গাহিয়া উঠিল গান
তোমার বিহনে ব্যাহত হয়েছে লক্ষ মানব প্রাণ।

বাংলার গান, বাংলার ধান, বাঙালির খাদ্য কণা
লুট হয়ে যায়, বিনিময়ে তার আসিয়াছে নকল সোনা,
জাহাজ আসিছে, আসে সম্ভার যত মেকি ঝলমল
সোনা চলে যায় সাগরের পারে, আবার গৃধ্নুদল
বাংলার বুকে হানা দিয়ে আসে, তোমার বজ্র স্বরে
সেই মুষিকেরা লুকাইয়াছিল অন্ধ গুহার ঘরে
তারা আসে আজ, তোমার আওয়াজ ধ্বনিবে না আরবার
যত বেঈমান এই বাংলারে করেছিল ছারখার
দিবস রাতে দস্যুর দল হানা দিয়ে ঘরে ঘরে
নিত্যই দেখি এখানে সেখানে মৃতদেহ আছে পড়ে
তোমার শোণিতে রাঙানো এ মাটি কাঁদিতেছে নিরবধি
তাই তো তোমারে ডাকে বাংলার কানন গিরি ও নদী।

ইলেকট্রার গান

শামসুর রাহমান

শ্রাবণের মেঘ আকাশে আকাশে জটলা পাকায়
মেঘময়তায় ঘনঘন আজ একি বিদ্যুৎ জ্বলে।
মিত্র কোথাও আশেপাশে নেই, শান্তি উধাও;
নির্দয় স্মৃতি মিতালি পাতায় শত করোটির সাথে।

নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, করবে শায়িত আজ।

সে কবে আমিও স্বপ্নের বনে তুলেছি গোলাপ,
শুনেছি কত যে প্রহরে প্রহরে বনদোয়েলের ডাক।
অবুঝ সে মেয়ে ক্রাইসোথেমিস্ আমার সঙ্গে
মেতেছে খেলায়, কখনো আমার বেণিতে দিয়েছে টান।

নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

পিতৃভবনে শুনেছি অনেক চারণের গাথা,
লায়ারের তারে হৃদয় বেজেছে সুদূর মদির সুরে।
একদা এখানে কত বিদুষক প্রসাদ কুড়িয়ে
হয়েছে ধন্য, প্রধান কক্ষ ফুলে ফুলে গেছে ছেয়ে।

নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

প্রজাপতি খুশি ফেরারী এখন, বিষাদ আমাকে
করেছে দখল; কেমন বিরূপ কুয়াশা রেখেছে ঘিরে।
রক্তের ডাকে দিশেহারা আমি ঘুরি এলোমেলো,
আমার রাতের শয্যায় শুধু কান্নার স্বাক্ষর।

নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

সেইদিন আজো জ্বলজ্বলে স্মৃতি, যেদিন মহান
বিজয়ী সে বীর দূর দেশ থেকে স্বদেশে এলেন ফিরে।
শুনেছি সেদিন জয়ঢাক আর জন-উল্লাস;
পথে-প্রান্তরে তাঁরই কীর্তন, তিনিই মুক্তিদূত।

নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

নন্দিত সেই নায়ক অমোঘ নিয়তির টানে
গরীয়ান এক প্রাসাদের মতো বিপুল গেলে ধসে।
বিদেশী মাটিতে ঝরেনি রক্ত; নিজ বাসভূমে,
নিজ বাসগৃহে নিরস্ত্র তাঁকে সহসা হেনেছে ওরা।

নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

আড়ালে বিলাপ করি একা একা, ক্ষুতার্ত পিতা
তোমার জন্য প্রকাশ্যে শোক করাটাও অপরাধ।
এমন কি, হায়, আমার সকল স্বপ্নেও তুমি
নিষিদ্ধ আজ; তোমার দুহিতা একি গুরুভার বয়!

আরও বেড়েছে। কিন্তু পরিবার, বিশেষ করে, স্ত্রী রেনুকে জানানো যাবে না। তারা দুশ্চিন্তা করবেন।

ইত্তেফাক ও তার মালিক-সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে নিয়ে তাঁর চিন্তার শেষ নেই। *ইত্তেফাক* তাঁর এবং তাঁর দলের কথা বলত। মানিক মিয়া বঙ্গবন্ধুর বড়ভাইয়ের মতো। তাই ইত্তেফাকের ওপর সরকারের চাপাচাপিতে তিনি খুবই বিক্ষুব্ধ। বন্ধু শহীদুল্লাহ্ কায়সারের *সংশপ্তক* বইটি পড়ে তাঁর খুব ভালো লেগেছে। ঐ বই পড়তে পড়তেই লিখেছেন, 'বেপরোয়া গ্রেফতারের পরেও ভেঙে পড়ে নাই দেখে ভালোই লাগছে। রাজনৈতিক কর্মীদের জেল খাটতে কষ্ট হয় না যদি বাইরে আন্দোলন থাকে।' রাজনীতি আর জীবন এভাবেই এক 'অর্গানিক' সম্বন্ধে বাঁধা পড়ে যায় সন্ধ্যেবেলা তাঁর ঘর বন্ধ করে দেয়। পরের দিন পাশেই রাখা পাগলদের গোসল করানোর কথা লিখেছেন। পাগলদের সাথে যে নিষ্ঠুর আচরণ করা হয় তাতে তিনি খুবই আহত। যদিও পাগলদের চিৎকারে প্রায়ই তিনি ঘুমুতে পারেন না, তবু তাদের জন্য রয়েছে তাঁর দরদি মন। সুযোগ পেলেই তাদের সাথে কথা বলেন, তাদের জন্য কিছু করতে চেষ্টা করেন। খাবার পাঠান।

৬ জুনে ডায়েরির পাতায় তিনি লিখেছেন, 'আগামীকাল ধর্মঘট। পূর্ববাংলায় জনগণকে আমি জানি, হরতাল তারা করবে। রাজবন্দীদের মুক্তি তারা চাইবে। ছয় দফা সমর্থন করবে।' মানুষের সমর্থন তাঁর প্রতি রয়েছে বলেই তিনি এই নিঃসঙ্গ জেলজীবন হাসিমুখেই বরণ করে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর মনের অবস্থা বোঝাতে এভাবে লিখেছেন, 'আমি একা থাকি, আমার সাথে কাউকে মিশতে দেওয়া হয় না। একাকী সময় কাটানো যে কত কষ্টকর তাহা যাহারা ভুক্তভোগী নন বুঝতে পারবেন না। আমার নিজের উপর বিশ্বাস আছে, সহ্য করার শক্তি খোদা আমাকে দিয়েছেন। ভাবি শুধু আমার সহকর্মীদের কথা। এক একজনকে আলাদা আলাদা জেলে নিয়ে কিভাবে রেখেছে? ত্যাগ বৃথা যাবে না, যায় নাই কোনো দিন। নিজে ভোগ নাও করতে পারি, দেখে নাও যেতে পারি, তবে ভবিষ্যৎ বংশধররা আজাদি ভোগ করতে পারবে। ... জয়ী আমরা হবই। ত্যাগের মাধ্যমে আদর্শের জয় হয়।' ভয়কে জয় করার জন্যই কবিগুরুর কাছে ফিরে যেতেন। গুনগুনিয়ে উঠতেন, 'বিপদে মোরে রক্ষা করো/এ নহে মোর প্রার্থনা,/বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

এর পরের দিন ৭ জুন। হরতালের দিন। বাইরে কী হচ্ছে কে জানে। সর্বক্ষণ ছটফট করছেন তিনি। লিখেছেন, 'বন্দী আমি, জনগণের মঙ্গল কামনা ছাড়া আর কি করতে পারি! ... গুলি ও মৃত্যুর খবর পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। শুধু পাইপই টানছি। ...কি হবে? কি হতেছে? দেশকে এরা কোথায় নিয়ে

করতলে কত গোলাপ শুকায়, ঝরে জুঁই বেলী;
আমার হৃদয়ে প্রতিশোধ জ্বলে রক্তজবার মতো।

নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

পারবো না আমি হানতে কখনো ক্রুর তরবারি,
যদিও ক্ষুব্ধ হৃদয় আমার, প্রতিশোধ জপমালা।
আত্মশুদ্ধি ঘটে যায় যদি দেখি সন্ধ্যায়
উড়ন্ত দু'টি সারস কী সুখে নদীটি পেরিয়ে যায়।

নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

যে যেমন খুশি যখন তখন বাজারে আমাকে
নানা ঘটনায় ষড়জে ষড়জে নিখাদে, আমি কি তেমন বাঁশি;
কণ্টকময় রক্তপিপাসু পথে হাঁটি একা;
আমার গ্রীবায় এবং কণ্ঠে আগামীর নিশ্বাস।

নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

পুনশ্চ মুজিবকথা

নির্মলেন্দু গুণ

সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় আকাশের চাঁদ
যেরকম গ্রহণগ্রস্ত মানুষের দৃষ্টিকে দখল করে, তিনিও ঠিক
তেমনি, এই বঙ্গীয় বদ্বীপবাসীর দৃষ্টিকে দখল করেছিলেন;
আর নিজেকে পরিণত করেছিলেন জন্মভূমির নয়নমণিতে।

সূর্যমুখী যেমন সর্বদা সূর্যের দিকে স্থির করে রাখে তার মুখ,
অথবা প্রথম প্রেমে-পড়া তরুণ প্রেমিক তার প্রেমিকা-বিগ্রহে
যেরকম অপলক চোখে মগ্ন রহে,—তিনিও ঠিক ঐ রকমই
তাঁর জন্মভূমির রুগ্ণ-পাণ্ডুর মুখের ভিতরে তাকিয়ে ছিলেন।

তিনি বাংলার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন জীবনানন্দবৎ,
তিনি এই ভূখণ্ডবাসীর মুখে তাকিয়ে ছিলেন নজরুলবৎ।

তাই তার চোখে ধরা পড়েছিল রূপসী বাংলার স্নিগ্ধ মুখশ্রী,
তাই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল—'আমার সোনার বাংলা',
তাই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল মুক্তি-স্বপ্ন, প্রিয় স্বাধীনতা।

তিনি তাঁর দেশকে ভালোবেসেছিলেন হো চি মিনের মতো,
তিনি তাঁর জন্মভূমিকে ভালোবেসেছিলেন লেনিনের মতো,
তাই বন্দী ভূখণ্ডবাসীর অশ্রুতে দ্রব হয়েছিল তাঁর হৃদয়।
তাই তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি-বিস্ফোরণে দ্রুত খসে পড়েছিল
ধর্মের ঘোমটার আড়ালে আচ্ছাদিত ছদ্মস্বাধীনতার মুখোশ।
তাই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল জন্মভূমির কলোনিকালিমা।

তাঁর দেশপ্রেম ছিল প্রশ্নাতীত, তিনি ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন,
তাঁর জাগতিক অস্তিত্বই ছিল স্বাধীনতার অনন্ত ঘোষণা।

আমার পরিচয়

সৈয়দ শামসুল হক

আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে, হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে, 'কোথা থেকে তুমি এলে?'

আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে।
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে।
আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলা থেকে।

এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার থেকে।
এসেছি বাঙালি জোড়বাংলার মন্দির বেদি থেকে।
এসেছি বাঙালি বরেন্দ্রভূমে সোনা মসজিদ থেকে।
এসেছি বাঙালি আউল বাউল মাটির দেউল থেকে।

আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারোভূঁইয়ার থেকে।
আমি তো এসেছি 'কমলার দীঘি' 'মহুয়ার পালা' থেকে।
আমি তো এসেছি তিতুমীর আর হাজী শরীয়ত থেকে।
আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণার থেকে।

এসেছি বাঙালি ক্ষুধিরাম আর সূর্যসেনের থেকে।
এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন্ ঠাকুর থেকে।
এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে।
এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে।

আমি যে এসেছি জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে।
আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।
এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণচিহ্ন ফেলে।
শুধাও আমাকে, 'এতদূর তুমি কোন্ প্রেরণায় এলে?'

তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির ইতিহাস শোনো নাই–
'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'
একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজও একসাথে থাকবোই
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবোই।

পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের–
কখনোই ভয় করি নাকো আমি উদ্যত কোনো খড়্গের।
শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস,
অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ;
একই হাসিমুখে বাজিয়েছি বাঁশি, গলায় পরেছি ফাঁস;
আপোষ করিনি কখনোই আমি এই হলো ইতিহাস।

এই ইতিহাস ভুলে যাব আজ, আমি কি তেমন সন্তান?
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান,
তারই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি–
চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি।

আমি কি বলতে পেরেছিলাম

মহাদেব সাহা

আমার টেবিলের সামনে দেয়ালে শেখ মুজিবের
একটি ছবি টাঙানো আছে
কোনো তেলরং কিংবা বিখ্যাত স্কেচ জাতীয় কিছু নয়
এই সাধারণ ছবিখানা ১৭ই মার্চ এ-বছর শেখ মুজিবের
জন্মদিনে একজন মুজিবপ্রেমিক আমাকে উপহার দিয়েছিলো
কিন্তু কে জানত এই ছবিখানি হঠাৎ দেয়াল ব্যেপে
একগুচ্ছ পত্রপুষ্পের মতো আমাদের ঘরময়
প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে সেদিন রাত্রিবেলা!
আমি তখন টেবিলের সামনে বসেছিলাম আমার স্ত্রী ও সন্তান
পাশেই নিদ্রামগ্ন
সহসা দেখি আমার ছোট্ট ঘরখানির দীর্ঘ দেয়াল জুড়ে
দাঁড়িয়ে আছেন শেখ মুজিব;
গায়ে বাংলাদেশের মাটির ছোপ লাগানো পাঞ্জাবি
হাতে সেই অভ্যস্ত পুরোনো পাইপ
চোখে বাংলার জন্য সজল ব্যাকুলতা
এমনকি আকাশকেও আমি কখনো এমন গভীর ও জলভারানত
দেখিনি।
তার পায়ের কাছে বয়ে যাচ্ছে বিশাল বঙ্গোপসাগর
আর তার আলুথালু চুলগুলির দিকে তাকিয়ে
আমার মনে হচ্ছিলো
এই তো বাংলার ঝোড়ো হাওয়ায় কাঁপা দামাল নিসর্গ
চিরকাল তার চুলগুলির মতোই অনিশ্চিত ও কম্পিত
এই বাংলার ভবিষ্যৎ!
তিনি তখনো নীরবে তাকিয়ে আছেন, চোখদুটি স্থির অবিচল
জানি না কী বলতে চান তিনি,
হঠাৎ সারা দেয়াল ও ঘর একবার কেঁপে উঠতেই দেখি
আমাদের সঙ্কীর্ণ ঘরের ছাদ ভেদ করে তার একখানি হাত
আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে–

যেমন তাকে একবার দেখেছিলাম '৬৯-এর গণআন্দোলনে
তিনি তখন সদ্য ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বেরিয়ে এসেছেন
কিংবা '৭০-এর পল্টনে আরও একবার '৭১-এর ৭ই মার্চের
বিশাল জনসভায়;
দেখলাম তিনি ক্রমে উষ্ণ, অধীর ও উত্তেজিত হয়ে উঠছেন
একসময় তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ কেঁপে উঠল
বুঝলাম এক্ষুণি হয়তো গর্জন করে উঠবে বাংলার আকাশ,
আমি ভয়ে লজ্জায় ও সঙ্কোচে নিঃশব্দে মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম।
আমার মনে হলো আমি যেন
মুখে হাত দিয়ে অবনত হয়ে আছি
বাংলাদেশের চিরন্তন প্রকৃতির কাছে,
একটি টলোমলো শাপলা ও দিঘির কাছে,
শ্রাবণের ভরা নদী কিংবা অফুরন্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে
কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো অভিযোগ নিঃসরিত হলো না;
তবু আমি সেই নীরবতার ভাষা বুঝতে চেষ্টা করলাম
তখন কী তিনি বলতে চেয়েছিলেন, কী ছিলো তার ব্যাকুল প্রশ্ন
ব্যথিত দুটি চোখে কী জানার আগ্রহ তখন ফুটে উঠেছিলো!
সে তো আর কিছুই নয় এই বাংলাদেশের ব্যগ্র কুশলজিজ্ঞাসা
কেমন আছে আট কোটি বাঙালি আর এই বাংলাদেশ!
কী বলবো আমি মাথা নিচু করে ক্রমে মাটির সাথে মিশে
যাচ্ছিলাম–
তবু তাকে বলতে পারিনি বাংলার প্রিয় শেখ মুজিব
তোমার রক্ত নিয়েও বাংলায় চালের দাম কমেনি
তোমার বুকে গুলি চালিয়েও কাপড় সস্তা হয়নি এখানে,
দুধের শিশু এখনো না খেয়ে মরছে কেউ থামাতে পারি না
বলতে পারিনি তাহলে রাসেলের মাথার খুলি মেশিনগানের
গুলিতে উড়ে গেল কেন?
তোমাকে কীভাবে বলবো তোমার নিষ্ঠুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে
প্রথমে জয়বাংলা, তারপরে একে একে ধর্মনিরপেক্ষতা
একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলাভাষাকে হত্যা করতে উদ্যত
হলো তারা,
এমনকি একটি বাঙালি ফুল ও একটি বাঙালি পাখিও রক্ষা পেল না।

এর বেশি আর কিছুই তুমি জানতে চাওনি বাংলায় প্রিয়
সন্তান শেখ মুজিব!
কিন্তু আমি তো জানি ১৫ই আগস্টের সেই ভোরবেলা
প্রথমে এই বাংলার কাক, শালিক ও খঞ্জনাই
আকাশে উড়েছিলো
তার আগে বিমানবাহিনীর একটি বিমানও ওড়েনি,
তোমার স্বপক্ষে একটি গুলিও বের হয়নি কোনো কামান থেকে
বরং পদ্মা-মেঘনাসহ সেদিন বাংলার প্রকৃতিই একযোগে
কলরোল করে উঠেছিলো।
আমি তো জানি তোমাকে একগুচ্ছ গোলাপ ও স্বর্ণচাঁপা
দিয়েই কী অনায়াসে হত্যা করতে পারতো,
তবু তোমার বুকেই গুলির পর গুলি চালালো ওরা
তুমি কি তাই টলতে টলতে টলতে টলতে বাংলার ভবিষ্যৎকে
বুকে জড়িয়ে সিঁড়ির উপর পড়ে গিয়েছিলে?
শেখ মুজিব সেই ছবির ভিতর এতক্ষণ স্থির তাকিয়ে থেকে
মনে হলো এবার ঘুমিয়ে পড়তে চান
আর কিছুই জানতে চান না তিনি;
তবু শেষবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাকে আমার বলতে
ইচ্ছে করছিল
সারা বাংলায় তোমার সমান উচ্চতার আর কোনো
লোক দেখিনি আমি।
তাই আমার কাছে বার্লিনে যখন একজন ভায়োলিন-বাদক
বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলো
আমি আমার বুক-পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানি দশ
টাকার নোট বের করে শেখ মুজিবের ছবি দেখিয়েছিলাম
বলেছিলাম, দেখো এই বাংলাদেশ;
এর বেশি বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি আর কিছুই জানি না!
আমি কি বলতে পেরেছিলাম, তার শেষবার ঘুমিয়ে পড়ার
আগে আমি কি বলতে পেরেছিলাম?

সে নাম মুজিব

সিকান্দার আবু জাফর

পূত মাতৃ অঞ্চলের প্রসন্ন আশ্রয়ে
সন্তানের কলকণ্ঠ ছিঁড়ে গেলে ভয়ার্ত বিস্ময়ে
থেমে গেলে হাতে হাতে খেজুরের পাতার পাটি বোনা
দুর্দান্ত কৌতুক মেলে শঙ্খচিল অথবা ঘুঘুর কণ্ঠে
কয়টি নতুন গল্প শোনা
সদ্য ফোটা শাপলার পরিতৃপ্ত আত্মসমর্পণ
অঙ্কিত বিচিত্র ছবি মুছে গেলে পুকুরের নিটোল দর্পণে
কবরের শ্মশানের অকস্মাৎ লাঞ্ছনা যখন
বন্দী করে নিয়ে যায় ঘরে ঘরে
মূর্ছাহত বাঙালির মন
তখন যে নাম
পিতার বক্ষের মতো নির্ভরতা
মেলে ধরে বলে
ভয় নেই, কল্যাণের ধ্রুব পদতলে
চূর্ণ হবে অসত্য অশিব
সে নাম মুজিব

নিরন্তর অত্যাচার শোষণের খাদে
আবর্তিত অন্ধকার নিষ্পেষিত মানুষের
ভীরু আর্তনাদে
নির্মেঘ দিনের চোখে স্বচ্ছ দৃষ্টি দুরূহ যখন
শেখানো পাখির ঠোঁটে নিরূপায়
হৃদয়ের মিথ্যা উচ্চারণ,
তখন যে নাম
বিব্রত কংকাল-কণ্ঠে জীবনের লক্ষ্য জয়ধ্বনি
চোখে চোখে উদ্ভাসিত
প্রত্যয়ের দিগন্ত সরণী
ভয়ংকর দানবের সমুদ্যত খড়্গমুখে
দৃপ্ত ঋজুগ্রীব
সে নাম মুজিব।

উদায়ুধ শাসকের সৃষ্ট অজুহাতে
মুমঙ্গল স্বর্গপুরী ক্লিন্ন হলে ধৃষ্ট অপঘাতে
ব্যর্থ হলে মর্যাদার মুখস্থ পরিদীপ্ত চিত্তের বেদনা
মাতা বধূ ভগ্নিদের সহস্র সজ্জায়
প্রসাধিতা কুলনারী নিহত সম্ভ্রমে ছেঁড়ে
অভ্যাসের দ্বার
পশু আর মানুষের ব্যবধান অস্পষ্ট যখন
মনুষ্যত্ব বিনাশের ষড়যন্ত্রের তবু তীব্র
বিদ্বেষের গরল সিঞ্চন।

তখন যে নাম
আকণ্ঠ তমিস্রামগ্ন বাঙালির
আলোক-নির্ভর
দীর্ণবুকে প্রত্যাশার বজ্রকণ্ঠস্বর
ডেকে বলে মৃত্যু নেই, মানুষের
পুত্র চিরঞ্জীব
সে নাম মুজিব।

আকাশ বাতাস আলো যে মুহূর্তে
রুদ্ধদ্বার খাঁচা
ধর্মের কবচ নিয়ে তখনই তো অর্থহীন বাঁচা
বাঙালি হলেই বাঁচি, ওতপ্রোত বাংলার
প্রাণের কল্লোলে
এবং সনাক্ত হই মানুষে প্রসন্ন আদলে
যাদের চোখের দ্বীপে এইসব
অশংসয় দৃষ্টি উন্মোচন
তাদের আত্মার ভোজে যখন প্রান্তরে
পথে শকুনের স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণ
তখন সে নাম
ডেকে বলে প্রতি আত্মদানে
বাঙালির ঘরে ঘরে বাঁচবে বাঙালি তার যথার্থ সম্মানে
মৃত্যুমুখে জননীর কোনো পুত্র কন্যা নয়
অশক্ত নির্জীব
সে নাম মুজিব।

একদিন চিরদিন জয়বাংলা

বেলাল চৌধুরী

জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন দুর্জয় এক সাহসের নাম
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন দুর্বার এক সংগ্রামের নাম
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন আট কেটি কোকিলের সম্মিলিত ঐকতান
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন কল্লোলিত সমুদ্রের উত্তাল গর্জন
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন পদ্মা মেঘনা যমুনা ধলেশ্বরী কালবৈশাখীর আভাস
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন ঝড়ের আগের মাভৈ ধ্বনি আলী আলী হাঁক
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের নির্ঘোষ
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন শেখ মুজিবের তর্জনী শাসন
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন ঘনকৃষ্ণ মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ চমকের রূপালি রেখা
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন টিয়া রঙা শাড়ির লাল আঁচল
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন কচি কলাপাতার উপর নরম পিছল রোদ
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন জননীর নাড়িছেঁড়া ক্রন্দন
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন দেশজুড়ে মুখরিত শব্দব্রহ্মাৎ
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন সমগ্র দেশ ও জাতির বন্দনামুখর স্তবগান
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন অগণন দুঃখী মানুষের মুখের বুলি
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন মিছিলে মিছিলে সয়লাব মানুষের জিন্দাবাদ
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন মসজিদে মন্দিরে আজানে কাঁসর ঘণ্টায়
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন ইষ্টমন্ত্র জপের ধ্যানে মোনাজাতের আকুলতায়
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন গোটা দেশের হৃদস্পন্দনে
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন আউল বাউল ভাটিয়ালি জারি-সারি-মুর্শিদায়
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন হরি বোষ্টুমির কীর্তনে মুশকিল আসান ফকিরের হায়দারি হাঁক
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন ফসলের শীষে ফলের বীজে লাঙলের ফলায়
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন শ্রমিক মজুরের উত্তোলিত হাতিয়ারে
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন বাংলার নৌকার প্রতীকে
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী পুণ্যসলিলা বঙ্গভূমির জয়ধ্বনি
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন কবিদের প্রজ্বলন্ত কবিতার শিখা
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন বাঘা সিদ্দিকীর হাতের অব্যর্থ নিশানা
জয়বাংলা ছিল আছে একদিন চিরদিন শতশত শহীদের আত্মোৎসর্গে
জয়বাংলা ধ্বনিতে উঠেছিল পুবের আকাশ রাঙা করে
জয়বাংলা জয় সূর্য জয় পতাকা
জয়বাংলা ধ্বনিতে ঘোষিত হয়েছিল শত্রুর নিপাত
জয়বাংলা ধ্বনিতে অংকুরিত হয়েছিল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়

জয়বাংলা ধ্বনিতে এসেছিল স্বাধীনতা
জয়বাংলা ধ্বনিতে মঞ্জরিত হয়েছিল বাঙালির জয়গান
জয়বাংলা আজো ধ্বনিত হয় দশ কোটি মানুষের রক্তজবা বুকে
জয়বাংলা আছে আজো বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রামে
জয়বাংলা আছে আজো বাঙালির নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
জয়বাংলা খতম করেছে স্বৈরাচার
জয়বাংলা চির শাশ্বত চির ভাস্বর চির অম্লান
জয়বাংলা জয় বাঙালির একদিন চিরদিনের শৌর্যবীর্য
জয়বাংলা অগণণ নক্ষত্রের অক্ষরে লেখা নাম
জয়বাংলা আবহমান বাংলা ও বাঙালির বিজয় অভিযানের নাম...।

এ কেমন জন্মদিন

আসাদ চৌধুরী

কি না কলম মারছইন গো আল্লাজি
ছাওয়ালিয়ার নছিবে' রে,
কি না লেখন লিখছইন গো আল্লাজি
ছাওয়ালিয়ার চাঁড়াতে রে ॥
ময়মনসিংহের হাইট্টারা গান

জন্মদিনে আমার ছেলের দাবি নূতন নূতন
জুতো জামা চাই,
টেবিলে থাকবে কলা, কেক, রসগোল্লা আরো কত কি যে,
আত্মীয় স্বজন এসে রেখে যাবে
দু-একটা পোটলা-পুটলি সাজানো টেবিলে।

এ কেমন জন্মদিন, খাঁ খাঁ বুক বেলুন-ফুটকা নাই,
লাল-নীল বাত্তি নাই,
কোনোখানে উৎসবের চিহ্নমাত্র নাই।
হে পিতা, তোমার জন্মদিনে
তোমার ও বাঙালির এ কেমন ভিন্ন আচরণ?
কেউ কেউ চোখ মোছে, কারো চোখে প্রতিশোধ নাচে,
মীর জাফরের মতো আড়চোখে কারবালা দ্যাখে,

তুমি নাই, তবুও তোমার কাছে
কী প্রবল প্রত্যাশায় ভিড় করে বাংলার মানুষ।
তোমার দেবার মতো কিছুই নাই, তবু চায় তোমার আশ্বাস।

আমরণ তুমিই বলেছো আমরা তো শুনেছি কেবল,
কেউ কেউ আছে, তারা কোনো দিন কিছুই শোনে না–
এখন কি ভিন্ন কিছু হবে?
তোমার বেলায় জানি সবকিছু একু-আধটু ভিন্ন ধরনের।
যেমন তোমার জন্মদিনে
জন্ম নয়, আনন্দ উল্লাস নয়–
মধ্যযুগ থেকে উঠে আসা একটি করুণ মৃত্যু
চেতনায়, বোধে, দ্যাখো
কী প্রবল নাড়া দিয়ে যায়।
আমাদের সমবেত পাপ, ভয়
কাপুরুষ-অপরাধ-বোধ নিয়ে
তোমার ফটোর দিকে আজো তাই তাকাতে পারি না।
আমাদের পিতার নামের সাথে
পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষা মিশে আছে, জেনো–
নিপীড়িত লাঞ্ছিত যারা
তারা পায় সংগ্রামের, বিপ্লবের বিপুল প্রেরণা।
অন্যায়ের প্রতিবাদে মানব-ভাষার শ্রেষ্ঠনাম
মুজিবুর রহমান
প্রগতি ও শান্তির নির্ভুল নাম
মুজিবুর রহমান
শান্তিকামী মানুষের আশীর্বাদে ধন্য এক নাম
মুজিবুর রহমান
পিতার অধিক স্নেহ ঘাতকের প্রতি তারও নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এ কেমন জন্মদিন মৃত্যুদৃশ্য ভেসে ওঠে শুধু
পদ্মা-মেঘনা যমুনার পলি দিয়ে গড়া
সাগরের লোনা মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া মাটি,
ভারটার পানিটা স'রে গেলে
বাঘের থাবার চিহ্ন,

হরিণের ধাবমান খুর-রেখা,
পিতামহদের দীঘল নিশ্বাস, শত শতাব্দীর অপমান
তুমি তো সেখানে পিতা, পেতেছো বিশাল সিংহাসন–

যে ঘাতক তোমার সুবিশাল ছায়াতলে
থেকে কেড়ে নিল তোমার নিশ্বাস–
শিশুঘাতী, নারীঘাতী ঘাতকেরে যে করিবে ক্ষমা
তার ক্ষমা নাই–
আমরণ অনুগত,
তোমারই অবাধ্য হবে আজ,
পিতা, অনুমতি দাও।

প্রতিশোধ হ্যামলেট

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

পিতা, জেনে যাও, তোমার এ অবিবেকী অন্যায় হত্যার রক্তঘাতী বিনিময় হবে।
তোমার অগাধ প্রেম, রাজধর্ম, হে জনক, উদারতা-ঈর্ষিত, বিশাল
কালকূট হয়ে, দ্যাখো তোমাকেই করেছে আঘাত!
হায় মানবিক কৃতঘ্নতা!
পশু আর প্রিয়তমা এক হয়ে গেছে
মহত্ত্বের স্নায়ু ছিঁড়ে দিতে।
তোমাদের উদ্বাহু বিশ্বাস, পিতা
কুকুরের খাদ্য দ্যাখো আজ!
চক্ষুহীন স্বর্ণলালসায় চারধারে
মরিয়া কৃতান্তকুল। আমাদের কামনার প্রিয়তমারাও
শুয়োরের বুনো আলিঙ্গনে তৃপ্তি চায় শুধু আজ।
শত্রুকে চিনেছি আমি পিতা! আমাদের এই প্রসাদের
মান্যবর বাসিন্দা সে আজ : ডেনমার্কের সম্মানিত প্রভু!
অমাত্য, দেহরক্ষী, বৈভব, সম্পদ রাণী
রাজদণ্ড পরিবৃত্ত সহজ নাগাল থেকে দূরে।
তোমার প্রাক্তন রাণী আমার মায়ের
কুলুষ প্রশ্রয়ে (হা ঈশ্বর!)
তোমার শোবার ঘর কলঙ্কিত করে প্রতিরাত্রে

ঘৃণ্য আরোহণে দ্যাখো প্রতিদিন
অপমান করে ডেনমার্কের প্রিয়তম সিংহাসন!

রক্তে বাজে প্রতিশোধ! পিতা, আমি প্রতি পলে
ধূর্ত বেড়ালের মত প্রাসাদের সতর্ক ছায়ায়
সুযোগের প্রতীক্ষায় হেঁটে ফিরি, উন্মাদের বেশে
এড়াই সন্দেহ; নিদ্রাকে
চিরশত্রু করেছি, দুর্লভ প্রেমকেও অবৈধ অশ্রুর সাথে নিরুদ্ধ করেছি অন্ধকারে!
রক্তে বাজে প্রতিশোধ! প্রতিটি স্নায়ুর
ক্ষুধার্ত চিৎকারে, দাঁতের প্রতিটি
উন্মত্ত কামড়ে উচ্চকিত শিরাদের ক্ষোভে
শরীরময় রক্তকণাদের বন্যতায়
বিনিদ্র চোখের মত দ্যাখো শুধু প্রতিশোধ জ্বলে!

এই সিঁড়ি

রফিক আজাদ

এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে,
সিঁড়ি ভেঙে রক্ত নেমে গেছে—
বত্রিশ নম্বর থেকে
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা ব'য়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে।

মাঠময় শস্য তিনি ভালোবাসতেন,
আয়ত দু'চোখ ছিল পাখির পিয়াসী
পাখি তার খুব প্রিয় ছিল–
গাছ-গাছালির দিকে প্রিয় তামাকের গন্ধ ভুলে
চোখ তুলে একটুখানি তাকিয়ে নিতেন,
পাখিদের শব্দে তাঁর, খুব ভোরে, ঘুম ভেঙ্গে যেতো।
স্বপ্ন তাঁর বুক ভ'রে ছিলো,
পিতার হৃদয় ছিলো, স্নেহে-আর্দ্র চোখ–
এদেশের যা-কিছু তা হোক না নগণ্য, ক্ষুদ্র

তাঁর চোখে মূল্যবান ছিলো–
নিজের জীবনই শুধু তার কাছে খুব তুচ্ছ ছিলো;
স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে প'ড়ে আছে
বিশাল শরীর ...

তাঁর রক্তে এই মাটি উর্বর হয়েছে
সবচেয়ে রূপবান দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ
তাঁর ছায়া দীর্ঘ হ'তে-হ'তে
মানচিত্র ঢেকে দ্যায় সস্নেহে, আদরে
তাঁর রক্তে প্রিয় মাটি উর্বর হয়েছে–
তাঁর রক্তে সব কিছু সবুজ হয়েছে।

এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে,
সিঁড়ি ভেঙ্গে রক্ত নেমে গেছে–
স্বপ্নের স্বদেশ ব্যেপে
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা ব'য়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে।

যিসাস মুজিব
মুহম্মদ নুরুল হুদা

হতে পারতে আইখম্যান, খুনীর কাহিনী
হতে পারতে মৃত্যুদণ্ড খাস সহি-দাতা
অথচ তোমার বুকে জেগেছিলো
এ কেমন আশ্চর্য ধমনী!
নিষ্পাপ বাঙালি রক্তে যে গাদ্দার খেলেছিলো হোলি
শক্তিমদমত্ত সেই সহিংস অশনি
তোমার বিশাল বুকে তারো জন্যে ছিলো কিছু ক্ষমা
গুড়িয়ে দাওনি পিতা, সেই খল নায়কের খুলি।

সে-সুবাদে সেই ভণ্ড পুরোহিত প্রাণী
আঁধারে সঙ্গী হয়ে পাঠকের প্রতিহিংসা-রায়
হাত দুটো প্রসারিত, পিতা, তুমি চূড়ান্ত কোরবানী
তোমার বঙ্গজ রক্তে সন্তানের পাপ ঘুচে যায়

ফুরাবে না গঙ্গাধারা, ফুরাবে না বঙ্গভাষী কবিদের নিব
ফুরাবে না এই রক্তে, পিতা, তুমি যিসাস মুজিব।

সে ছিল দিঘল পুরুষ

বাবলু জোয়ারদার

হাত তুললেই
ধরে ফেলতো চাঁদ
আকাশের নীল
ধরে ফেলতো সপ্তর্ষীমণ্ডল কেমন অনায়াসে।

সে ছিল দিঘল পুরুষ
তার বুকের গভীর শব্দে
আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যেতো স্বদেশের মমতায়
আর সাড়ে সাত কোটি মানুষ হয়ে যেতো মন্ত্রমুগ্ধ
হেঁটে যেতো তার সাহসের সীমানায়

হাত বাড়ালেই
ধরে ফেলতো পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল
সাড়ে সাত কোটি হৃদয়
ধরে ফেলতো বৈশাখী মেঘ কেমন অনায়াসে।

একবার যুদ্ধ জয়ের পর
স্বজনের লাশ গুনতে গুনতে শত্রুর প্রতি
ছুঁড়ে দিয়েছিলো ক্ষমা; তারপর
ক্ষমার আগুনে নিজেই ভস্মীভূত।

দিঘল পুরুষ সে
আজো আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে।

১৫ আগষ্টের এলিজি

শওকত ওসমান

Here is a mourning Rome, a dangerous Rome.

—Shakespeare

('এই এক শোকাতুর রোম, বিপদজ্জনক রোম।'
জুলিয়াস সিজার নাটকের সিজার-হত্যার পর মার্ক অ্যান্টনির উক্তি।)

ইতিহাস নয়
অদৃষ্টের পরিহাস,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
তোমার ঘাতকেরা আজ
নিজেদের সেবক রূপ জাহির করে।
উপনিবেশ পূর্ব পাকিস্তান
তার মাথার উপর ডাণ্ডা ঘোরাতো
ব্যারাক-নির্মিত যে সৈন্যদল
তাদের পদলেহী
দাস-মনোবৃত্তির চরমতম জঘন্য প্রকাশ
নরাধম প্রাণীর দল
চোরের মায়ের বড় গলা
এখন চিৎকাররত এই দেশের মানুষের,
তার নাকি আসল হিতাকাঙ্ক্ষী
মিত্র, স্বজন।

এমন নির্লজ্জ বেহায়াপনার সমর্থকও
মেলে এই ভূখণ্ডে।
ইনসাফের তৌলদণ্ড
যাদের হাতে ন্যস্ত
তারা পর্যন্ত অন্ধ হয়ে যায়
ধর্মব্যবসায়ীদের আলখেল্লার ঝলকে।
অথবা
ইহ-জাগতিক তরক্কীর
শ্রীবৃদ্ধির আকর্ষণে।
তখন বিবেকের অবলম্বনের জন্য

আর কোথায় বাড়াব হাত?
ইতিহাস নয়, অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া
আর কোন পরিচয় হতে পারে
এমন পটভূমির?
তবে তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
রবীন্দ্র-প্রেমিক ছিলে তুমি,
তারই বাণী, 'প্রতিকারহীন
মনুষ্যত্বের পরাভবকে চরম বলে
বিশ্বাস করা আমি অপরাধ মনে করি',
আজ আমাদেরও সান্ত্বনা।
তোমার আর এক প্রিয় কবি
যে নজরুলকে তুমি কাছে এনেছিলে
যে বয়সে তার সেবা-শুশ্রূষার জন্যে
তাকে 'জারজ', 'শয়তান', 'ধর্মদ্রোহী'
ইত্যাদি গালাগালে সজ্জিত করেছিলো
যে স্যোশাল ফোর্স বা
সামাজিক চাপ-শক্তি
সেই অপশক্তির মুখে থুতু দিয়ে
আজ তিনি আমাদের 'জাতীয় কবি',
যথাসম্মানে বিভূষিত।
সেই স্যোশাল ফোর্স
রূপকথার রাক্ষসের মত প্রাণপ্রাপ্ত
তোমাকে বিনাশের আয়োজনে
ব্যাপৃত ছিল,
ইতিহাস সাক্ষী।
সেখানেই আমাদের সান্ত্বনা নিহিত,
তুমিও ফিরে আসবে বৈকি
যথামর্যাদায় সার্থকনামা, বঙ্গবন্ধু।
তাইত আজও দৈনন্দিন প্রাণ ধারণ করি।
তাইত আজ
তুলে নিয়েছি কণ্ঠে তোমার স্লোগান:
জয় বাংলা!
জয় বাংলা!!

তোমাকেই আসতে হবে

মযহারুল ইসলাম

আমাদের প্রাণের ক্রন্দন বলেছে তুমি আসছ,
তুমি আসবেই, তোমাকে আসতেই হবে।
না হলে কৃষকদের পান্তা ভাতে লবণ পড়বে না,
মাল্লার দাঁড় জলের স্পর্শ পাবে না,
সন্ধ্যার দীপ জ্বলবে না বাংলার ঘরে ঘরে,
তোমার জন্যে আমার জননী রোজা রেখেছিলো
তার ইফতার হবে না।
তুমি আসছ, তুমি আসবেই
তোমাকে আসতেই হবে। পথ চেয়ে আছে
ভোরের দোয়েল। আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা।
ক্রাচে ভর করা সূর্য-সৈনিক। বত্রিশ নম্বরের
জনশূন্য পথ। ক্ষত-বিক্ষত সংবিধান। তৃষ্ণার্ত পতাকা।
লক্ষ জনতার তরঙ্গ।
তোমাদের প্রিয় তোফায়েল
তার মাথার চুলগুলো সব খুইয়ে একা একা
রাত্রির অন্ধকারে পদচারণায় ব্রত প্রতিদিন।

উদ্যানে তুমি আসবে বলে বিজয়মালা হাতে
তার অনন্ত প্রতীক্ষা। তোমার দুই কন্যার চোখে
অতল সমুদ্র। লোনা অশ্রুর ঢেউ উথাল পাথাল।
ভিখিরীর বেশেই না হয় তুমি এসো
অডিসিউসের মত। স্থবির ধনুক হয়ে পড়ে আছে
তোমার সাধের বাংলাদেশ। তোমাকেই পরাতে হবে
জ্যা, লাগাতে হবে তীর। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, মারী, যন্ত্রণা
দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে, লোভাতুর একেকটি
রাক্ষস। লুটেরারা দল, সন্ত্রাস-দানব
হিংস্র থাবা মেলে আছে। হে অডিসিউস,
ইথাকার মতই বাংলাদেশে তোমার
বড়ই প্রয়োজন। তোমাকে আসতেই হবে।

মুজিবের এপিটাফ্

হায়াৎ মামুদ

আমরা দেবতা নই। তুমিও কি ছিলে?
ভুল–সে তো করে মানুষেই।
অপার ক্ষমার ভুলে যেই মাশুল দিলে
তার দায় আমাদের শুধতে হবেই।

স্খলন ও ভ্রান্তির শেষে মানুষ গেলেও
(যেমন গিয়েছ তুমি ইতিহাসে)
বেঁচে থাকে বৃক্ষলতা, ধূলিকণা–সেও
তারই ঘ্রাণে, স্মৃতি ও সুবাসে।

আমরাও বেঁচে থাকি স্মৃতি নিয়ে তোর,
তোর রক্ত ফুল হবে, আঙিনার ভোর।

একটি মুজিব

আসলাম সানী

একটি মুজিব ঘুমিয়ে আছে টুঙ্গিপাড়ার ঘাসে
একটি মুজিব খুঁজে দেখো আছে তোমার পাশে।
একটি মুজিব ছবি হয়ে সবার মনে থাকে
একটি মুজিব আন্দোলনে বাঙালিদের ডাকে।
একটি মুজিব ছিলো, আছে সাহসী এক যোদ্ধা
একটি মুজিব বাঙালিদের চিরকালের শ্রদ্ধা।



পরিশিষ্ট ৭

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু গান

১

শোনো, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ
সেই সবুজের বুকচেরা মেঠোপথে
আবার এসে ফিরে যাব,

(আমার) হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো।
শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে
হায়রে এমন সোনার দেশ॥
বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা,
রূপের যে তার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ।
'জয় বাংলা' বলতে মনরে আমার
এখনো কেন ভাবো,
(আমার) হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো।
অন্ধকারে পূর্বাকাশে উঠবে আবার দিনমণি ॥

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর : অংশুমান রায়

২

মুজিব বাইয়া যাওরে
নির্যাতিত দেশের মাঝে
জনগণের নাও ওরে
মুজিব বাইয়া যাওরে ॥

ও মুজিব রে, ছলেকলে চব্বিশ বছর রক্ত খাইল চুষি
জাতিরে বাঁচাইতে যাইয়া
মুজিব হইল দোষী রে
মুজিব বাইয়া যাওরে ॥

ও মুজিব রে, খিদার জ্বালা হৃদয় কালা রক্ত কালা মুখে
কথায় কথায় চালায় গুলি
বাঙালিদের বুকে রে
মুজিব বাইয়া যাওরে ॥

ও মুজিব রে, আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে কাঁদেরে বাঙালি
নিপীড়িত মানুষ কাঁদে
মুজিব মুজিব বলিরে
মুজিব বাইয়া যাওরে ॥

ও মুজিব রে, বাঙালির ভাগ্যাকাশে এল দুঃখের নিশি
তুমি বাংলার চির সম্রাট
অন্ধকারের শশীরে
মুজিব বাইয়া যাওরে॥

ও মুজিব রে, অত্যাচারীর উৎপীড়নে দিক না যতই ব্যথা
সাত কোটি বাঙালির প্রাণে
মুজিব তুমি নেতা রে
মুজিব বাইয়া যাওরে ॥

সুর : 'মাঝি বাইয়া যাও' সুরের অনুকরণে
শিল্পী : মুহম্মদ আবদুল জব্বার
[স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গীত]

৩

জয় বাংলা জয় বাংলা বলে সব আয়রে বাঙালি
সোনার বাংলা স্বাধীন হইয়াছে।
দেখো বনের পাখী কতই সুখী আজ
গাছের ডালে বইসা গান গাইছে
সোনার বাংলা স্বাধীন হইয়াছে।

স্বাধীন দেশের মানুষ আমরা
করব না আর ভয়
হিংস্র পশু পলাইয়াছে
মোদের হইছে জয়
ভাইরে চাইয়া দেখো ঘরে ঘরে
জয়ের নিশান উড়তাছে
সোনার বাংলা স্বাধীন হইয়াছে ॥

আশা গেছে বাসা গেছে
তাতে নাইরে দুখ
এবার নতুন করে গড়বো মোরা
আশায় বান্ধি বুক
দেখো নতুন সুরুয উদয় হইলো
দুখের নিশি পোহইছে ॥

ময়ূরপংখী নৌকা মোদের
ঠেকছিল চড়ায়
এখন নয়া যুগের বান ডাইকাছে
বাংলার দরিয়ার
এবার সাত কোটি লোক টানছে বৈঠা
বঙ্গবন্ধু হাল ধইরাছে ॥

কথা : মোমতাজ আলী খান
সুর ও শিল্পী : মোস্তফা জামান আব্বাসী
[বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোম্পানি কর্তৃক রেকর্ডকৃত]

৪

বঙ্গবন্ধু ডাকে রে
মুজিব ভাই ডাকে রে
কে কোথায় আছ
মাঠে ঘাটে গঞ্জে হাটে
কোথায় আছ
গ্রামে শহরেতে
কলে কারখানাতে
কোথায় আছে
হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রীষ্টান
মিলি আয় লাখে লাখে রে ॥

শোন ভাই মুজিবের কথা
দেশে আনলো সে যে স্বাধীনতা
কোন সন্তান করলো সুখী
এমন করে বাংলা মাকে ॥

ফুটলো যে ফুল স্বাধীনতার
বাংলা দেশের ঘরে ঘরে
হুঁশিয়ার ভাই থাকিস তোরা
যেন থাকে সে ফুল বৃন্তপরে ॥

রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর ও শিল্পী : নির্মলেন্দু চৌধুরী
['হিজ মাস্টার্স ভয়েস' কলিকাতায় রেকর্ডকৃত]

৫

বাংলা মায়ের রাখাল ছেলে
বাঁশী দিল টান
শোন ভাই হিন্দু মুসলমান
মায়ের মুখে ফুটলো হাসি পালাইছে বেঈমান
রে ভাই পালাইছে শয়তান ॥

গোলাপ যেমন দেখতে ভালো
আরও গোলাপ-কলি
তাহার চাইয়াও অধিক ভালো
বাংলা মায়ের বুলি
বটবৃক্ষের ছায়ার মতো শীতল মায়ের প্রাণ ॥

মায়েরে আজ জানাই সালাম
মায়ের দোয়ার জোরে
মায়ের মুখের হাসি যেন রাখতে পারি ধরে ॥

মায়ে আমার হইয়াছিল শয়তানের শিকার
কেউ ছিল না কাছে মায়ের কেড়ে নিছে মণিহার
কোলের জাদু তার
সেই মায়ের আজ সামনে খাড়া সাত কোটি সন্তান ॥

কথা ও সুর : মোমতাজ আলী খান
শিল্পী : মোস্তফা জামান আব্বাসী
[বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোম্পানি কর্তৃক রেকর্ডকৃত]

৬

জয় বাংলা জয় বাংলা বলিয়া রে
তরী দিলাম ছাড়ি
সেই তরীতে হাইল ধইরাছে
গোপালগঞ্জের মাঝি ॥

উত্থাল পাত্থাল গাঙ্গের পানি
নাও চলে উজান
ভয় কিরে তোর আসুক তুফান
শক্ত হাতে হুঁশিয়ার মাঝি
হাইল আছে ধরি ॥
ঝড় তুফানে চলবে তরী
চলবে উজান পানে

উঠুক না মেঘ আসুক ঝঞ্ঝা
পাড়ি দিব মোরা
আল্লার নাম স্মরি ॥

পুব আকাশে সূর্য উঠেছে
ফর্সা চারিদিক হইয়াছে
আর ভয় নাইরে তোর
নাইরে তোর ভয়
'জয় বাংলার জয়'॥

কথা ও সুর : হরলাল রায়

৭

ও রহিম ভাই, ও করিম ভাই, যদু ভাই, ও মধু ভাই
দুখের দইরা হইবা যদি পার
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর হাইল ধইরা বইছে নৌকার ॥

এগারো দফাতে গড়া
নৌকাখানা মনোহরা
মাস্তুলে তার বাদাম ওড়ে
দেখনারে ভাই নয় দফার ॥

বাইশ বছরে তেইশ পরিবার
যা নিয়েছে তোমার আমার,
হইছে সময় আয়রে ও ভাই খবর করি আজকে তার ॥

মোদের পাটের টাকায় জানি
বানাইছে তিন রাজধানী
দিন আইসাছে ভাইরে এখন
হিসাব নেব সেই টাকার ॥

তারবেলা আর মঙ্গলা বাঁধ
বানাইয়া পুরাইছে সাধ
ওরে বিন বাঁধে ভাইসা গেছে
মা বাবা বোন ভাই আমার ॥

সোনার বাংলা কইরা শ্মশান
মরুতে বানায় পরিস্থান
ওরে দুঃখে কষ্টে অনাহারে
বাংলার মানুষ হাড্ডিতে সার ॥

কথা ও সুর : আবদুল লতিফ

৮

ওরে ও ওরে মাঝি ভাই
তোরা বৈঠা হাতে ধর
এবার তোদের হাল ধরেছে
শেখ মুজিবর ॥ ওরে ও ...

বাংলাদেশের সবুজ বুকে
মোদের জন্ম ভাই
এই দেশে এই মায়ের বুকে
অত্যাচারীর ঠাঁই নাই ॥ ওরে ও ...

জন্ম তোমার ধন্য হলো
শেখ মুজিবর ভাই
তোমার নামে জারি সারি
গাই যে সর্বদাই ॥ ওরে ও ...

কুলি মজুর ওরে কাঙাল
একটুখানি থাম (তোরা)
ওরে আর কয়টা দিন পরে
এদেশে ভাসবে মধুর গান ॥ ওরে ও ...

কথা ও সুর : মো. আজিজুল ইসলাম

৯

হারে ও আমার বাংলার
শেখ মুজিব
বাংলাদেশকে কইরাছ সজীব
৭ কোটি বাঙালির তুমি হইছ নয়নমণি
দুখি মায়ের দুখি সন্তান
বানাইবা সব ধনী ॥
৭ কোটি বাঙালির দাবী হবেরে আদায়
বাঙালিদের পদাঘাতে খানের গুষ্টি
মইরা যায় ॥

এসো এসো
আজি মোরা লড়াই করি
দেশের লাগিয়া
তোমাকে আনিব মুজিব
জেলখানা ভাঙ্গিয়া ঐ
ইয়াহিয়া ভুট্টোরে মারব লাঠি দিয়া
তোমাকে করিব মুক্ত
থাকব না আর পরাধীন॥

কথা ও সুর : মো. সিরাজুল ইসলাম

১০

বাংলা দ্যাশের খাঁটি মানুষ
শেখ মুজিবর জেনো ভাই।
তার মতো আর বাংলার বন্ধু নাই ॥

তেইশ বছর অনেক নেতা
সেজে এলেন জাতির পিতা
এখন মোদের খাঁটি ত্রাতা
শেখ মুজিবকেই দেখতে পাই ॥

দুই যুগ ধরে বাংলাবাসী
ছিলাম মোরা উপবাসী
শেষে নেতা মুজিব আসি
বাংলাদেশ করলেন রোশনাই ॥

জালিম শোষক এহিয়া খান
করলো মুজিবরকে কারা প্রদান
এখন যায় যদি যাক মোদের পরান
শেখ মুজিবের মুক্তি চাই ॥

কথা ও সুর : মকসেদ আলী সাঁই

১১

বাঙালিরা জানের জান
রাখতে হবে বাঙালিদের মান ॥
ওরে কাঙালের দরদী এল
শেখ মুজিবর রহমান
বাংলা নেতা শেখ মুজিবর ভাই
তাহার মতো দরদী নেতা কোনো দেশে নাই।
বুক ফুলাইয়ে সবাই মিলে
হওনারে আজ আগুয়ান
ও হায় ইয়াহিয়া কি করিল
শেখ মুজিবকে জেলে দিল
খানের দলে কত কষ্ট দিল
কভু না ভুলিতে পারে
বাংলা মায়ের এই সন্তান ॥

ও হায় ভয় কিরে আজ বঙ্গবাসী
আমরা সাড়ে সাত কোটি মায়ের সন্তান আছি
ওরে হায়দরি হাঁক হাঁকতে আছি

শেখ মুজিবর রহমান ॥
বাঙালিদের নয়নমণি
শেখ মুজিবর গুণের গুণি
আল্লা মোদের সহায় আছেন
রাখব না দালালদের জান ॥

ও হায় কৃষক শ্রমিক ছাত্র যারা
লাঠি নিয়া হওরে খাড়া
আমাদেরকে ঠকাইল যারা
রাখ না আজ তাদের জান।

ইয়াহিয়ার ইচ্ছা ছিল
সার্জেন্ট জহুরুল যেমনি শহীদ হইল
তেমনি মোদের নেতা মরত
কিন্তু আল্লা মোদের নেগাবান
সিরাজ কবি ভেবে বলে যাইওনা ভাই খানের দলে
শেখ মুজিবর
বাংলার ওস্তাদ জানিও ভাই হিন্দু মুসলমান ॥

কথা ও সুর : সিরাজুল ইসলাম

১২

ও আমার বাংলাদেশের মাঝি ভাই
জয় বাংলা বলিয়া আইসো রঙিন পাল উড়াই।
আমার বাংলাদেশের মাঝি ভাই ॥

ও মাঝি ও, ওরে ছয় দাঁড়েতে নৌকা চলে
মুখে আল্লাজী
ওরে বাঁকা নায়ের হাল ধইরাছে
গোপালগঞ্জের মাঝি ॥

ও মাঝি ও, গোপালগঞ্জের নায়ের মাঝি
বাংলাদেশের নাইয়া
সে যে সব দুঃখীরে পার কইরা দেয়
জয় বাংলা গান গাইয়া ॥

ও মাঝি ও, সে নায়েতে পার হইতে
জলদি কইরা আয়
ওরে অনেক দিনের স্বপ্ন ঘেরা
যাইতে সোনার গাঁয়
আমার বাংলাদেশের মাঝি ভাই ॥

শিল্পী : রথীন্দ্রনাথ রায়
['হিজ মাস্টার্স ভয়েজ' কর্তৃক জানুয়ারি '৭১ সালে রেকর্ডকৃত]

১৩
দিনের শোভা সুরুয রে, রাইতের শোভা চান,
ওরে বাংলার শোভা বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর বাংলার বীর সন্তান
সে যে বাংলা মায়ের নয়ণমণি পূর্ণিমার চান।

যার লাগিয়া বাংলার মানুষ
কাইন্দা হইলেন পেরেশান কানছে দুনিয়া জাহান
তারে দীর্ঘজীবী কর দয়াল রহিম রহমান ॥

অত্যাচারীর অত্যাচারে তার হয় নাই নত মাথা
ওরে হিমালয় পর্বতের মত অটল
রয়েছেন মোদের নেতা
গণতন্ত্রের প্রতীক সে যে বাংলার ধ্রুবতারা
সে বিহনে সোনার বাংলা হয় দিনেতেও আধিয়ারা ॥

কথা ও সুর : আবদুল গনি বোখারী

১৪
জয় বাংলা বাংলার জয়
হবে হবে হবে, হবে নিশ্চয়।
কোটি প্রাণ একসাথে জেগেছে অন্ধরাতে
নতুন সূর্য উঠার এই তো সময় ॥

বাংলার প্রতি ঘর ভরে দিতে চাই মোরা অন্নে,
আমাদের রক্ত টগবগ দুলছে
মুক্তির দীপ্ত তারুণ্যে।

নেই ভয়–
হয় হউক রক্তের প্রচ্ছদপট
করি না করি না করি না ভয় ॥
অশোকের ছায়ে যেন রাখালের বাঁশরী
হয়ে গেছে একেবারে স্তব্ধ,
চারিদিকে শুনি আজ নিদারুণ হাহাকার
আর ঐ কান্নার শব্দ।

শাসনের নামে চলে
শোষণের সুকঠিন যন্ত্র,
বজ্রের হুঙ্কারে শৃঙ্খল ভাঙতে
সংগ্রামী জনতা অতন্দ্র।

আর নয়–তিলে তিলে বাঙালীর এই পরাজয়
করি না করি না করি না ভয় ॥

ভুখা আর বেকারের মিছিলটা যেন ঐ
দিন দিন শুধু বেড়ে যাচ্ছে,
রোদে পুড়ে জলে ভিজে অসহায় হয়ে আজ
ফুটপাথে তারা ঠাঁই পাচ্ছে।
বারবার ঘুঘু এসে খেয়ে যেতে দেব না তো আর ধান,
বাংলার দুশমন তোষামোদী চাটুকার
সাবধান সাবধান সাবধান!
এই দিন–
সৃষ্টির উল্লাসে হবে রঙ্গীন।
(আর) মানি না মানি না কোনো সংশয় ॥

মায়েদের বুকে আজ শিশুদের দুধ নেই
অনাহারে তাই শিশু কাঁদছে,

গরিবের পেটে আজ ভাত নেই ভাত নেই
দ্বারে দ্বারে তাই ছুটে যাচ্ছে।
মা-বোনের পরণে কাপড়ের লেশ নেই
লজ্জায় কেঁদে কেঁদে ফিরছে,
ওষুধের অভাবে প্রতিটি ঘরে ঘরে
রোগে শোকে ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

অন্ন চাই বস্ত্র চাই
বাঁচার মতো বাঁচতে চাই
অত্যাচারী শোষকদের আজ
মুক্তি নাই মুক্তি নাই মুক্তি নাই ॥

কথা : গাজী মাজহারুল আনোয়ার
সুর : আনোয়ার পারভেজ

১৫

জয় বাংলা জয় বাংলা বইলা রে
মাঝি বাদাম দাও তুলিয়া
আল্লার নাম লইয়া নৌকায়
কাছি দাও খুলিয়া মাঝি রে ॥

ওরে পদ্মা মেঘনা ধল্লার মাঝি রে
ও মাঝি বৈঠা চালাও কৈষা
বিপদ বালার ভাবনা চিন্তা
আর কইরো না বইসা মাঝি রে ॥

এবার নতুন সুরুজ উদয় হইল রে
মাঝি বইছে নতুন বাও
দাঁড়ের ঘায়ে তুফান ভাইঙ্গা
সামনে বাইয়া যাও মাঝি রে ॥
ওরে তোমরা আমার এই না বাংলা রে

ও মাঝি আর তো কারও নয়
মনের মতো বাইয়া চলো
নাইকো বাধা ভয় মাঝি রে ॥

আমরা বাংলাদেশে বসত করি রে
মাঝি বাংলার কামাই খাই
বাংলা ভাষায় হাসি কান্দি
বাংলাতে গান গাই মাঝি রে ॥

ওরে জনম নিলাম বাংলাদেশে রে
ও মাঝি বাংলার গরব করি
বাংলা মায়ের কোলে যেন
মরণ কালে মরি মাঝি রে ॥

[কথা ও সুর : হাফিজুর রহমান]

BANGLADESH
Joan Baez

[It was sung from for heart: the woeful lyric and the mournful note all were heres. The song was composed in 1971.]

16
Bangladesh, Banladesh, Bangladesh Bangladesh
When the sun sinks in the west
Die a million people of the Bangladesh
The story of Bangladesh
Is an ancient one again made fresh
By blind men who carry out commands
Which flow out of the laws
Upon which nations sand
Which say to sacrifice & people for a land.

Once again we stand aside
And watch the families crucified
See a teenage monther's vacant eyes
As she watches her feeble baby try
To fight the monsoon rains
And the colour of lives
And the students at the university
Asleep at night quite peacefully
The soliders came and shot them in their beds
And terror took the dawn, awakening
shrieks of dread
And the silent frozen forms and
pillows drenched in red.
Did you read about the
army officer's plea
for donors' blood it was given willingly
By boys who took the needle in their veins
And from their bodies every drop of
blood was drained
No time to comprehend and there was little pain.
And so the story... By all who carry. ...

দ্র. সেলিম রেজা (সম্পা.) *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১২৯

George Harrison

My friend came to me
told me that he wants help for his country lives.
Although I could feel pain ... I had to try
Now I am asking all of you ...
Bangladesh, Banladesh ...

Where so many people are dying fast, looks like a mess.
I have never seen such disaster,

How could you let your hand
Bangladesh, Bangladesh ...

Such a great disaster
I do not understand
I have never seen such a great disaster
Now please, do not ...

I will ask you to release the people of Bangladesh.
Release the people of Bangladesh
Bangladesh, Bangladesh ...

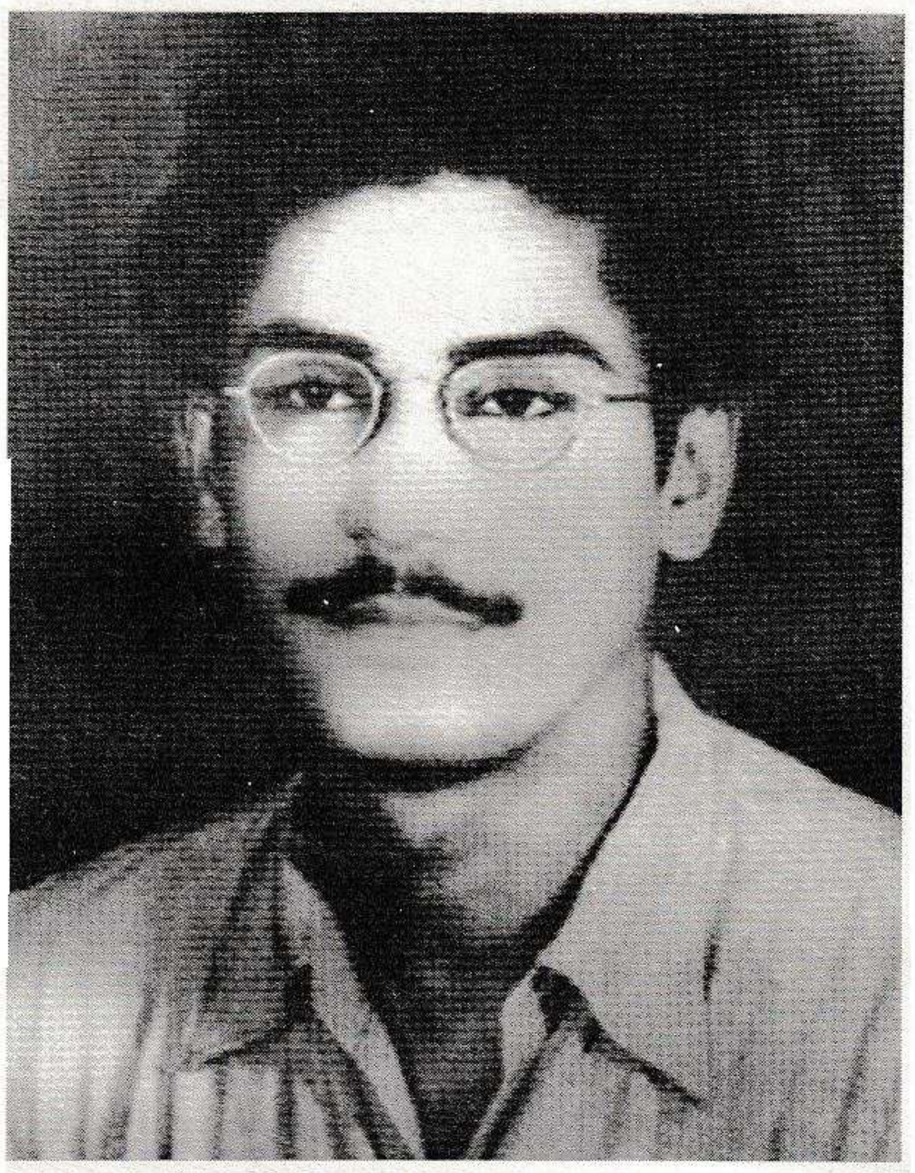
Now it seems to far from where we are,
We can reach ...
We got to release Bangladesh
Release the People of Bangladesh
We got to release Bangladesh

Now please let your hand
Release the people of Bangladesh.

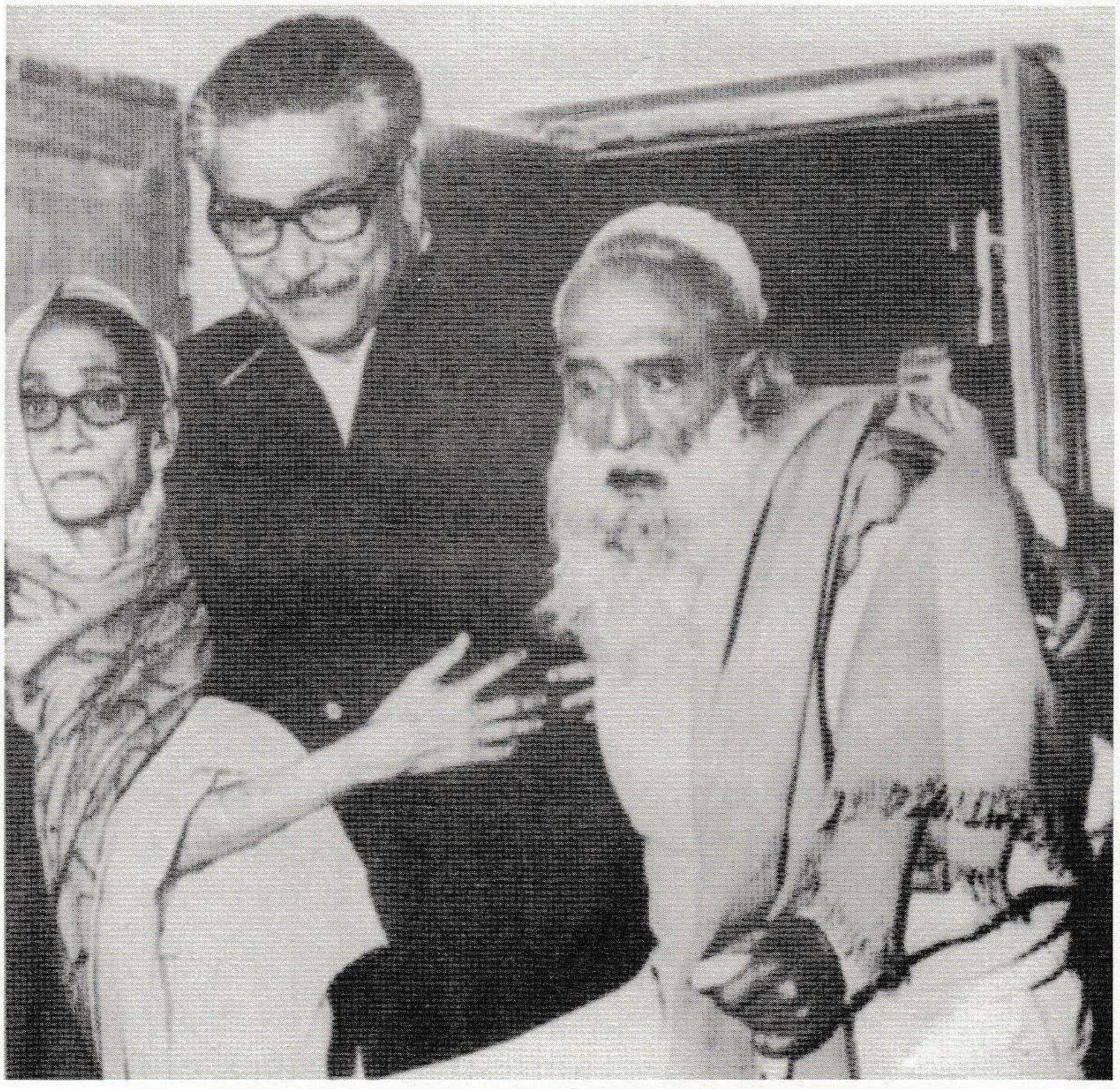
দ্র. সেলিম রেজা (সম্পা.), ঐ, পৃ. ১৩১

পরিশিষ্ট ৮

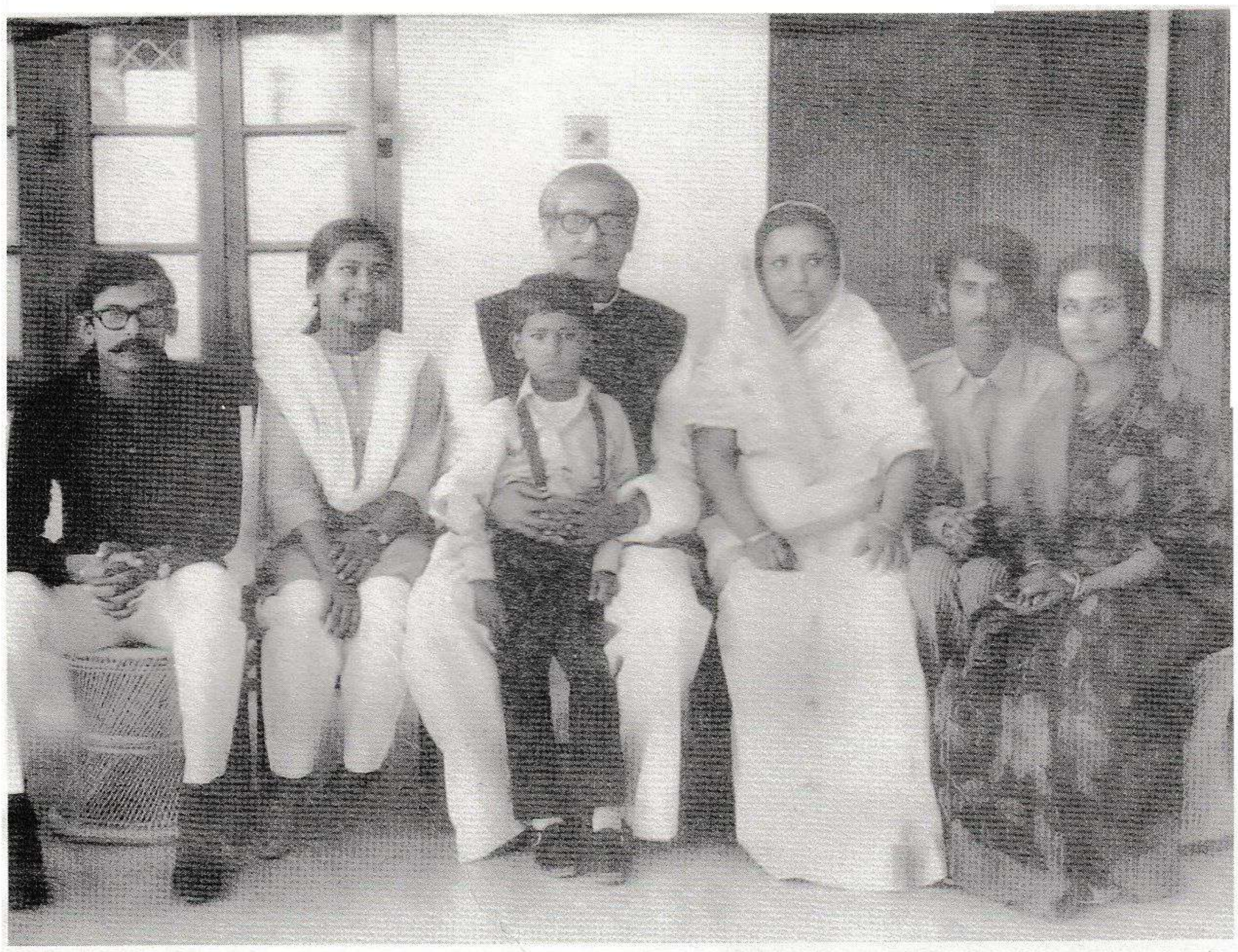
আলোকচিত্রে বঙ্গবন্ধু



তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান



বাবা-মায়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু, বাবা—শেখ লুৎফর রহমান, মা—সাহারা খাতুন



১৯৬৯ : সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



টুঙ্গিপাড়ায় আদি পৈতৃক বাড়ি



জানুয়ারি ১৯৬৯, জেলখানা থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাওয়ার পথে



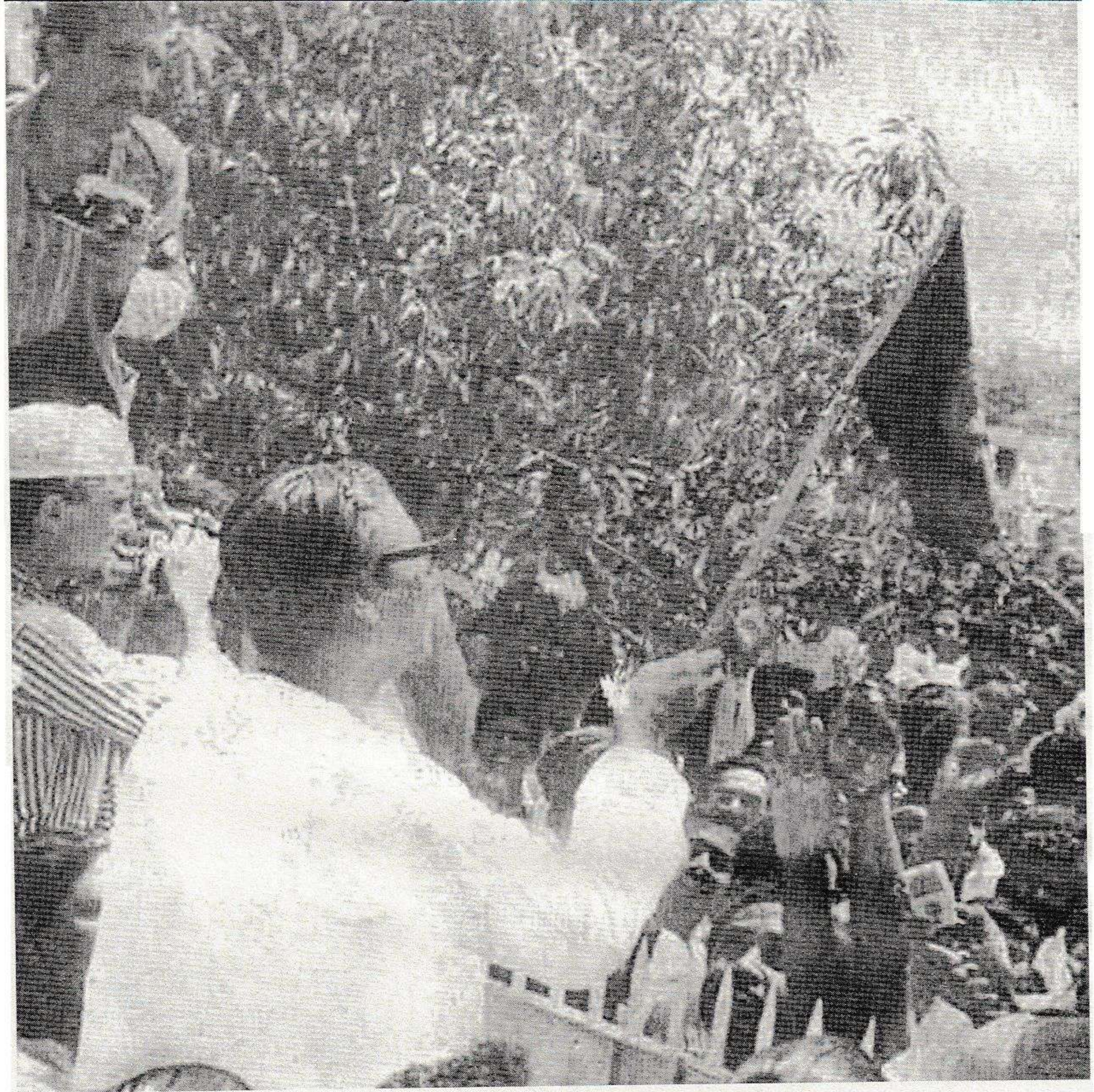
১৯৪৯, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে



১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫, জয়পুরহাটে উত্তরবঙ্গ আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান



১০ জানুয়ারি ১৯৭২, সহকর্মী পরিবেষ্টিত অবস্থায় ট্রাকের উপরে বঙ্গবন্ধু



২৩ মার্চ ১৯৭১, ৩২নং ধানমন্ডির বাড়িতে উৎফুল্ল জনতার মাঝে স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলে ধরলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



আগরতলা মামলা থেকে মুক্তির পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। বাম দিক থেকে মহিউদ্দিন আহমদ মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব ও আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ

২৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, রেসকোর্স ময়দানে ছাত্রজনতার বিশাল সমাবেশে
প্রিয়নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে উপাধি দেওয়া হয় 'বঙ্গবন্ধু'



১৯৬৯, কারামুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব



৭ মার্চ ১৯৭১, রমনা রেসকোর্সে স্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ
মানুষের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ



বঙ্গবন্ধু পরিবারের মাঝে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। উপবিষ্ট বাম থেকে : শেখ রাসেল, বঙ্গবন্ধু, বেগম মুজিব, ইন্দিরা গান্ধী, শেখ রেহেনা, শেখ হাসিনা ও কোলে জয়, বেগম রাজিয়া নাসের। দণ্ডায়মান ডান থেকে : এম ওয়াজেদ মিয়া, তাহমিনা শেখ, শেখ কামাল ও শেখ জামাল।



২৪ মে ১৯৭২, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে এলেন শেখ মুজিব



২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



বিশ্বাসঘাতকদের গুলিতে নিহত মহানায়কের মহাপ্রস্থান, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫

তথ্যসূত্র

অলি আহমদ, *জাতীয় রাজনীতি* ১৯৪৫-৭৫, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮২

আখতার হোসেন (সম্পা), *দুই বাংলার কবিতায় বঙ্গবন্ধু*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

আতিউর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

আতিউর রহমান ও হাশেমী *ভাষা-আন্দোলনের আর্থসামাজিক পটভূমি*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৯

আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮

আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন* : অর্থনৈতিক পটভূমি, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯০

আনিসুজ্জামান, 'যদিও বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস অনুপস্থিত ছিলেন, তার প্রেরণা কার্যকর ছিল', *বিচিত্রা*, ১৬ আগস্ট, ১৯৯৬

আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫

আসাদ চৌধুরী, *কবিতাসমগ্র*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০০

এ কে নাজমুল করিম, *মুসলিম অভিজাত ও মধ্যবিত্ত: একে নাজমূল করিম স্মারকগ্রন্থ;* সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪

এম এ মুহিত, *মহাপুরুষদের কথা কাছে থেকে দেখা*, অন্যান্য, ঢাকা, ২০০১

এম. নজরুল ইসলাম (সম্পা), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ, জ্যোৎস্না, পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৭

এস এম মালেক, ডা., *বাংলাদেশ আজ মৃত্যু উপত্যকা*, নিউজ এন্ড ভিউজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫

জসীম উদ্‌দীন, *ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে* পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমেরিয়াল ট্রাস্ট, *জাতির জনক*, অ্যালবাম, ২০০৩

ড. কামাল হোসেন, *সাক্ষাৎকার*, ১৫ জানুয়ারি, ১৯৯৯

ডা. এ. এস. এম. জাকারীয়া স্বপন (সম্পা.), *সত্তা: ছবি ও স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু*, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৪

নির্মলেন্দু গুণ, *নির্বাচিতা*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

ফয়েজ আহমদ, *আগরতলা মামলা : শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪

বদরুদ্দীন উমর, *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বিবিসি, বিসিডিজেসি, ২০০১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, বিভিন্ন খণ্ড, ১৯৮২

বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়টিক সোসাইটি, ২০০১

বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮৬

বেবী মওদুধ (সম্পা), *বাঙালির শুদ্ধ নাম শেখ মুজিবুর রহমান*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

বেলাল চৌধুরী, *বত্রিশ নম্বর*, আগামী, ঢাকা, ১৯৯৭

মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী, পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বিবৃতি, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৪

মহাদেব সাহা, *মহাদেব সাহার শ্রেষ্ঠ কবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯

মাসুদুল হক (অনু), *সিদ্দিক সালিকের নিয়াজীর আত্মসমালোচনা দলিল*, নভেল পাবলিকেশন, ১৯৮৮

মাহবুব তালুকদার, *বঙ্গভবনে পাঁচ বছর*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯২

মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রবন্ধ, *যুগান্তর*, ১৪ আগস্ট, ২০০৩

মিজানুর রহমান (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, নভেল পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৮৮

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪

মুসা সাদিক, *ইতিহাসের আলোকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা*, জনকণ্ঠ, ৪ এপ্রিল, ২০০২

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের বিদেশনীতি, *দৈনিক সমকাল*, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

মোনায়েম সরকার (সম্পা), *বাঙালির কণ্ঠ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; জীবন ও রাজনীতি*, ১ম ও ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৮

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দীন, 'ধন্য সেই পুরুষ', *কৃষি ও কৃষকের দেশ*, বেতার বাংলা সংকলন, জুন ২০০০

মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সহজ পাঠ*, সুমুন্নয়, ডিসেম্বর ২০০৮

মোস্তফা জামান আব্বাসী (সম্পা.), *স্বাধীনতা দিনের গান*, বাংলাদেশ লোকসংগীত সমিতি ঢাকা, ১৯৭২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, বিভিন্ন খণ্ড, বিশ্বভারতী

রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ : বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত বক্তৃতা ও বিবৃতি*, কখন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯

লর্ড ব্রকওয়ে, লিবারেশন-এর চেয়ারম্যান, ১৯৭৯ সালে বঙ্গবন্ধু মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া বাণী

লেনিন আজাদ, *ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষিকাঠামো*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৯

শন ম্যাকব্রাইড, সর্ব ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর ৬২তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণ, লন্ডন, ২০ মার্চ, ১৯৮২

শামসুর রাহমান, *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯

শাহরিয়ার ইকবাল (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধুর জীবনের শেষ বছরের দৈনন্দিন কর্ম তালিকা ও কতিপয় দলির*, উত্তরবঙ্গ প্রকাশনী, ২০০০

শেখ হাসিনা, *'শেখ মুজিব আমার পিতা'*;, *বিচিত্রা* ১৬ আগস্ট, ১৯৯৬

শেখ বদরুল আলম (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধুর যত কবিতা*, আলো প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : শিল্পচিন্তা, রবীন্দ্র-রচনা সংকলন*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লি. কলকাতা, ১৯৯৬

সিদ্দিকুর রহমান অনূদিত *রবার্ট পেইন-এর সেই দুঃসময়*, (মূল : The Tortured and the Damned), অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

সিরাজউদ্দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১

সেলিনা হোসেন, বঙ্গবন্ধু তোমার জন্মদিনে, *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৭ মার্চ ২০০৬

সেলিম রেজা (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮

সৈয়দ শামসুল হক, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০

হুমায়ুন আজাদ, *'স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিব'*, *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৭ মার্চ, ২০০৬

Amarty Sen, *Development as Freedom*, Alfred A. Knoff Inc, New York, 1999

Anthony Mascarenhas, *Bangladesh: A legacy of Blood*, London, Hodder & Stoughton, 1986

Archer K Blood, *The Cruel Birth of Bangladesh*, UPL, Dhaka, 2002

Bangabandhu Speak, Published by Bangladesh government, 1972

L. Azad, *The Mass Uprising in 1969; A Sociological Analysis*, (Unpublished Ph.D Thesis)(, Dhaka University, 1993

Moudud Ahmed, *south Asia: Crisis of Development (The case of Bangladesh)*, UPL, 2005

Nurul Islam, *Making of a Nation Bangladesh: An Economist's Tale*, UPL, Dhaka, 2003

Obaydul Haq, *Bangabandhu Sheikh Mujib : A Leader with a Difference, Radical Asia Publication*, 1996-(2nd ed.)

R. Sen, Political Elites in Bangldesh, UPL,Dhaka, 1986

Refiqul Islam, A Tale of Millions: BangladeshLiberation War-1971, Ananya, Dhaka, 2005 (rpt)

Roaded Khan (ed), *The American Papers*

S. A. Kari, *Sheikh Mujib: Trumph and Tragedy*, UPL, Dhaka, 2005

Shahryar Iqbal (ed), *Sheik Mujib in Parliament* (1955-568), Agamee Prakshani, Dhaka

Ziaur Rahman, *Speches of Sheikh Mujib in Pakistan Parliament*, 1955-56, Haqqani Publishers, Dhaka, 1990

দৈনিক আজাদ, ২৯ অক্টোবর, ১৯৭
দৈনিক আজাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭১
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ মে, ১৯৭৪

দৈনিক পাকিস্তান, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১
দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭১
দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

দৈনিক বাংলা, ৮ মে, ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ২৫ মে, ১৯৭২
দৈনিক বাংলা, ১০ এপ্রিল, ১৯৭৩
দৈনিক বাংলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
দৈনিক বাংলা, ২৬ মার্চ, ১৯৭৫
দৈনিক বাংলা, ৪ জুলাই, ১৯৭৫

দৈনিক সংগ্রাম, ৪ জানয়ারি, ১৯৭১
দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১
দৈনিক সংবাদ, ৮ মে, ১৯৭২
দৈনিক সংবাদ, ২১ মে, ১৯৭২

The Finanical Times, London, August 16, 1975
The Guardina, 27 march, 1971
The Listener, London, August 28, 1975
The Times, 27 March, 1971

The Encyclopaedia Britanica, 1998

www.bangladoot.org
www.aboutbangladesh,osp

নির্ঘণ্ট

অংশুমান রায় ২২, ২৩২
অন্নদাশঙ্কর রায় ২৫, ২৩৯, ২৪২
অমর্ত্য সেন ১৭২, ২৫৯
অ্যালেন গিন্‌সবার্গ ২৩৯
আইভি রহমান ২৩৯
আইয়ুব কাদরি ১৭০
আইয়ুব খান, প্রেসিডেন্ট ২৫, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৬০, ১৭৭
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ২৫, ৫৭, ৫৮, ১৬০
আতাউর রহমান খান ৫২
আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক ৯৯, ১০০, ২৩৩
আনিসুর রহমান, অধ্যাপক ২৩৩
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১
আবদুল্লা আল ফারুখ ২৩৩
আবু হোসেন সরকার ৫৩
আবুল কাশেম ১৩৫
আবুল কাশেম সন্দ্বীপ ২৩৩
আবুল ফজল ২২৩, ২৩৩
আবুল মনসুর আহমদ ১০২, ১০৪
আবুল মাল আবদুল মুহিত ১৭৪
আবুল হাশিম ১২, ৩৩, ৩৪
আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যাপক ১২৫, ২২৩
আব্দুল আহাদ, সঙ্গীতশিল্পী ৭২
আব্দুল মোনেম খান, গভর্নর ৫৫, ১৭৭
আবদুল হামিদ খান ভাসানী— দ্র. মওলানা ভাসানী
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ৪৪৬
আব্দুস সামাদ [আজাদ] ২১২
আমিনুর রহমান ২৩৩
আমিরুল ইসলাম ৫৮
আর্চার কে, ব্লাড ১৬৭
আলতাফ মাহমুদ, সঙ্গীতজ্ঞ ২৩২
আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ২৩
আসলাম সানী ৪৭৩
আসাদ চৌধুরী ৪৬৪

আসাদুজ্জামান আসাদ ৫৯
আহসানউল্লাহ মাস্টার ২৩৯
আঁদ্রে মাল্‌রো ২৩৯
ইউনেস্কো ৮৯
ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স ১০০
ইন্দিরা গান্ধী ৮৩, ১৯৮, ২০০
ইবনে বতুতা ২৩
ইয়াহিয়া খান ৬১, ৬৮, ৬৯, ৭৭, ৮২
ইস্কান্দার মীর্জা ৫৩

এ. আর. মল্লিক, ডক্টর ২৩৩
এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ৫৬
এ. কে. খন্দকার, এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) ২৬২
এ. কে. ফজলুল হক, শেরে বাংলা ৪১, ৪৩
১১ দফা ৬৩, ৬৫, ৭১
এডওয়ার্ড হীথ ৮৩
এম. আর. আখতার মুকুল ২৩২
এম. এ. হান্নান ১৬৩
এম. নজরুল ইসলাম ২৫৯
এম. মনসুর আলী ১৬১
এস. এ. এম. এস. কিবরিয়া ২৩৯

ঐক্যফ্রন্ট ৯২

ওবায়দুল হক ৩২

কঅপ (কোম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি) ৫৪
কবীর চৌধুরী ২৩৩
কাইয়ুম চৌধুরী ২৩৭
কাগমারী সম্মেলন ৫৩
কাজী আরিফ ২৩৯
কাজী এম. বদরুদ্দোজা ২১৩
কাজী নজরুল ইসলাম, কবি ২০৭, ২৩৫, ২৩৯
কাজী হাবিব উদ্দিন ২৩৩

কামরুল হাসান, শিল্পী ২২৩
কামাল আতাতুর্ক ১০২
কামাল লোহানী ২৬৪
কামাল হোসেন, ড. ৬৭
কিম ইল সুং ১০২
কিরণশঙ্কর রায় ১২
কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন ২৩৯
কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ২৩১
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী- দ্র. মনসুর আলী

খন্দকার মোশতাক ৫৬
খাজা খায়েরউদ্দিন ৬৭
খাজা নাজিমউদ্দিন ৩৯, ২২৫
খান সারওয়ার মুরশিদ, অধ্যাপক ২২৩

গাজিউল হক ৩০
গাজী গোলাম মোস্তফা ৭৩
গাজী মাজহারুল ইসলাম ২৩৩
গোলটেবিল বৈঠক ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ২২, ২৩৩

চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল ২৩১
চিত্তরঞ্জন দাস, দেশবন্ধু ১২

৬ দফা ৫৫, ৭৩, ৭৪, ১৪৫
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৫৯

জয়নুল আবেদিন, শিল্পী ১৪৬, ২২৩
জর্জ ওয়াশিংটন ১০২
জর্জ বার্নার্ড শ ২৩৩

জর্জ হ্যারিসন ২৩৯
জসীমউদ্‌দীন, কবি ২২৮, ৪৪৯
জহুরুল হক, সার্জেন্ট ৫৯

'জাতির পিতা' ১০২
জাতীয় শ্রমিক লীগ ৬১
জাতীয় সঙ্গীত ২৩৫
জাহিদুর রহিম, রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী ২৩৫
জিয়াউর রহমান ১৫৭, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৪
জিল্লুর রহমান ২০২
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক ২৬২
জীবনানন্দ দাশ ২১৫
জুলফিকার আলী ভুট্টো ৬৮, ৬৯, ৭৩, ৭৫
জেনারেল আকবর ৮২
জেনারেল টিক্কা খান ১৬৪
জেনারেল নিয়াজী ১৬৪
জেলা গভর্নর ৯৮, ২১৩
জ্যোতি বসু ২৬০

টমাস উইলিয়াম্‌স্‌ (কিউ. সি.) ৫৭

ডাকসু ৫৯
ড্যাক ৬০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৪, ৯১

তসদ্দুক আহমদ ৩৫
তাজউদ্দীন আহমদ ৫৬, ১৫০
তোফায়েল আহমদ ৫৯

দুই অর্থনীতি ১১৫
দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৩

নক্রুমা ১০২
নির্মলেন্দু গুণ ২১৫, ৪৫৫

নুরুল আমীন ৩৬
নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক ২২৩, ২৩৩

পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টি ৭৩
পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র লীগ ৫৮, ৭১
পূর্ব পাকিস্তান সংগীতশিল্পী সমাজ ৭২
প্রজাস্বত্ত্ব আইন ১১০
প্রণব ঘোষ ২৩৩
প্রফেসর মোজাফ্‌ফর আহমদ, রাজনীতিবিদ ১৬৪

ফয়েজ আহমদ ১৩১
ফার্সি ভাষা ৮৭

'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ৫৯
বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন ২৩১
বঙ্গবন্ধু পুরস্কার ২১২, ২১৩
বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন ২৩১
বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক ২৩২
বঙ্গভঙ্গ ১১১
বাংলা একাডেমি ২৩১
বাংলা চুক্তি ১১৭
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ২৩৭
বাকশাল ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭
বাবলু জোয়ারদার ২১৫
বেলাল চৌধুরী ৪৬৩
বেলাল মোহাম্মদ ২৩২
বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ২৬৩

ভাষা আন্দোলন ৩৫, ৩৬, ৩৯, ২২৪

মওদুদ আহমদ ৫৮
মওলানা ভাসানী ৪৪
মঞ্জুরুল ইসলাম ২৩৯
মতিয়া চৌধুরী, 'অগ্নিকন্যা' ১৭৯
মণি সিংহ ১৬১
মনোরঞ্জন ধর ১০৯
মমতাজউদ্‌দীন আহমদ, অধ্যাপক-নাট্যকার ২৬৩

মযহারুল ইসলাম ৪৭২
মহাত্মা গান্ধী ১০২
মহাদেব সাহা ৪৫৮
মাও সেতুং ১০২
মাসুদুল হক ১৬৪
মাহবুব তালুকদার ২৩৪
মুশাররফ হোসেন, অধ্যাপক ২৩৪
মুসা সাদিক ১৬৪
মুস্তফা আলম ২৩২
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, অধ্যাপক ২৬৬
মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক ২২৩
মুহম্মদ এনামুল হক ২২৩
মুহম্মদ নুরুল হুদা ৪৬৮
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. ২২৩
মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, বিচারপতি ১৮১
মেজর রফিক, দ্র. রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম
মোজাফ্ফর আহমদ, রাজনীতিবিদ ১৬১
মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক ২৩৩
মোহাম্মদ ফজলুল হক, ফ্লাইট সার্জেন্ট ৫৯
ম্যান্ডেলা ১৮
ম্যাসকারানহ্যস ১৬৩
যুক্তফ্রন্ট ৪০, ৪১, ৪২

রথীন্দ্রনাথ রায় ২৩২
রফিক আজাদ ৪৬৭
রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম ১৬৩
রবার্ট পেইন ২৩৩, ২৩৪
রবিশঙ্কর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩৩, ২৩৫
রবীন্দ্রসঙ্গীত
রশীদ চৌধুরী, শিল্পী
রাজু আহমেদ ২৩২
রাশিদুল হাসান ২৩২
রাষ্ট্রভাষা– দ্র. ভাষা-আন্দোলন

রেজাউল করিম চৌধুরী ২৩২
রেহমান সোবহান, অধ্যাপক ১১৫
রোজনামচা ২৫১
রোয়েদাদ খান ১২৪

লর্ড ব্রকওয়ে
ললিতকলা একাডেমি
লাহোর প্রস্তাব দিবস
লেনিন. ভ্লাদিমির ইলিচ

শওকত ওসমান
শন্ ম্যাক্ব্রাইড্ ১৩১, ২৬০
শফিকুজ্জামান ২৩২
শরৎচন্দ্র বসু ১২
শামসুদ্দোহা
শামসুর রাহমান ৪৫২
শামসুল হক
শাহরিয়ার ইকবাল ২৫৭
শেখ হাসিনা ৩১
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১২

সত্যজিৎ রায় ২২৩
সত্যেন্দ্রনাথ রায় ২১৭, ২১৮
সন্জীদা খাতুন ২৩৬
সমর দাস ২৩২
সর্দার আলাউদ্দিন ২৩২
সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩৬, ৩৭
সালাহ্উদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক ২৬২
সিকান্দার আবু জাফর ৪৬১
সিদ্দিক সালিক ১২২
সিরাজউদ্দীন আহমেদ ২৩২
সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক ১২৩
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক ২৬৪
সুকর্নো ১০২